ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোঃ জামাল উদ্দিন খান
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং ৭৮/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ২০১৯

পিএইচ.ডি.
থিসিস

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান

মোঃ জামাল উদ্দিন খান

★

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১৯

উৎসর্গ

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ
সমাজসংস্কারক মহানবী
হযরত মুহাম্মদ সা.
এবং
শ্রদ্ধেয় মাতা ও পিতার
নামে উৎসর্গীকৃত

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে ঘোষণা করছি যে, **ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান** শীর্ষক শিরোনামে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে রচিত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার শিক্ষক মহোদয় ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য বা প্রকাশের উদ্দেশ্যে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক উপস্থাপিত হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে অন্য কেউ এ শিরোনামে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেননি।

তারিখ : ঢাকা
০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯

(মোঃ জামাল উদ্দিন খান)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং- ৭৮/২০১৩-২০১৪
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ফোন : ৮৮০-২-৯৬৬১৯০০, ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল : mazamanbd@yahoo.com

Dr. Md. Akhteruzzaman
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Tel: 880-2-9661900, Fax: 880-2-8615583
E-mail: mazamanbd@yahoo.com

সূত্র :

তারিখ : ০৮ ডিসেম্বর, ২০১৯

প্রত্যয়ন পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক মোঃ জামাল উদ্দিন খান কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ ও সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে প্রণীত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের উদ্দেশ্যে বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক উপস্থাপিত হয়নি।

আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই উক্ত শিরোনামে ডিগ্রি লাভের জন্য কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ তা'আলার অশেষ কৃপায় **'ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান'** শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। যথারীতি গবেষণাটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান সমাজসংস্কারক মহানবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর শানে অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি।

এ গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ পর্যায়ে সর্বপ্রথম আন্তরিক ও গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অত্র গবেষণা কর্মের স্বনামধন্য তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালরেয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান স্যারের সমীপে। যিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয়ের মাধ্যমে অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি সার্বিক সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। তিনি আমার গবেষণা পত্রের প্রতিটি শব্দ পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন-বিয়োজন করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এক কথায় এ গবেষণা কর্মের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ছত্র, তার অবদানের সাক্ষ্য বহন করছে। এর প্রতিদানস্বরূপ মহান আল্লাহ তার উত্তম পুরস্কার দান করুন।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর ড. শেখ মোঃ ইউসুফসহ অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী ও একাডেমিক কমিটির সদস্যবৃন্দকে যারা পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য নির্ধারিত দু'টি সেমিনারে আমার উপস্থাপিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে গঠনমূলক সমালোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে আমাকে এ গবেষণা কর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। আমি তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয়া জান্নাতবাসী মা মরহুমা কোহিনুর বেগমকে। যিনি বিগত ৯ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ২০১১ খ্রি. তারিখে ইনতিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। যার দু'আ-ই আমার জীবন চলার পাথেয় এবং সৎকর্মে অনুপ্রেরণার উৎস। যিনি আজীবন আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য নিজের সুখকে বিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের সৎ মানুষ ও সৎপথে চলার জন্য তিনি সবসময় আমাদের সদুপদেশ দিয়েছেন। সাথে সাথে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ মোসলেম উদ্দিন খান-কে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তার সদুপদেশ, সততা, ও নিষ্ঠা আমাকে এখনও সৎপথে চলতে অনুপ্রেরণা যোগায়।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবার দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতের কারণেই আজ আমি জীবনের এতদূর পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছি। আজ এই স্মরণীয় মুহূর্তে মহান আল্লাহর দরবারে আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা-বাবার পবিত্র আত্মার শান্তি, মাগফিরাত, মুক্তি ও জান্নাত কামনায় দু'আ করছি। মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন (আমিন)।

আজ এ স্মরণীয় মুহূর্তে আমি আরও স্মরণ করছি আমার পরম সঙ্গিনী আসমা আক্তার মুন্নীকে। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে আমাকে অনবরত উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা

Dhaka University Institutional Repository

যুগিয়েছে। আমি তার কাছে চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ। আজ আমি স্মরণ করছি আমার পরম স্নেহের কন্যা সন্তান নুর-এ জান্নাত ও মারইয়ামকে। আমি তাদের সুস্বাস্থ ও দীর্ঘায়ু এবং ইহকালিন কল্যাণ ও পরকালিন মুক্তি কামনা করছি। তারা যেন ইমানদার, নামাযি ও ইসলামের খাদিমা হিসেবে জীবন যাপন করতে পারে এবং সমাজের মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারে সে জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

আমার বড় ভাই মোঃ কামাল উদ্দিন, বড় বোন রেজিনা পারভিন, ছোট বোন উম্মে ছালমা লিয়া ও ভাতিজি মায়িশা প্রত্যেকেই যার যার স্থান থেকে দু'আ ও ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং তাদের সুস্বাস্থ্য, নেক হায়াত, ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন সাফল্যের জন্য মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

আমি আমার বন্ধু মোঃ রুহুল আমীনকেও কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পন্য করব না, কারণ সে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে আমাকে গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে।

জনাব এ.বি.এম নূরুল্লাহ অভিসন্দর্ভটি দক্ষতা ও আন্তরিকতাসহ কম্পিউটার কম্পোজ, মুদ্রণ ও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে গবেষণাকর্মে অনেক সহযোগিতা করেছেন। এজন্য তার কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নিবেদন করছি, তিনি যেন তাঁর এ বান্দার ক্ষুদ্র সাধনা কবুল করেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি দান করেন।

(মোঃ জামাল উদ্দিন খান)
পিএইচ.ডি. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

(ক) বিভিন্ন গ্রন্থের নাম, গ্রন্থাকারের নাম, ব্যক্তির নাম, গ্রন্থাকারের রচিত বা ব্যবহৃত শব্দকে যথাযথভাবে রাখা হয়েছে। তবে আল কুরআনের শব্দের ক্ষেত্রে সর্বত্র আল কুরআন বা কুরআন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব বইয়ে এসলাম বা এছলাম ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থলে ইসলাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) বিদেশি শব্দাবলির ক্ষেত্রে বাংলা আধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আমার লেখা এ অভিসন্দর্ভে আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দের অনুলিখন প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে শব্দগুলো বাংলায় যেভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সেভাবেই প্রচলিত বানান গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, কতিপয় শব্দ– আইন, আদালত, আখিরাত ইত্যাদি।

গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত পাঠ সংকেত বা অনুলিখনের ক্ষেত্রে অনুসৃত রীতি হলো :

অনু.	:	অনুবাদ
অনূ.	:	অনূদিত
ইফাবা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
ইং	:	ইংরেজি
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
প্রাগুক্ত	:	পূর্বোক্ত/পূর্বের উক্তি
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
তাং	:	তারিখ
তা.বি.	:	তারিখ বিহীন
পরি.	:	পরিশিষ্ট
সা.	:	সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা ‘আনহু/‘আনহা
রহ.	:	রহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি
আ.	:	‘আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম
হি.	:	হিজরি সাল
খ.	:	খণ্ড
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ/খ্রিষ্টাব্দ
খৃ.পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
ড.	:	ডক্টর (পিএইচ.ডি./ Doctor of Philosophy)
পৃ.	:	পৃষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

মৃ.	:	মৃত্যু
সং.	:	সংস্করণ
AD	:	After death of Christ
C.	:	Christ
Cf.	:	Confer/Compare
ed.	:	edition
eds.	:	edited
H.	:	Hijrah
N.B.	:	Note Bane
IFB	:	Islamic Foundation Bangladesh
ibid	:	ibidem, which means ‘in the same place’
M.Phil	:	Master of Philosophy
p.	:	Page
Ph.D.	:	Doctor of Philosophy
pp.	:	Pages
vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

গবেষণা পত্রে ব্যবহৃত আরবি বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণায়নের ব্যাপারে অনুসৃত নিয়ম

ব্যঞ্জনবর্ণ		ব্যঞ্জনবর্ণ		স্বরবর্ণ	
ء	ঊর্ধ্বকমা	ط	ত্ব	ـَـ	অ, আ- া
ب	ব	ظ	য	ـِـ	ই- ি
ت	ত	ع	‘ (উল্টো কমা)	ـُـ	উ- ু
ث	স	غ	গ/ঘ	ـَا	আ-া
ج	জ	ف	ফ	ـِيْ	ঈ-ী
ح	হ	ق	ক	ـُوْ	ঊ- ূ
خ	খ	ك	ক	أَ	আন্
د	দ	ل	ল	إِ	ইন্
ذ	য	م	ম	أُ	উন্
ر	র	ن	ন	ـْـ	হস্ চিহ্ন
ز	য	و	ও/ভ	ـّـ	বর্ণ দ্বিত্ব চিহ্ন
س	স	ه	হ		
ش	শ	ة	হ/ঃ		
ص	স/স্ব	ي	য়		
ض	দ/দ্ব				

ء (হামযা) আলিফের মত। তবে সাকিন হলে (’) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, مُؤْمِنٌ = মু’মিন।
ع হরফের উচ্চারণে (‘) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন, عُشْرٌ = ‘উশর, شَافِعِيْ = শাফিয়ি‘, اِجْتِمَاعْ = ইজতিমা‘।

বহুল প্রচলিত বাংলা শব্দের বানানগুলো অনেক ক্ষেত্রে যথা অবস্থায় রাখা হয়েছে। যেমন- যাকাত, ওয়াকফ, হিবা, মিরাছ, গনিমাহ, খারাজ, মাযহাব, ওয়ায, হায়াত, আলিম, ফরজ, সুন্নাত প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

- উৎসর্গ ii
- ঘোষণা পত্র iii
- প্রত্যয়ন পত্র iv
- কৃতজ্ঞতা স্বীকার v
- শব্দ সংক্ষেপ vii
- প্রতিবর্ণায়ন ix
- সূচিপত্র x

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

- গবেষণা প্রস্তাবনা ১
- গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব ৩
- গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য ৬
- গবেষণা কর্মের পদ্ধতি ৬
- গবেষণা কর্মের পরিধি ৭
- গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্তের উৎস ৭
- গবেষণা কর্মের সময়কাল ৭
- গবেষণা কর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা ৮
- গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা ৮
- অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা ১১
- উপসংহার ১২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের পরিচয়	১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামি সমাজের পরিচয়	২৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইন	৪৭

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ পরিচিতি	১০৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	সমাজের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ	১২৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর	১৫৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা	১৬৩

চতুর্থ অধ্যায়
সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আইনসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তায় আইন বিভাগ	১৮১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তায় বিচার বিভাগ	১৯৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তায় শাসন বিভাগ	২০৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ	২৩৮

পঞ্চম অধ্যায়
সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা	২৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	নারীর নিরাপত্তা অবস্থা	২৬৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	শিশুর নিরাপত্তা অবস্থা	২৮২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	শ্রমিকের নিরাপত্তা অবস্থা	২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায়

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩১৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ভুক্তভোগীগণের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা	৩২৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সুপারিশ ও করণীয়	৩৩৩

- উপসংহার ৩৩৮
- পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার অনুসূচি ৩৪২
- গ্রন্থপঞ্জি ৩৪৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal)

মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে পূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করাই মানুষের ঐকান্তিক বাসনা। সামাজিক নিরাপত্তা বলতে মূলত যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা থেকে সমাজের নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাকে বুঝায়। নিরাপত্তা শব্দের অর্থ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া, রক্ষা করা, নিরাপদ থাকা, নিরাপদ রাখা। সে অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হলো এমন এক ধরনের ব্যবস্থা বা কর্মসূচি যার মাধ্যমে সমাজবাসীকে সম্ভাব্য বিপদাপদ থেকে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করা। যেমন– হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া, মৃত্যু, বার্ধক্য, রোগ-ব্যাধি, বেকারত্ব, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, পানিতে ডুবে মারা যাওয়া, যানবাহন সংক্রান্ত দুর্ঘটনা, এছাড়া যে কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে তা সবই সামাজিক নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার কারণ এবং এ সকল সমস্যা থেকে সমাজবাসীকে রক্ষা করে নিরাপত্তা দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তা। আবার সামাজিক নিরাপত্তা বলতে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত এক ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বুঝায়। মূলত যে সব সমস্যা ও অর্থনৈতিক দুর্যোগে মানুষ নিজের সম্পদ, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা মুকাবিলা করতে পারে না, সেসব দুর্যোগ থেকে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক যে ব্যবস্থাসমূহ নেয়া হয় সেগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বলে। সামাজিক নিরাপত্তার লক্ষ্য হলো সমাজের অক্ষম ও বিপন্ন মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের ব্যবস্থা করে জীবনযাত্রার একটি ন্যূনতম মান বজায় রাখা।

আধুনিক সমাজে সামাজিক নিরাপত্তা বিকাশে ইসলামের অবদান সর্বাধিক তাৎপর্যমন্ডিত। ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মই নয়; একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাও বটে। সমগ্র মানবজাতির মুক্তি ও কল্যাণের বাণী নিয়ে ইসলামের আবির্ভাব। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবন এক অবিভাজ্য সত্তা। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে উন্নয়ন এবং কল্যাণের প্রতি এতে সমান গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, অসহায়কে সহায়তা দান, নিরাশ্রয়কে আশ্রয়দান, বিপদগ্রস্তকে পরিত্রাণ প্রদান এবং অক্ষমকে সহানুভূতি প্রদর্শনকে অতিমাত্রায় উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মানবতাবোধের বিকাশ, মানবিক চেতনা সৃষ্টি এবং পারস্পরিক বিপদাপদে সাহায্য দানের প্রেরণা ইসলামই মানুষের মধ্যে জাগ্রত করেছে।

ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা মানুষকে স্বাধীনভাবে এবং মান-মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ইসলাম সর্বক্ষেত্রে পরোপকার, জনসেবা, দানশীলতার প্রতি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ধনী-দরিদ্র প্রত্যেক সামর্থবান ও সক্ষম মানুষকে এ কাজে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে। ধনী ব্যক্তি যেমন নিজের ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বলে জনসেবা ও জনকল্যাণে কাজ করবে, দরিদ্র ব্যক্তিও তেমনি নিজের শারীরিক শক্তি, সামর্থ্য, মুখের ভাষা ও মনের দরদ, চিন্তা ও সেবা দিয়ে এক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রাখতে পারে। এভাবে ইসলাম জনসেবা, জনকল্যাণ, পরোপকার, সদকা বা পূণ্যকর্মের প্রেরণা ও উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কারও আর্থিক অবস্থা তার সমাজের কল্যাণকর কাজের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। ইসলাম মানুষকে মানবপ্রীতির এত উঁচু স্তরে উন্নীত করে যেখান থেকে সৎ ও পূণ্যকর্মের প্রেরণা, উদ্দীপনা সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ফলে এ উৎসাহ-উদ্দীপনা মানুষের আবেগপ্রবণ মনকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। এ মানুষ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বৈশিষ্ট্য তথা নিজের কল্যাণে চিন্তা না করে দানশীল হয় এবং নিজের সঞ্চিত ধন-সম্পদ দুঃস্থ মানবতার সেবায় ব্যয় করে। এভাবে ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কল্যাণমুখী করে তোলে। এরূপ মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে মানবতাবোধ উৎসারিত হয়, সে মানবতাবোধের তাগিদেই মানবসমাজে গড়ে উঠে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। আর এ সম্পর্কের

Dhaka University Institutional Repository

অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের মধ্য দিয়ে সমাজে যে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয় মূলত সেটাই ইসলাম– পৃথিবীর একমাত্র কল্যানকামী জীবন আদর্শ। এ জন্যই ইসলামে দরিদ্র ও আর্তদের সেবা দান, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব পালন, দানশীল হওয়া, যাকাত প্রদান ও সমবেতভাবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সকলের সমাধিকার প্রদান ও ভোগ করা ইত্যাদি বিষয় পালনের জোরালো নির্দেশ রয়েছে। ইসলাম এভাবেই সমাজসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে মানুষকে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী দানশীলতা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। সেজন্য ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে সম্পদের সুষম বণ্টন, অসহায় জনগণের নিরাপত্তা বিধান ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। যাকাত ব্যবস্থাই বিশ্বের প্রথম সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যার দর্শন ও আদর্শের অনুসরণে গড়ে উঠেছে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ইসলামের আরেকটি সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান হল 'বাইতুল মাল'। ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নবি কারিম সা. রাষ্ট্রের জন্য সরকারি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করেছিলেন। আর এ অর্থভাণ্ডারের নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থানকে বাইতুল মাল বলা হয়। এর মাধ্যমেই জনগণের কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তাকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এক্ষেত্রে আরও একটি ব্যবস্থা হলো 'ওয়াকফ'। সাধারণত কোনো ধর্মীয় বা জনহিতকর কাজে কোনো মুসলিমের সহায়-সম্পদ ও সম্পত্তির সমুদয় বা আংশিক স্থায়ীভাবে দান করার প্রথাকে ওয়াকফ বলে। এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজের স্থায়ী কল্যাণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

'করযে হাসানা' হলো আরও একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপাদান। অভাবগ্রস্ত মানুষকে প্রয়োজনের মুহূর্তে সুদমুক্ত ও শর্তহীন ঋণ প্রদানের প্রথাকে করযে হাসানা বলে। পবিত্র কুরআনে এরূপ করযকে আল্লাহকে করয দেয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় এরূপ আরও কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে সদাকায়ে যারিয়া, সদাকাতুল ফিতর, কুরবানির পশুর চামড়ার বিক্রয়লব্দ অর্থ দান, 'উশর ও খারাজ অন্যতম। ইসলামের এসব ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন ও দরিদ্র জনগণের কল্যাণ সাধন। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসলাম মানব সমাজের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে খুলাফায়ে রাশিদিনের আমলে বিশ্বের প্রথম কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে জনগণের কল্যাণ সাধনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো বাইতুল মাল ব্যবস্থা। বিশ্বের সকল দারিদ্র্য বিমোচন আইন এবং নিরাপত্তা কর্মসূচির পথপ্রদর্শক ও ভিত্তি হিসেবে বাইতুল মালকে আখ্যায়িত করা হয়। বাইতুল মালের আদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতে পৃথিবীর সব দেশে জনকল্যাণ বিভাগগুলো পুরোপুরি না হলেও আংশিকভাবে বাইতুল মালের ভূমিকা পালন করে থাকে।

ইসলামের শুরু থেকেই যে পুরুষ বা নারী তার মৌলিক চাহিদা পূরণে অক্ষম বা অপারগ তার চাহিদা পূরণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর অর্পিত ছিল। ইসলামের মহান আদর্শে যার কোনো অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই তার অভিভাবক। এছাড়া যার অভিভাবক নেই রাষ্ট্রপ্রধানই তার অভিভাবক। ইসলামের আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে যায় তা তার ওয়ারিসগণ পেয়ে থাকে। আর যে ব্যক্তি অসহায় পরিবার-পরিজন রেখে যায় তাদের দায়-দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের। ইসলামে যাকাত প্রদান করা ফরয করা হয়েছে। যাকাত হলো ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তার প্রথম প্রতিষ্ঠান। বার্ষিক মোট সঞ্চয়ের ২.৫ শতাংশ হারে যাকাত প্রদান করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিম নর-নারীর উপর অবশ্যপালনীয় ফরজ। ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো ধনীদের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ করা এবং তা দরিদ্রদের মাঝে সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

সামাজিক নিরাপত্তা সম্বন্ধে ইউরোপিয়রা যে চিন্তা বা ধারণা পোষণ করেণ তা তাদের নিজস্ব চিন্তাধারা বা মস্তিষ্ক প্রসূতও বলা যায়। কিন্তু ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত, যা কুরআন ও হাদিসে নির্দেশিত ও সন্নিবেশিত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পূণ্য নেই; কিন্তু পূণ্য আছে– কেউ আল্লাহ,

Dhaka University Institutional Repository

পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবি-রাসুলগণের উপর ইমান আনলে এবং গরিব আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, অভাবগ্রস্থ, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করলে, সালাত কায়িম করলে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূরণ করলে, আর্থিক সংকট, দুঃখ-ক্লেশ ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকি।'[১]

উক্ত আয়াতে মুসলিমদের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে তা তাদের পূরণ করা অপরিহার্য। কুরআনে গরিব ও অভাবী লোকদের সাহায্য প্রদান করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কুরআন সমাজের প্রতিটি উপার্জনক্ষম সদস্যকে সহযোগিতামূলক কর্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্ট প্রতিটি জীবের প্রতি দয়ার মনোভাব পোষণ করার আহ্বান জানিয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করতে পারবে না। তোমরা যা কিছু ব্যয় কর আল্লাহ সে বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞাত।'[২]

মুসলিম সমাজে কোনো মহিলা যদি অবিবাহিতা বা স্বামী পরিত্যাক্তা বা বিধবা হয় তাহলে তাকে দেখাশুনার দায়িত্ব বর্তায় তার পরিবারের পুরুষ সদস্যদের উপর যদি সে (মহিলা) উপার্জনক্ষম না হয়। ইসলামে ছেলে-মেয়ের শিক্ষা-দীক্ষা এবং দেখাশুনার দায়িত্ব পিতামাতার। সন্তানরাও পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় তাদের দেখাশুনা, সেবা-শুশ্রূষা করবে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী, উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী সন্তান এবং পিতামাতা একে অপরের সম্পদ লাভ করে। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার মত কোনো কারণ না থাকলে কেউই তাদেরকে তাদের নির্ধারিত অংশ থেকে বিরত রাখতে পারে না।

বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র ও অনুন্নত দেশে দরিদ্র শ্রেণি, নিম্ন বেতনভুক্ত কর্মচারী ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ এবং ঋণ সমস্যার সমাধানে বাইতুল মাল ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ প্রতি বছর যাকাত, উশর, ফিতরা, সদকা, কুরবানির চামড়া ইত্যাদি খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। পরিকল্পিত উপায়ে এসব অর্থ সংগ্রহ করে বাইতুল মালের ন্যায় তহবিল সৃষ্টি করা গেলে দারিদ্র্য বিমোচন, ভিক্ষাবৃত্তি রোধ, পতিতা পুনর্বাসন, অক্ষম বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা, ও স্বামী পরিত্যক্তাদের পুনর্বাসন ইত্যাদি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। বাইতুল মালের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত সেবামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করা যেতে পারে। আর এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই **ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান** শিরোনামে পিএইচ.ডি. গবেষণা করার আবশ্যকতা অনুধাবন করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Improtance of the Research)

আরবীয় মুসলিমদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্র ধরেই প্রাচীন বাংলায় তাদের আগমন ঘটে। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য নয়, শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারের জন্যই এসেছেন অনেকেই। ইসলামের সোনালী যুগের এবং তার নিকটবর্তী যুগের মুসলিমগণ যেই উদ্দেশ্যে যেখানেই যেতেন না কেন তারা ইসলামি জীবনদর্শনের মর্মকথা মানুষের সামনে উপস্থাপন করার কোনো সুযোগ ত্যাগ করতেন না। এ পথ ধরেই অতি প্রাচীন কালে বাংলায় ইসলামের আগমন। এখানে এসে ইসলাম ধর্ম এবং তৎকালীন মুসলিম সভ্যতা একটি সর্বতোভাবে বিপরীতমুখী সভ্যতার সংস্পর্শে আসে। হিন্দুদের বর্ণবৈষম্য নীতি তাদের সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ব্রাহ্মণরা অন্যান্য বর্ণের লোকদের উপর নির্মম নির্যাতন শুরু করে এবং কুলীন প্রথা আরোপিত হওয়ার পর তাদের অত্যাচার আরও বেড়ে যায়।

১. আল-কুরআন, ১১ : ১৭৭
২. আল-কুরআন, ৩ : ৯২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা যখন তাদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে পড়ে এবং পরিত্রাণের পথ খুঁজছিল তখন প্রাচীন বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটে। ইসলামের উদারতা, ন্যায়, সাম্য এবং শান্তির বাণী নিপীড়িত হিন্দুদেরকে মুগ্ধ করে এবং ফলে কেউ কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। প্রাচীন বাংলায় ইসলামের আগমনের প্রভাবে হিন্দুধর্মের মধ্যে সংস্কার সাধন শুরু হয়। রামানন্দ, নানক, শ্রী চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষ হিন্দুধর্মের সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। মুসলিমগণের আগমনের ফলে বাংলার আইন, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, কলা ইত্যাদি বিভাগের উৎকর্ষ সাধিত হয়।

অবিভক্ত পাক-ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের ফলে এখানে মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীত এবং আচার-আচরণও ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রণীত হয় ইসলামি আইনের আলোকে অনেক আইন। পরিবার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইনও তা থেকে বাদ যায়নি। মুসলিম শাসনের অবসানের পর আসে ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশ শাসনামলে আইনের ক্ষেত্রে ব্যাপক সংশোধন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন সাধিত হয়। ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান শাসনকাল। পরে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এসব শাসনকালে আইনের ব্যাপক রদ-বদল হয়েছে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যূষিত এ এলাকায় সর্বদা পালিত হয়েছে ইসলামি আইনের আলোকে সামাজিক রীতি-নীতি।

উল্লেখ্য যে, আইন হচ্ছে এমন এক জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা বর্তমান যুগের সামগ্রিক মানবজীবনকে ধারণ করে। আইনের ব্যাপ্তি ও পরিধি অনেক বিস্তৃত ও ব্যাপক। মানবজীবনের যে কোনো বিষয়, তা জীবন-জীবিকা সম্পর্কিত হোক কিংবা সামাজিক আচার-আচরণ-অনুষ্ঠান সম্পর্কিত, কিংবা ব্যক্তিজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট কিংবা পারস্পরিক লেনদেন, ব্রবসা-বাণিজ্য বিষয় হোক, কিংবা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান সম্পর্কিত হোক সকলই আইনের আওতাভুক্ত। বর্তমানে স্বাভাবিকভাবে সবকিছুতেই আইনের শাসন মেনে নেয়া হয়েছে। আইনের উদ্দেশ্য হলো, সমাজে ভারসাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বিশ্বব্যাপী আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাবের কারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই এমন কিছু রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান থাকে যে রীতি-নীতি ও বিধি-বিধানকে কেন্দ্র করেই সে সমাজ বা রাষ্ট্রকে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। সে নীতি ও বিদানের ভিত্তিতেই সে সমাজ বা রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের নাগরিক ও সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করা হয়।

মানবেতিহাসের সূচনা থেকেই সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ জীবনে ভারসাম্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে আসছে। মানবসমাজের সূচনালগ্নে আজকের মতো এমন কোনো আইনি প্রতিষ্ঠান ছিল না, যে প্রতিষ্ঠান আইনের সংস্কার ও আধুনিকায়ন নিয়ে কাজ করত। তখনকার দিনে রাজা-বাদশাহগণ তাদের ইচ্ছা ও মর্জি মতো সমাজের জন্য যা প্রয়োজন বোধ করতেন সে অনুযায়ী নির্দেশ জারির মাধ্যমে আইন রচনা করতেন। তাদের রচিত আইন প্রজাদের জন্য অবশ্যপালনীয় হতো, কিন্তু রাজা-বাদশাহগণ নিজেরা কোনো আইন কিংবা বিধিবিধানের আওতাধীন থাকতেন না। তারা ছিলেন সকল বিধি-বিধান ও পালনীয় রীতিনীতির ঊর্ধ্বে। রাজা-বাদশাহদের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করা কিংবা এ সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করার কোনো অধিকার কারো ছিল না। শুধু তাই নয়, ধর্ম ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও এখতিয়ার তৎকালীন রাজা-বাদশাহদের হাতে ন্যস্ত ছিল। ফলে সাধারণ মানুষ শাস্তির ভয় এবং রাজার আনুগত্যের প্রেরণা থেকে রাজা-বাদশাহদের যে কোনো আদেশ নিঃশঙ্কোচে পালন করত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু যুগের পরিবর্তন ও সময়ের বিবর্তনে মানুষের মধ্যে নতুন নতুন রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটে। রাজা, রাজত্ব ও শাসন নীতির ব্যাপারে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় নতুন ধারণা, নতুন চেতনা। গণমানুষের মধ্যে রাজার নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস সঞ্চারিত হয়। ধীরে ধীরে গণমানুষের মধ্যে এ দাবি উচ্চকিত হতে থাকে যে, সমাজ ও কৃষ্টির উন্নতিকল্পে গণমানুষের চাহিদা, দাবি ও প্রত্যাশাকে আইন রচনার মৌল ভিত্তির মর্যাদা দিতে হবে। গণমানুষের চাহিদা ও সম্মতিকে উপেক্ষা করে কোনো নীতি ও বিদান রচনা করা যাবে না। এভাবে কোনো একক শক্তিধর ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কিংবা কোনো প্রভাবশালী মহলের আইন তৈরিতে একচ্ছত্র অধিকারকে অস্বীকার করার সূচনা ঘটে। সে সাথে রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আইন রচনার মৌলভিত্তি করার দাবি শক্তিশালী হতে থাকে।

ফলে পাশ্চাত্যের আইন বিশেষজ্ঞগণ যে ব্যাপারে গণমানুষের সম্মতি নেই, সেটিকে আইন রচনার ভিত্তি মানতে নারাজ। তাদের মতে, জনগণ যেটিকে আইনের ভিত্তি মানতে সম্মত কেবল সেটিই হবে আইন রচনার মূলনীতি। আধুনিক যুগে আইন রচনার ক্ষেত্রে গণমানুষের মতামত প্রদানের অধিকার মৌলিকভাবে স্বীকৃত। অতএব আইন হলো, মানুষের জীবনাচারকে সুশৃঙ্খল করার জন্য গণমানুষের সম্মতিতে যে নীতি ও বিধি-বিধান রচিত হয়, তা-ই হলো আইন। এ আইন শাসক গোষ্ঠী কার্যকর করে। এর ভিত্তিতে আইনের ক্ষেত্রে চারটি জিনিসকে মৌলিক শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। এ চারটি মৌল শর্তের নিরিখে যদি কোনো বিধি-বিধান কিংবা নীতি উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে সেটি আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে কোনো নীতি বা প্রস্তাব আইনে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য চারটি শর্ত পূরণ করতে হয়। চারটি শর্ত হলো– (ক) প্রস্তাবিত একটি নীতিমালা থাকতে হবে; (খ) বিধানের খসড়া প্রণয়নে একটি জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা থাকতে হবে; (গ) সেটির ব্যাপারে গণমানুষের সম্মতি থাকতে হবে এবং (ঘ) সেটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারকে পালন করতে হবে। তবেই কেবল সেটিকে আইন বলা যাবে।[৩]

পাশ্চাত্য এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যে নীতি ও বিধান সমাজে ভারসাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং যে সব নীতি মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অত্যন্ত জরুরি এসব ব্যাপারে অবশ্যই গণমানুষের সম্মতি ও সমর্থন আদায় করতে হবে। কারণ প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠী তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য নিজেরাই আইন ও নীতি বিধান রচনার অধিকার রাখে।

কিন্তু ইসলামি আইন এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলামি আইন কোনো একটি দল, একটি জাতি কিংবা একটি রাষ্ট্রের জন্য আসেনি; বরং তার বাণী সমভাবে গোটা মানব জাতির জন্য এসেছে। আরব ও অনারব, পূর্ব ও পশ্চিম, তাদের রীতিনীতি, প্রথা-পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিক অবস্থার মধ্যে যত পার্থক্যই থাক না কেন, ইসলামি আইন তাদের প্রত্যেককেই সম্বোধন করে। তাই ইসলামি আইন প্রতিটি পরিবার, গোত্র, দল ও রাষ্ট্রের আইন। বরং তা বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন আইন। আইন বিশেষজ্ঞগণ তা কল্পনা করতে পারেন; কিন্তু রচনা করতে সক্ষম নন।

ইসলামি আইন কোনো একটি নির্দিষ্ট যুগের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং তা প্রতিটি যুগের জন্য কার্যকর। ইসলামি আইনকে এমনভাবে ঢেলে নির্মাণ করা হয়েছে যে, যুগের পরিবর্তন ও বিবর্তনের কোনো প্রভাবই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। প্রত্যেক যুগে এর নতুনত্বে যেমন কোনো পার্থক্য সূচিত হয় না, তেমনি এর ব্যাপক নিয়ম-কানুন, মৌলিক তত্ত্বাবলি ও মতাদর্শে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন পড়ে না। এর মূলপাঠ বা বাণীগুলোতে এমন ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও স্থিতিস্থাপকতা বিদ্যমান যে, তা প্রতিটি পরিস্থিতিতে সমাধান দিতে সক্ষম, যদিও বর্তমান সময়ের বিচারে সে পরিস্থিতি সৃষ্টির আদৌ কোনো সুদূর সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হয় না। ইসলামি আইনের মূলপাঠ বা বাণীসমূহে যে কোনো

---

৩. সম্পাদনা পরিষদ, *বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের রচনায় ইসলামী আইন*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৭), খ.১, পৃ.

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুযোগ নেই এটাই তার মূল কারণ। মানবরচিত আইনসমূহের মূলপাঠে যেমন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হতে থাকে ইসলামি আইনে তার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ হওয়ায় এখানকার অধিবাসীরা ইসলামি সামাজিক রীতিনীতি ইসলামি আইনের আলোকে মেনে চলে। সামাজিক নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার জন্য রয়েছে ইসলামি আইন; পাশাপাশি রয়েছে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন। দেশের প্রচলিত আইন পাশ্চাত্যের ধাচে প্রণীত বিধায় এর সাথে সমন্বয় করে ইসলামি আইনের আলোকে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিপালন করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। দেশে এমন অনেকে আছেন যারা এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। কিন্তু প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক ও আনুষঙ্গিক গবেষণা তথ্যের অভাববোধ করে থাকেন, সে কারণে এ বিষয়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব অত্যাধিক। আর এ প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য বিষয়টিকে **ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান** শীর্ষক গবেষণার শিরোনাম হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য (Objective of the Research)

মেধা ও প্রতিভা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশ্নের উত্তর আবিস্কার করাই হলো গবেষণার কাজ। গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হলো লুকায়িত সত্যের আবিস্কার। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতিকে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাধ্যমেই প্রেরণ করেছেন। পরবর্তীতে তাদেরকে পারস্পরিক পরিচিতির জন্য বিভিন্ন বংশ, সম্প্রদায় ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। ফলে সমাজের উদ্ভব হয়েছে। সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি সদস্য একই রূপ সক্ষমতার অধিকারী হয় না। সেখানে বাস করে শিশু, নারী, প্রতিবন্ধী, অক্ষম, বয়স্ক এমনকি হঠাৎ বিপদের সম্মুখীন হওয়া ব্যক্তি। সমাজের এসব সদস্যদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য ইসলামি আইনে রয়েছে ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। দেশের প্রচলিত আইনেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিষয়ক আইন রয়েছে। এ সমস্ত কল্যাণকর আইন ও আইনের আলোকে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে নাগরিক সমাজকে ব্যাপকভাবে অবহিতকরণই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহকে সামনে রেখে প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে :

- সামাজিক নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণকে প্রাধান্য দিয়ে ইসলামের পরিচয় তুলে ধরা।
- ইসলামি আইনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির স্বরূপ উপস্থান করা।
- সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইনের ভূমিকার মূল্যায়ন ও উপযোগি বিবরণ প্রকাশ করা।
- সমাজের পরিচয় ও সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ব্যাপক আলোকপাত করা।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির উদঘাটন করা।
- বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের কার্যাবলির পর্যালোচনা করা।
- ইসলামি আইনের আলোকে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পালনে ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের আলোকে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিচালনা করতে সৃষ্ট সমস্যাবলি ও প্রতিবন্ধকতা উদঘাটন করে তার প্রতিকার করার পদ্ধতি বের করার চেষ্টা করা।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি (Research Methodology)

বিশেষ ব্যক্তিদের নির্ধারিত কোনো বিষয়ে বিশেষ অধ্যয়ন হলো গবেষণা। সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে যুক্তিপূর্ণ নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোন বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের বা জ্ঞান অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলা হয়।[৪] গবেষণার আলোচ্য বিষয় প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞান সংযোজন করে। গবেষণার উদ্দেশ্য

৪. মানসম্পন্ন গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৪টি ধাপ হলো, ১. ঐতিহাসিক (Historical) ২. বর্ণনামূলক (Descriptive) ৩. বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) এবং ৪. পর্যবেক্ষণমূলক (Observational)। একটি গবেষণার জন্য উল্লিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ

Dhaka University Institutional Repository

ও নীতিমালাকে ঠিক রেখে প্রথমে গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। বিষয় নির্বাচনের পর ধারাবাহিকভাবে গবেষণার পরিধি, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, ও উপস্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আদর্শ ও উপযুক্ত আর্ত-সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical) বর্ণনামূলক (Descriptive) বিশ্লেষণমূলক ও পর্যবেক্ষণমূলক (Observational) ধাপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, আলোচনাভিত্তিক বিবৃতি, যেখানে যেটা উপযোগী সেখানে সেটা প্রয়োগ করা হয়েছে।

গবেষণা বিষয়বস্তুর গভীরতা ও জনস্বার্থে সর্বজনীন প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে কখনও একক বিশ্লেষণ আবার কখনো মাঠ জরিপসহ (Field Survey) গ্রুপভিত্তিক মতামতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম হলো বাংলা। তবে তথ্য উপাত্ত, তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলির সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিও সংযুক্ত করা হয়েছে। এটি বাংলা ভাষায় রচিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম।

গবেষণা কর্মের পরিধি (Scope of the Research)

বাংলাদেশের সমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ, নারী, শিশু ও শ্রমিকের নিরাপত্তা বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্ব অনুধাবনপূর্বক দেশের সরকার এতদ বিষয়ে নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেছে এবং সেসব আইনের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নানাবিধ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বিশেষ করে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা) ও অন্যান্য কার্যক্রম, সামাজিক ক্ষমতায়ন, নগদ হস্তান্তর (বিশেষ) কর্মসূচি, খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি : সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি : সামাজিক ক্ষমাতয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক সুরক্ষার জন্য বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম, সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য উন্নয়ন খাতের কার্যক্রম : চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও নতুন উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুসলিম অধ্যুষিত সমাজ হিসেবে এখানে প্রচলিত রয়েছে কিছু ইসলামি আইনের আলোকে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম। যেমন– (১) যাকাত; (২) ‘উশর বা অর্ধেক ‘উশর; (৩) কাফফারা; (৪) ফিদিয়া; (৫) মোহর, (৬) মিরাছ; (৭) সদাকাতুল ফিতর; (৮) নাফাকাত; (৯) নাজর বা মান্নত; (১০) উদহিয়া বা কুরবানি; (১১) আকিকা; (১২) হিবা; (১৩) অসিয়াত; (১৪) ওয়াকফ; (১৫) জারাইর; (১৬) মিনাহ ও (১৭) সারাইব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের আলোকে প্রণীত এ উভয়বিধ কর্মসূচিকে গবেষণার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনাই হলো এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত।

গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্তের উৎস (Sources of Data)

এ গবেষণা কর্মের অভিসন্দর্ভটা প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎসের (Secondary Source) ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। উভয়বিধ উৎস অনুসারে গবেষণা রীতির প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার চেষ্টা করা হয়েছে। একই সাথে উৎসসমূহ ব্যবহারের সময় যথাস্থানে পূর্ণ সূত্রের উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস (Primary Sources)

করলে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর খুব গভীরে প্রবেশ করা যায় এবং একটি মানসম্পন্ন সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো সম্ভব হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কেন্দ্র করে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ইতিহাস, বর্ণনা, বিশ্লেষণ এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণ এ ৪টি দিক যথাযথভাবে সমন্বয় করতে পারলে লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত হয়। এ গবেষণার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ধাপসমূহ সতর্কতা ও গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণার অর্জিত ফলাফল যাতে টেকসই কৌশলে পরাজিত কিংবা অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত না হয় সে বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। দ্র. প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী, *গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল*(ঢাকা : মাহফুজ কম্পিউটারস, ২০১৩), পৃ. ২২; ৩০-৩১

Dhaka University Institutional Repository

প্রাথমিক উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, অফিসিয়াল রেকর্ড, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার, সমাজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও ভুক্তভোগীগণের মতামত বিশ্লেষণ, গঠণমূলক সুপারিশ ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন, সাময়িকী, অর্ধবার্ষিকী, কিংবা বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, বিভিন্ন ঘোষণা সম্বলিত বিজ্ঞাপন, প্রকাশনা, বিবরণী, পুস্তিকা, ব্রুশিউর, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ওয়েবসাইট ইত্যাদি গবেষণা কর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Sources)

দ্বৈতীয়িক উৎসের মধ্যে রয়েছে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত আইন ও সমাজ সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী, ইসলামি ফিকহ, আইন ও সমাজ বিষয়ক গ্রন্থাবলী, বাংলাদেশ ব্যাংক, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলীর বিবরণসহ ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, আইএলও অফিস থেকে প্রকাশিত বই-পুস্তক গবেষণা কর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণার কর্মের সময়কাল (Research Time Frame)

এ গবেষণার সময়কাল ৫ বছর ৬ মাস। এ সময় কালকে বিভিন্ন ভাগে বিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দেশি-বিদেশি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, জার্নাল, অভিসন্দর্ভের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট, ওয়েবসাইট, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক, সামাজিক বিষয়ক গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ ও ভুক্তভোগীগণের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার অনুসূচির মাধ্যমে সাক্ষাৎকার নিয়ে তাদের মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাঁচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে গবেষণা কর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে এটি অতি যত্নসহকারে সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম খসড়া (ড্রাফটিং), সম্পাদনা, পুনঃসম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রুফসহ থিসিসটি উপস্থাপনযোগ্য করতে সময় লেগেছে মোট ৫ বছর ১০ মাস। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত ও ব্যয়িত মোট সময়কে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

কাজের ধরন	ব্যয়িত সময়
প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	১৮ মাস
দ্বিতীয় পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	০৯ মাস
১ম ও ২য় পর্যায়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন	০৮ মাস
লেখা তৈরি ও সম্পাদনা	০৮ মাস
সাক্ষাৎকার (অনুসূচির মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ ও ভুক্তভোগীগণ)	০৬ মাস
তথ্য উপস্থাপন, বিশ্লেষণ ও কম্পিউটার কম্পোজ	১২ মাস
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রুফ, চূড়ান্ত প্রিন্ট, সম্পাদনা এবং বাঁধাই	০৯ মাস

গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Research)

গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে গবেষণা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতার দায়ভার সম্পূর্ণ গবেষকের নিজের। গবেষণাকর্ম পরিচালনায় যে সব সীমাবদ্ধতা ছিল তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ :

তথ্য ভাণ্ডারের অপর্যাপ্ততা : বাংলাদেশের দু'একটি ছাড়া বিভিন্ন লাইব্রেরিতে আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য ভাণ্ডারের অপ্রতুলতা। বিশ্বব্যাপী তথ্য প্রযুক্তির (Information Technology) ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটলেও বাংলাদেশের লাইব্রেরিগুলো এখনও এ প্রযুক্তিতে দুঃখজনকভাবে

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটাই পিছিয়ে। অনেক প্রতিষ্ঠানের MIS (Management Information Technology) অত্যন্ত দুর্বল ও অসম্পূর্ণ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

সীমিত সময় : পিএইচ.ডি. একটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ গবেষণামূলক উচ্চ শিক্ষার স্তর যা সামাজিক ক্ষেত্র ছাড়াও জাতীয় ও বৈশ্বিক পেক্ষাপটে অর্থবহ ও শক্তিশালী অবদান রাখতে সক্ষম। কিন্তু পিএইচ.ডি গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। গবেষণার জন্য বরাদ্ধকৃত সময়সীমা বেশি হলে এ ধরনের নিবিড় (Indepth) গবেষণাকর্ম আরও সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং অধিক অর্থবহ করা সম্ভব হত।

বই-পুস্তকের অপ্রতুলতা : ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় নিরাপত্তার বিধান এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ বিষয়ে বইয়ের অপ্রতুলতা লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এ বিষয়ের বই প্রাপ্তি খুবই দুষ্কর এবং উত্তম মানসম্পন্ন গ্রন্থাবলি পাওয়া সম্ভব হয়নি।

গবেষণা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review related to the Research)

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান শীর্ষক গবেষণার অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত সম্বলিত সাহিত্য পর্যালোচনা এখানে উপস্থাপিত হলো :
বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক সালাহউদ্দীন জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার সনদের ধারাসমূহ উল্লেখপূর্বক ইসলামের বিধি-বিধান ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে কুরআন-হাদিসে উল্লিখিত মৌলিক মানবাধিকার বিষয়ে 'বুনিয়াদি হুকুক' শিরোনামে উর্দু ভাষায় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি 'মৌলিক মানবাধিকার' (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭) শিরোনামে অনুবাদ করেন বিশিষ্ট অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ। ২৭৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত উক্ত গ্রন্থ থেকে সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবজ মৌলিক মানবাধিকার সংক্রান্ত অনেক তথ্য-উপাত্তের দিক-নির্দেশনা পাওয়া গেছে।

মিশরের বিখ্যাত লেখক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক সাইয়েদ কুতুব শহীদ প্রণীত 'মা'আলিম ফিত তরিক' গ্রন্থখানা সুসাহিত্যিক মুহাম্মাদ আবদুল খালেক কর্তৃক অনূদিত 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৭)। উক্ত গ্রন্থে ইসলামি সমাজের বৈশিষ্ট্য ও সমাজ গঠনের উপায়, জাহিলি সমাজের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির উপায় ও ইসলামি সমাজ ও জাহিলি সমাজের মৌলিক পার্থক্যসহ ইসলামি সমাজের ক্রমবিকাশের ধারা উল্লিখিত হয়েছে। সরাসরি সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি এখানে উদ্ধৃত হয়নি।

ভারতের আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী রচিত (ইন্স্যুরেন্স ইসলামি মা'ইশাত মে) বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন অনূদিত 'ইসলামী অর্থনীতিতে বীমা' (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭) শীর্ষক গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলো– মানব জীবনে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা, বীমা, জুয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর বিষয়, পুঁজিবাদী, সমাজবাদী ব্যবস্থা ও ইসলামি সমাজে বীমা এবং জীবন বীমা সম্পর্কিত সমালোচনার স্বরূপ, ইসলামি বীমা : ধারণা ও বাস্তবায়ন, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামি বীমার অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে বইটি সমাপ্ত করা হয়েছে।

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান রচিত 'ইসলামী বিচার ব্যবস্থা' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২) শীর্ষক বইয়ে লেখক সংক্ষেপে ইসলামি বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন।

বিশিষ্ট ইসলামি গবেষক ড. আহমদ আলী রচিত 'ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার ও মর্যাদা' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৭) শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থে ইসলামি রাষ্ট্রের পরিচয়, অমুসলিমদের শ্রেণীভেদ, ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিমদের স্থায়ী নাগরিকত্ব লাভের পদ্ধতি, অমুসলিম নাগরিকদের অধিকারসমূহ, অমুসলিমদের উপর আরোপিত বিশেষ করসমূহ, অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড, অমুসলিমদের অপরাধ ও শাস্তির বিধান, অমুসলিমদের প্রতি রাসুলুল্লাহ সা.-এর

Dhaka University Institutional Repository

মহানুভবতা এবং অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে মুসলিম শাসকগণের ভূমিকা বিষয়ে আলোচিত হয়েছে।

তরুণ লেখক নূরুল ইসলাম কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬) শীর্ষক বইয়ে ইসলামে পারিবারিক জীবনের গুরুত্ব, পরিবার গঠনের বিভিন্ন স্তর, পরিবার সংরক্ষণে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপ, পাশ্চাত্যের পারিবারিক ব্যবস্থা, সমাজে প্রচলিত যৌতুক প্রথা ও তার বিরূপ প্রভাব এবং পারিবারিক বিপর্যয় রোধে মানুষের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

ড. মুস্তফা আস-সিবা'ই রচিত আকরাম ফারুক অনূদিত 'ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৭) শীর্ষক বইয়ে যুগে যুগে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ, নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মুসলিম নারীর অবস্থা, নারী সমাজের উন্নয়ন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, বহু বিবাহ ও ইসলাম, তালাক প্রসঙ্গ, নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ও নর-নারীর অবাধ মেলামেশা ইত্যাদি বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন সম্পাদিত 'দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম' (ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯) শীর্ষক ১৮১ পৃষ্ঠা সম্বলিত গ্রন্থে ইসলামি অর্থনীতি : দারিদ্র্য বিমোচন, দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামি প্রেক্ষিত, দারিদ্র্য বিমোচন : প্রচলিত কৌশল বনাম ইসলামি কৌশল, যাকাত, আওকাফ এবং ক্ষুদ্র ঋণদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের একটি সমন্বিত মডেল, দারিদ্র্য বিমোচন : ইসলামি কৌশল এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে ইসলাম ইত্যাদি শিরোনামে গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম রচিত 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা' (ঢাকা : ইফাবা, ২০১২) শীর্ষক গ্রন্থে দারিদ্র্য পরিচিতি ও বর্তমান পরিস্থিতি, যাকাতের পরিচয় ও বিকাশধারা, যাকাত আদায় ও বন্টননীতি, দারিদ্র্য বিমোচন ও যাকাত, ইসলামি অর্থনৈতিক উন্নয়নে যাকাতের অবদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ড. আহমদ আলী কর্তৃক প্রণীত 'ইসলামের শাস্তি আইন' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫) শীর্ষক বইটিতে শাস্তির সংজ্ঞা, শাস্তির শ্রেণী বিন্যাস, ইসলামি শাস্তি আইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ইসলামি শাস্তি আইনের উদ্দেশ্যসমূহ, শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশের বিধান, শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার বিশেষ অবস্থাসমূহ, চৌর্যবৃত্তির শাস্তি, সশস্ত্র ডাকাতি ও লুণ্ঠনের শাস্তি, জোর করে সম্পদ অপহরণের শাস্তি, ব্যভিচারের শাস্তি, মদ্যপানের শাস্তি, ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার শাস্তিসহ হুদুদ, কিসাস, দিয়াত ও তা'যিরি দণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সংকলিত 'ইসলামী আইন' (ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪) নামক গ্রন্থে আইন শাস্ত্রে ধর্মের প্রবাব, সাধারণ ও ধর্মীয় আইনের মৌলিক দর্শন, মুসলিম বিশ্বে ইসলামি আইনের প্রয়োগ, ঐশী ও মানবিক আইনের পরিচয়, আইন ও আইনাদর্শের সংঘাত, মানবিক ও ঐশী আইনের উৎস ও ক্রমবৃদ্ধি, কুরআনি আইন অনুসরণের গুরুত্ব, ইসলামি আইনে মানবিক অবদান, মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ এবং ইসলামি আইনের প্রগতিশীল বিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে।

ড. মোঃ মশিউর রহমান কর্তৃক প্রণীত 'বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবাধিকার' (ঢাকা : ইফাবা, ২০১৬) নামক গ্রন্থে মানবাধিকার প্রসঙ্গ, অধিকার ও মানবাধিকার, মানবাধিকারের ক্রমবিকাশ, হজ্জ, বিদায় হজ্জ এবং বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ, হজ্জ ও বিদায় হজ্জ প্রসঙ্গ, বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রতিফলিত মানবাধিকারের চেতনাসমূহ যেমন– বিদায় হজ্জের ভাষণে জীবন রক্ষার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, মর্যাদা রক্ষার অধিকার, হত্যা বিষয়ক দণ্ডবিধি, ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, জাতীয়তার অধিকার, ভাষা ও বর্ণবাদের ভিত্তিতে বৈষম্যে পূর্ণ সাম্য বিধানের অধিকার, ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভের অধিকার, নারী অধিকার, দাস-দাসীর অধিকার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিনয় ঘোষ রচিত 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০)' (ঢাকা : বুক ক্লাব, ২০১৫) গ্রন্থে ঊনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও এ গ্রন্থে স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের ধারা বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়নি।

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম প্রণীত 'মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম' (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩) শীর্ষক ৬০৮ পৃষ্ঠার একখানা বিশাল গ্রন্থ। এ গ্রন্থে লেখক যেসব বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন তাহলো– মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবাধিকারের বিকাশ, প্রধান প্রধান ধর্মে মানবাধিকার, কতিপয় বিশেষ মানবাধিকার, মানবাধিকার সংরক্ষণে জাতিসংঘের ভূমিকা, বাংলাদেশের মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার পরিস্থিতি, বাংলাদেশের মানবাধিকার উন্নয়নে এনজিও'র ভূমিকা এবং সবশেষে মানবাধিকার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের অবদান ইত্যাদি।

মুসা আনসারী প্রণীত 'ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২) শীর্ষক গ্রন্থে ইতিহাসের দর্শন ও ইতিহাসে যুগবিভাগের সমস্যা সম্পর্কে লেখকের গভীর চিন্তা ও উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে।

মোঃ নূরুল ইসলাম রচিত 'সমাজবিজ্ঞানের উপাদান' (ঢাকা : ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০১২) নামক গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের প্রাথমিক ধারণাসমূহসহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজে বিচ্যুতি, অপরাধ ও শাস্তি, সমাজকাঠামো ও বিভিন্নতা এবং কিছু প্রাচীন সভ্যতার উপর বিশদভাবে আলেঅকপাত করা হয়েছে।

আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান প্রণীত 'সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা' (ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৫) শীর্ষক গ্রন্থখানিতে যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান পেয়েছে তাহলো– সামাজিক ইতিহাসের ধারণা, সামাজিক বিবর্তনের পর্যায়সমূহ, বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতা, পুজিবাদের উত্থান এবং সবশেষে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

বিশিষ্ট গ্রন্থকার মিয়া মুহম্মদ সেলিম প্রণীত 'সামাজিক উন্নয়ন কৌশল' (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯) শীর্ষক গ্রন্থে লেখক সামাজিক জীবনে মানব উন্নয়ন ও মানব উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ যেমন– মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানবের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ তুলে ধরেছেন। ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আলোচনা এখানে তেমন একটা উল্লিখিত হয়নি।

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার রচিত এম. আনিসুজ্জামান অনূদিত 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ ২০১৪) শীর্ষক গ্রন্থে লেখক চারটা পরিচ্ছেদে বৃটিশ শাসন আমলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে লেখক সীমান্তে বিদ্রোহী শিবির, সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অবিরাম ষড়যন্ত্র, শাহ নিয়ামত উল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী, তিনটি শর্ত– যার ফলে একটা ইসলামি দেশ দারুল হারব বা শত্রুদেশে পরিণত হয়, বৃটিশ শাসনে ভারতীয় মুসলিমদের অন্যায়, বাংলায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বন্টনের খতিয়ান : এপ্রিল ১৮৭১ শীর্ষক শিরোনামে বৃটিশ শাসনে বাংলার সামাজিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

আব্বাস আলী খান রচিত 'বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস' (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৭ম প্রকাশ, জুন ২০১১) শীর্ষক গ্রন্থে ৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলার মুসলিমদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে প্রায় দু'শ বছর যাবত মুসলিমদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার-নিপীড়ন ও সামাজিক নিরাপত্তহীনতার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' (ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩) গ্রন্থখানা সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ-এর দীর্ঘজীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত। এ গ্রন্থ থেকে রাজনীতির ক খ, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন,

Dhaka University Institutional Repository

বেংগল প্যাক্ট, ময়মনসিংহে সংগঠন, পুলিশ সুপার টেইলারের সাথে সাক্ষাৎকারসহ বৃটিশ শাসন আমলের অনেক মৌলিক প্রশাসনিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভ গঠন পরিকল্পনা (Structure of the Study)

গবেষণার সুবিধার্থে **'ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান'** শীর্ষক এ পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভকে ৬টি অধ্যায় এবং প্রত্যেক অধ্যায়কে কয়েকটি করে পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়ভিত্তিক আলোচনার শিরোনাম এবং অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায়

এ অধ্যায়ে মূলত 'গবেষণার বাস্তবতা বিষয়ক পর্যালোচনা'র বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণার অবতরণিকা এ অধ্যায়ে প্রস্তুত করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য, গবেষণা কর্মের পদ্ধতি, গবেষণা কর্মের পরিধি, গবেষণা কর্মের তথ্য- উপাত্তের উৎস, গবেষণা কর্মের সময়কাল, গবেষণাকর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা, ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, অভিসর্ন্দভ গঠন পরিকল্পনা, উপসংহার ইত্যাদি ধারাবাহিক পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সহনশীলতা ও সামাজিকতার ধর্ম। গবেষণা অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা'** বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের পরিচয়, ইসলামি সমাজের পরিচিতি ও সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি এ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। উল্লিখিত বিষয়বস্তু ও আলোচনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্তও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে সামাজিক সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত দেশ হিসেবে পরিচিত। অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে **'বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা'** সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। বিষয়টি বিশ্লেষণের জন্য আরও যেসব পরিচ্ছেদ বিন্যাস করা হয়েছে তাহলো– বাংলাদেশ পরিচিতি, সমাজের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর এবং বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা। শিরোনামোক্ত বিষয়বস্তুকে আরও বস্তুনিষ্ঠ করে তুলতে যথাস্থানে তত্ত্ব ও উপাত্ত সংযুক্ত করা হয়েছে এবং তথ্যসূত্রসহ প্রয়োজনীয় টিকা-টিপ্পনি সংযোজন করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ আইন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম হলো– **'সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আইনসমূহ'**। এখানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে আরও যেসব পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে তাহলো– সামাজিক নিরাপত্তায় আইন বিভাগ, সামাজিক নিরাপত্তায় বিচার বিভাগ, সামাজিক নিরাপত্তায় শাসন বিভাগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ। উক্ত শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরও সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

আইনের যথাযথ প্রয়োগ ছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কখনো বাস্তবায়িত হতে পারে না। অভিসন্দর্ভের এ অধ্যায়ে **'সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা'** শীর্ষক শিরোনামে বাস্তবে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইনের কতটুকু প্রয়োগ হচ্ছে তা তুলে ধরার প্রয়াস পাওয়া গেছে। এখানে বিশেষ করে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা, নারীর নিরাপত্তা অবস্থা, শিশুর নিরাপত্তা অবস্থা ও শ্রমিকের নিরাপত্তা অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের শিরোনামাধীন বিষয়গুলো আলোচানা-পর্যালোচনা করে আরও সুস্পষ্ট করতে সংশ্লিষ্ট স্থানে এতদ্‌সংক্রান্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সূত্রসহ প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে কোনো আইন প্রয়োগ করতে গেলে অনেক বাধা-বিপত্তি ও প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক আইনগুলোও তা থেকে ব্যতিক্রম কিছু নয়। উক্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়ও রয়েছে। তাই অভিসন্দর্ভের শেষ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে **'সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায়'**। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে সমাজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক সমস্যা কোথায় তা উদ্ঘাটন করে সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিরসনের উপায় সম্বলিত একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। অভিসন্দর্ভের শেষে উপসংহার লেখা হয়েছে।

উপসংহার (Conclusion)

অভিসন্দর্ভের শেষ পর্যায়ে উপসংহার (Conclusion) লেখা হয়েছে। উপসংহার হিসেবে এতে সমগ্র অভিসন্দর্ভের সার-নির্যাস সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে যে অনুভূতিতে এর উপাত্ত প্রস্তুত করা হয়েছে সে বিষয়ে নিজের একান্ত অভিব্যক্তি প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর বিশেষজ্ঞ-ভুক্তভোগী দৃষ্টিকোণ বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি সংযুক্ত করা হয়েছে। সর্বশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযুক্ত করা হয়েছে যা সমাজ বিষয়ক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, সমাজ সংস্কারক, ইসলামি সমাজ বিষয়ক গবেষকবৃন্দসহ অনুসন্ধিৎসু আপামর জনসাধারণের বিশেষভাবে উপকারে আসবে বলে প্রত্যাশা করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে ইসলামি সমাজ ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি, দেশ ও দেশবাসী যদি যৎসামান্য উপকৃত হন তাহলেই এ শ্রমসাধনা সার্থক হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম বিশ্ব মানবের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানবজীবনের সর্বক্ষেত্র ও সর্বস্তর থেকে পৃথিবীর সব রকমের আনুগত্য ও দাসত্ব পরিহার করে বিশ্বজাহানের মালিক ও ইলাহ আল্লাহ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করাই ইসলাম। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা আর মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রদর্শিত জীবনপদ্ধতি অনুসরণ এবং এর বিপরীত পথ-মত ও তন্ত্র-মন্ত্র পরিহার করে চলার নামই ইসলাম। পৃথিবীর সকল দেশের মুসলিম নিজেদের ধর্মকে ইসলাম নামে অভিহিত করে থাকেন। নিচে ইসলামের পরিচিতি উপস্থাপিত হলো :

ইসলাম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : ইসলাম (إِسْلاَمٌ) শব্দটি (س ل م) ধাতু থেকে উৎপন্ন। ইহা বাবে ইফ'আল (باب إفعال) এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শান্তি, আপোষ, বিরোধ পরিহার। স্বরচিহ্নের তারতম্যে বিভিন্ন আকারে একই অর্থে আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম শব্দটির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়।[১] ইসলাম শব্দটি সালমুন শব্দ থেকে গঠিত। সালম (سَلْمٌ) শব্দটির নিম্নোক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

১. বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়বিধ অপবিত্রতা, বিপদাপদ ও দোষক্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকা;[২]
২. যুদ্ধ বিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব, যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব, সন্ধি ও নিরাপত্তা;[৩]
৩. শান্তি ও শান্তি কামনামূলক মুসলিম অভিবাদন;[৪]
৪. আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন।[৫]

সালাম (سَلَم) ও সালম (سَلْم)-এই উভয় শব্দেরই অর্থ হচ্ছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ ও হুকুম পালন।[৬] উক্ত অর্থগুলোর মধ্যে পবিত্র ও দোষ-ক্রুটিমুক্ত অর্থটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

সিলম (سِلْم), সিলাম (سِلاَم) ও সালিম (سَلِم)-এর অর্থ কঠিন প্রস্তর; কারণ তাতে কোমলতা নেই, নরম হওয়া থেকে মুক্ত। সালাম (سَلَم)-এর অর্থ বাবলা বৃক্ষের ন্যায় কণ্টকমুক্ত বৃক্ষ; যে বৃক্ষ কণ্টক থাকায় বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।[৭] আস-সালাম (السَلاَمُ) শব্দটির মধ্যেও (যা আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম) যাবতীয় দুর্বলতা থেকে মুক্ত হওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। তাফসিরে রুহুল মা'আনি গ্রন্থে আস-সালাম শব্দটির নিম্নোক্ত অর্থ বর্ণিত হয়েছে :

ذو السلامة من كل نقص وآفة 'যাবতীয় বিপদাপদ ও দোষক্রুটি থেকে মুক্ত।' এছাড়া বর্ণিত হয়েছে الذي ترجى منه السلامة هو 'সেই সত্তা যার নিকট থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভের আশা করা যায়।'[৮] ইবনুল আছির-এর মতে, السلام اسم الله تعالى لسلامته من العيب والنقص 'আস-সালাম

---

১. আল-কুরআন, ২ : ২০৮, ৩ : ১৯, ৩ : ৮৩-৮৫, ৪ : ৯০-৯১, ১২৫, ৫ : ৩, ৬ : ১২৫, ৮ : ৬১, ৯ : ৭৪, ১০ : ২৫, ৩৯ : ২২, ৪৯ : ১৭, ৫১ : ২৫, ৬১ : ৭
২. আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*(রিয়াদ : মাকতাবাহ নাজ্জার মুস্তফা বায, ২০০৯), পৃ. ৩১৫
৩. আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*(দামেশক : দারুল কলম, ২০০৯), পৃ. ৪২১
৪. আবুল ফদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*(কুয়েত : দারুন নাওয়াদির, ২০১০), খ.১৫, পৃ. ১৯০
৫. সায়্যিদ মুহাম্মদ মুরতাদা আল-হুসাইনি আয-যাবিদি, *তাজুল 'আরুস*(কুয়েত : কুয়েত সরকারি মুদ্রণালয়, ২০০০), খ.৩২, পৃ. ৩৭১
৬. আবু নাছর ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল-জাওহারি, *আস-সিহাহ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৯), পৃ. ৫৫৫
৭. আবুল ফাদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৮৫; আল-জাওহারি, *আস-সিহাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৫
৮. সাইয়িদ মাহমুদ আল-আলুসি, *রুহুল মা'আনি*(বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আলাবি, তা.বি.), খ.২৮, পৃ. ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলার একটি নাম এ কারণে যে, তিনি যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র।'[৯] ইমাম রাগিবের মতে আল্লাহ তা'আলার এক নাম আস-সালাম এ কারণে যে, وصف بذلك من حيث لا يلحقه العيوب والآفات التي تلحق الخلق 'যে সকল বিপদাপদ ও দোষত্রুটি সৃষ্টিতে রয়েছে সেগুলো আল্লাহকে স্পর্শও করতে পারে না।[১০] সালাম শব্দটির আর একটি অর্থ দু'আ; কারণ তাও বিপদাপদ এবং পাপ-পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করার জন্য একটি নিবেদন। এ একই শব্দমূল থেকে গঠিত শব্দ আসলামা (أَسْلَمَ), য়ুসলিমু (يُسْلِمُ), ইসলামান (إِسْلَامًا) সকর্মক ও অকর্মক উভয়বিধ ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে সালম (سَلْمٌ) শব্দের যে সকল অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তার সবই ইসলাম (إسلام) শব্দের মধ্যে নিহিত, যা বাবে ইফ'আল (إِفْعَالٌ)-এর মাসদারে নিহিত রয়েছে। অর্থাৎ মুক্ত ও পবিত্র হওয়া অথবা মুক্ত ও পবিত্র করাও এর আর একটি অর্থ।

অতএব, ইসলাম শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে ইবাদত, দীন ও আকিদাকে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট করা। যেমন– الإسلام: الدخول في السلم 'আনুগত্যে প্রবেশ করা।'[১১] এছাড়া বলা হয়,الإسلام والاستسلام: الانقياد 'আল-ইসলাম ও আল-ইসতিসলাম উভয় শব্দের অর্থ আনুগত্য করা।'[১২]

কুরআন মাজিদে আলোচ্য শব্দমূল থেকে গঠিত বহু শব্দ উপরিউক্ত ব্যুৎপত্তিগত অর্থসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দমূল, কয়েকটি আয়াতে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয়বিধ কলুষ ও দোষত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيْهَا 'উহা সম্পূর্ণ দোষত্রুটিমুক্ত, তাতে কোন খুঁত থাকবে না।'[১৩] إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ 'কিন্তু যে ব্যক্তি পবিত্র অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে।'[১৪]

কয়েকটি আয়াতে ইসলাম সন্ধি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, فَلاَ تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ 'অতএব তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধি প্রস্তাব করো না।'[১৫] وَإِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا 'আর যদি তারা সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে।'[১৬] কয়েকটি আয়াতে উহা আনুগত্য ও বাধ্যতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ 'বরং আজ তারা অনুগত।'[১৭]

আবার কয়েকটি আয়াতে উহা আত্মসমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, قَالَ لَه رَبُّه اَسْلِمْ لا قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'তার প্রতিপালক তাকে বললেন, তুমি আত্মসমর্পণ কর। তিনি বললেন, আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ করলাম।'[১৮]

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 'যে ব্যক্তির জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমগণ নিরাপদে থাকে সে ব্যক্তিই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম।'[১৯] উক্ত হাদিসে সালিমা (سلم) শব্দটি 'নিরাপদ রয়েছে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদিসে ইসলাম ও তা থেকে উদ্গত বিভিন্ন শব্দের আরও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।[২০]

---

৯. ইবনুল আছির, *আন-নিহায়াহ ফি গারিবিল হাদিসি ওয়াল আছার*(দাম্মাম : দারু ইবনিল জাওযি, ১৪২১ হি.), পৃ. ৪৪১
১০. আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *মুফরাদাতু আলফাযিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২
১১. আর-রাগিব আল-ইসফাহানি, *আল-মুফরাদাত ফি গারিবিল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭
১২. আবুল ফাদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৮৫
১৩. আল-কুরআন, ২ : ৭১
১৪. আল-কুরআন, ২৬ : ৮৯
১৫. আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৫
১৬. আল-কুরআন, ৮ : ৬১
১৭. আল-কুরআন, ৩৭ : ২৬
১৮. আল-কুরআন, ২ : ১৩১
১৯. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, পৃ. ১৭-১৮, হাদিস নং ৯
২০. ড. আশ-শাইখ খলিল মামুন শিহা, *মাউসু'আতু মু'জামুল মুফাহরিস লিআলফাযিল হাদিস*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ২০১৩), খ.১২, পৃ. ৬৩৩, ৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ : ইসলাম শব্দের আভিধানিক অর্থ বশ্যতা, সমর্পণ, আত্মসমর্পণ, ইসলাম গ্রহণ,[২১] আনুগত্য করা, নিঃশর্ত হুকুম পালন, অনুগত হওয়া, কোন কিছু মাথা পেতে নেয়া, সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া, আত্মত্যাগ করা, মেনে নেয়া, নিষ্ঠার সাথে কাজ করা ইত্যাদি।

ইসলাম শব্দের পারিভাষিক অর্থ : ইসলাম শব্দের পরিভাষায় সাইফুদ্দিন আবুল হাসান আল-আমিদি তার রচিত কিতাবু ইহকামিল আহকাম ফি উসুলিল আহকাম গ্রন্থে ইসলাম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তার নির্গলিত অর্থ দাঁড়ায় যে, মুসলিম আলিমদের মতে ইসলাম শব্দটির পারিভাষিক অর্থ এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকেই উদ্ভুত এবং উভয় প্রকারের অর্থের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। অভিধান রচয়িতাগণ ইসলাম শব্দের নিম্নোক্ত পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করেছেন :

الإسلام من الشريعة إظهار الخضوع وإظهار الشريعة والتزام لِما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه.

শারি'আহ'র পরিভাষায় ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও আত্মসমর্পণ এবং রসুল সা. কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আনীত সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ ও ধারণ।[২২]

ড. খুরশিদ আহমদ বলেন, ইসলাম এমন একটি আদর্শ, যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ জয় এবং তার ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন মানুষ সমগ্র মানবতার জন্য বয়ে আনে শান্তি ও নিরাপত্তা।[২৩] অন্য কথায়, ইসলাম-এর অর্থ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশ মান্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন। প্রত্যেক বিষয়ের বা বস্তুর মূলমন্ত্র বা তত্ত্ব তাই হতে পারে যে সে বিষয়ের বা বস্তুর নামে বর্তমান থাকে। আল্লাহ তা'আলার দীনের মূলতত্ত্ব নিহিত রয়েছে ইসলাম শব্দটিতেই। আরবি ভাষায় তাই ইসলাম বলতে বুঝায় আনুগত্য, বাধ্যতা ও আত্মসমর্পণ। ইসলাম শব্দটি আদেশ পালন, পরিপূর্ণ অনুসরণ এবং কোন সত্তার কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দকরণের অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিজের স্বাধীন ইচ্ছার বদলে কেউ অন্য কোন সত্তার ইচ্ছা অনুযায়ী চললে বুঝা যায় যে, সে নিজেকে অন্যের নিকট সমর্পণ করেছে। অতএব ইসলামের মূল মর্মবাণী হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট সোপর্দ করে দেয়া। তার সমস্ত শক্তি, তার যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবাবেগ, তার সমস্ত প্রিয়বস্তু এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত যতগুলো অঙ্গ আছে সব কিছুকেই আল্লাহ তা'আলার নিকট সমর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। কুরআনের পরিভাষায়, ইসলাম অর্থ আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা বা ইসলাম গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ্য তার নামই ইসলাম। অন্য কথায় বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের আনুগত্য ও তাঁর নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নামই ইসলাম। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ও প্রতি স্তরে আল্লাহ তা'আলার বিধিনিষেধ পালন করা; তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা, এ লক্ষ্যে নিজেকে বিলীন করে দেয়াই ইসলাম।

ইসলাম শব্দের অপর অর্থ হলো শান্তি। আল্লাহ মানুষের জন্য যে জীবনবিধান প্রদান করেছেন তা-ই তাঁর ইচ্ছা; কিন্তু প্রশ্ন দেখা দেয় মানুষের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে এত অশান্তি কেন? সর্বত্র নিরাপত্তাহীনতা বিরাজ করছে কেন? এর কারণ ইসলাম অর্থ শান্তি, এটা নিছক নীতিকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন ও সমাজের ব্যাপক ক্ষেত্রে ইসলাম অনুপস্থিত, আর তাই আজ সর্বত্র

---

২১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৭), পৃ. ৯৯
২২. আবুল ফাদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৮৬
২৩. ড. খুরশিদ আহমদ, অনূ. নূরুল আমিন জাওহার, *ইসলামের আহ্বান*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০০২), পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

অশান্তি; নিরাপত্তাহীনতা। মানুষ যদি ইসলাম মেনে চলে তাহলেই শান্তি পায়। আল্লাহর বিধান অমান্য করে যারা নিজেদের মনগড়া পথে চলে তারাই অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতা ভোগ করে। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য ও ইবাদতের পরিবর্তে মানুষ আজ তারই মত অন্য মানুষের দেয়া মতাদর্শ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার দাসত্বকে বরণ করে নিয়েছে বলেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অশান্তি বিরাজ করছে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অশান্তি, যুলুম ও বিশৃঙ্খলা মুক্ত করার নির্দেশ ইসলামে রয়েছে বলেই ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার আদর্শ। মানুষ যদি সত্যিই শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায় তাহলে তার নিজের মর্জি মত জীবনযাপন না করে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান মেনে চলতে হবে। তাই আল্লাহ তাঁর প্রেরিত বিধানের নাম রেখেছেন ইসলাম বা শান্তি। ইসলাম চায় মানবীয় ইচ্ছা ও ঐশী ইচ্ছার মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়ন করতে এবং এভাবেই মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে। আল্লাহর সাথে শান্তির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তার নিজের মধ্যে, মানব সমাজে, এমনকি প্রকৃতির সাথেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলাম মহান আল্লাহ প্রদত্ত আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের বিধান; ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবনযাপন পদ্ধতি, ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনের শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের পথ। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার নিকট সমর্পিত হয়ে যায় সে মুসলিম। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্য, আত্মসমর্পণ আর মুসলিম হচ্ছে অনুগত ও আত্মসমর্পণকারী। মুসলিম শব্দটিও 'আসলামা' ক্রিয়া থেকে কর্তৃবাচ্য পদ। সুতরাং ইসলাম আনুগত্য, আত্মসমর্পণের দীন আর মুসলিম হচ্ছে অনুগত; আল্লাহর ইচ্ছার নিকট সমর্পিত। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই মুসলিম।[২৪]

আল্লাহ তা'আলার বাণী– إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلَامُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।'[২৫] এ আয়াতের তাফসির বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম রাযি রহ. 'ইসলাম' শব্দের নিম্নোক্ত চারটি অর্থ বর্ণনা করেছেন :

(ক) الإسلام هو الدخول في الإسلام أي في الانقياد 'ইসলামে প্রবেশ করা'

(খ) الإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة والْمسلم 'আকিদা ও দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা; যে ব্যক্তি স্বীয় ইবাদতকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে সে মুসলিম।'

(গ) الإسلام في عرف الشرع فالإسلام هو الإيمان 'ইসলাম হলো ইমান।'

(ঘ) الإسلام عبادة عن الانقياد 'ইসলাম হলো আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ।'[২৬]

ইসলামের বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত হাদিস থেকে। হযরত উমর রা. বলেন, একদা আমরা রসুল সা.-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এ সময়ে তথায় একজন অপরিচিত লোক আগমন করলেন। লোকটির পরিধানের পোশাক ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সাদা, আর তার চুলগুলো ছিল অত্যন্ত কাল। তার চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদে ভ্রমণের কোনও চিহ্ন দৃশ্যমান ছিল না, অথচ আমাদের কারও নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন না। লোকটি রসুল সা.-এর নিকট এসে তার হাঁটুকে রসুল সা.-এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে নিজ হাঁটুর উপর হাত রেখে বসে পড়লেন। অতঃপর তিনি রসুল সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলামের পরিচয় বলে দিন। রসুল সা. বললেন : ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসুল; সালাত কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসের সাওম পালন করবে এবং সামর্থ থাকলে বাইতুল্লাহ শরিফের হাজ্জ আদায় করবে। এতে লোকটি বললেন : আপনি সত্য বলেছেন। হযরত উমর রা. বলেন, আমরা এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলাম যে, লোকটি

২৪. ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*(ঢাকা : আইসিএস পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০১৪), পৃ. ১৮-১৯

২৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

২৬. ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযি, *আত-তাফসিরুল কাবির*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ১৯৮১), খ.৭, পৃ. ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

নিজেই প্রশ্ন করছে। আবার নিজেই প্রশ্নের উত্তরকে সঠিক বলে সত্যায়ন করছে। অতপর তিনি রসুল সা.-এর কাছে আবার প্রশ্ন করলেন, আপনি আমাকে ইমানের পরিচয় বলে দিন। রাসুল সা. বললেন : ইমান এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর রসুলগণে, আখিরাতে ও ভাল-মন্দ সকল প্রকারের তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করবে। এতে লোকটি বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। অতপর তিনি রসুল সা.-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে ইহসান সম্বন্ধেও কিছু বলুন। রাসুল সা. বললেন, ইহসান এই যে, তুমি এভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তাকে দেখছ। যদি ঐরূপ অবস্থা তুমি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করতে না পার, তবে অন্তত অনুভব করবে যে, তিনি অবশ্যই তোমাকে দেখছেন। উমর রা. বলেন, লোকটি চলে যাওয়ার পর রাসুল সা. আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উমর! এই প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি কে ছিলেন তা কি তুমি জান? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসুলই উত্তম জানেন। রাসুল সা. বললেন, তিনি ছিলেন হযরত জিবরিল আ.। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।[২৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রসুল সা. বলেন,

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان.

'পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামস্বরূপ ইমারত প্রতিষ্ঠিত : (১) এ বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসুল; (২) সালাত কায়িম করা; (৩) যাকাত প্রদান করা; (৪) হজ্জ আদায় করা এবং (৫) রমাদান মাসের সাওম পালন করা।'[২৮]

ইসলাম ও ইমান বিষয়ে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُوْلُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ

'বেদুইনরা বলে, আমরা ইমান এনেছি; (হে রসুল) তুমি তাদেরকে বল, তোমরা ইমান আননি; তবে তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। বস্তুত তোমাদের অন্তরের মধ্যে এখনও ইমান প্রবেশ করেনি।'[২৯] উক্ত আয়াত ও অনুরূপ আরও কতকগুলো আয়াত দ্বারা ধারণা করা হয় যে, ইসলাম ও ইমান দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র অবস্থার নির্দেশক। কারো কারো মতে শব্দদ্বয় পৃথক অর্থের প্রকাশক অর্থাৎ ইসলাম অর্থ সাধারণভাবে স্বীকৃতি আর ইমান অর্থ আন্তরিক স্বীকৃতি। ছা'লাব-এর মতে, ইসলাম মৌখিক স্বীকৃতির সাথে আর ইমান অন্তরের স্বীকৃতির সাথে সম্পর্কিত।[৩০] হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলতেন, الإسلام علانية والإيمان في القلب 'ইসলাম হচ্ছে বাইরের বিষয়, আর ইমান হচ্ছে অন্তরের বিষয়।'[৩১]

অন্য একটি মতে ইমান ও ইসলাম একটি আর একটিতে প্রবিষ্ট; পরস্পরের প্রতিনিধিত্বকারী। যেমন– হাদিসে বর্ণিত আছে, একদা রসুল সা.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো : أي الإسلام أفضل؟ فقال الإيمان 'ইসলামের কোন বিষয়টি শ্রেষ্ঠতম? তিনি বললেন : ইমান।'[৩২] এছাড়া হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বনু আবদিল কায়েস-এর প্রতিনিধিদলের নিকট ইমানের নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছিলেন, 'ইমান হচ্ছে কালিমা শাহাদত, সালাত কায়িম করা, যাকাত প্রদান করা এবং রমাদান মাসে সাওম পালন করা।'[৩৩] এরূপে হযরত জারির ইবন আবদুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত আছে, একদা জনৈক বেদুইনকে ইমান শিক্ষা দিতে গিয়ে রসুল সা. বলেছিলেন, 'তুমি

২৭. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জানুয়ারি ২০১৫), খ.১, পৃ. ৭৫, হাদিস নং ১
২৮. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, পৃ. ১৬, হাদিস নং ৭
২৯. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৪
৩০. আবুল ফাদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৮৬
৩১. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ., *মুসনাদ আহমাদ*(বৈরুত : দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবি, ২০০৯), খ.১, পৃ. ৬৬, হাদিস নং ৯
৩২. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ., *মুসনাদ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭৪, হাদিস নং ১৬
৩৩. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ., *মুসনাদ আহমাদ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৭১-৭২, হাদিস নং ১৪

Dhaka University Institutional Repository

এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসুল; সালাত কায়িম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ শারিফের হাজ্জ করবে।' এজন্যই বলা হয়ে থাকে– الْمسلم التام الْمسلم مظهر للطاعة مؤمن بها 'যে ব্যক্তির কার্যকলাপ ও দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় এবং সে তার উপর ইমান রাখে, সে ব্যক্তিই পূর্ণ মুসলিম।'[৩৪]

কেউ কেউ বলেন, ইসলাম ও ইমান শব্দ দু'টি সমার্থক শব্দ। যেমন কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা বলছেন, فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ 'সেখানে যারা মু'মিন ছিল, আমি তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বের করে আনলাম। সেখানে আমি মাত্র একটির অধিক মুসলিম পরিবার পেলাম না।'[৩৫] এছাড়া অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।'[৩৬] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَقَالَ مُوْسٰى يٰقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ 'আর মুসা বলল, হে আমার জাতি! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ইমান এনে থাক তবে তাঁরই উপর ভরসা কর, যদি তোমরা প্রকৃত মুসলিম হয়ে থাক।'[৩৭] উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে নিম্নোক্ত বর্ণনাগুলোও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

(ক) ইসলাম শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করা। যদিও ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে ইমান ও ইসলাম শব্দদ্বয়ের অর্থে পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু শারি'আতি পরিভাষায় ইসলাম ছাড়া ইমানের অস্তিত্ব এবং ইমান ছাড়া ইসলামের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এগুলোর একটির অস্তিত্বের জন্য অপরটির অস্তিত্ব অপরিহার্য।[৩৮]

(খ) শারি'আতের তত্ত্বগত বিচারে ইসলাম ও ইমান সমার্থক শব্দ এবং দু'টি একই অর্থ প্রদান করে। যেমন– আল্লাহ তা'আলার বাণী, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম' এ আয়াতের এটাই মর্ম।[৩৯]

(গ) ইসলাম ও ইমানের অর্থ পৃথক পৃথক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এদের একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ইমান শব্দের অর্থ 'অন্তরের বিশ্বাস' এবং ইসলাম শব্দের অর্থ 'দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা' হলেও শারি'আতে কাউকে মু'মিন বলা সত্ত্বেও তাকে মুসলিম না বলা অথবা কাউকে মুসলিম বলা সত্ত্বেও তাকে মু'মিন না বলা সম্ভব নয়। শব্দদ্বয়ের সমার্থক শব্দ হওয়ার তাৎপর্য এটাই।[৪০]

উপরিউক্ত অভিমতগুলোর মধ্যে শেষোক্ত অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর সাথে এ কথাটি সংযোজন করা যায় যে, ইমান হচ্ছে ইসলামের পরিপূর্ণ অবস্থার নাম অর্থাৎ ইমান ছাড়া কারো ইসলামকে পরিপূর্ণ মনে করা যায় না। কথাটিকে এভাবেও বলা যায় যে, ইসলাম শব্দের অর্থ ইমান শব্দের অর্থ অপেক্ষা অধিক ব্যাপক।

এ বিষয়ে শি'আদের অভিমত হলো–

الفرق بين الإسلام والإيمان الذي جاء به الحديث : هو أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسوله به حقنت الدماء، وعليه جرت الْمناكح والْمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. والإيمان : الهدى، وما ثبت في

---

৩৪. আবুল ফাদল জামালুদ্দিন ইবন মুহাম্মদ ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১৫, পৃ. ১৮৬

৩৫. আল-কুরআন, ৫১ : ৩৫-৩৬

৩৬. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

৩৭. আল-কুরআন, ১০ : ৮৪

৩৮. ইমাম আবু হানিফা রহ., ভাষ্য. মোল্লা আলি কারি রহ., *আল-ফিকহুল আকবার*(কায়রো : দারুল কুতুবিল আরাবিয়া আল-কুবরা, ১৯৫৬), পৃ. ৭৯-৮০

৩৯. ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহ., *ফাতহুল বারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিততুরাস, ১৯৮৬), খ.১, পৃ. ২২

৪০. শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আল-কুসতাল্লানি, *ইরশাদুস সারি*(কায়রো : আল-মাতবা'আ আল-কুবরা আল-আমিরিয়া, ১৩২৩ হি.), খ.১, পৃ. ১৮৪-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

القلوب من صفة الإسلام، وما ظهر من العمل. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة أن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن.

'ইসলাম ও ইমানের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হাদিসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর তাওহিদের এবং রসুল সা.-এর রিসালাতের স্বীকৃতির নাম। উক্ত স্বীকৃতির পর স্বীকৃতিদাতা তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে, মুসলিমদের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হালাল হয়ে যায় এবং সে মুসলিম আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে ইমান হচ্ছে হিদায়াত ও ইসলামের গুণ কারো অন্তরে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হওয়ার এবং আমলের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটার নাম। ইসলাম অপেক্ষা ইমান এক স্তর ঊর্ধ্বে। ইমান ইসলামের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইসলাম-এর অর্থে আবশ্যিকভাবে ইমান-এর অর্থ অন্তর্ভুক্ত নয়।'[৪১] ইসলাম ও ইমান-এর উদাহরণ কা'বা ও হারাম-এর উদাহরণের অনুরূপ। কোন ব্যক্তি হারাম শারিফে থাকলে তার জন্য কা'বা শারিফে থাকা জরুরি নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি কা'বা শারিফে অবস্থানরত থাকলে তাকে অবশ্যই হারাম শারিফেও অবস্থানরত বলতে হবে।[৪২]

হাদিসে ইসলাম শব্দ দ্বারা কখনও কখনও ইসলামি আখলাককেও বুঝানো হয়েছে। যেমন একদা জনৈক ব্যক্তি রসুল সা.-কে জিজ্ঞাসা করল, أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام 'ইসলামের কোন বিষয়টি উত্তম? রসুল সা. বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে এবং সালাম দিবে।[৪৩] এরূপে হাদিসগুলোতে উল্লিখিত ইসলাম শব্দ দ্বারা ইসলামি আখলাক বুঝানো হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন পর্যায়ের একটি পর্যায় হচ্ছে হুসনু ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য। এ প্রসঙ্গে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه 'মানুষের ইসলামের একটি সৌন্দর্য হচ্ছে যা তার জন্য দরকারি নয় তা ত্যাগ করা।'[৪৪] এ স্থলে অপ্রয়োজনীয় ও অর্থহীন আচরণ ত্যাগ করাই হুসনু ইসলাম বা ইসলামের সৌন্দর্য নামে আখ্যায়িত।

ইসলামকে দীন নামেও অভিহিত করা হয়। বস্তুত দীন সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাপকতর অর্থ বহন করে। দীন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আনুগত্য ও ইখলাস হলেও এর মর্মার্থ হচ্ছে মিল্লাত ও শারি'আত। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম'[৪৫] এ আয়াতের এটাই মর্ম। এরূপে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সত্যের দীন[৪৬], আল্লাহর দীন[৪৭] ও মযবুত দীন[৪৮] বলে আখ্যায়িত করেছেন। দশম হিজরিতে যে আয়াতে আল্লাহ দীন-এর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, সেখানে ইসলামকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে আয়াতটি ব্যবহার করেছেন।[৪৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'[৫০] ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে 'দীন শব্দটি ইমান, ইসলাম ও শারি'আতের যাবতীয় বিধি-বিধান– এ তিন অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে

---

৪১. আস-সাইয়িদ ফাখরুদ্দিন আত-তিরিহি, *মাজমা'উল বাহরাইন*(তেহরান : আল-মাকতাবাহ আল-মুরতাদাবিয়া, তা.বি.), পৃ. ৮৭

৪২. সাইয়িদ মুহাম্মদ হুসাইন আত-তাবাতাবা'ই, *আল-মিযান ফি তাফসিরিল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাহ আল-আ'লা লিলমাতবু'আত, ১৯৯৭), খ.১, পৃ. ২৯৬-২৯৭

৪৩. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, পৃ. ১৮, হাদিস নং ১১

৪৪. ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী রহ., অনু. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৬০৬, হাদিস নং ২৩২১

৪৫. আল-কুরআন, ৩ : ১৯

৪৬. আল-কুরআন, ৯ : ৩৩

৪৭. আল-কুরআন, ১১০ : ২

৪৮. আল-কুরআন, ৩০ : ৩০

৪৯. মুহাম্মদ আলি আস-সাবুনি, অনু. মাওলানা নিয়ামতউল্লাহ ও মাওলানা হাবিবুর রহমান, *সাফওয়াতুত তাফাসীর*(ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৬), খ.২, পৃ. ১৩৬

৫০. আল-কুরআন, ৫ : ৩

Dhaka University Institutional Repository

থাকে।'[৫১] মির সাইয়িদ শারিফ আল-জুরজানির মতে, 'দীন হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন-ব্যবস্থা যা জ্ঞানী ও চিন্তাশীল মানুষকে রসুল সা.-এর আনীত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহ্বান জানায়।'[৫২]

উপরিউক্ত আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, ইসলাম আকিদা ও মৌখিক স্বীকৃতি, ইসলাম আমল, আবার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন-বিধানও। আর এগুলোর সকলের সমষ্টির নাম হচ্ছে দীন। এ দীনে রয়েছে : (ক) আকিদা, (খ) ইবাদত ও (গ) মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক যেমন– ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক, আইন বিষয়ক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি। যদিও সকল নবিই দীন ইসলাম প্রচার করেছেন এবং তাদের প্রচারিত দীনের মধ্যে খুঁটিনাটি বিধি-বিধানে সামান্য পার্থক্য থাকলেও মূলনীতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ পার্থক্য ছিল না। এখানে ইসলাম বলতে সাধারণত হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক মানব জাতির জন্য প্রেরিত দীন ও শারি'আতকেই বুঝানো হয়েছে।

ইসলাম কয়েকটি বিষয় থেকে মুক্ত : ইসলাম সম্পর্কে বহুল প্রচলিত কিছু বিষয় থেকে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

ইসলাম শুধুমাত্র কিছু মিশনারি কাজের নাম নয় : ইসলামের কোনো বিশেষ দিককে ভিত্তি করে দা'ওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করাকে ইসলাম বলে মনে করা হয়। ইসলামকে এক্ষেত্রে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন না করে কোনো বিশেষ দিককেই গুরুত্ব দেয়া হয়। যারা এমনটা মনে করেন এ ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা প্রভাবিত অংশ ইসলামকে সামাজিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে চিন্তা করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে না। জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড থেকে ইসলামকে পৃথক করে শুধু দু'-একটি দিক মানুষের সামনে উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। দা'ওয়াতি কার্যক্রম এবং মিশনারি তৎপরতার ক্ষেত্রে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ এবং পরিপূর্ণভাবে তা মানুষের সামনে উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। দীনের আংশিক উপস্থাপনা দীন সম্পর্কে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ দিকটা আজ বাস্তব সত্য। দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই যাবতীয় মিশনারি কার্যক্রম ও দা'ওয়াতি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা উচিত। আল্লাহর এ পৃথিবীতে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বকে মুসলিমদের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবলই একটি ধর্ম নয় : ইসলামকে পাশ্চাত্যের সংকীর্ণ অর্থে একটি ধর্ম মনে করা হয়; যা যথাযথ নয়। দার্শনিকগণ ধর্মের যে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন 'ইসলাম' তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। খ্যাতনামা গ্রন্থকার যদুনাথ সিনহা তার লিখিত An Introduction to Indian Philosophy গ্রন্থে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন, 'Religion consists in belief in a super human power or powers which control and guide the destiny of man. The sentoments of awe, reverence, love and devotion and the pratical conduct which follow from them.'[৫৩] অর্থাৎ এক বা একাধিক মানবাতীত শক্তি যা মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, এতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে অনুযায়ী ভয়ভীতি, শ্রদ্ধা, প্রেম ও ধ্যানের ভাবাবেগে উদ্গত বাস্তব আচার-আচরণকে ধর্ম বলে।

ধর্মের উক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ধর্ম শুধুমাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার। স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিগত সম্পর্কের দিকটিই কেবল ধর্ম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে, এর বাইরে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকবে

৫১. ইমাম আবু হানিফা রহ., ভাষ্য. মোল্লা আলি কারি রহ., *আল-ফিকহুল আকবার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
৫২. মির সাইয়িদ শারিফ আল-জুরজানি, *কিতাবুত তা'রিফাত*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, তা.বি.), পৃ. ১১১
৫৩. Jadunath Sinha, *Introduction to Indian Philosophy*(Agra : The Modern Press, 1949), p. 35

Dhaka University Institutional Repository

না। তাই ধর্ম মূলত অত্যন্ত সংকীর্ণ ধারণা সৃষ্টিকারী একটি সংস্কৃত শব্দ। কতকগুলো ধর্মমত ও নীতিতে অন্ধবিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক কিছু উপাসনার নামই ধর্ম। মানুষের বাস্তব ও বস্তুজীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের সমাজে ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত বিভ্রান্তিকর ধারণা হচ্ছে ধর্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার, ধর্ম বস্তুজগত থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য ধর্মের আওতার বাইরে। ধর্ম ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার ব্যাপার। ইহকালের ভরসা রাষ্ট্রের উপর; পরকালের ভরসা ধর্মের উপর। ব্যক্তিজীবন স্রষ্টার আর সমাজজীবন রাষ্ট্রের।[৫৪] মোটকথা, মানুষের প্রগতিশীল ও কল্যাণকর প্রচেষ্টা বর্জিত সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতাই ধর্ম। অন্য কথায়, জীবনের স্তবস্তুতি করার পর সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে মানুষ ধর্মমুক্ত। ধর্ম সম্পর্কে এ যে ধারণা এর সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে আনুগত্যের মতাদর্শ আর মুসলিম হচ্ছে অনুগত। সে পৃথিবীর এ জগতে আল্লাহর খলিফা তথা প্রতিনিধি– জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে আল্লাহর বান্দা। ব্যক্তিজীবনে স্তবস্তুতি করার পর সে ইসলামের বিধি-বিধান থেকে মুক্ত, জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইসলামের কোন এখতিয়ার নেই, এসব ক্ষেত্রে মানুষ লাগামহীন ঘোড়ার মত যা ইচ্ছা তাই করবে ইত্যাদি ধরনের অন্যায্য ধারণাকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে।

দীর্ঘদিনের উপেক্ষা এবং অনবহিতির দরুন অনেকেই ইসলামকে প্রচলিত অর্থে একটি ধর্ম মাত্র মনে করে নিয়েছেন। কুরআন, হাদিস ও ইসলামি জীবনবিধান সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা ইসলামকেও ভুলবশত ব্যক্তিগত জীবনেই সীমাবদ্ধ দেখতে চান। তারা ভাবেন ইসলামে রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জীবনের অন্যান্য দিকের সমস্যা সমাধানের জন্য কোন পথনির্দেশ নেই। অনেকে বিদেশী মতাদর্শের সচেতন অনুসারী হওয়ার কারণে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষবশত এসব বিশ্বাস করেন এবং প্রচার করে বেড়ান। এরা বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ; কিন্তু সক্রিয় অংশকে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রভাবিত অংশের সংখ্যা নগণ্য হলেও এরা সুসংগঠিত ও সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক কর্মতৎপর।[৫৫] রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় এরা বহু দল, উপদলে বিভক্ত হলেও ইসলামি আদর্শের তথা কুরআন ও সুন্নাহ প্রবর্তনের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে এরা ঐক্যবদ্ধ। তবে এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অনেক সরলপ্রাণ মুসলিমও আজ এসব প্রচারণার শিকার হয়ে পড়েছেন। তাদের মনে নানা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে, নানা সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছে, বিশ্বাস ও কর্মের পর্বত প্রমাণ বৈপরীত্যে তারা হাবুডুবু খাচ্ছেন। ইসলামকে যারা ধর্ম হিসেবে মানেন তাদেরকে সামগ্রিক জীবনে শুধু গোঁজামিলই দিতে হয়। কারণ ইসলামের বহুবিধ আদেশ, নিষেধ ও মতামতের সাথে সমাজে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থার বিরোধ দেখা যায়। এর ফলে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামকে বাদ দিতে হয় অথবা ইসলামের উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যা দ্বারা গোঁজামিলের পথ তৈরি করা হয়।

ইসলাম শুধুই কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের নামও নয় : হিন্দুধর্মে রয়েছে বার মাসে তের পার্বণ, এর বাইরে আর কোন ধর্মকর্ম নেই। অনেকে একই পদ্ধতিতে ইসলামকে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব বলে মনে করে থাকে। আর মনে করে বলেই শবেবরাত, শবে কদর, আশুরা, ঈদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট কিছু দিবসে তারা ইবাদতের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। এ নির্দিষ্ট দিবসগুলোর বাইরে তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে বাইরে বিচ্ছিন্ন থাকে। এমনকি নিয়মিত ইবাদত সম্পাদনকারী মুসল্লিদের ঐ নির্দিষ্ট দিবসগুলোতে মসজিদে স্থান পেতে কষ্ট হয়। ইসলাম বার মাসে তের পার্বণের আদর্শ নয়; তেত্রিশ

---

৫৪. ড. ওয়াহিদুদ্দিন খান, অনূ. আবদুল মতিন জালালাবাদী, *আধুনিক চিন্তাধারা বনাম ধর্ম*(ঢাকা : ইফাবা, জুলাই, ১৯৮৮), পৃ. ১৯৯
৫৫. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

কোটি দেবতার উপাসনার ধর্মও নয়।[৫৬] ইসলামের ইবাদত সার্বক্ষণিক, প্রতিক্ষণে, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, ঘুমাতে, গৃহে, সমাজে, অফিস-আদালতে, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে সর্বক্ষেত্রে।[৫৭] মানুষের জীবন, প্রয়োজন এবং কর্মপ্রবাহের কোনো একটি দিক সম্বন্ধেও ইসলাম উদাসীন নয়। এটা ন্যূনতম কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নামও নয়, যা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সম্পন্ন করলে ইমানের দাবি আদায় হয়ে যায়। ইসলামি ব্যবস্থার বিস্তৃতি এত ব্যাপক যে বাস্তব জীবনের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি আবেগতাড়িত বিশ্বাস হিসেবে একে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

ইসলাম কারো নামসর্বস্ব মতাদর্শ নয় : ইসলাম শব্দটা কোন প্রচারকের নাম থেকে উদ্গাত হয়নি। সে সমস্ত ধর্মের নাম সংশ্লিষ্ট ধর্মগ্রন্থে নেই, সেসব ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মের নাম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের নামের সাথে জড়িত করে ফেলেছেন। এভাবে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে আজ যেসব ধর্ম ও মতাদর্শ রয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটির নামকরণ করা হয়েছে কোন বিশেষ ব্যক্তির নামে বা যে জাতির মধ্যে তা উৎপত্তি লাভ করেছে তার নামে। যেমন– যিশু খ্রিস্টের অনুসারীরা খ্রিস্টান, গৌতম বুদ্ধের অনুসারীরা বৌদ্ধ, কনফুসিয়াসের অনুসারীরা কনফুসিয়ান, ইয়াহুদি গোষ্ঠীর নামানুসারে ইয়াহুদি, মার্কস ও লেনিনের অনুসারীরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, মাও-এর অনুসারীরা মাওবাদী, বাহাউল্লাহর অনুসারীরা বাহাই। কিন্তু ইসলাম নামকরণের মধ্যে রয়েছে পৃথক বিশেষত্ব। শাব্দিক বিশ্লেষণে ইসলাম একটি গুণবাচক বা গুণ সম্বন্ধনীয় নামকরণ, মুহাম্মদ সা.-এর অনুসারীরা মুসলিম। মুসলিমদের আদর্শ ইসলাম। ইসলাম অর্থ আনুগত্য আর মুসলিম অর্থ অনুগত। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে ইসলামকে মোহামেডানিজম নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে খ্রিস্টান লেখক ও পাশ্চাত্যবাদী প্রাচ্যবিদ পণ্ডিতদের লেখার মাধ্যমে। এটা একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। ইসলামি মতাদর্শকে ব্যক্তিনির্ভর করার এ এক ঘৃণ্য প্রয়াস। ইসলাম মোহামেডানিজম নয় বা মুসলিমরা মোহামেডান নয়।[৫৮] এর কারণ হলো :

১. কুরআন ও হাদিসে এমন নামকরণের পক্ষে কোন ভিত্তি নেই;
২. আল্লাহ নিজেই তাঁর প্রদত্ত জীবনবিধানের নাম ইসলাম রেখেছেন। এ নামেই মহানবী সা. তাঁর মিশন পরিচালনা করেছেন।
৩. মোহামেডানিজম শব্দ থেকে এমন ধারণা তৈরি হতে পারে যে, ইসলাম মুহাম্মদ সা. প্রবর্তিত ধর্ম। এর মাধ্যমে মুহাম্মদ সা.-এর উপর খোদায়ী আরোপ করাও হতে পারে। বাস্তবে ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন আদর্শ। মুহাম্মদ সা. সে জীবন আদর্শের পরিচালক।
৪. এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ ইসলামের বিশ্বজনীনতা ও সকলের জন্য গ্রহণযোগ্যতাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র। কারণ মুসলিমরা মুহাম্মদ সা. ছাড়াও আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী-রসুলকেও বিশ্বাস করে।

ইসলাম শব্দটার অর্থের মধ্যে বিশেষ গুণের পরিচয় পরিস্ফুট হয়। ইসলামের তুলনা কেবল ইসলাম নিজেই। নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম কোন ব্যক্তিবিশেষের আবিষ্কার নয়, কোন জাতির নামানুসারেও এ মতাদর্শের নাম হয়নি। ইসলাম নামটি আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত।

ইসলাম শুধু আকাশের উপরের এবং মাটির নিচের কথা বলে না : ইসলামকে আকাশের উপরের এবং মাটির নিচের ব্যাপার বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুগত কর্মকাণ্ডে ইসলামের করণীয় যেন কিছুই নেই এটাই অনেকে বুঝতে চান। সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলামের যে দিক-নির্দেশিকা রয়েছে তা মানুষের সামনে তুলে ধরার খুব একটা প্রয়োজন রয়েছে বলে তারা মনে করেন না। চোখের সামনে সংঘটিত অন্যায় দেখে তারা চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেন দ্বন্দ্ব-সংঘাত এড়ানোর জন্য। বস্তুত আসমান ও জমিনের মধ্যখানের ফাঁকা জায়গার

---

৫৬. এ.জেড.এম. শামসুল আলম, *ইসলাম ও হিন্দুধর্ম*(ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৫), পৃ. ১৯০
৫৭. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৫৮. সম্পাদনা পরিষদ, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৭), খ.১, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

কোনো সমস্যামূলক বিষয়ে ইসলামের শিক্ষাকে তারা উপস্থাপন করতে চান না। পৃথিবীতে তাই ইসলাম মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত না থাকলেও একে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তারা কোন সহায়ক ভূমিকা তো দূরে থাক, বরং দায়িত্বশীল পর্যায়ে বিরোধিতার হাতকেই প্রসারিত করে থাকেন। ইসলাম মানব রচিত কোন বাতিল তন্ত্রমন্ত্রের সাথে আপোষ করে অধীনস্থ হয়ে থাকার জন্য পৃথিবীতে আসেনি; ইসলাম এসেছে পৃথিবীতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। আল্লাহ নবী মুহাম্মদ সা. দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার নবুওয়াতি জীবনের সামগ্রিক প্রয়াসের মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরাজমান সমস্যা নিয়ে কথা বলা যাবে না এটা রসুল সা.-এর শিক্ষা বিরোধী।[৫৯] দৈনন্দিন জীবনে এর সুস্পষ্ট অনন্য অনুষ্ঠানগুলো, এর ন্যায়শাস্ত্র এবং পদ্ধতি বিদ্যা অনুসরণ না করে শুধুমাত্র কতিপয় ধর্মীয় আচার মেনে আখিরাতে জান্নাত প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী প্রত্যয়বাদ হিসেবেও ইসলামকে বিবেচনা করা অযৌক্তিক। ধর্মীয় বনাম জাগতিক এ দুই ভাগে জীবনকে বিভক্ত করা ইসলাম কোন দিনই স্বীকৃতি প্রদান করেনি। অন্যান্য যেসব মতবাদ নিজেদেরকে ‘ধর্মীয়’ বলে দাবি করে কেবল এগুলোই জীবনের এ বিভাজনকে স্বীকৃতি দেয়; ইসলাম তা দেয় না।

ইসলাম বৈরাগ্যবাদ নয় : ইসলামে সন্ন্যাস বা বৈরাগ্য নেই। মহানবী সা. স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন : لا رهبانية في الإسلام ‘ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।’[৬০] আরবিতে বৈরাগ্যবাদের প্রতিশব্দ হল– ‘রুহবানিয়া’ (رهبانية); আর এরই ইংরেজি প্রতিশব্দ হল– Religion পার্থিব ও বস্তুজগত বর্জিত সম্পূর্ণ পারলৌকিকতার চর্চা বা বৈরাগ্য ইসলাম সমর্থন করে না। বৈরাগ্য হলো জীবনের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া, সংসারের প্রতি কর্তব্য না করার এটা একটি ফন্দিমাত্র। এ রকম পলায়ণপর মনোবৃত্তিকে ইসলাম কখনও ও কোথাও আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয় না। কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা ও নির্দেশে এরূপ দায়িত্বহীনতার কোন স্থান নেই। ইহজগতকে অস্বীকার করে পরকাল নিয়ে ইসলামের কার্যক্রম নয়। ইহকাল, পরকাল, বস্তুবাদ, আধ্যাত্মবাদ, পৃথিবী, আখিরাত এগুলোর কোনটাকেই ইসলাম অস্বীকার করে না।[৬১]

ইসলামি জীবনব্যবস্থা শুধু সাময়িক ব্যবস্থা নয় : ইসলামি জীবন ব্যবস্থা মানব জাতির জন্য শুধু সাময়িক ব্যবস্থা নয়। ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ের জন্যও তা প্রেরিত হয়নি। কোন বিশেষ পরিবেশ বা প্রজন্মের জন্যও তা নির্দিষ্ট হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হচ্ছে গতিশীল মানবজীবনের জন্য একটা চিরস্থায়ী মৌলিক বিধান। মানব সভ্যতার সর্বশেষ অধ্যায় পর্যন্ত মানুষ তার জীবনকে যাতে অবতীর্ণ বিধানের আলোকে পরিচালিত করতে পারে এমনি এক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে। এ সত্য পথের অনুসৃতির মাধ্যমেই মানুষ মর্যাদাবান হতে পারে। নির্ভেজালভাবে আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধান অনুসরণ করেই মানুষ সম্মানিত হতে পারে। অনাগত মানবগোষ্ঠীর জন্য ইসলাম বিশ্বজনীন চলমান বিধান হিসেবে বিদ্যমান।

ইসলাম কয়েকটি বিষয়ের সাথে যুক্ত : ইসলাম মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে যুক্ত। বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

ইসলাম একটি জীবনদর্শন ও জীবনব্যবস্থা : ইসলাম হচ্ছে একটি জীবন ব্যবস্থার নাম। এটি একটি সঠিক মতাদর্শ। সঠিক জীবন ব্যবস্থা মানুষের বস্তুগত জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। ইসলাম এ দুটো দিকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। সব সংঘাত ও সংঘর্ষের চিরন্তন ও মহাসমন্বয় হচ্ছে ইসলাম। জীবনাদর্শ, জীবন ব্যবস্থা ও জীবন বিধান হিসেবে ইসলামে রয়েছে সকল সমস্যার যথাযথ সমাধান। রয়েছে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার সমাধানের উপায় আর

---

৫৯. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৬০. ইমাম হুসাইন ইবন মাসউদ আল-বাগভি, *শারহুস সুন্নাহ*(বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৮৩), খ.২, পৃ. ৩৭১, হাদিস নং ৪৮৪

৬১. মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, *মোস্তফা চরিত*(ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, অক্টোবর ২০১৪), পৃ. ৫৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর পর আখিরাতের অনন্ত জীবনে নিশ্চিত সুখ-শান্তি লাভের পন্থা। ইসলাম মানুষের চলার পথের সন্ধানদাতা, উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী জীবন এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন তথা মানব জীবনের চরম লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র পথ।[৬২]

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান : ইসলামের উপস্থাপিত বক্তব্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। ইসলাম মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সমাজে স্থায়ী সুখ-শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠাকারী একটি মতাদর্শ। তাই এর ব্যাপ্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধিকার রয়েছে। তাই ইসলাম মানুষের সঠিক পথের দিশারি, পৃথিবী ও আখিরাতের সর্বাঙ্গীন ও পূর্ণাঙ্গ একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الإِسْلاَمُ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।'[৬৩] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন : اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيْنًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমত পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দীন হিসেবে ইসলামকেই তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।'[৬৪] এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মানবতার জন্য নি'আমত হিসেবে পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক শুধু উপাসনার নয়। উপাসনা, স্তবস্তুতির পর মানুষ আল্লাহ-নিরপেক্ষ জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষের সমগ্র জীবনই আল্লহর নির্দেশের অধীন। ইসলামে আল্লাহ শুধু স্তবস্তুতি ও উপাসনার নির্দেশ দিয়েই ক্ষ্যান্ত হননি; বরং মানবজীবনের যাবতীয় দিক ও বিভাগ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করেছেন। ইসলাম সর্বব্যাপক এবং এর ব্যবস্থাগুলো পরস্পর সঙ্গতিপূর্ণ।

ইসলাম একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা : ইসলামের প্রদর্শিত পথ সহজ-সরল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত।[৬৫] ইসলাম মানুষের জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ ভারসাম্য স্থাপনে সক্ষম। বিশ্বের অপর কোন মতাদর্শ ইসলামের ন্যায় ভারসাম্য স্থাপন করতে পারেনি। কেউ হয়ত পার্থিব বিষয় নিয়ে ব্যস্ত, আর কারও কারবার শুধু আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে। বৌদ্ধধর্ম মতে, জীবহত্যা মহাপাপ। এ জন্য জীবহত্যা না করার নীতিতে অটল থেকে নিরামিষ আহার করে মঠের মধ্যে ধ্যানরত থেকে আত্মার বিশুদ্ধকরণই তাদের মুক্তির পথ। খ্রিস্টান ধর্ম মতে জীবনে কঠোর সংযমব্রত পালন করে চিরকুমার বা চিরকুমারী অবস্থায় গির্জায় থেকে আত্মোন্নতির সাধনাই তাদের কাম্য। আর হিন্দুধর্ম মতে সংসারত্যাগী বৈরাগী হয়ে নির্জনবাসে মালা জপতে জপতে ব্যক্তিসত্তার উন্নতির প্রয়াসই করণীয়। এসব ধর্মের বাস্তব জীবনে কোন কিছুই করণীয় নেই। বস্তু ও বাস্তব জীবনকে তারা কোন গুরুত্বই দেয়না। অন্যদিকে মার্কসবাদী নাস্তিকতায় পেটের ক্ষুধাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আত্মার ক্ষুধাকে অস্বীকার করা হয়েছে। এ এক বিরাট ভারসাম্যহীনতা।[৬৬] ইসলাম জীবনের সকল দিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়েছে। জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। তাই ইসলামই একমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য যে মূলনীতি উপস্থাপন করেছে, একমাত্র তার আলোকেই ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে সুষ্ঠু ও ভারসাম্যপূর্ণ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

---

৬২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৫), খ.৫, পৃ. ৫২১
৬৩. আল-কুরআন, ৩ : ১৯
৬৪. আল-কুরআন, ৫ : ৩
৬৫. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানি, অনু. মুফতী মুহাম্মদ তৈয়েব হোসাইন, *ইসলামী জীবনব্যবস্থা*(ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ৩১২
৬৬. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সুবিন্যাস্ত একটি মতাদর্শ : মতাদর্শ হিসেবে ইসলামে রয়েছে একটি সিস্টেম যা অত্যন্ত সুসংবদ্ধ, পদ্ধতিসম্মত, বিধিবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ। ইসলামের প্রতিটি নীতি ও পদ্ধতি অত্যন্ত সুসংহত। ইসলামের নির্দেশিত সমকল কর্ম সম্পাদন করতে হয় সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সিস্টেমের ভিত্তিতে। এ ক্ষেত্রে খামখেয়ালির কোন অবকাশ নেই। ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ সা. তদানীন্তন আরবের এক করুণ, বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল, জাহিলি ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে আল্লাহ প্রদত্ত অহির জ্ঞানের ভিত্তিতে সেখানে একটি আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সিস্টেমের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিস্টেম হল কোন ব্যবস্থার সামগ্রিক পর্যালোচনা। সামগ্রিক বা অখণ্ডরূপে কোন বিষয়ের পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণই সিস্টেমের উদ্দেশ্য। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তির নাক, কান বা মুখের বর্ণনা ও পর্যালোচনা তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন তা সমগ্র দেহের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন হবে। এ ক্ষেত্রে মানবদেহ হচ্ছে একটা সিস্টেম। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী আনাতোল র‍্যাপোর্ট সিস্টেমের একটা সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তার মতে, 'A whole which functions as a whole by virtue of interdependence of its parts is called a system' অর্থাৎ 'সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা সামগ্রিক ব্যবস্থা যা তার বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে কার্যকর থাকে।'[৬৭] যেমন : মোটরগাড়ি একটা সিস্টেমের অধীনে কর্মরত। সিস্টেম তাই সব সময়ই তা অত্যন্ত সুসংহত ও সুশৃঙ্খল। একটা বৃহৎ সিস্টেমের মধ্যে অনেক উপসিস্টেম থাকতে পারে। তাদেরকে পৃথক করে বিবেচনা করা যায় ইসলাম এমনই একটা সিস্টেম। ইসলামের পর্যালোচনা অখণ্ড ও সামগ্রিক। ইসলাম মানব জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে বিবেচনা না করে একটা ইউনিটি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ইসলাম একটা সুসংহত মতাদর্শ।

ইসলাম একমাত্র ব্যাপকভিত্তিক মতাদর্শ : মতাদর্শ হিসেবে ইসলামের রয়েছে ব্যাপকতা। ইসলাম মানুষের সার্বিক জীবন পথের দিশারি। ইসলামের এ ব্যাপকতার কারণেই মানুষের জীবনের কোন ক্ষুদ্র দিকও ইসলামের আওতার বাইরে কল্পনাতীত।[৬৮]

ইসলাম হচ্ছে একটি বিপ্লবী চেতনা ধারা : ইসলাম একটি বিপ্লবী আদর্শ; মানুষের জীবনে এক মহাবিপ্লব। ইসলাম স্বতঃতই একটি বিপ্লবী চেতনা ধারা; যা পৃথিবীতে এসেছে একটি কাম্য পরিবর্তন সাধনের জন্য। এ পরিবর্তন জোড়াতালির মাধ্যমে পরিবর্তন নয়; বরং আমূল পরিবর্তন। শেষ নবী মুহাম্মদ সা. ইসলামকে একটি বিপ্লবী চেতনা ধারা হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রদর্শিত আদর্শ ছিল একটি আমূল পরিবর্তন আনয়নের প্রয়াস। তাই এক আল্লাহর একচ্ছত্র ও সার্বভৌম প্রভুত্বের ভিত্তিতে মানবজীবনের পরিপূর্ণ ইমারত রচনা করার প্রচেষ্টা ও আন্দোলনকেই বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে বলা হয় ইসলাম।[৬৯]

ইসলাম একটি বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন : ইসলাম সকল বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী মহান আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত। তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা বিজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবভিত্তিক। একই সাথে ইসলাম সামাজিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শও। স্বর্ণযুগে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পুরোমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলাম তখন আরব ভূমিতে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই এমনটা সম্ভব হয়েছিল। আর এ লক্ষ্যেই রসুল সা. ইসলামি মতাদর্শের ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[৭০]

---

৬৭. Anatol Rapoport, *Systems Theory and Regulatory Mechanism*(New York : University Press of America, 2007), p. 28

৬৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০০৫), খ.৫, ৫২১

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, ৫২৩

৭০. নঈম সিদ্দিকী, অনূ. আকরাম ফারূক ও আবদুস শহীদ নাসিম, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.*(ঢাকা : বর্ণালি বুক সেন্টার, ২০১৭), পৃ. ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম চায় সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্য ও বিভেদের মূলোৎপাটন করে একটি শোষণহীন, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন করতে। ইসলাম মানুষকে মানুষের গোলামির বন্ধন থেকে মুক্ত করে আল্লাহর সত্যিকার বান্দাতে পরিণত করতে চায়। রসুল সা.-এর অনুসৃত পন্থায় একটি বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা সম্ভব।

ইসলাম মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ : ইসলামই পারে মানবতাকে যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে। একটি বিপ্লবী আদর্শ, একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামেই নিহিত রয়েছে মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার যথাযথ সমাধানের উপায়। একমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানবতার সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ।

ইসলাম মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ : আজকের হতাশাক্লিষ্ট, শোষিত-বঞ্চিত মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ ইসলাম। যাবতীয় শোষণ, বঞ্চনা, নিপীড়ন ও মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব মূলোৎপাটনে আগামী দিনে একমাত্র ইসলামই ভূমিকা পালন করতে সক্ষম; এ ক্ষেত্রে আর কোন বিকল্প নেই।[৭১] মানবরচিত যাবতীয় আদর্শের ব্যর্থতার পটভূমিতে এক্ষেত্রে ইসলাম হতে পারে মানবতার একমাত্র ভবিষ্যৎ। ইসলামই হবে আগামী দিনের জীবনবিধান।[৭২]

মোটকথা, ইসলাম হচ্ছে বিশ্বাস ও ইবাদত, রাজনীতি ও নেতৃত্ব, অর্থনীতি ও উন্নয়ন, আইন ও বিচার, যুদ্ধ ও শান্তির নীতি প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এক নিখুঁত ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। ইসলাম এমন এক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শব্দ যা তার অর্থের ব্যাপকতায় স্থান, কাল ও পাত্রকে অতিক্রম করে। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। মানুষের বুনিয়াদি ইবাদত, ব্যক্তি জীবনের কর্মকাণ্ড, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা, শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি, নৈতিক চরিত্র, অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, জীবন-সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা, বিবাহ-শাদি, উত্তরাধিকার আইন, পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, যুদ্ধ ও শান্তি, প্রতিবেশী, পরিবার ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সুবিচার-অবিচার, সমাজ ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি এমন কোনো ক্ষেত্র ও পরিধি নেই, যে ব্যাপারে ইসলাম সঙ্গত-অসঙ্গত, বৈধতা-অবৈধতার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেনি। মানুষের পরিপূর্ণ জীবনের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত এ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও বিধানের নামই হচ্ছে দীন ইসলাম। সামাজিক নিরাপত্তার দিকটিও ইসলামের নীতিমালা থেকে বাদ পড়েনি। তাই দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, ইসলাম একমাত্র পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা।

---

৭১. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, খ.৫, প্রাগুক্ত, ৫৩১

৭২. নঈম সিদ্দিকী, অনূ. আকরাম ফারূক ও আবদুস শহীদ নাসিম, *মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামি সমাজের পরিচয়

সমাজ হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠীর একক, যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান আছে, পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা পরস্পরিক সহযোগিতায় বা সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রচলিত সমাজের মতো ইসলামি সমাজও মানুষের মানবিক প্রয়োজন পূরণের স্বার্থে, মানুষের জন্য এবং কেবল মানুষের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করে। তবে ইসলামি সমাজের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্ভাবিত আইন-কানুন কিংবা মূল্যবোধ অনুসারে হয় না। বরং এ সমাজের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও নিযন্ত্রণের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামি আদর্শ, আইন-কানুন ও মূল্যবোধ পরিপূর্ণভাবে সক্রিয় থাকে। ইসলামি সমাজ বিশ্ব বিস্তৃত একটা বিশাল সমাজ। নিচে ইসলামি সমাজের পরিচিতি উপস্থাপিত হলো :

ইসলামি সমাজের পরিচয়

ইসলামি সমাজের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন :

মাজিদ খাদ্দুরির মতে, ‘ইসলামি আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামষ্টিক প্রতিষ্ঠান হলো ইসলামি সমাজ।’[৭৩]

আল-মাওয়ার্দির মতে, ‘যে সমাজ একান্তভাবে দীন সংরক্ষণ করে, পার্থিব কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে এবং সামাজিকভাবে নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করে সে সমাজকে ইসলামি সমাজ বলা হয়।’[৭৪]

প্রফেসর খুরশিদ আহমদের মতে, ‘যে সমাজের সকল কার্যক্রম ইসলামি আইন দ্বারা পরিচালিত এবং যে সমাজে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও প্রাধান্য মেনে নিয়ে, তাঁর বিধান অনুসরণ করে তা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা পরিচালনা করা হয় তাকে ইসলামি সমাজ বলে।’[৭৫]

ইবনে খালদুনের মতে, ‘সমাজের সদস্য মানুষের মানবিক, বৈষয়িক, পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণ সাধনের সার্বিক ব্যবস্থা সম্পন্নকারী সমষ্টিক ব্যবস্থার নাম ইসলামি সমাজ।’[৭৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে, ‘সে সমাজকে ইসলামি সমাজ বলা যায় যার সকল বা অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম এবং সকল কাজ ইসলামের নীতিমালা অনুসারে পরিচালিত হয়।’[৭৭]

ইমাম ইবন তাইমিয়ার মতে, ‘ইসলামি সমাজ একটি ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সফলভাবে সকল ইসলামি আইন প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।’[৭৮]

নিজামুল মুলক তুসির মতে, ‘যে সমাজের জনসাধারণের জীবন-সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা বিধান, সুবিচার, মৌলিক চাহিদা পূরণ, সুখ-শান্তি নিশ্চিতকরণ, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক হয়ে থাকে, তাকেই ইসলামি সমাজ বলা হয়।’[৭৯]

---

৭৩. Majid Khadduri, *Al-Shafi's Risala*(UK : The Islamic Texts Society ,1987), p. 179
৭৪. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ৯৩
৭৫. Prof. Khurshid Ahmad, *Family Life in Islam*(Leicester : Islamic Foundation, 1982), p. 51
৭৬. আবদুর রহমান ইবন খালদুন, *মুকাদ্দিমা ইবন খালদুন*(বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০১), খ.১, পৃ. ১৬১
৭৭. আবু জাফর আহমদ আত-তাহাবি, *শারহু মা'আনিল আছার*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৩৯৯হি.), পৃ. ২০১
৭৮. ইবন তাইমিয়া, *মাজমু' আল-ফাতাওয়া*(মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ২০০৪), খ. ১৯, পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

তাই ইসলামি সমাজ হলো ইসলামের আদর্শ, রীতিনীত ও বিধিবিধানের ভিত্তিতে গড়ে উঠা মানবসমাজ। এ সমাজের বিকাশ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। এর অধিকাংশ সদস্য ইসলামি অনুশাসনের অনুসারী হন। আদিপিতা হযরত আদম ও আদিমাতা হযরত হাওয়া আ.-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তা ছিল ইসলামি সমাজের সুতিকাগার। পরবর্তীতে তা বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন রকম সমাজে রূপ লাভ করে।

সুতরাং যে সমাজ ইসলামি হুকুম-আহকাম ও আদর্শ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ইসলামি সমাজ বলা হয়। আর ইসলামি সমাজব্যবস্থা বলতে এমন সমাজব্যবস্থাকে বুঝায় যেখানে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ছাড়া ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব নয়। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা থাকলে ইসলামি শাসনব্যবস্থা থাকবে। আর রাষ্ট্রীয়ভাবে শাসন কাজে ইসলামকে আইনের উৎস ও সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করা হলে ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে। সহজভাবে বললে, সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য যে সমাজব্যবস্থায় ইসলামি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্দিষ্ট হয় এবং অক্ষুণ্ন থাকে সে সমাজব্যবস্থাকে ইসলামি সমাজব্যবস্থা বলে।

মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকেই ইসলামি সমাজের উৎপত্তি এবং ধীরে ধীরে তার ক্রমবিকাশ। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءًۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِه وَالْاَرْحَامَ.

'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বিপুল সংখ্যক নর-নারী ছড়িয়ে দেন। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর।'[৮০] উক্ত আয়াত থেকে দু'টি মূলনীতি নির্গত হয়েছে : (১) সকল মানুষ একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্ট হয়েছে; অতএব সকল মানুষ সমান। (২) উক্ত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক। বস্তুত ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা উক্ত মূলনীতি দু'টির উপর প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে এ শিক্ষা দেয় যে, বিশ্ব-মানব সকলে মূলত পরস্পর ভাই ভাই এবং উক্ত বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মিক ঐক্য ও সংহতি অপরিহার্য। আল-কুরআনের প্রথম সুরা আল-ফাতিহার শুরুতে বলা হয়েছে : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ 'সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য।'[৮১] প্রথমোক্ত সুরা নিসার আয়াতে ও সুরা ফাতিহার এই আয়াতে আল্লাহকে রবুবিয়্যাত বা প্রতিপালকত্বের বিশেষণে বিশেষিত করে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার রবুবিয়্যাত গুণের পরিধিকেও সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি; বরং প্রথমোক্ত আয়াতে তাকে সমগ্র মানব জাতির সাথে এবং শেষোক্ত আয়াতে তাকে জগতসমূহের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এটা থেকে জানা যায় যে, ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে, জীবনের সকল প্রয়োজনে ও জীবিকা অর্জনের ব্যাপারে সকল মানুষ এক ভ্রাতৃসংঘের ন্যায়। একটা বিশেষ পরিবেশে সমানাধিকারের ভিত্তিতে সকলেই বেঁচে থাকার ও আত্মবিকাশ লাভ করার সমান সুযোগ লাভ করবে। স্বয়ং তাওহিদের আকিদাও সমগ্র মানব জাতির ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে : الخلق كلهم عيال الله 'সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার।'[৮২]

৭৯. নিজাম-উল-মুলক আবু আলি আল-হাসান আত-তুসি, *সিয়াসাতনামা*(তেহরান : কিতাব ফুরুশি জাওয়ার, ১৩৪৪হি.), পৃ. ১১২
৮০. আল-কুরআন, ৪ : ১
৮১. আল-কুরআন, ১ : ১
৮২. ইমাম আল-হাফিয আহমাদ ইবন আলি আল-তামিমি, *মুসনাদু আবি য়া'লা*(দামিশক : দারুস সাকাফাহ আল-আরাবিয়া, ১৯৯২), খ.৬, পৃ. ৬৫, হাদিস নং ৩৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতির ঐক্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করার জন্য ইসলাম আধ্যাত্মিক দা'ওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারণ শুধু পার্থিব বস্তুর উপায়-উপকরণের উপর ভিত্তি করে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিশ্চিত ও সুদৃঢ় হতে পারে না। এ কারণেই ইসলাম আকিদা-বিশ্বাসের সাহায্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কার্য নবী-রসুলগণই সম্পাদন করে গিয়েছেন এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন উক্ত মিশনের সর্বশেষ সদস্য। ইসলামি সমাজ সর্বপ্রথম গঠিত হয় মদিনাতে। সেখানে আনসার, মুহাজির, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের নিয়ে একটি সমাজের রূপদান করা হয়। তা দ্বারা যে মহৎ বিশ্ব-সামজ গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণে সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হয়ে রয়েছে :

১. **সাম্য ও ন্যায় :** বর্ণ, গোত্র, বংশ ও জাতিত্বকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে বরং একমাত্র তাকওয়াকেই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড বলে নির্ধারিতকরণ;

২. **সমান আচরণ :** মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনসমূহের ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান আচরণ;

৩. **ইনসাফ ও ন্যায় বিচার :** মানুষের বিধানের স্থলে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সকল মানুষের জন্য ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রাপ্তিকে সহজ করে দেয়া।

ইসলামি সমাজে সাম্য ও ন্যায় : ইসলাম মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে, অমুসলিমদের উপাসনাসমূহকে হিফাজত করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, প্রতিশ্রুতি পূরণ করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে নির্দেশ করেছে এবং মধ্যপন্থী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামি সমাজ বর্ণবাদ, গোত্রবাদ, গোষ্ঠীবাদ ও ভৌগোলিক সীমারেখাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ঘৃণ্য মানসিকতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। ইসলামি সমাজে জাতিভেদের কোনও স্থান নেই। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গের উপর শ্বেতাঙ্গের এবং অনারবের উপর আরবের কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এরূপে ইসলামি সমাজে গোত্রবাদ ও গোষ্ঠীবাদের ভিত্তিতেও কারও উপর কারও কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব নেই; বরং ইসলামি সমাজে একমাত্র তাকওয়ার ভিত্তিতেই মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।'[৮৩] তবে মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَرَفُوْا 'আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্র ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।'[৮৪] পবিত্র কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে : يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ 'হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন'[৮৫] এ আয়াতে আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির ঐক্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাতে সুন্দর ও সুসভ্য সমাজ গঠনে ও তার দৃঢ়তা সাধনে সহায়তা লাভ করা যায়। তবে এ উদ্দেশ্যে ইসলাম মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ সম্পর্কে আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে : إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ 'মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের ভাই। অতএব, তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।'[৮৬] এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র উল্লিখিত হয়েছে: فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ 'অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।'[৮৭]

---

৮৩. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩
৮৪. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩
৮৫. আল-কুরআন, ৪ : ১
৮৬. আল-কুরআন, ৪৯ : ১০
৮৭. আল-কুরআন, ৮ : ১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি ভ্রাতৃত্বের এ মেযাজ ও স্বভাব ইসলামি সমাজের যাবতীয় কার্য ও আচরণে প্রতিফলিত দেখা যায়। এটা দ্বারাই সমাজে এরূপ সাম্য সৃষ্টি হয়েছে যার উপমা পৃথিবীর অন্য কোনও সমাজে পাওয়া যায় না। এর স্পষ্ট ও বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রে। অবশ্য হাজ্জ পালনের ক্ষেত্রটি ইসলামি সাম্য প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্য থেকে মাত্র একটা ক্ষেত্র। হাজ্জ পালনের সময়ে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্র পরিচয় অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। একবার জাবালা ইবনুল আইহাম গাসসানি সর্বশেষ গাসসান বাদশাহ যিনি হযরত উমর রা.-এর খিলাফতের যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, হাজ্জের সময়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন। এ সময়ে হঠাৎ তার চাদরের কোণে জনৈক বেদুইনের পা পড়ল। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বেদুইনকে চপেটাঘাত করলেন। বেদুইন হযরত উমর রা.-এর নিকট তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। হযরত উমর রা. রায় দিলেন, বেদুইন যেন আমির জাবালাকে অনুরূপ একটা চপেটাঘাত করে। এতে আমির জাবালা স্বীয় প্রতিপত্তির অহংকারে বললেন, ‘আমি হচ্ছি সে মর্যাদাবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি যার প্রতি কেউ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলে সে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তির যোগ্য হয়ে যায়।’ হযরত উমর রা. বললেন, ‘জাহিলি যুগে ঐরূপ নিয়মই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ইসলাম এসে বাদশাহ ও ফকিরকে এবং উচ্চ ও নিচকে সমান ও একাকার করে দিয়েছে।[৮৮]

ইসলামি সমাজে মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন : মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইসলামি সমাজের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। আল্লাহ্ তা'আলা বলছেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً

‘আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, তাদেরকে জলে-স্থলে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং আমি তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি। আর আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি।’[৮৯] ইসলাম মানুষ হিসেবে মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। ইসলাম মাতাপিতা, স্ত্রী প্রমুখ পরিবারের সদস্যদেরকে বুদ্ধিমত্তা ও মানবতার ভিত্তিতে অতিশয় মর্যাদাবান করেছে। ইসলাম পুরুষকে জীবন-যুদ্ধের কর্ণধার করেছে এবং নারীকে পুরুষের জীবন-সঙ্গিনী বানিয়ে সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। ইসলাম দাসকে মুক্তির সুসংবাদ শুনিয়েছে, দরিদ্র ও নিঃস্বদের জন্য আর্থিক সহায়তা দানের বিধান প্রবর্তন করেছে, মুসাফিরদের হিফাজত ও মেহমানদারির ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে, ইয়াতিমদের সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছে, প্রতিবেশীদের সাথে সহানুভূমিমূলক আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে এবং বিধবাদেরকে সম্মানিত জীবন যাপন করার পূর্ণ অধিকার প্রদান করেছে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, ইসলাম দাসপ্রথা থেকে উদ্ভুত সমস্যার সমাধানও প্রশংসনীয় পন্থায় সম্পন্ন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রচলিত এ ঘৃণ্য প্রথাকে অত্যন্ত কৌশলের মাধ্যমে রহিত করে দিয়েছে। ইসলাম মানবাধিকারের দিক দিয়ে দাসদেরকে তাদের স্বাধীন মনিবদের সমান করে দিয়েছে। স্বাধীন মুসলিম মনিবগণও তাদের প্রতি কোনরূপ অমানবিক ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা বৈধ মনে করতেন না। তারা একই দস্তখানে বসে তাদের সাথে একত্রে আহার গ্রহণ করতেন। ইসলাম দাসদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকূপ থেকে বের করে এনেছে এবং তাদেরকে সম্মানের উচ্চ স্থানে পৌঁছার সুযোগ করে দিয়েছে। সর্বোপরি তাদের অন্তর থেকে হীনতাবোধ দূর করেছে। রসুল সা. দাসদাসীদেরকে সমাজে সম্মান ও মর্যাদার আসন দান করেছেন। হিজরতের পর মদিনাতে গিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করার কালে তিনি স্বীয় চাচা হযরত হামযা রা.-কে স্বীয় খাদিম ও মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়িদ ইবন হারিসা রা.এর ভাই, হযরত

৮৮. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫২১
৮৯. আল-কুরআন, ১৭ : ৭০

Dhaka University Institutional Repository

খালিদ ইবন রাওয়াহা আল-খাইছামি রা.-কে হযরত বিলাল হাবসি রা.-এর ও হযরত আবু বকর রা.-কে হযরত খারিজা ইবন যায়িদ রা.-এর ভাই বলে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। মক্কা বিজয়ের পর কা'বা শরিফের ছাদে চড়ে আযান দেয়ার সম্মান ও সৌভাগ্যও হযরত বিলাল রা. লাভ করেছিলেন। আর যখন এ বিষয়টি কুরাইশ নেতৃবর্গের নিকট অমনঃপুত লেগেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে ঘোষনা করেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী।'[৯০] আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করে লোকদের সম্মুখে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা উপস্থাপিত করেছিলেন। এতদ্বারা আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি তাদের নিকট পরিস্কার করে তুলে ধরেছেন যে, বংশ নয়; বরং তাকওয়া ও ব্যক্তিগত পূণ্যই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদা লাভের একমাত্র মানদণ্ড। রসুল সা. একটি বিখ্যাত হাদিসে বলেছেন, 'তোমাদের দাসগণ তোমাদের ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের খাদিম বানিয়েছেন। যে ব্যক্তির অধিকারে তার ভাই ন্যস্ত থাকে, সে যেন তাকে নিজে যা খায় তাই খেতে দেয় এবং নিজে যা পরিধান করে তাই পরিধান করায়। তোমরা তাদেরকে দিয়ে তাদের ক্ষমতার অতীত বোঝা বহন করাবে না। যদি কখনও তাদের মাথায় তাদের সাধ্যের অতীত বোঝা রাখতেও হয়, তবে তা বহনে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করবে। তোমাদের কেউ যেন স্বীয় দাসদাসীকে আমার দাস বা আমার দাসী বলে সম্বোধন না করে; বরং তোমরা তাদেরকে আমার পুত্র বা আমার কন্যা বলে সম্বোধন করবে।'[৯১] বস্তুত ইসলামের কল্যাণে দাসগণ ও যারা ইসলামি সমাজে মাওলা নামে পরিচিত ছিলেন, উচ্চ উচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। খলিফা হযরত উমর ইবন আবদিল আযিয রহ. তার শাসন কালে কয়েকজন দাসকে কায়রোতে বিচারপতি নিযুক্ত করেছিলেন।[৯২] ভারতীয় উপমহাদেশে দাস বংশের এবং মিশরে মামলুক বংশের রাজত্ব ও রাজ্য শাসনের ইতিহাস ইসলামে দাসদের উচ্চ মর্যাদা লাভ করার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।[৯৩]

ইসলাম দাসদেরকে মুক্তি দেয়ার কার্যের ফযিলাতের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং তাদের প্রতি সদয় ও সহৃদয় ব্যবহার করতে গুরুত্ব দিয়েছে। দাসদাসীদের বিষয়ে ইসলাম কর্তৃক প্রদত্ত বিধানাবলির মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান এই যে, তা যাকাতের একটি নির্দিষ্ট অংশকে দাসদাসীদের মুক্তির উদ্দেশ্যে তাদের মুক্তিপণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য নির্দেশ করেছে। আর যেহেতু কোনও দাসদাসীকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্য বা মুক্তিপণের সম্পূর্ণ অর্থ অথবা তার অংশবিশেষ কোনও ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে পরিশোধ করা সাধারণত সম্ভব হয় না, তাই ইসলামে সমাজের একাধিক বিত্তশালী সদস্যের নিকট থেকে প্রাপ্ত যাকাতের অর্থ দ্বারা উক্ত কর্তব্য সম্পাদনা করা বিধান প্রদত্ত হয়েছে। ইসলাম দাসদাসীদের অধিকারসমূহের রক্ষার প্রতি এরূপ গুরুত্বারোপ করেছে এবং তাদের অধিকার রক্ষার জন্য এরূপ বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে যে, ইসলামি সমাজে দাসত্ব প্রথা আর দাসত্ব প্রথা থাকেনি।

ইসলামি সমাজে অমুসলিমদের প্রতি আচরণ : ইসলাম অমুসলিমদের প্রতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছে এবং তাদের অধিকারসমূহকে রক্ষা করেছে অর্থাৎ ইসলাম তাদের জীবন-সম্পদ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত

---

৯০. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

৯১. ড. সুবহি আস-সালিহ, *আন-নাজমুল ইসলামিয়া*(বৈরুত : দারুল ইলম লিল মালাইন, ১৯৯২), পৃ. ৪৬৮

৯২. আল-মাকরিযি, *আল-খুতাত*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, ১৯৯৮), খ.২, পৃ. ৩৩২

৯৩. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১), পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

উমর রা. স্বীয় খিলাফতের যুগে বাইতুল মুকাদ্দাসের খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির অধীনে তাদেরকে যে সকল অধিকার প্রদান করেছিলেন, তার বিবরণ ছিল নিম্নরূপ :

'এটা হচ্ছে আল্লাহর বান্দা আমিরুল মু'মিনিন উমর কর্তৃক ইলিয়াবাসীদেরকে প্রদত্ত নিরাপত্তা। এ নিরাপত্তা তাদের জীবন, সম্পদ, গির্জা ও ক্রুশের জন্য, তাদের সুস্থ ও অসুস্থ সকলের জন্য এবং তাদের সকল সমধর্মাবলম্বীর জন্য প্রদত্ত হল। অতএব তাদের উপাসনালয়সমূহে বসবাসও করা যাবে না এবং তাদেরকে বিধ্বস্তও করা যাবে না। আর তাদের সীমানা ও আয়তন কমানও যাবে না। আর তাদের ক্রুশসমূহের সংখ্যা বা তাদের ধন-সম্পদের পরিমাণকেও কমান যাবে না। ধর্মীয় ব্যাপারে তাদের প্রতি কোনরূপ শক্তি প্রয়োগ করা যাবে না।'[৯৪] উক্ত অধিকারসমূহ শুধু ইলিয়ার অধিবাসীদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল না; বরং মুসলিমগণ কর্তৃক বিজিত সকল দেশের অধিবাসীদেরকেই এ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিসমূহে এ সকল বিষয় উল্লিখিত রয়েছে।

আল-কুরআন ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে পরিবেশ রচনা করেছে, তা দ্বারা সমাজে কতকগুলো বিশেষ গুণসম্পন্ন মানুষের সৃষ্টি হয়। উক্ত বিশেষ গুণগুলো দু'টি শব্দে নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায় : (১) মুত্তাকি ও (২) সালিহ। মুত্তাকি এমন গুণসম্পন্ন মানুষ যে আল্লাহর ভয়ে সকল প্রকারের অপরাধ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। আর সালিহ এমন গুণসম্পন্ন মানুষ যে যাবতীয় সৎকার্য সম্পাদন করতে চেষ্টা করে, যার দ্বারা মানুষের ব্যক্তিগত জবিনে পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে, সমাজে সততা ও শান্তি আসতে পারে এবং সর্বোপরি জীবনের উত্তম উদ্দেশ্যাবলি অর্জনে মানুষ সফল হতে পারে। ইসলামে সৎকাজের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সৎকাজ বলতে শুধু কতকগুলো নির্দিষ্ট ইবাদতকেই বুঝান হয় না; বরং তা দ্বারা এমন যাবতীয় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সৎকাজকে বুঝান হয় যাদের উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত গভীর রহস্যাবলির জ্ঞান লাভ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণ সাধন, সৎকার্যসমূহ ব্যাপকভাবে বিস্তীর্ণ এলাকায় সম্পাদন, পাপাচারের মূলোৎপাটন ও উন্নত সমাজের প্রতিষ্ঠা। এতদ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, সালিহ মানুষ অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তি স্বীয় সৎকাজের সাথে ইলম ও হিকমতের নি'আমত দ্বারা লাভবান হবে, সৎ কার্যাবলিতে সদা তৎপর এবং গম্ভীর অথচ সৃষ্টির প্রতি স্নেহপরায়ণ হবে। আল-কুরআনে সৎ কাজের যে ধারণা প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে সৎ উদ্দেশ্যাবলি যেমন– আল্লাহর মা'রিফাত ও হিকমতের সন্ধান এবং আল্লাহর রহমত কামনা ইত্যাদি অর্জনের লক্ষ্যে সর্বপ্রকারের প্রচেষ্টা চালানোর এবং অসৎ কার্য থেকে বিরত থাকতে আদেশ-উপদেশ প্রদান করার বিশেষ নির্দেশ। মা'রিফাতের জ্ঞান লাভ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিতকরণ পর্যন্ত এবং নিজ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা থেকে শুরু করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম তথা অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করা পর্যন্ত যাবতীয় সৎকাজ সে সকল ব্যক্তির ধ্যানে ও কর্মে প্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত হবে। এভাবেই ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।[৯৫]

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি : পৃথিবীর সকল মানুষ একই বংশোদ্ভুত–এ মতের উপরই ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম একজন মানুষ, পরে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে সে জোড়া থেকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্ম হয়েছে। প্রথম দিক দিয়ে একজোড়া মানুষের সন্তানগণ

---

৯৪. আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখুর রুসুল ওয়াল মুলুক*(কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭), খ.৫, পৃ. ২৬৫-২৬৮
৯৫. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামি বিশ্বকোষ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ৫২৩

Dhaka University Institutional Repository

দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই দল ও একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল; তাদের ভাষাও ছিল এক। কোন প্রকার বিরোধ-বৈষম্য তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল ততই তারা পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং এ বিস্তৃতির ফলে তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বংশ, জাতি, গোত্র ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ল। তাদের ভাষা বিভিন্ন হয়ে গেল, পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়ে অনেক বৈষম্য ও বৈচিত্র দেখা দিল। দৈনন্দিন জীবন যাপনের রীতিনীতিও আলাদা হয়ে গেল এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আবহাওয়ায় তাদের রং, রূপ ও আকার-আকৃতি বদলিয়ে গেল। এসব পার্থক্য একেবারেই স্বাভাবিক, বাস্তব পৃথিবীতেই এটা বর্তমান। কাজেই ইসলামও এ সকলকে ঠিক একটা বাস্তব ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করেছে। ইসলাম এ সকলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার পক্ষপাতি নয়; বরং এ সকলের দ্বারা মানব সমাজে পারস্পরিক পরিচয় লাভ করা যায় বলে ইসলাম এগুলোকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু পার্থক্য বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে মানব সমাজে বর্ণ, বংশ, ভাষা, জাতীয়তা এবং স্বদেশীকতা যে হিংসা-বিদ্বেষ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, ইসলাম কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না, এর দৃষ্টিতে এটা সম্পূর্ণরূপেই ভুল। মানুষ এবং মানুষের মধ্যে শুধু জন্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নিচ, আশরাফ-আতরাফ এবং আপন-পরের যে পার্থক্য করা হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে তা একেবারেই অজ্ঞতাবশত ও মূর্খতাব্যঞ্জক। ইসলাম সমগ্র বিশ্বের মানুষকে সম্বোধন করে বলে যে, সকলেই এক মাতা ও এক পিতার সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই এবং মানুষ হওয়ার দিক দিয়ে সকলেই সমান।[৯৬]

সমাজে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও তার কারণ : মানুষ সম্পর্কে এ ধারণা গ্রহণ করার পর ইসলাম বলে যে, মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য যদি হতে পারে, তবে তা বংশ, বর্ণ, ভৌগোলিক সীমা এবং ভাষার ভিত্তিতে নয়, তা হতে পারে মনোভাব, চরিত্র ও জীবনাদর্শের দিক দিয়ে। এক মায়ের দুই সন্তান বংশের দিক দিয়ে যতই এক হোক না কেন, তাদের মনোভাব, চিন্তাধারা এবং চরিত্র যদি বিভিন্ন রকমের হয়, জীবনের কর্মক্ষেত্রে তাদের পথও সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই দূর সীমান্তের অধিবাসী প্রকাশ্যে যতই দূরবর্তী হোক না কেন, তাদের মত ও চিন্তাধারা যদি এক রকমের হয়, তাদের চরিত্র যদি এক প্রকারের হয়, তবে তাদের জীবনের পথও সম্পূর্ণ এক হবে তাতে সন্দেহ নেই। এ মতের ভিত্তিতে ইসলাম পৃথিবীর সমগ্র বংশ এবং আঞ্চলিক ও জাতীয়তার বুনিয়াদে গঠিত সমাজের সম্পূর্ণ বিপরীত এক অভিনব সমাজ গঠন করে, যার চিন্তাধারা, মত, চরিত্র ও আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। এ সমাজে মানুষ ও মানুষের মিলনের ভিত্তি শুধু জন্মগত নয়; বরং তা হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা বিশ্বাস এবং জীবনের একটা আদর্শ। যে ব্যক্তিই আল্লাহ তা'আলাকে নিজের মালিক ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করবে এবং নবীর প্রচারিত বিধানকে নিজ জীবনের একমাত্র আইন হিসেবে গ্রহণ করবে, সে ব্যক্তিই এহেন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে, হোক সে আফ্রিকার অধিবাসী কিংবা আমেরিকার, আর্য হোক কিংবা অনার্য, কালো হোক কিংবা গোরা হিন্দি ভাষাভাষী হোক কিংবা আরবি ভাষাভাষী হোক। আর যেসব মানুষ এ সমাজে প্রবেশ করবে তাদের সকলের অধিকার ও সামাজিক মর্যাদাও সম্পূর্ণ সমান হবে।[৯৭] তাদের মধ্যে বংশীয়, জাতীয় অথবা শ্রেণিগত বৈষম্যের কোন স্থানই থাকবে না। সেখানে কেউ উচ্চ আর কেউ নিচু নয়, কোন প্রকারের অস্পৃষ্যতা তাদের মধ্যে থাকবে না। কারো হাতের স্পর্শে কারো অপবিত্র হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকবে না। বিবাহ-শাদি, পানাহার, বৈঠকী মেলামেশার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বাঁধা-বিপত্তি থাকবে না। কেউ নিজ জন্ম কিংবা পেশার দিক দিয়ে নিচ কিংবা ছোট জাত বলে পরিগণিত হবে না। কেউ নিজ জাত কিংবা পরিবারের ভিত্তিতে কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারবে না। যার চরিত্র অধিকতর উত্তম এবং অন্যান্য লোক অপেক্ষা যার মনে আল্লাহর ভয় অনেক বেশি মানব সমাজে একমাত্র তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে।

৯৬. আল-কুরআন, ৪ : ১
৯৭. হাসান আইউব, অনূ. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*(ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪), পৃ. ৩০০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি সমাজে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব : এ সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা বংশ ও ভাষার সমস্ত বৈষম্য এবং ভৌগোলিক সীমারেখা চূর্ণ করে পৃথিবীর কোণে কেণে বিস্তৃত হতে পারে এবং এর ভিত্তিতে পৃথিবীর সমগ্র মানুষের এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব স্থাপিত হতে পারে। বংশীয় ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে স্থাপিত সমাজগুলোতে শুধুমাত্র সেসব লোকেরাই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যারা নির্দিষ্ট একটা বংশে কিংবা নির্দিষ্ট কোন এক দেশে জন্মলাভ করে, তার বাইরের লোকদের পক্ষে এ ধরনের সমাজের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের এ চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত সমাজে এ মত ও চরিত্রনীতির সমর্থক প্রত্যেকটি মানুষই প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে। আর যারা সে বিশ্বাস ও চরিত্রনীতিকে সমর্থন করে না, ইসলামি সমাজ তাদেরকে নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারে না বটে; কিন্তু তাদের সাথে মানবোচিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলে এবং তাদেরকে মানবোচিত অধিকার প্রদান করতে ইসলামি সমাজ সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, এক মায়ের দুই সন্তান যদি মত ও চিন্তাধারার দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়, তবে অবশ্য তাদের জীবন যাপন পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয়ই এটা নয় যে, তারা একে অপরের ভাই-ই নয়। এভাবে সমগ্র মানব বংশের দু'টি দল কিংবা এক দেশের অধিবাসী লোকদের দু'টি দলও যদি ধর্মমত এবং চরিত্রনীতির দিক দিয়ে তারা অবশ্যই সম্পূর্ণ এক ও অভিন্ন।[৯৮] সম্মিলিত মানবতার ভিত্তিতে সে সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক অধিকার দেয়ায় ধারণা করা যেতে পারে ইসলামি সমাজ তা সবই অমুসলিম সমাজকে দিতে প্রস্তুত।

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার এ মৌলিক বিষয়গুলো বুঝে নেয়ার পর এখানে মানবীয় মিলন-প্রীতির বিভিন্ন ব্যাপারের জন্য ইসলাম নির্ধারিত যাবতীয় নিয়ম ও রীতিনীতির আলোকপাত করা হলো :

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি : মানব সমাজের প্রাথমিক ও বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবার। একজন পুরুষ ও একজন নারী। পারস্পরিক মিলনের ফলেই হয় এ পরিবারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। এ মিলনের ফলস্বরূপ এক নতুন বংশের সৃষ্টি হয়। তারপর সেসব সন্তানের দিক দিয়ে নতুন আত্মীয়তা, সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃত্বের একটা স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়। আর সব শেষে এ জিনিসই ছড়িয়ে বিস্তৃত হয়ে একটা বিরাট সমাজের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত পরিবার এমন একটা প্রতিষ্ঠান যাকে কেন্দ্র করে একটা বংশ এর অধস্তন পুরুষকে মানব সভ্যতার বিপুল দায়িত্ব পালন করার জন্য বিশেষ স্নেহ, ত্যাগ, হৃদয়ের গভীর ভালবাসা ও দরদ এবং কল্যাণকামানা সহকারে তৈরি করতে পারে। এ প্রতিষ্ঠান মানব সভ্যতার স্থায়িত্ব এবং ক্রমোন্নতির জন্য নতুন লোকের কেবল জন্ম দিয়েই ক্ষ্যান্ত হয় না; বরং এর সদস্যগণ যে মনে-প্রাণে এটাই কামনা করে যে, তাদের স্থান দখল করার জন্য যে নতুন মানুষের জন্ম হচ্ছে তারা তাদের চেয়েও উপযুক্ত হোক। এ দিক দিয়ে এ তত্ত্ব কথায় কোন সংশয় থাকে না যে, পরিবারই হচ্ছে মানব সভ্যতার মূল ভিত্তি।[৯৯] আর এ মূল ভিত্তির সুস্থতা ও শক্তির উপর স্বয়ং তামাদ্দুনের সুস্থতা ও শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে। এ জন্যই ইসলাম সর্বপ্রথম এ পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর শুদ্ধ ও মজবুত বুনিয়াদের উপর স্থাপন করার দিকে বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করেছে।

ইসলামি সমাজে দাম্পত্য জীবনের গুরুত্ব : ইসলামের দৃষ্টিতে একটা নারী ও পুরুষের মিলন তখনই বিশুদ্ধ ও সংগত হতে পারে যখন এ মিলনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি থাকবে এবং তার ফলে একটা নতুন পরিবার সৃষ্টি হতে পারবে। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মিলনকে ইসলাম শুধু একটা নিষ্পাপ স্ফূর্তি কিংবা একটা সাধারণ পদস্খলন মনে করেই উপেক্ষা করতে পারে না। এর দৃষ্টিতে এটা সভ্যতার মূল বুনিয়াদকেই একেবারে ধ্বংস করে দেয়। এ করণেই ইসলাম এ ধরনের সম্পর্ককে সম্পূর্ণ হারাম ও আইনগত অপরাধ বলে মনে করে।[১০০] এ ধরনের অপরাধের জন্য ইসলাম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে, যেন মানব সমাজে এরূপ সভ্যতা ধ্বংসকারী সম্পর্ক স্থাপনের সমস্ত কারণ ও সুযোগের ছিদ্র পথ থেকে রক্ষা

---

৯৮. হাসান আইউব, অনূ. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২

৯৯. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ২৯

১০০. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৫, পৃ. ৩৭-৩৮, ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে চায়। পর্দার হুকুম, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশায় নিষেধাজ্ঞা, নাচগান ও অশ্লীল ছবির উপর কঠিন নিয়ন্ত্রণ, সঙ্গত ও নৈতিক চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং অশ্লীলতা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক সে উদ্দেশ্যেই করা হয়।[১০১] আর এ বাধা-নিষেধের কেন্দ্রীয় ও মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় করে তোলা। অন্যদিকে নারী-পুরুষের দায়িত্বপূর্ণ মিলন অর্থাৎ বিবাহকে ইসলাম সংগত বলেই ঘোষণা করেনি; বরং তাকে মঙ্গলময়, পুণ্যের কাজ এবং একটা ইবাদত বলে মনে করে। বয়ঃপ্রাপ্তির পর নারী-পুরুষের অবিবাহিত থাকা ইসলাম একেবারেই সমর্থন করে না। সমাজের প্রত্যেক যুবককে সে এ জন্য উৎসাহিত করে যে, তার মাতাপিতা তামাদ্দুনের যে দায়িত্বপূর্ণ করেছে, তাদের পালা আসার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও সে দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইসলামে সন্ন্যাসবাদ আদৌ সমর্থিত নয়। উপরন্তু এটাকে মনে করে আল্লাহর নির্ধারিত স্বভাব-নিয়মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী একটা বিদ'আত। যে সব খারাপ প্রথা ও কুসংস্কারের দরুণ বিবাহ একটা কঠিন দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে, ইসলাম সে সবের তীব্র প্রতিবাদ করে। এর একান্ত ইচ্ছা এ যে, মানব সমাজে বিবাহ যেন অতীব সহজসাধ্য এবং ব্যভিচার যেন খুবই কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। আর এর বিপরীতে বিবাহ যেন কঠিন এবং ব্যভিচার যেন খুবই সহজসাধ্য কখনও হতে না পারে। এ জন্যই ইসলাম কয়েকটা বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হারাম করে দেয়ার পর অন্যান্য সমস্ত দূর ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা জায়িয করে দিয়েছে। আশরাফ-আতরাফদের সমস্ত ভেদাভেদ চিরতরে চূর্ণ করে দিয়ে সমস্ত মুসলিমদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-শাদির অবাধ অনুমতি দিয়েছে। মোহর ও দান যৌতুক খুবই সংক্ষিপ্ত ও সুবিধাজনক করার হুকুম দিয়েছে, যেন উভয় পক্ষই তা খুব সহজেই পালন করতে সমর্থ হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ অনুষ্ঠান উদযাপন করার জন্য কোন কাযি, পণ্ডিত, পুরোহিত কিংবা অফিস ও রেজিস্টারের কোনই বাধ্যতামূলক আবশ্যকতা নেই। ইসলামি সমাজে বিবাহ খুবই সহজ, সাদাসিদে ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। যে কোনো স্থানে দু'জন সাক্ষীর সামনে বয়ঃপ্রাপ্ত নারী-পুরুষের ইজাব-কবুলের[১০২] দ্বারা অনায়াসেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তার জন্য এ শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এ ইজাব-কবুল গোপনে হলে চলবে না; এটা মহল্লা বা গ্রামের লোকজনকে জানিয়ে-শুনিয়ে করতে হবে।

ইসলামি সমাজে পারিবারিক জীবনের পদ্ধতি : ইসলামি সমাজে পারিবারিক জীবনে ইসলাম পুরুষকে পরিবারের কর্তা ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছে। ঘরের শৃঙ্খলা রক্ষা করার সকল দায়িত্ব পুরুষের উপর অর্পণ করা হয়েছে। স্ত্রীকে স্বামীর এবং সন্তানকে পিতামাতা উভয়েরই আনুগত্য করার জন্য আদেশ করা হয়েছে। যে পরিবারে কোন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা নেই এবং ঘরের লোকদের চরিত্র ও কাজ-কারবার সুস্থ রাখার জন্য দায়িত্বশীল কেউ নেই, ইসলাম এ ধরনের শিথিল পারিবারিক ব্যবস্থা মোটেই পছন্দ করে না। শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য একজন শৃঙ্খলাকারীর একান্ত প্রয়োজন। ইসলাম এ দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিবারের পিতাকেই স্বাভাবিক কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তার অর্থ কখনই এটা নয় যে, পুরুষকে ঘরের একজন স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্বাধীন শাসনকর্তা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসাই হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের মূল ভাবধারা। একদিকে স্বামীর আনুগত্য করা যেমন কর্তব্য, অন্যদিকে স্বামীরও কর্তব্য এই যে, সে তার ক্ষমতা অন্যায়, যুলুম ও বেইনসাফির কাজে প্রয়োগ না করে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর-সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার জন্য ব্যবহার করবে। দাম্পত্য সম্পর্ককে ইসলাম ঠিক ততক্ষণ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে চায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে প্রেম-ভালবাসার মাধুর্য কিংবা অন্তত নিরবিচ্ছিন্ন মিলন-প্রীতির সম্ভাবনা বজায় থাকবে। কিন্তু এ সম্ভাবনা যখন একেবারেই থাকবে না, তখন ইসলাম স্বামীকে তালাক দেয়ার এবং স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে নেয়ার অধিকার দেয়, আর যেসব অবস্থায় বিবাহ স্বামী-স্ত্রীর মিলন প্রেমের পরিবর্তে শুধু অশান্তিরই কারণ হয়ে পড়ে, সেখানে ইসলামি আদালতকে বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিয়ে থাকে।[১০৩]

---

১০১. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১২৭-১২৮
১০২. সম্পাদনা পরিষদ, *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪
১০৩. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি সমাজে আত্মীয়তার সীমা : পরিবারের সংকীর্ণ পরিধির বাইরে আত্মীয়তাই হচ্ছে নিকটবর্তী সীমান্ত। এর পরিধি বহু প্রশস্ত হয়ে থাকে। যারা পিতামাতার সম্পর্ক কিংবা ভাই-বোনের অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের দিক দিয়ে একে অন্যের আত্মীয় হবে ইসলাম তাদের পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, সাহায্যকারী ও দয়াশীল দেখতে চায়। কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে নিকটাত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।[১০৪] হাদিস শরিফে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ও তাদের অধিকার আদায় করার জন্য বার বার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং এটাকে একটা পুণ্যের কাজ বলে গণ্য করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজ আত্মীয়দের সাথে মনোমালিন্য, কপটতা ও তিক্ততাপূর্ণ আচরণ করবে, ইসলাম তাকে মোটেই ভাল দৃষ্টিতে দেখে না। কিন্তু তাই বলে আত্মীয়-স্বজনদের অনাহুত পক্ষপাতিত্ব করাও ইসলামের দৃষ্টিতে কোন সৎকাজ নয়, নিজ পরিবার ও গোত্রের লোকদের অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করা ইসলামের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ। এরূপ কোন সরকারি কর্মকর্তা যদি জনগণের অর্থ দ্বারা নিজ লোকদের প্রতিপালন করতে শুরু করে, কিংবা কোন মামলার বিচারের বেলায় তাদের প্রতি অকারণে পক্ষপাতিত্ব করে তবে মনে রাখতে হবে যে, এটা একটা শয়তানি অপরাধ। ইসলাম যে আত্মীয়তা রক্ষা করার আদেশ দেয়, তা নিজের দিক দিয়ে এবং অধিকার ও ন্যায়ের সীমার মধ্যে হওয়া আবশ্যক।

ইসলামি সমাজে প্রতিবেশীর অধিকার : আত্মীয়তার সম্পর্কের পর দ্বিতীয় নিকটবর্তী হচ্ছে প্রতিবেশীর সম্পর্ক। কুরআনের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন প্রকার। প্রথমত আত্মীয় প্রতিবেশী, দ্বিতীয়ত অনাত্মীয় প্রতিবেশী এবং তৃতীয়ত অস্থায়ী প্রতিবেশী–স্বল্পকালের জন্য যার সাথে উঠা-বসা ও চলা-ফেরা করার সুযোগ হয়েছে, ইসলামের সামাজিক বিধান অনুযায়ী এরা প্রত্যেকেই বন্ধুত্ব, সহানুভূতি ও ভাল আচরণ পাওয়ার অধিকারী। হাদিসে বর্ণিত আছে,

عن عائشة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه.

‘হযরত আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি নবি কারিম সা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবি কারিম সা. বলেছেন, আমাকে জিবরাইল আ. প্রতিবেশী সম্পর্কে সব সময় অসিয়াত করে থাকেন। এমনকি, আমার মনে হয়, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন।’[১০৫] অপর একটা হাদিসে উল্লিখিত আছে যে,

عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه.

‘হযরত আবু শুরাইহ রা. থেকে বর্ণিত। নবি কারিম সা. একদা বলছিলেন, আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু’মিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হলো : হে আল্লাহর রসুল! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।’[১০৬]

অন্য একটা হাদিসে রয়েছে,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به.

‘হযরত আনাস ইবন মালিক রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি উদারপূর্তি করে আহার করে এবং তারই পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, অথচ সে তা জানে, তবে সে আমার প্রতি ইমান আনেনি।’[১০৭]

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.

---

১০৪. হাসান আইউব, অনূ. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১-২৭৫

১০৫. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১১), খ.৯, পৃ. ৪০৯, হাদিস নং ৫৫৮৯, ৫৫৯০

১০৬. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ৪১০, হাদিস নং ৫৫৯১

১০৭. ইমাম তাবারানি, *আল-মু’জামুল কাবির*(কায়রো : মাকতাবা ইবন তাইমিয়া, ১৯৮৩), খ.১, পৃ. ২৫৯, হাদিস নং ৭৫১

Dhaka University Institutional Repository

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ সঙ্গী হলো সেই যে স্বীয় সঙ্গীর কাছে উত্তম, আল্লাহর নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী হলো সেই যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম।'[১০৮]

প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে হাদিসের ভাষ্য হলো :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها، وصيامها، وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار ، قال يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها، وصدقتها، وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار من الأقط، ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة.

'হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসুল সা.-এর নিকট নিবেদন করল যে, হে আল্লাহর রসুল! একজন মহিলা খুব বেশি নফল সালাত আদায় করে, প্রায়ই সাওম সাধনা করে থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে দান-সদাকা করে থাকে; কিন্তু তার কটূক্তিতে তার প্রতিবেশী ভয়ানকভাবে নাজেহাল। রসুল সা. বলেন, সে জাহান্নামী। উপস্থিত লোকেরা আরো নিবেদন করল, অন্য একজন মহিলা এমন আছে, যার মধ্যে এ ধরনের ভাল গুণ অবশ্য নেই; কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রসুল সা. বললেন, সে জান্নাতী হবে।[১০৯] রসুল সা. লোকদের বিশেষ তাকিদ করে বলেছেন যে, নিজের সন্তানদের জন্য কোন ফল কিনে আনলে তার কিছু অংশ প্রতিবেশীর বাড়িতে অবশ্যই প্রেরণ করবে; নতুবা ফলের খোসা বাইরে ফেলবে না। কারণ এটা দেখে গরিব প্রতিবেশীর মনে দুঃখ জাগতে পারে। মোটকথা, যারা একে অপরের প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করছে, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা সেসব লোককে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, সাহায্যকারী ও সুখ-দুঃখের সাথী হিসেবে দেখতে চায়। ইসলাম তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় যে, তারা যে একজন অপরজনের উপর নির্ভর করতে পারে এবং একজন অপরজনের সাহায্যে নিজের জীবন, সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদাকে নিরাপদ বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যেসব সমাজে একটা দেয়ালের দুই দিকে অবস্থিত দুই ঘরের অধিবাসী দুইজন মানুষ পরস্পর চিরদিন অপরিচতি থাকে এবং যে সমাজে এক গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো সহানুভূতি, কোনো সহৃদয়তা ও নির্ভরতা নেই সেসব সমাজ কখনও ইসলামি সমাজ বলে বিবেচিত হতে পারে না।

ইসলামি সমাজ জীবনের মূলনীতিসমূহ : এসব নিকটবর্তী, দূরবর্তী আত্মীয়তা ও সম্পর্কের বাইরের সম্পর্কের যে এক বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে সেটা হলো গোটা মুসলিম সমাজই তার অন্তর্ভুক্ত। এ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র ইসলাম মানুষের সামগ্রিক জীবনকে যেসব বড় বড় নিয়ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত করে, নিচে সংক্ষেপে তা উপস্থাপিত হলো :

সৎকর্মে সহযোগিতা করা ও অসৎকর্মে সহযোগিতা না করা : এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 'সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালংঘনে সহযোগিতা করবে না।'[১১০]

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা : এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ اِمَّةٍ اِخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে; তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দিবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে।'[১১১]

ভালবাসা ও শত্রুতা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল : হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

---

১০৮. ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী, অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৩৮১, হাদিস নং ১৯৫০

১০৯. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৯৯২), খ.৯, পৃ. ২২৭-২২৮, হাদিস নং ৯৪৬২

১১০. আল-কুরআন, ৫ : ২

১১১. আল-কুরআন, ৩ : ১১০

Dhaka University Institutional Repository

عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه.

'হযরত সাহল ইবন মা'আয ইবন আনাস জুহানি রা. থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যেই দান করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মানা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শত্রুতা পোষণ করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই বিবাহ-শাদি করে, সে তার ইমান পরিপূর্ণ করল।'[১১২]

হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা পরিহার করা : হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তোমরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, পারস্পর ধোঁকাবাজি করো না, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের (ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে) পশ্চাতে শত্রুতা করো না এবং একের বেচাকেনার উপর অন্যে বেচাকেনার চেষ্টা করবে না। তোমরা আল্লাহ বান্দারূপে ভাই ভাই হয়ে থাক।'[১১৩]

সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা : এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, 'তোমাদের কেউ প্রকৃত মু'মিন হবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'[১১৪]

সমাজে সকল নারী-পুরুষের মধ্যে সকল ব্যক্তিগত ও সর্বজনীন সম্পর্ক এবং একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়াকে সুগঠিত করে। যদিও এটা বুঝা যায় যে, ইসলামি সমাজের জন্য ব্যবস্থাসমূহ প্রতিটা একে অপরের সাথে পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত তাই একটা ব্যবস্থা ছাড়া আরেকটা ব্যবস্থা প্রয়োগের চেষ্টা করাটা শুধুমাত্র পার্থিব জীবনে সর্বনাশা পরিণতির সৃষ্টি করে না; বরং পরকালেও দুর্দশার কারণ হয় এবং এভাবে প্রয়োগ অনৈসলামি এবং আল্লাহকে রাগান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ সমাজের ভারসাম্য এবং ইসলামি মূল্যবোধকে নিশ্চিত করতেই আল্লাহ তা'আলা বিচার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে শাস্তি দিতে বলেছেন। এ কারণেই, নিম্নোক্ত আয়াতের প্রয়োগটা হদ্দের কঠিন শাস্তির সাথে সম্পর্কিত যা সমাজে সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য গভীর প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا ۚ فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটা কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; তারাই সত্যত্যাগী। তবে যদি এরপর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১১৫]

এ আয়াতটা যথেষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোন নারীর চরিত্রে কালিমা লেপন করে অভিযুক্ত করা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। এটা সমাজে নারী যে সম্মানজনক সত্ত্বা সে চিন্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও তথাকথিত প্রগতিশীল স্বাধীনতাকামী সমাজে নারীর সত্ত্বাগত কোন মূল্য নেই, আছে বাণিজ্যিক মূল্য। নারীদের মর্যাদা আজ ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে পশ্চিমা গণমাধ্যমের পর্দায় এবং মা, কন্যা, বোন অথবা স্ত্রী হিসেবে তাদের ভূমিকা আজ দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে।[১১৬] আরেকটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখতে পাই যে, সমগ্র বিশ্বে আপাতত প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে সমাজে মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা যাচ্ছে না, তাই পুরুষের পক্ষে তার পরিবারের ভরণ-পোষণ কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই

---

১১২. ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী, অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মে ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৭২০, হাদিস নং ২৫২৩

১১৩. ইমাম মুসলিম রহ.,অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, পৃ. ১০১, হাদিস নং ৬৩০৯

১১৪. ইমাম বুখারী রহ. অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, জুন ২০১৩), খ.১, পৃ. ১৯, হাদিস নং ১২

১১৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫

১১৬. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সমাজের অবস্থা হচ্ছে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে আজ তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করতে হচ্ছে।[১১৭] তাই পরিবারে প্রত্যেকের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একে অপরের সাথে সমঝোতা করে নিতে হচ্ছে।

ইসলামি খিলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আজও মুসলিম বিশ্বে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার ছোঁয়া দেখা যায়। কিন্তু কালক্রমে অনৈসলামি রাষ্ট্র কাঠামোর মাঝে ইসলামের এ সামাজিক মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে হালকা হয়ে যাচ্ছে ও তার খাপ খাওয়ানো ব্যবস্থা সকলকে সুবিধা দিতে পারছে না। পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো ইসলামের আলোকে নারীকে সম্মানের চোখে দেখার বিষয়টাকে ধ্বংস করে নারীকে অপব্যবহারের তীব্র চেষ্টা চালানো হচ্ছে। প্রতিটা ঘরে ঘরে তাদের স্যাটেলাইট নামক আগ্রাসী দানবের মাধ্যমে এ প্রচণ্ড আক্রমণের জ্বলন্ত স্বাক্ষী আরব বিশ্বের দেশগুলো। এটা হয় মানুষকে যৌন হতাশার দিকে ঠেলে দেয় অথবা তথাকথিত স্বাধীনতা চর্চাকে উৎসাহিত করে।[১১৮] কিছু দেশে দু'টি ব্যবস্থাই সহাবস্থান করে। যেমন– তুরস্ক, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

নারী-পুরুষের সম্পর্কের অব্যবস্থাপনার কারণে সমাজের সামাজিক ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। বর্তমানে যে অপরাধ, অসৎ কাজ সমাজে দেখা যায়, তার কারণ হচ্ছে সে দূষিত ভিত্তি যার উপর ভর করে দাড়িয়ে আছে সামাজিক ব্যবস্থা, আর অন্য সকল ব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে, পুরো ব্যবস্থাই এ দূষিত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। 'সামাজিক অপরাধ' এটা প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞান গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।[১১৯] এ সমস্যা যতই হোক না কেন এটাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয় এবং কখনও এর কারণ খুঁজতে মূল ভিত্তিতে যাওয়া হয় না। আমাদের বুঝা উচিত যদি ভিত্তিই খারাপ হয় তাহলে এ ভিত্তি থেকে যা কিছু উৎসারিত হবে সবই খারাপ হবে। এ ধারণাটা সমাজে স্বাভাবিকভাবে পরিলক্ষিত হয় না। ধর্ষণ, শিশু নির্যাতন, পর্ণোগ্রাফি, ব্যভিচার, অনাচার, বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ও নির্যাতন এ সব কিছুই হচ্ছে মৌলিক সমস্যার উপসর্গ মাত্র। সকল মুসলিমেরই মনে আজ এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া উচিত যে, তাদের সমাজ কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হচ্ছে?

মুসলিমদের অবশ্যই এ ক্ষেত্রে তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করে এটা বুঝতে হবে যে, ধর্ম নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা এ জীবনব্যবস্থা ভ্রান্ত এবং খুঁজে বের করতে হবে ইসলামের সত্যতাকে এবং শুধুমাত্র সে সমাজ তৈরি করতে হবে যা ইসলামি আকিদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এবং যেখানে সামাজিকভাবে ইসলামি শারি'আহর প্রয়োগ হয় যা মানুষকে ইহকালে ও পরকালে উভয় জগতে সাফল্য ও উন্নতি দান করবে।

একজন মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর প্রেরিত সকল আইন অনুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা। অন্যদিকে একজন অমুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যতটুকু সম্ভব আত্মতুষ্টি অর্জন করা। উদ্দেশ্যের এ ভিন্নতা থেকে আমাদের নির্দেশ করে এ দু'জনের কাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি উভয়ই ভিন্ন হবে এবং সে সাথে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা দিবে। সামাজিক ব্যবস্থা সমগ্র মানবজাতির উপকারের জন্য এবং মানবজাতির উন্নয়ন ও উৎপাদনকে নিশ্চিত করে আল্লাহ তা'আলা নারী ও পুরুষের সম্পর্ককে সাজিয়েছেন। এরূপ কোনো ব্যবস্থা ছাড়া আমরা সন্যাসীপনার দিকে ধাবিত হতে পারি এবং তাতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে দুঃখ-দুর্দশা দেখা দিতে পারে। মানুষের মধ্যে তিন ধরনের সহজাত প্রবৃত্তি দেখা যায়। এগুলো হলো– অসীম কোনো কিছুর আরাধনা করার তাড়না, বেঁচে থাকার তাড়না এবং প্রজননের তাড়না। যদি এ সহজাত প্রবৃত্তিসমূহকে সঠিক ভিত্তিতে ব্যবহার করে কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশনা দেয়া না যায় তাহলে এগুলো সমাজকে বিভিন্ন সমস্যার দিকে নিয়ে যাবে, যা বর্তমান সমাজে দেখা যায়। প্রজনন প্রবৃত্তি নিজেই মানুষকে

১১৭. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*(ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২), পৃ. ৫৪
১১৮. মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখুর উমাম ওয়াল মুলুক*(কায়রো : আল-মাতবা'আতুল ইস্তিকামা, ১৯৩৯), খ.২, পৃ. ৬১৮
১১৯. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*(ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায় এবং যা নির্ভর করে নারী-পুরুষের ভূমিকার উপর।[১২০] যেমন– মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যার ভূমিকা। এখানে এদের সম্পর্ক ইসলামি শারি'আহর দ্বারা সংজ্ঞায়িত হবে।

এটা খুবই কৌতুহলজনক যে, ইসলাম মুসলিমদের প্রত্যেকের ভূমিকার উপর ভিত্তি করে যে অবস্থার পার্থক্য করে দিয়েছে সে অবস্থান এখনও সমগ্র মানবজাতি ধরে রেখেছে; তবে এ কুফরি ব্যবস্থা তাকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্ক, ভাই ও বোনের সম্পর্ক, স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক সকল সম্পর্কই আজ দু'টি ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।[১২১] যথা :

১. ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তির উপর এবং
২. স্বাধীনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা নামক ধারণার উপর।

সকল সম্পর্কই আজ তৈরি হচ্ছে প্রয়োজন ও প্রবৃত্তির তাড়না এবং ব্যক্তির সীমাবদ্ধ চিন্তার উপর ভিত্তি করে। সমাজের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যক্তিকে আহ্বান করছে কিভাবে সে আরেকজনের সাথে আচরণ করবে। যেমন– টেলিভিশনে বক্তৃতা, সিনেমা, গান, ম্যাগাজিন ইত্যাদির মাধ্যমে বিপরীত লিঙ্গের সাথে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে সম্বন্ধে পুঁজিবাদীরা একটা নির্দিষ্ট বার্তা দিচ্ছে, কারণ তারা সমাজে একটা নির্দিষ্ট আবহ তৈরি করতে চায়। আবার একজন নারীরা কি ঘরে মনোযোগী হবে নাকি পেশাগত উন্নতির দিকে। এ সকল বার্তা সব সময় সমাজকে একটা সন্দেহজনক অবস্থান এবং অশান্তিতে রাখে। কারণ, এ বার্তা সব সময় পরিবর্তন হতে থাকে এবং বারবার একটার সাথে আরেকটার সংঘর্ষ হয়। সরকারেরও হস্তক্ষেপ করতে হয় যখন এ রকম পরিস্থিতি দেখা দেয়। এটা বুঝা যায় যখন কোন একটা পরিস্থিতিতে সরকার পরিকল্পিত প্রচার অভিযান চালায়। যেমন– এইডস আতংক। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে যখন এটা ভীতিকর হয়ে যায় তখন সরকার একজনের সাথে দীর্ঘ সম্পর্কের কথা বলে এবং সরকারের এ নীতি সিনেমাগুলোতে দেখা যায় অর্থাৎ অবাধ সম্পর্কের সিনেমার সংখ্যা কমে যায়।

পশ্চিমা সরকারগুলো সন্তান ও পিতামাতার সম্পর্কের বিষয়েও আজ হস্তক্ষেপ করে দেখিয়ে দেয় কে সন্তানকে প্রহার করতে পারবে, সম্প্রতি পিতামাতাকে এ সুবিধা দিয়ে একটা আইন পাস হয়েছে। পশ্চিমা বিশ্বে বিবাহ বিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধির পর একটা আইন পাস হয় যাতে বিচ্ছেদিত দম্পতিদের মধ্যে কোন পিতা যদি তার সন্তানের ভরণ-পোষণ না দেয় তবে শিশু-সহযোগী সংস্থাগুলো তার পিতাকে দৌড়ের উপর রাখবে যদি সে ভরণ-পোষণ না দেয়। এ আইন তাদের টক-শোগুলোর একটা প্রধান আলোচনার বিষয়। আবার নারীদের পেশাগত উন্নতি ও পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামানোতে মাতৃত্বের প্রতি নারীদের অনীহার কারণে সরকার আবার অধিক সন্তানধারী মাকে অর্থনৈতিক সুবিধা দিয়ে শিশু জন্মহার বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এসব বিকল্প অস্থায়ী ও অনুপযোগী সমাধান আমাদেরকে নির্দেশ করে মানুষের তৈরি এ ব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা এবং অসম্পূর্ণতা বিরাজ করছে। যা হচ্ছে, মানুষ যে সীমাবদ্ধ জীব তারই প্রতিফলন।

ইসলামি সমাজে নারী-পুরুষের ভূমিকা : নারীরা সব সময় সম্মানের পাত্র এবং অবশ্যই মর্যাদাপূর্ণ। পুরুষের জন্য বাধ্যতামূলক নারীদেরকে মিথ্যা কলংক বা অপবাদ, শোষণ এবং আক্রমণ থেকে রক্ষা করা। একজন নারীর প্রধান ভূমিকাই হচ্ছে স্ত্রী এবং মা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা। তার দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানদের দেখাশুনা ও পরিচর্যা করা এবং স্বামীর প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া। যদিও এ দায়িত্ব স্বামীকে সন্তানদের দেখাশুনা করা এবং স্ত্রীদের সামাজিক ভূমিকা ও পেশাগত উন্নয়নকে অস্বীকার করে না। বরং ইসলাম উৎসাহিত করে নারীদেরকে সামাজিক ভূমিকা পালনে।[১২২] যেমন একজন চিকিৎসক, শিক্ষিকা অথবা বিচারক হিসেবে এবং তাকে অনুমতি দেয় সকল প্রকার পেশাগত কাজ করতে। যেমন– ব্যবসা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তার প্রাথমিক কর্তব্য ও

১২০. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
১২১. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০০৭), পৃ. ৪৭-৫০
১২২. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

দায়িত্বের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। নারীরা পরিবারকে দেখাশুনা করতে পারবে এবং অর্থায়নও করতে পারবে। তবে স্ত্রীদেরকে এবং পরিবারকে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান দেয়া এটা মূলত ফরজ দায়িত্ব হচ্ছে স্বামীর এবং পিতাদের উপর; কোন নারীর উপর নয়।

ইসলামি সমাজের রাজনৈতিক জীবনে নারী ও পুরুষের ভূমিকা : নারীরা পুরুষের মতই রাষ্ট্রের চলমান কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অনুরূপভাবে, বর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে মুসলিম রমণীগণের উপর ফরজ দায়িত্ব হল দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা এবং দা'ওয়াত দেয়া। এটা হচ্ছে অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং মুসলিমদেরকে ইসলাম বুঝার জন্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য দা'ওয়াত দেয়া। এ কারণেই আকাবার বাই'আতে দুজন মহিলাকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।[১২৩]

আবার একজন নারী কখনও শাসক হতে অনুমোদন পাবে না। যেমন– খলিফা অথবা শাসকের পদও দখল করে রাখতে পারবে না। যেমন– প্রদেশসমূহের ওয়ালি বা গভর্নর। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় ইমাম বুখারি রহ. কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে হযরত আবি বাকরা রা.-এর বর্ণনায়, তিনি বললেন, 'যখন রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট এ মর্মে সংবাদ উপনীত হল পারস্যের ব্যাপারে যে, তারা রাজার (কিসরা) কন্যাকে তাদের শাসক হিসেবে নির্বাচিত করেছিল, তিনি বললেন, 'কখনোই সে জাতি সফলতার মুখ দেখবে না যারা নারীদের হাতে তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করে।'[১২৪]

নারী-পুরুষ এক নয় : দৃশ্যত কিছু লোক বলে এটা ইসলামের লিঙ্গ বৈষম্য আচরণ। এটা শুধুমাত্রই ভ্রান্ত নয় এবং এটা পরিপূর্ণভাবেই ভুল এবং মূর্খতার একটা চিহ্ন। এটা মুসলিমদের উপরে পশ্চিমা বিশ্বের আক্রমণকে আরও স্পষ্ট করে। সমতার পুরো ধারণাটাই একটা ভুল ধারণা। যেহেতু প্রকৃতিগতভাবেই নারী-পুরুষ উভয়ই ভিন্ন। ইসলামে একজনকে আরেকজন থেকে অধস্তন হিসেবে দেখা হয় না। অন্যদিকে যেটা বিদ্যমান খ্রিস্টধর্মের মধ্যে। এটাও নয় যে, পশ্চিমাদের মত নারীদেরকে অর্থনৈতিক পণ্য হিসেবে দেখা হবে।[১২৫] ইসলামে নারী এবং পুরুষ উভয়েরই দায়িত্ব ও ভূমিকা কিছু ক্ষেত্রে একই এবং অন্য কিছু ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও ভূমিকা আবার ভিন্ন। যেমন– পুরুষদের উপর ফরজ জিহাদ করা এবং পরিবারকে অর্থায়ন করা। কিন্তু এটা নারীদের উপর ফরজ নয়। তাই কেউ যদি ইসলামে সমতার ধারণাকে আনতে চায় তাহলে এ সমতা আসবে পুরস্কার এবং শাস্তির বিষয়ে। যেমন– নারী ও পুরুষ উভয়ই কোনো ফরজ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে অথবা কোনো হারাম কাজ করে তারা অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হবে আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে অথবা ইসলামি রাষ্ট্র থেকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه.

'কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।'[১২৬]

জনজীবনে এবং ব্যক্তিগত জীবনে নারী-পুরুষ একত্রিত হওয়ার আইন : পশ্চিমা বিশ্বে প্রতিদিনই অশালীনতার ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। আর ইসলামি সমাজে বৈধ বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের শালীনতাকে নিশ্চিত করে। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে অথবা বর্তমানে ইসলামি রাষ্ট্র ছাড়া অবস্থায় নারী এবং পুরুষ যদি না তারা মাহরাম (বিবাহযোগ্য নয় একজন আরেকজনকে) হয় তবে তারা জনজীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনে এক সাথে একত্রিত হতে পারবে না। তবে শারি'আহ আইন একত্রিত হওয়ার অনুমোদন দেয় যেসব ক্ষেত্রে তাহলো– শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, ক্রয়-বিক্রয় এবং হজ্জ ইত্যাদি জনবহুল স্থানে। যদিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একত্রিত হওয়া

১২৩. ড. মুহাম্মদ হোসাইন হায়কাল,অনূ. মওলানা আবদুল আউয়াল, *মহানবীর জীবন চরিত*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৩), পৃ. ২৬৯

১২৪. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারি শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৬), খ.৭, পৃ. ২৩৩, হাদিস নং ৪০৮৩

১২৫. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

১২৬. আল-কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন করে কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষা এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে জানার জন্য; বিনোদনের জন্য একত্রিত হওয়া (বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়) সম্পূর্ণ নিষেধ। অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে এবং বাজারেও। ইসলাম জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবন উভয়কেই সংজ্ঞায়িত ও নিয়ন্ত্রণ করে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ ط إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ م بِمَا يَصْنَعُوْنَ. وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا.

'মু'মিনদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।'[১২৭] জনজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের উভয় জায়গায় একজন পুরুষ এবং নারীর জন্য এটা হারাম যে, একাকী এমন কাউকে সাথে নিয়ে বসবে যে তাদের মাহরাম নয়। মহানবী সা. বলেন, 'তোমরা মহিলাদের নিকট একাকী প্রবেশ করা থেকে বিরত থাক। জনৈক আনসার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসুল! আপনি স্বামীর নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে কি নির্দেশ দেন? তিনি উত্তর দিলেন, স্বামীর নিকটাত্মীয়রা মৃত্যুতুল্য।'[১২৮] এটা পুরুষদের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। এ দৃষ্টিভঙ্গি পুরো সমাজের চেহারা পাল্টে দিবে। যেমন– ইসলামি রাষ্ট্রের গণপরিবহণে নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা থাকবে; তেমনি শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষকে আলাদা করা হবে।

মহিলাদের পোশাক পরিধানের আইন : শারি'আহ অনুযায়ী নারী-পুরুষ উভয়েরই শরীরের নির্দিষ্ট অংশ ঢেকে রাখা ফরজ, যাকে বলা হয় আওরাহ। খোলামেলাভাবে অন্যকে আকর্ষণ করানোর পশ্চিমা ধারণা সম্পূর্ণ এর বিপরীত এবং যা মানুষকে যৌন হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। ব্যক্তিগত জীবনে একজন নারী তার স্বামীর সামনে তার আওরাহ ঢেকে না রাখলেও কোন সমস্যা নেই। যেমন– বুক থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখলে চলবে। অতটুকু পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ মানার জন্য জনজীবনে একজন নারীর উপর ফরজ তার আওরাহকে পরিপূর্ণভাবে ঢেকে ফেলা।[১২৯] যেমন– তার পুরো শরীর, ঘাড়, গলা এবং চুল; তবে মুখ এবং হাত ব্যতীত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰأَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ أَدْنٰى أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا.

'হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিনদের নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১৩০] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ فِىْ قَلْبِه مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا. وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُوْلٰى.

'হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে পর-পুরুষের সঙ্গে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বল না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।'[১৩১]

জনজীবনের পোশাকটা মাথা ও গলা সমন্বিত একটা রুমাল দ্বারা আবৃত (খিমার) থাকবে এবং একটা অতিরিক্ত কাপড় (জিলবাব) যেটা সে ঘরে পরিহিত কাপড়ের উপর পরিধান করবে। জিলবাব অবশ্যই ঢিলেঢালা হতে হবে, পাতলা হতে পারবে না; যার ভিতরে সব কিছু দেখা যায় এবং অতি উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো (তাবাররুজ) হতে পারবে না। মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে চোখ ধাঁধানো এবং পুরুষদের মনোযোগ

১২৭. আল-কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

১২৮. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.৮, পৃ. ৪৯২, হাদিস নং ৪৮৫৬

১২৯. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের হালাল-হারামের বিধান*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭), পৃ. ১১১

১৩০. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫৯

১৩১. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩২-৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আকর্ষণ করতে পারে এমন কোন সুগন্ধিযুক্ত যার সুগন্ধ আরেকজন অনুভব করতে পারে এমন কিছু জনজীবনে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।[১৩২] হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত যে, রসুলুল্লাহ সা. বলেন, প্রতিটি চোখ ব্যভিচারী। কোনো মহিলা যদি সুগন্ধি লাগিয়ে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যায়, তবে সে হলো এমন, এমন অর্থাৎ ব্যভিচারিণী।'[১৩৩]

ইসলামি সমাজে বিবাহ : মানব জাতির মধ্যে ভালবাসা এবং প্রজননের আকাঙ্খা প্রবৃত্তিগতভাবে বিদ্যমান। বৈসাদৃশ্য বিপদগামী ভ্রান্তচিন্তার পশ্চিমারা কোন নিয়ম বা বাধা রাখেনি এ সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করার জন্য। ইসলাম মানব জাতিকে একটা ব্যবস্থা দিয়েছে এ সহজাত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ ও প্রকাশ করার জন্য। যেমন– বিবাহ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বলেন,

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

'আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।'[১৩৪]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَنْكِحُوْا الأَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ؕ إِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ ؕ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ.

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দিবেন; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।'[১৩৫]

ইসলামে কৌমার্য বা চির কুমার বলে কিছু নেই এবং মহিলাদের বিয়ের জন্য জোর করা যাবে বলে বর্তমান সংস্কৃতিতে ও পশ্চিমারা ইসলামের ব্যাপারে যে মিথ্যা অপপ্রচারের চিত্র বিশ্বের সামনে অঙ্কিত করেছে তা ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোন নারীর ইচ্ছা বা সম্মতি ব্যতীত কোন বিবাহ ইসলামে বৈধ নয়।

পবিত্র কুরআনে পুরুষেরা নারীদের আদেশ করবে বলে যা বুঝানো হয়েছে তা তাদেরকে রক্ষা ও আশ্রয়ের বিষয়ে বুঝানো হয়েছে। তাকে শাষণ-শোষণ করার জন্য বুঝানো হয়নি অথবা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মত বুঝানো হয়নি। বরং স্বামীকে মান্য করার কথা বলা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মূল সত্য এই যে, তাদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকতে হবে। রসুলুল্লাহ সা. বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'[১৩৬] সে কারণে স্বামীর ভূমিকাও হবে স্ত্রীর প্রতি সন্তোষজনক, তাকে বুঝা, যত্ন করা এবং সম্মান দেয়া। তাই যদি স্বামী স্ত্রীকে এমন কোন কিছু করার নির্দেশ দেয় যা আল্লাহ ও শারি'আহ আইনের বিরুদ্ধে (যা তার উপর ফরজ) তখন তার অবশ্যই স্বামীকে অমান্য করতে হবে।

অন্য সভ্যতায় যেখানে কিছু দূষিত আচার চর্চার কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অবনতির দিকে যাচ্ছে সেখানে ইসলামে স্ত্রীকে স্বামী মোহর দিচ্ছে এবং ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করতে হলে স্বামী সে সাহায্য করতে বাধ্য হচ্ছে, যদি না পারে তাহলে গৃহ পরিচারিকা রেখে সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে হবে।[১৩৭]

---

১৩২. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০
১৩৩. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৪), খ.৫, পৃ. ১৯২, হাদিস নং ২৭৮৬
১৩৪. আল-কুরআন, ৩০ : ২১
১৩৫. আল-কুরআন, ২৪ : ৩২
১৩৬. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৩), খ.৩, পৃ. ৪৪৩-৪৪৪, হাদিস নং ১১৬৩
১৩৭. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৭

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসা নিয়ে ইসলামি ও পশ্চিমা সামজের দৃষ্টিভঙ্গি : বর্তমান ভ্রান্ত সমাজ ব্যবস্থায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক পরিস্কারভাবে গড়ে উঠেছে মানুষের শারীরিক চাহিদা এবং আবেগের তাড়নার ভিত্তিতে। ভালবাসা একটা জনপ্রিয় শব্দে পরিণত হয়েছে বিশ্বের সকল ভাষাগুলোতে; সকল সম্পর্কগুলো গড়ে উঠে এটার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু কারো কাছে পরিস্কার কোন ধারণা নেই যে এটা কোন মাধ্যম প্রকাশ করতে হবে। এ অসংজ্ঞায়িত আবেগের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা সম্পর্কের ফলাফল আজকে মানুষের কাছে পরিস্কার হয় তখন, যখন দেখা যায় সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মানুষ বিবাহ করতে ব্যর্থ হচ্ছে অথবা অনীহা প্রকাশ করছে। স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে এবং পরস্পরের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কি হবে এসব কিছুই মানুষের মনগড়া নিয়মে চলছে যা তাদেরকে চরম দুঃখ-দুর্দশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের গুরুত্বকে তুলে ধরেছে এবং স্বামী-স্ত্রী প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে তার একটা পরিস্কার রূপরেখা দিয়েছে। ইসলাম সকল প্রকার সন্দেহকে দূরে রেখে এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়কে সঙ্গত রেখে কাজ করার অনুমতি দেয়; তাদের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধির জন্য একটা মূলকাঠামো দেয়; যেখানে এসব কিছুই পশ্চিমারা বৈসাদৃশ্যভাবে দিয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এটাও বলেছেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের অধিকার।'[১৩৮]

পবিত্র কুরআনে বিশেষ করে সুরা আন-নিসা, সুরা আন-নুর ও রসুল সা.-এর প্রচুর হাদিসে এবং এসব থেকে অনুসৃত ফকিহগণের গ্রন্থসমূহে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা রয়েছে, যা সমাজের মৌলিক নীতি হওয়া উচিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের উচিত এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের জীবন শুরু করা।

ইসলামি সমাজে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব : বর্তমান সমাজে পিতামাতার ভূমিকা প্রতিনিয়ত অবনতির দিকে যাচ্ছে। সন্তানরা বলতে শুরু করেছে তারা স্বতন্ত্র এবং তাদেরও অধিকার আছে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার, আর সন্তানদের শিষ্টাচার শেখানোর জন্য পিতামাতা খুবই সামান্য ভূমিকা রেখে থাকে। স্বাধীনতার নামে সন্তানরা অহংকারী ও অস্থির হয়ে যাচ্ছে, নিজের আচার-আচরণকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের পাতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যায় যে, শুধুমাত্র অর্থের জন্য সন্তানরা তাদের পিতামাতাকে হত্যা করছে। আবার সন্তান বড় হয়ে পিতামাতার ভরণ-পোষণ দিচ্ছে না, সেবা করছে না; বরং বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে অথবা খবরও নিচ্ছে না যে পিতামাতা কোথায় আছে, কেমন আছে। ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানদের আচরণ শারি'আহ'র মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।[১৩৯] যেমন– নিম্নোক্ত হাদিসগুলো দেখলে বুঝা যাবে যে, পিতামাতার প্রতি সন্তানের আচরণ কেমন হওয়া উচিত।

হযরত আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, শুধুমাত্র পিতামাতাকে অমান্য করার গুনাহ ছাড়া।'[১৪০] পিতামাতার মৃত্যুর পূর্বে কেউ যদি এ প্রকার গুনাহ থেকে তাদের কাছে ক্ষমা না করিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা ন্যায্যভাবে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আমর রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি নির্ভর করে পিতার সন্তুষ্টির উপর এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ভর করে পিতার অসন্তুষ্টির উপর।'[১৪১]

---

১৩৮. আল-কুরআন, ২ : ২২৮

১৩৯. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০-৪২১

১৪০. আল্লামা মোল্লা আলি কারি, *মিরকাতুল মাফাতিহ*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ২০০১), খ.৯, পৃ. ১৬০, হাদিস নং ৪৯৪৫

১৪১. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৪), খ.৪, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯, হাদিস নং ১৯০৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাকে ঘিরে আরও অনেক আইন আছে, যা এখানে আলোচনা করা হয়নি, এখানে শুধুমাত্র তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার আলোচনা অনেক বৃহৎ। কারণ নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও এর ফলাফল থেকে উঠে আসা প্রতিটা বিষয়েও ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। ভ্রান্ত এবং নষ্ট চিন্তার চর্চা যা পশ্চিমাদের মধ্যে এবং বর্তমানে ইসলামি সভ্যতা ও ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুসলিম উম্মাহর একান্ত প্রয়োজন ইসলামি সভ্যতাকে অধ্যায়ন করা ও আকড়ে থাকা। পশ্চিমারা যে ব্যাধির দিকে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে তা থেকে মুসলিমদেকে গুরুত্বের সাথে বের হয়ে আসতে হবে এবং তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ইসলামকে একমাত্র বিকল্প হিসেবে আহ্বান জানানোর মাধ্যমে। তাই মুসলিমদের একটা প্রজন্ম তৈরি করতে হবে যারা পুনর্জাগরিত হওয়ার আকাঙ্খা রাখে এবং যারা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে পারবে।

অতএব, পশ্চিমাদের দেয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যবস্থা থেকে মুসলিমদের বের হয়ে আসতে হবে। আর তা না হলে বর্তমান প্রজন্ম শুধুই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের ভাবতে হবে কোন ধরনের ভবিষ্যৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অপেক্ষা করছে এ বিকৃত ও অপরাধে ঘেরা সমাজে; যদিও মুসলিমদের সংগ্রামের ক্ষেত্র বহু তবে এ কাজগুলো সমাধান করার পদ্ধতি কেবলমাত্র একটাই যা কুরআন এবং সুন্নাহর বাস্তবায়ন তথা ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন। আল্লাহ তা'আলা থেকে বিজয় নেয়ার জন্য ইসলামি সমাজব্যবস্থার জন্য সংগ্রাম করা প্রয়োজন। ইসলামি খিলাফত শুধুমাত্র সামাজিক ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত করবে না, অন্য সকল ব্যবস্থাকেও প্রতিষ্ঠিত করবে যা মুসলিম উম্মাহকে বাধ্য করবে ইসলামি আইন গ্রহণ করতে, ইসলামি বিধি-বিধান রক্ষা করতে এবং তা প্রচার করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَه مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وِمِنْ خَلْفِه يَحْفَظُوْنَه مِنْ أَمْرِ اللهِ ط إِنَّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.

'মানুষের জন্য তার সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী থাকে; তারা আল্লাহর আদেশে তার রক্ষণাবেক্ষণ করে। আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করতে সচেষ্ট হয়।'[১৪২]

মোটকথা, এই হলো ইসলামি সমাজের একটি স্বাভাবিক চিত্র। বর্তমানে সারা বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই; ফলে সর্বত্র এখন আর পরিপূর্ণ ইসলামি সমাজব্যবস্থাও দৃশ্যমান নয়। অথচ পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজে সার্বক্ষণিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করার কথা ছিল। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে সুসংগঠিত ইসলামি সমাজ দান করে সম্মানিত করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে পূর্ববর্তী উম্মাহকে যে সমাজ ব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সম্মানিত করেছিলেন, আজকের মুসলিম উম্মাহকে সে নিরাপত্তাময় সমাজে দৃঢ় পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের সফলতা দান করুন।

১৪২. আল-কুরআন, ১৩ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইন

ইসলামি আইন হলো সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবজ। আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, আইনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন এবং আনুগত্য প্রকাশ যে কোনো সমাজের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির প্রধান ও পূর্ব শর্ত। জাহিলি যুগের সমাজে বস্তুনিষ্ঠ কোনো নিয়মনীতি ও আইন-কানুন বাস্তবায়ন ও অনুসরণের লেশমাত্রও ছিল না। মহানবী মুহাম্মদ সা. তাঁর নবুওয়াতি জীবনে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে পর্যায়ক্রমে ইসলামি আইন-কানুন ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রবর্তন করেছিলেন এবং মানুষের মধ্যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে আইনের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও আইন মেনে চলার মননশীলতা তৈরি করে দিয়েছিলেন, যার ভিত্তিতে মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম একটা ক্ষুদ্র অথচ নিরাপদ ইসলামি কল্যাণরাষ্ট্র। এ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটার মূল চালিকাশক্তি ছিল কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআনে আইন ও বিচার সম্পর্কে হযরত দাউদ আ.-কে সম্বোধন করে মহান আল্লাহ বলেন :

يٰدَاوٗدُ إِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ

‘হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ কর না, কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।’[১৪৩]

একইভাবে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা.-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ.

‘সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে তুমি তাদের বিচারনিষ্পত্তি করবে এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে তা ত্যাগ করে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না।’[১৪৪]

নিচে ইসলামি আইন ও সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো–

ইসলামি আইনের সংজ্ঞা : ইসলামি আইন বলতে শারি‘আহ প্রবর্তিত আইনকে বুঝায়। শারি‘আহ (شريعة) একটা আরবি একবচনের শব্দ, বহুবচনে শারায়ি‘ (شرائع); যা আরবি শিন, রা ও আইন (ش ر ع) তিনটি মূলবর্ণ থেকে উৎপন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হলো– ‘দীন, জীবন-পদ্ধতি, ধর্ম, জীবনাচার, নিয়মনীতি ইত্যাদি।’[১৪৫] তবে আরবি ভাষায় শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো– ‘পানির উৎসস্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করে।’[১৪৬] অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে শারি‘আহ-এর আভিধানিক অর্থ হলো– পানি পান করার স্থান, ঘাট, ঝর্ণা, জলাশয় বা কূপে যাওয়ার পথ, অনুসরণীয় স্পষ্ট পথ, অভ্যাস, আইন, বিধান, পথ, পন্থা, ইত্যাদি।[১৪৭]

শারি‘আহ শব্দটি শির‘আত উচ্চারণে যে জীবন পদ্ধতির অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ‘তোমাদের প্রত্যেকের জন্য শারি‘আহ ও জীবন-পদ্ধতি নির্ধারণ করেছি।’[১৪৮]

পরিভাষায় ইসলামি আইনের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত তাবিয়ি কাতাদাহ রহ. বলেন– ‘ইসলামি আইন হচ্ছে আল্লাহতা‘আলার পক্ষ থেকে আরোপিত নির্দেশ, নিষেধাজ্ঞা, সীমারেখা ও ফারায়িজ।’[১৪৯]

---

১৪৩. আল-কুরআন, ৩৮ : ২৬
১৪৪. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮
১৪৫. ইসমাইল ইবন হাম্মাদ আল-যাওহারি, *আস-সিহাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯২
১৪৬. ইবন মানযুর, *লিসানুল আরব*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪০-৪১
১৪৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু‘জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০০
১৪৮. আল-কুরআন, ৫ : ৪৮
১৪৯. ইমাম কুরতুবি, *আল-জামি লিআহকামিল কুরআন*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০৬), খ.৬, পৃ. ২১১

Dhaka University Institutional Repository

ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন, ‘আল্লাহতা‘আলা যেসব আকিদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন, তা-ই ইসলামি আইন।’[১৫০] তিনি অন্যত্র বলেছেন, ‘আল্লাহতা‘আলা, রসুলুল্লাহ সা. ও উলুল আমর তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমির-এর আনুগত্য করা।’[১৫১]

মওলানা আবদুর রহীম বলেন, ‘এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যদ্বারা তার অবলম্বনকারী লোকেরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড লাভ করতে পারে।’[১৫২]

ড. আবদুল কারিম জাইদান বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধি-বিধান জারি করেছেন তাকে ইসলামি আইন বলা হয়। সে বিধান কুরআন অথবা রসুলুল্লাহ সা.-এর বাণী, কর্ম বা সম্মতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে পারে।’[১৫৩]

মান্না খলিল আল কাত্তান বলেন,
ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والْمعاملات ونظم الحياة في شعبها الْمختلفة لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة.
‘আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকিদা, ইবাদত, আখলাক, লেনদেন ও জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের প্রভুর ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন তা-ই শারি‘আহ তথা ইসলামি আইন।’[১৫৪]

ইসলামি আইনের সংজ্ঞা আরও সহজভাবে এভাবে দেয়া যায় যে, ‘আল্লাহতা‘আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রসুলুল্লাহ সা.-এর মাধ্যমে স্বীয় বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই হলো ইসলামি আইন।’ এ সংজ্ঞার আলোকে আল্লাহতা‘আলার যাবতীয় আদেশ-নিষেধ ও এতদুভয়ের ভিত্তিতে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মাকরুহ ও হারাম ইত্যাদি যে সকল বিধান প্রণয়ন করা হয় তা হচ্ছে ইসলামি আইন।

ইসলামি আইনের উৎস : ইসলামি আইনের উৎস প্রথমত দু’ভাগে বিভক্ত। (১) মুখ্য ও মৌলিক উৎস (২) গৌণ ও সম্পূরক উৎস। ইসলামি আইনের মুখ্য ও মৌলিক উৎস চারটা। সেগুলো হলো– (১) আল-কুরআন; (২) আস-সুন্নাহ; (৩) আল-ইজমা ও (৪) আল-কিয়াস।[১৫৫]

এগুলোর পাশাপাশি ইসলামি আইনের কয়েকটা সম্পূরক ও গৌণ উৎস রয়েছে। সেগুলো হলো– (১) ইসতিহসান; (২) ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালা; (৩) শারউ মান কাবলানা বা পূর্ববর্তী শারি‘আত; (৪) ইসতিসহাব; (৫) আমালু আহলিল মদিনা; (৬) উরফ ও রেওয়াজ; (৭) কাওলুস সাহাবি;[১৫৬]

ইসলামি আইনের মুখ্য ও মৌলিক উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

আল-কুরআনুল কারিম : ইসলামি আইনের সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে আল-কুরআনুল কারিম। ইসলামি আইনের সকল ধারাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কুরআনুল কারিম থেকে উৎসারিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতা‘আলা নিজেই আইন প্রণয়নকারী।[১৫৭] নিচে আল-কুরআনের সংজ্ঞা প্রদত্ত হলো :

আল-কুরআন-এর আভিধানিক সংজ্ঞা : আল-কুরআন (اَلْقُرْآنُ) শব্দের বিশ্লেষণে বিশ্লেষণধর্মী ‘আলিমগণের কেউ কেউ বলেন, আল-কুরআন শব্দটা মাহমুয বা হামযাযুক্ত। আবার কারো কারো মতে, তা হামযাযুক্ত নয়। আরবি قُرْآنٌ শব্দটা قَرَأَ-يَقْرَأُ ক্রিয়ার বাবে فَتَحَ يَفْتَحُ থেকে মাসদার বা ক্রিয়ামূল। আয-যাজ্জাজের মতে - قَرَأَ

---

১৫০. ইবন তাইমিয়া, *মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া*(মদিনা মুনাওয়ারা : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, ২০০৪), খ. ১৯, পৃ. ৩০৬
১৫১. ইবন তাইমিয়া, *মাজমু‘ আল-ফাতাওয়া*, প্রাগুক্ত, খ. ১৯, পৃ. ৩০৯
১৫২. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৯
১৫৩. ড. আব্দুল কারিম জাইদান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শারি‘আতিল ইসলামিয়া*(আলেকজান্দ্রিয়া : দারু উমর ইবনুল খাত্তাব, ১৯৬৯), পৃ. ৩৯
১৫৪. মান্না আল কাত্তান, *তারিখুত তাশরি‘ইল ইসলামি*(কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহাবাহ, ২০০১), পৃ. ১৪
১৫৫. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী, অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামি ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*(ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল’ রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৪), পৃ. ৬২
১৫৬. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী, অনুঃ আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামি ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৭৭
১৫৭. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮

Dhaka University Institutional Repository

يَقْرُأ ক্রিয়ার বাবে نَصَرَ يَنْصُرُ এর ক্রিয়ামূল (مصدر)। আল-লিহয়ানির মতে, قَرَأ يَقْرَأ ক্রিয়ার ক্রিয়ামূল তিনভাবে হয়ে থাকে : (১) قَرْاٌ (২) قِرَاءَةٌ এবং (৩) قُرْآنٌ এ ক্রিয়াটা মূলে সকর্মক ক্রিয়া (فعل متعدي) হলেও কোন কোন সময় সকর্মক ক্রিয়ার অর্থ প্রকাশের জন্য এর সাথে অতিরিক্ত একটি ب (বা) হরফ যুক্ত হয়। যেমন, قَرَأْتُ الْقُرْآنَ (আমি কুরআন পাঠ করেছি), এ একই অর্থে আবার قَرَأْتُ بِالْقُرْآنِ (আমি কুরআন পাঠ করেছি) ব্যবহৃত হয়।[১৫৮] قَرْءٌ শব্দটা পাঠ করা এবং একটা বিষয়কে অপর একটা বিষয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করার অর্থও প্রকাশ করে। একটা বর্ণকে অপর একটা বর্ণের সাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করা হলে তাকে قِرَاءَةٌ (কিরাআত) বলা হয়।[১৫৯]

আরবি ভাষাবিদ আল-ফাররার মতে, আল-কুরআন নামটি আল-কারাইন (القرائن) থেকে উদ্ভূত। এটা করিনা (قرينة) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ অনুরূপ। যেহেতু কুরআনের একটা আয়াত অপর আয়াতকে সত্যায়ন করে এবং এক আয়াত অপর আয়াতের অনুরূপ। এ কারণে 'কুরআন' কে কুরআন বলা হয়। কুরআন শব্দটি পাঠ করা অর্থে ব্যবহার করে হামযাসহ আল্লাহতা'আলা উল্লেখ করেছেন,[১৬০] إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَه وَقُرْآنَه فَإِذَا قَرْأْنَاه فَاتَّبِعْ قُرْآنَه

আল-কুরআন-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামি শারি'আতের পারিভাষায় ও ব্যবহারিক অর্থে 'আল-কুরআন হচ্ছে মহান আল্লাহতা'আলার সে মহাগ্রন্থ, যা তিনি তাঁর রসুল মুহাম্মাদ সা.-এর উপর নাযিল করেছেন এবং সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণনারীতিতে তা বর্ণিত হয়েছে।' বলা হয়েছে–

أما الكتاب هو القرآن الْمنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الْمكتوب في الْمصاحف الْمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة.

'কিতাব বলতে এমন কুরআনকে বুঝায়, যা রসুলুল্লাহ সা.-এর উপর নাযিল করা হয়েছে। এটি মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আর এটি নবী কারিম সা.-এর নিকট থেকে মুতাওয়াতির[১৬১] পর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।'[১৬২]

উক্ত সংজ্ঞায় 'যা রসুলুল্লাহ সা.-এর প্রতি নাযিল করা হয়েছে' বলে পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহ থেকে কুরআনকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং 'যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ রয়েছে' বলে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ নেই, সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে পৃথক করে দেয়া হয়েছে। যেমন– ঐ সমস্ত আয়াত যেগুলোর বিধান বলবৎ আছে; কিন্তু তিলাওয়াত রহিত হয়ে গেছে। আর 'যা সন্দেহাতীতভাবে তাওয়াতুর পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়ে আসছে' সংজ্ঞায় এ শর্তারোপের মাধ্যমে যা এ প্রক্রিয়ায় বর্ণিত নেই সেগুলো থেকেও কুরআন মাজিদকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

এ সংজ্ঞার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, গোটা কুরআনই মুতাওয়াতির পন্থায় প্রমাণিত এবং মুসহাফে উসমানিতে যা আছে তা পুরোটাই মুতাওয়াতিরভাবে প্রমাণিত। কুরআনের কোন অংশই মুসহাফে উসমানি থেকে বাদ পড়ে যায়নি। এটাই গোটা মুসলিম উম্মাহর আকিদা ও অকাট্য সত্য।

কিতাবুল্লাহর আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা : আল্লাহতা'আলা তাঁর কিতাবে কুরআনের সংজ্ঞায় বলেন,[১৬৩]

وَإِنَّه لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الأَمِيْنُ. عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ. بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে আল-কুরআনুল কারিমের গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্টসমূহ বর্ণিত হয়েছে, তাহলো–

- কুরআন মাজিদ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নযিলকৃত।

---

১৫৮. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ, *কুরআন পরিচিতি*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫), পৃ. ১

১৫৯. "قَرَأْتُ الشَّيْءَ قُرْآنًا: جمعته وضممت بعضه بعضا" দ্র. মাজদুদ দীন আল ফিরূযাবাদি, *বাসাইরু যাবিত তাময়িয ফি লাতাইফি কিতাবিল আযিয*(কায়রো : ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, মিশর, ১৪১৬ হি.), খ.৪, পৃ. ২৬২-২৬৩

১৬০. এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করবার দায়িত্ব আমারই। অতএব যখন আমি তা পাঠ করি তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর।' দ্র. আল কুরআন, ৭৫ : ১৭-১৮

১৬১. 'যে বর্ণনার সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এত বেশি যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা রচনা বা বলা স্বভাবতই অসম্ভব বলে মনে হয়, এরূপ বর্ণনাকে মুতাওয়াতির বলা হয়।' দ্র. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৭০), পৃ. ৪৭

১৬২. শাইখ আহমদ মোল্লাজিওন, *নুরুল আনওয়ার*(বৈরুত : দারুল কুতুব আল 'ইলমিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৭

১৬৩. আল-কুরআন, ২৬ : ১৯২-১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

- আল-কুরআন রূহুল আমিন হযরত জিবরাঈল আ.-এর মাধ্যমে মহানবী মুহাম্মদ সা.-এর উপর অবতারিত।
- আল-কুরআন রসুলুল্লাহ সা.-এর উপর এজন্য নাযিল হয়েছে, যাতে তিনি তা দ্বারা উম্মতকে সতর্ক করতে পারেন। এ পর্যায়ে আল্লাহতা'আলা বলেন,[১৬৪]

لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ.

- আল-কুরআন স্পষ্ট আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে।

হাদিসের আলোকে কুরআনের সংজ্ঞা : রসুলুল্লাহ সা. কুরআনুল কারিমের সংজ্ঞায় বলেন,[১৬৫]

كتاب الله فيه نباء ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذى لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضى عجائبه، وهو الذى تنته الجن اذ سمعته حتى قالوا: انا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فامنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم.

আল-কুরআন ও ইসলামি আইনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। এটা সর্বযুগের সকল মুসলিম আলিমগণের ঐকমত্য ও ইজমা যে, ইসলামি আইন কুরআনেরই বিধান। কেননা কুরআনই ইসলামিকে সত্যায়ন করেছে। ইসলামি আইনের বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করলে দেখা যাবে যে, আকিদা ও বিশ্বাসের মূল বিষয়গুলো যেমন– তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাত ইত্যাদি বিষয় কুরআনের বিশাল অংশ জুড়ে আলোচিত হয়েছে। শিরক, কুফরের পরিচিতি সম্পর্কে কুরআনে বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইমানের আরকানের মধ্যে আল্লাহ, মালাইকা, আসমানি কিতাব, নবী-রসুলগণ ও শেষ দিবসের প্রতি ইমানের অপরিহার্যতার কথা কুরআনে বলা হয়েছে। ইসলামের আরকানের মধ্যে শাহাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত ও হাজ্জের বর্ণনা কুরআনে রয়েছে। আকিদার পাশাপাশি শারি'আহর বিভিন্ন আমল ও মু'আমালাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও কুরআনে রয়েছে। ব্যক্তির নিজের করণীয়, বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন ও সংরক্ষণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন, অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়, রাজনৈতিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয়সহ শারি'আহর সকল মৌলিক কিছুই স্পষ্টভাবে কুরআনে বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহতা'আলা বলেন।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً وَّبُشْرٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ.

'আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদস্বরূপ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করলাম।'[১৬৬]

বিগত ১৪০০ বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত যে সকল ইমাম, আলিম ও পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন, তাদের কোনো একজনও এ কথা দাবি করেননি যে, ইসলামি আইন কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু। সাহাবাগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত রচিত তাফসির, হাদিস, ফিকাহ, উসুলে ফিকাহসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি রেফারেন্স গ্রন্থসমূহে ইসলামি আইনকে কুরআনেরই বিধান বলা হয়েছে। কেননা ইসলামি আইন সাব্যস্ত হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে এবং কুরআনই ইসলামি আইনের প্রাথমিক উৎস ও দলিল। কুরআন ছাড়া ইসলামি আইনের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায় না।

আস-সুন্নাহ : সুন্নাহ ইসলামি আইনের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস। কুরআনের পরেই এর অবস্থান। সুন্নাহর শাখা-প্রশাখা অনেক বিস্তৃত, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অনেক বেশি, আইনি ব্যবস্থাপনা অনেক সূক্ষ্ম। কেননা সুন্নাহ মূলত কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনে বর্ণিত সাধারণ নীতিমালার বিশ্লেষণ। এ কারণে সুন্নাহ ইসলামি আইনের অকাট্য উৎস।[১৬৭]

সুন্নাহর শাব্দিক অর্থ : আরবি সুন্নাহ (سُنَّةٌ) শব্দটির বাংলা অর্থ– পথ, পদ্ধতি, পন্থা, নিয়ম-নীতি, রীতি-পদ্ধতি ইত্যাদি।[১৬৮] শাব্দিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটা ভাল-মন্দ উভয় পথ-পদ্ধতি বুঝায়।[১৬৯] যেমন আল্লাহতা'আলা

---

১৬৪. আল-কুরআন, ৪ : ১৬৫
১৬৫. ইমাম তিরমিজি রহ., *জামি' আত-তিরমিজি*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুয়ালিয়া, ১৪২০ হি.), পৃ. ৪৬৪, হাদিস নং ৪৯০৬
১৬৬. আল-কুরআন, ১৬ : ৮৯
১৬৭. আল-কুরআন, ৪৫ : ১৮
১৬৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৮

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيْلاً ‘আমার রসুলগণের মধ্যে তোমার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম এবং তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবে না।’[১৭০] একইভাবে রসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন[১৭১],

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء

সুন্নাহর পারিভাষিক অর্থ : ফকিহগণ সুন্নাহ বলতে আইনের ঐ ধরনকে বুঝিয়ে থাকেন, যা ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু তা পালন করার জন্য বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যা বিদ‘আতের বিপরীত।[১৭২] উসুলবিদগণের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয়– السنة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره ‘রসুলুল্লাহ (সা.)-এর কথা, কাজ, সম্মতি ও অনুমোদনকে বলা হয় আস-সুন্নাহ।’[১৭৩] আস-সুন্নাহ মূলত কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আল্লাহতা‘আলা বলেন,

بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ ط وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

‘প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্টভাবে প্রমাণাদি ও গ্রন্থাবলীসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে সুস্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।’[১৭৪] আল্লাহতা‘আলা আরও বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى ‘এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো অহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।’[১৭৫]

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে, রসুলুল্লাহ সা.-এর কথা, কাজ, মৌন সম্মতি ও গুণাবলী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে সব কিছুই সুন্নাহ।[১৭৬] এ সংজ্ঞার আলোকে রসুলুল্লাহ সা.-এর স্বভাবগত চারিত্রিক গুণাবলীও সুন্নাহর আওতাভুক্ত।

উসুলবিদগণ অন্যভাবেও সুন্নাহর বিশ্লেষণ করেছেন। তাদের মতে, সুন্নাহ বলতে শারই‘ বিধানের ঐ ধরনকে বুঝায় যা পালন করলে সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়, কিন্তু পরিত্যাগ করলে শাস্তি পেতে হয় না। যেমন– বিভিন্ন ওয়াক্তের ফরয সালাতের পূর্বের ও পরের সুন্নাত সালাত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাহ শব্দটা মানদুব শব্দের সমার্থবোধক। যা ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ, মুবাহ থেকে ভিন্ন একটা পরিভাষা।[১৭৭]

রসুলুল্লাহ সা.-এর ইশারা, ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পরিত্যাগ করেছেন, সবকিছুই উসুলবিদগণের দৃষ্টিতে সুন্নাহর আওতাভুক্ত।[১৭৮] যেমন, আবু বকর রা.-কে ইমামতি অব্যাহত রাখার জন্য রসুল সা.-এর ইশারা, বিভিন্ন সম্রাটের কাছে লেখা তাঁর পত্রাবলী।

সুন্নাহ ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য বিষয়ে দু’টো মত বিদ্যমান। জমহুরের মতে, হাদিস বলতে শুধু রসুল সা.-এর বাণীকে বুঝায়। সে দৃষ্টিকোণ থেকে হাদিসের চেয়ে সুন্নাহ ব্যাপক এবং হাদিস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত। অন্য মত অনুযায়ী হাদিস দ্বারা রসুল সা., সাহাবা ও তাবিয়িগণের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি বুঝায়। এ দৃষ্টিতে হাদিস ব্যাপক অর্থবোধক ও সুন্নাহ হাদিসের একটা অংশবিশেষ।[১৭৯]

সুন্নাহ শব্দটা বিদ‘আতের বিপরীত। সুন্নাহ শারি‘আহ অনুমোদিত আর বিদ‘আত শারি‘আহ নিষিদ্ধ পদ্ধতি।[১৮০] সুন্নাহর সংজ্ঞায় কোন কোন উসুলবিদ বলেন, কুরআন ব্যতীত রসুল সা. থেকে প্রকাশিত যাবতীয় বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিই সুন্নাহ।[১৮১] তারা ‘কুরআন ব্যতীত’ শর্তটা যোগ করেছেন এ যুক্তিতে যে, কুরআন রসুল সা.

---

১৬৯. মাজদুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন ইয়াকুব আল-ফিরূযাবাদি, *আল-কামুস আল-মুহিত*(কায়রো : দারুল হাদিস, ২০০৮), ৮১৫
১৭০. আল-কুরআন, ১৭ : ৭৭
১৭১. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৬, পৃ. ১৮৭, হাদিস নং ৬৫৫৬
১৭২. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*(দামেশক : দারুল ফিকর, খ.১, ১৯৮৬), পৃ. ৪৩২
১৭৩. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৭৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৪৪
১৭৫. আল-কুরআন, ৫৩ : ৩-৪
১৭৬. ড. মুস্তফা আস-সুবায়ি‘, *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরী‘*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০
১৭৭. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২২৭
১৭৮. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
১৭৯. আবু ইসহাক ইবরাহিম ইবন মুসা আল-লাখমি আশ-শাতিবি, *আল-মুআফাকাত ফি উসুলিস শারি‘আহ*(কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতিল কুবরা, তা.বি.), খ.৪, পৃ. ৪
১৮০. ইবন বাদরান হাম্বালি, *আল-মাদখাল ইলা মাযহাবি আহমদ*(কায়রো : আল-মাতবাআতুল মুনিরিয়া, ১৯২৭), পৃ. ৮৯
১৮১. মুহাম্মাদ বিন আলি আশ-শাওকানি, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকিকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসুল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

Dhaka University Institutional Repository

থেকে প্রকাশিত নয়; বরং তা আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনি জিবরাইল আ. থেকে তা গ্রহণ করে উম্মতের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।[১৮২]

অতএব রসুল সা.-এর নবুওয়াতের পূর্বেকার কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হবে না।[১৮৩] আল-কুরআন ও আস-সুন্নাহ উভয়ই যে অহি, সে ব্যাপারে আলিমগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হাদিস শাস্ত্রের উসুল অনুযায়ী সুন্নাহ-এর যে সকল হাদিস সার্বিক বিবেচনায় বিশুদ্ধ শুধু সেগুলোই শারি'আহ-এর দলিল ও উৎস হিসেবে গৃহীত।

আল-ইজমা : রসুলুল্লাহ সা.-এর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন ইসলামি আইনের কেন্দ্রবিন্দু। মুসলিম উম্মাহ নতুন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তাঁর উপর অহি অবতীর্ণের মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা উক্ত পরিস্থিতির সমাধান করে দিতেন। এ কারণে তাঁর যুগে ইজমার কোন আবশ্যকতা দেখা দেয়নি। তাঁর ইন্তিকালের পর নতুন নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের অপরিহার্যতা সামনে রেখে সামষ্টিক ইজতিহাদের মাধ্যমে ইজমার সূচনা হয়।

ইজমার শাব্দিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইজমা শব্দটা দুটো অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত: কোন কিছুর জন্য দৃঢ় সংকল্প করা, দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করা।[১৮৪] এ অর্থে আল্লাহতা'আলা ঘোষণা করেন, فَأَجْمِعُوْا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ 'তোমরা যাদেরকে শরিক করেছ তৎসহ তোমাদের কর্তব্য স্থির করে লও।'[১৮৫]

একই অর্থে রসুলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, لا صيام لِمن لم يجمع قبل الفجر 'যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে রোযার নিয়ত নিশ্চিত করল না, তার রোযা হলো না।'[১৮৬]

দ্বিতীয়ত: একমত হওয়া বা ঐকমত্য পোষণ করা। কোন বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যও দৃঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে হয়। অতএব একক ব্যক্তির দৃঢ় প্রত্যয় সামষ্টিক রূপ নিয়ে ঐকমত্য সম্পন্ন হয়।

ইজমার পারিভাষিক অর্থ : উসুলবিদগণ ইজমার বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ উসুলবিদের মতে– إنه اتفاق الْمجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي 'রসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকাল পরবর্তী বিভিন্ন যুগে শারি'আতের কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐকমত্য হলো ইজমা।[১৮৭]

ইজমা হচ্ছে রসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহর মুজতাহিদগণ কোন এক যুগে শারি'আহ-এর কোনো এক বিধানের উপর একমত হওয়া।[১৮৮] ইজমার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের বিপরীত কোনো কিছুর উপর একমত না হওয়া। এজন্যই রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, 'আমার উম্মাতকে আল্লাহতা'আলা ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত করবেন না।' ইজমার বিধানের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّه مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِه جَهَنَّمَ ؕ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

'কারও নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর সে যদি রাসুলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মু'মিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে, তবে যেদিকে সে ফিরে যায় সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দিব এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব, আর তা কত মন্দ আবাস!'[১৮৯]

অতএব উপরিউক্ত দিকসমূহ বিবেচনান্তে জানা যায়, রসুলুল্লাহ সা.-এর ইন্তিকালের পর মুসলিমগণ নতুন বিষয়ের শারই' বিধান জানতে চাইলে সমসাময়িক মুজতাহিদগণ যদি উক্ত নতুন বিষয়ের কোন একটা বিধান উদ্ভাবন করে তার উপর একমত হন, তাহলে তাদের এ ঐকমত্যকে ইজমা বলা হবে। ইজমা সংঘটিত হওয়ার

---

১৮২. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহিল ইসলামি*(দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৬), পৃ. ১৮৯

১৮৩. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয-যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

১৮৪. আলি ইবন মুহাম্মদ আল-আমিদি, *আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৬১

১৮৫. আল-কুরআন, ১০ : ৭১

১৮৬. ইমাম নাসাই, *সুনানুন নাসাই*(রিয়াদ : বাইতুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়া, ২০০১), পৃ. ২৫৪, হাদিস নং ২৩৩৬

১৮৭. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫১৪

১৮৮. ইমাম মুহাম্মদ ইবন মুহাম্মদ আল-গাযালি, *আল-মুসতাসফা মিন 'ইলমিল উসুল*(মদিনা মুনাওয়ারা : মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯), খ.১, পৃ. ১৭৩

১৮৯. আল-কুরআন, ৪ : ১১৫

Dhaka University Institutional Repository

পর তা শারি'আতের প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হয়। খুলাফায়ে রাশিদিনের সকলেই তাদের সামনে নতুন কোন সমস্যা সৃষ্টি হলে এ পদ্ধতিতে কাজ করতেন। এ কারণেই খলিফা উমর রা. সাহাবি ও মুজতাহিদগণকে ইসলামি রাষ্ট্রের তৎকালীন রাজধানী মদিনা কেন্দ্রিক বসবাসে উদ্বুদ্ধ করতেন।

আল-কিয়াস : কিয়াস ইসলামি আইনের চতুর্থ উৎস। কিয়াসের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। নতুন বিষয়ের ইসলামি বিধান উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে কিয়াসের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমায় বর্ণিত বিধান সীমিত। অপর দিকে মানুষের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ চলমান। দৈনন্দিন জীবনে মুখোমুখী হওয়া এসব ঘটনার ইসলামি আইন জানতে তাদের কিয়াসের প্রয়োজন রয়েছে। কিয়াস হচ্ছে কোন বিষয়ের জন্য সে বিধান নির্ধারণ করা, যে বিধান স্পষ্টভাবে অন্য একটা বিষয়ের জন্য কুরআন বা হাদিসে বর্ণনা করা আছে, উভয় বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী ইল্লাত বা কারণ থাকার কারণে।[১৯০] কিয়াস যে ইসলামি আইনের উৎস ও দলিল সে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহতে বহু প্রমাণ রয়েছে।[১৯১]

কিয়াসের শাব্দিক অর্থ : আরবি কিয়াস (قياس) শব্দটা ক্রিয়ামূল। যা দু'টো বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়–

প্রথমত : পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ। একটা দিয়ে অন্যটার পরিমাপ করা। যেমন বলা হয়– قست الأرض بالْمتر 'আমি মিটারের মাধ্যমে ভূমির পরিমাপ করেছি।'[১৯২]

দ্বিতীয়ত : তুলনা করা, একটার সাথে অন্যটার সাদৃশ্য নির্ধারণ করা। যেমন বলা হয়– قايست بين العمودين 'আমি স্তম্ভ দুটোর পরিমাপ নির্ধারণের জন্য পরস্পরের মধ্যে তুলনা করেছি।[১৯৩]

কিয়াসের পারিভাষিক অর্থ : পরিভাষায় কিয়াসের সংজ্ঞা সম্পর্কে উসুলবিদগণ বলেন–

القياس هو إلحاق مالم يرد به نص على حكمه بما ور د فيه نص على حكمه في الحكم، لاشتراكهما في علة ذلك الحكم.

'যে বিষয়ের বিধানে কোন নস বর্ণিত হয়নি, উক্ত বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাকে যে বিষয়ের বিধানে নস বর্ণিত হয়েছে তার সাথে এ ভিত্তিতে মিলানো যে, উক্ত বিধানের ইল্লাতের তথা কার্যকারণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান রয়েছে।'[১৯৪]

আল্লামা ইবনুল হাজিব সংক্ষেপে বলেছেন, 'কিয়াস হলো বিধানের ইল্লাতের দিক থেকে শাখা-প্রশাখা মূলের অনুরূপ হওয়া।[১৯৫]

ইসলামি শারি'আহর সম্পূরক ও গৌণ উৎসগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ–

ইসতিহসান (উত্তম বিধান নির্ধারণ) **:** ইসলামি আইনের যেসব উৎসের ব্যাপারে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে তন্মধ্যে ইসতিহসান অন্যতম। কোন বিষয়ের বিধানের ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য বিষয়ের বিধান গ্রহণ না করে বিশেষ বিবেচনায় ভিন্ন বিধান গ্রহণই ইসতিহসানের মূল প্রতিপাদ্য। হানাফি মাযহাবে এ উৎসের অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। ইসতিহসানের কয়েকটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও কম-বেশি সকলেই এ পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন।

কাযি আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দি ইসতিহসানের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন, العدول عن قياس إلى قياس أقوى 'দুটি কিয়াসের মধ্যে তুলনামূলক অধিকতর শক্তিশালী কিয়াসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।'[১৯৬] এ সংজ্ঞায় বর্ণিত অর্থে ইসতিহসানকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কেননা উসুলুল ফিকহের নীতিমালা অনুযায়ী

---

১৯০. ইমামুল হারামাইন, *আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ*(দোহা : কাতার বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৯৯ হি.), খ.২), পৃ. ৩৮৭
১৯১. ড. মুহাম্মদ আল-মুখতার আশ-শানকিতি, *আল কিয়াস ফিল 'ইবাদাত*(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ১৪২০ হি.), ১৮৫-২২৫
১৯২. ড. আবদুল করিম যাইদান, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহ*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১), পৃ. ১৯৪
১৯৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৫৭২
১৯৪. ড. আবদুল করিম যাইদান, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলিল ফিকহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪
১৯৫. শামসুদ্দিন মাহমুদ ইবন আবদুর রহমান আল-ইস্পাহানি, *বায়ানুল মুখতাসার শারহে মুখসারি ইবনুল হাজিব*(মক্কা মুকাররমা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, তা.বি.), খ.৩, পৃ. ৫
১৯৬. কাযি আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দি, *আদাবুল কাযি*(বাগদাদ : মাতবা'আতুল ইরশাদ, ১৯৭১), খ.১, পৃ. ৬৫০

Dhaka University Institutional Repository

দুটি কিয়াসের মধ্য থেকে শক্তিশালী কিয়াসটিই গ্রহণযোগ্য।[১৯৭] তবে এ সংজ্ঞাটিও পরিপূর্ণ নয়। কেননা নাসের ভিত্তিতে ইসতিহসান, ইজমার মাধ্যমে ইসতিহসান, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইসতিহসানসহ ইসতিহসানের অন্যান্য প্রকার এ সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে যায়।

ইমাম আশ-শাতিবি বলেন, الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي। 'ইসতিহসান হল, সামগ্রিক দলিলের বিপরীতে আংশিক স্বার্থ বা কল্যাণ গ্রহণ'[১৯৮] পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলোর তুলনায় এ সংজ্ঞাটি ব্যাপক অর্থবোধক।

ইসতিসলাহ বা মাসালিহ মুরসালা (জনকল্যাণ বিবেচনা) : উসুলবিদগণ কিয়াসের ক্ষেত্রে কর্মের বৈশিষ্ট্য ও বিধানের মধ্যকার উপযোগিতাকে শারি'আহ প্রণেতা কর্তৃক বিবেচনার দিক বিবেচনার দিক থেকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। শারি'আত প্রণেতা কর্মের যেসব বৈশিষ্ট্যকে আইন প্রণয়নের উপযুক্ত কার্যকারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন সেগুলো মুনাসিব মু'তাবার (বিবেচ্য উপযোগ) এবং যেগুলো তিনি পরিত্যাগ করেছেন সেগুলো মুনাসিব মুলগা (পরিত্যাজ্য উপযোগ) হিসেবে স্বীকৃত। এ দু'প্রকার ছাড়া আরও এক প্রকার মুনাসিব রয়েছে, যা গ্রহণ বা পরিত্যাগের ব্যাপারে নাস বা ইজমায় কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। এ প্রকার মুনাসিবকে ইমাম মালিক রহ. মাসালিহ মুরসালাহ, ইমাম আল-গাযালি ইসতিসলাহ, মুতাকাল্লিম উসুলবিদগণ মুনাসিব মুরসাল মুলাইম, কেউ কেউ ইসতিদলাল মুরসাল, ইমামুল হারামাইন ও ইবনুস সাম'আনি ইসতিদলাল নামকরণ করেছেন।[১৯৯]

মাসালিহ মুরসালাহ পরিভাষাটি মাসালিহ ও মুরসালাহ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। মাসালিহ শব্দটি মাসলাহা শব্দের বহুবচন, যার অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, স্বার্থ।[২০০] আর মুরসালাহ অর্থ মুক্ত, বন্ধনহীন।[২০১] অতএব মাসালিহ মুরসালাহ অর্থ সাধারণ কল্যাণ, কিন্তু ব্যবহারিক দিক থেকে পরিভাষাটি জনকল্যাণ, জনস্বার্থ, জনকল্যাণচিন্তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় মাসালিহ মুরসালাহ বলা হয়, 'ঐ সব বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীকে, যা শারি'আত প্রণেতার উদ্দেশ্যে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু তা গ্রহণ বা পরিত্যাগ করার পক্ষে-বিপক্ষে কোন দলিল নেই। অথচ তা বিবেচনায় এনে কোন বিধান প্রণয়ন করলে মানুষের কল্যাণ সাধিত অথবা অকল্যাণ দূরীভূত হয়।[২০২] যেমন– উমর রা.-এর জেলখানা ও দিওয়ান প্রতিষ্ঠা।

উরফ (রেওয়াজ ও প্রথা) : ফকিহগণ অনেক মাসআলার বিধান উদ্ভাবনে উরফ বা প্রথার উপর নির্ভর করেছেন। এ কারণে ইসলামি আইনে উরফ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত। ইসলামি আইনের প্রমাণাদি এ উৎসকে সমর্থন করে। একে কেন্দ্র করে অনেক ফিকহি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। এমনকি সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনাও এর প্রামাণিকতার স্বীকৃতি প্রদান করে। ইসলামি আইনের পাশাপাশি প্রচলিত আইনেও উরফ তথা প্রথা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়।

অভিধানে উরফ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত, ধারাবাহিকতা, স্বীকৃতি, অনুমোদন, সমর্থন, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ইত্যাদি।[২০৩]

পরিভাষায় উরফ বলা হয়, 'যেসব বিষয় মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে বা তাদের মধ্যে প্রচলিত কর্মকাণ্ড যাতে তারা অভ্যস্ত হয়েছে, অথবা যেসব শব্দ প্রকৃত অর্থের বিপরীতে বিশেষ অর্থ প্রদানের জন্য তারা ব্যবহার করে, যা অন্যরা শ্রবণ করলে সহজবোধ্য হয় না।'[২০৪]

---

১৯৭. জালালুদ্দিন আল-মাহাল্লি, *শারহে মিনহাজুত তালিবিন লিন নাবাভি বিহাশিয়াতি কালইউভি ওয়া আমিরাহ*(কায়রো : মাতবা'আতুল ইসা আল-বাবি আল-হালাবি, তা.বি.), খ.২, পৃ. ৩৫৩
১৯৮. আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*(আল-খুবার : দারু ইবন আফফান, ১৯৯৭), খ.৪, পৃ. ২০৬
১৯৯. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৭৫২
২০০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৬
২০১. ড. মুহাম্মদ মোস্তফা আয-যুহাইলি, *আল-ওয়াজিয ফি উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩
২০২. আবু ইসহাক ইবরাহিম আশ-শাতিবি, *আল-মুওয়াফাকাত*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ২৪৩
২০৩. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৪
২০৪. ড. ওয়াহাবাহ আয-যুহাইলি, *উসুলুল ফিকহিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

সাদ্দুয যারায়ে (অন্যায়ের উপকরণ রোধকরণ) : সম্পূরক অপরাধ বর্তমান সময়ে আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অপরাধ দমনে প্রণীত বিভিন্ন আইনে এ পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এর ভিত্তিতে মূল অপরাধের সাথে সাথে উক্ত অপরাধের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী সম্পূরক অপরাধগুলো নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে। ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস সাদ্দুয যারায়ের দাবিও একই। কোন হারাম কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বা ফরয কাজ থেকে বিরতকারী কার্যাবলি নিষিদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ে।

সাদ্দুয যারায়ে পরিভাষাটি দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। সাদ্দ ও যারায়ে। সাদ্দ শব্দের অর্থ বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং ক্রিয়ামূল হিসেবে এর অর্থ বন্ধ করা, বাধা দেয়া, নিবারণ করা ইত্যাদি।[২০৫] আর যারায়ে শব্দটি যারি'আহ শব্দের বহুবচন। যার অর্ধ মাধ্যম, উসিলা, পথ ইত্যাদি।[২০৬]

পরিভাষায় সাদ্দুয যারায়ে বলা হয়, যে সব অনুমোদিত কাজ বা উপায়-উপকরণ শারি'আত নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত করে, তার পথ রুদ্ধ করাই সাদ্দুয যারায়ে।[২০৭]

ইসতিসহাব (পূর্বের বিধান অক্ষুণ্ন রাখা) : ইসতিসহাব শব্দটি সাহবুন থেকে নির্গত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোন কিছু বা অবস্থা স্থায়ী করতে চাওয়া, সঙ্গী মনোনীত করা, সঙ্গে থাকা, সঙ্গী হওয়া ইত্যাদি।[২০৮] পরিভাষায়, 'পূর্বে যা প্রতিষ্ঠিত ছিল তা বহাল রাখা এবং যা অনুমোদিত ছিল না তার প্রত্যাখ্যান স্থায়ীকরণই ইসতিসহাব।'[২০৯]

আমালু আহলিল মদিনা (মদিনাবাসীর কর্ম) : আমালু আহলিল মাদিনা পরিভাষাটি তিনটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। আমাল অর্থ কাজ, কর্ম। আহল শব্দের অর্থ অধিবাসী, অধিকারী এবং মদিনা শব্দের অর্থ নগর, শহর ইত্যাদি। তবে এখানে মদিনা দ্বারা নবী কারিম সা.-এর হিজরতের শহর মদিনা মুনাওয়ারা উদ্দেশ্য এবং মদিনাবাসী বলতে প্রথম তিন যুগ তথা সাহাবা, তাবিয়ি ও তাবি তাবি'ইনগণের যুগের মদিনাবাসীই উদ্দেশ্য। অতএব আমালু আহলিল মদিনার শাব্দিক অর্থ মদিনাবাসীর কর্ম।

পরিভাষায় মদিনাবাসীর কর্ম বলতে বুঝানো হয়, যে কাজের ব্যাপারে সাহাবা ও তাবি'ইগণের যুগে মদিনার অধিবাসী বিজ্ঞ আলিমগণ সকলে অথবা তাদের অধিকাংশ ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং সে অনুযায়ী আমল করেছেন। উক্ত কাজের বিধিবদ্ধতার সূত্র বর্ণনানির্ভর বা ইজতিহাদপ্রসূত যাই হোক না কেন।

কাওলুস সাহাবি (সাহাবিগণের অভিমত) : কওলুস সাহাবি পরিভাষাটি কওল ও সাহাবি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। কওল শব্দের অর্থ কথা, উক্তি, বাণী, বক্তব্য, মত, অভিমত ইত্যাদি।[২১০] আর সাহাবি শব্দটি মূলত সাহিব থেকে সম্বন্ধ স্থাপনকারী আরবি ইয়া অক্ষর সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানে সাহিব শব্দটির অর্থ হলো– সঙ্গী, সাথী, নিকটতম বন্ধু, মালিক, অধিকারী, কোন মত বা পদ্ধতির অনুসরণকারী, কোন কিছুর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রহরী ইত্যাদি। অতএব কওলুস সাহাবি অর্থ রসুল সা.-এর সাথীর উক্তি বা অভিমত।

শারউ মান কাবলানা (পূর্ববর্তী শারি'আত) : শারউ মান কাবলানা বা আমাদের পূর্ববর্তীদের শারি'আত বলা হয় ঐসব বিধি-বিধান ও আইন-কানুনকে, যা মহান আল্লাহ আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের জন্য প্রণয়ন করেছিলেন, যা তাদের নবী ও রসুলগণ যেমন– ইবরাহিম, মুসা, ইসা আ.-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ করেন এবং

---

২০৫. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৮
২০৬. মাজদুদ্দিন আল-ফিরূযাবাদি, *আল-কামুসুল মুহিত*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৩
২০৭. ইবন তাইমিয়া, *বায়ানুদ দালিল আলা বুতলানত তাহলিল*(রিয়াদ : মাকতাবাতু লিনা, তা.বি.), পৃ. ৩৫১
২০৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫
২০৯. ইবন কায়্যিম আল-জাওযিয়া, *ই'লামুল মুআক্কি'ইন*(দাম্মাম : দারু ইবন জাওযি, ১৪২৩ হি.), খ.১, পৃ. ৩৩৯
২১০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৭

Dhaka University Institutional Repository

যার মূল উদ্দেশ্য ছিল হালাল ও হারামের ভিত্তিতে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের এবং মানুষের সাথে অপর মানুষের সম্পর্ক পরিচালনা করা।[২১১]

ইসলামি আইনের আনুষঙ্গিক ও গৌণ উৎসগুলোর প্রত্যেকটা কুরআন ও সুন্নাহর সমর্থনপুষ্ট ও এতদুভয়ের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে শারি'আহর উৎস দুই প্রকার। এক, যাদের সম্পর্ক শুধুমাত্র নকলের সাথে। দুই, যাদের সম্পর্ক কেবল রায়ের সাথে। প্রথম প্রকার উৎসের ভিত্তি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ এবং দ্বিতীয় প্রকার উৎসের ভিত্তি হচ্ছে কিয়াস ও ইসতিদলাল। ইসলামি শারি'আতে বুনিয়াদি ও কেন্দ্রীয় মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ; বুদ্ধি তার অনুসারী মাত্র। অন্যদিকে মানব রচিত আইন অধিকতর বুদ্ধিনির্ভর।

সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি আইন

মানুষ জন্মগতভাবে সামাজিক জীব। মানব জাতি মৌলিক প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, যৌন চাহিদা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মেটাতে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বংশ, গোত্র, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক সর্বোপরি ধর্মীয় ভিত্তিতে প্রথম নগর রাষ্ট্র, চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্মাণ করেছে। মানবজাতি যখনই কোন সমাজ ব্যবস্থা গড়েছে– সাথে সাথে এর নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান, রীতিনীতি এমনকি আইন ও সংবিধান প্রণয়ন করেছে।

ইসলামি আইনের বিভাগ : ইসলামি আইনের তিনটা বিভাগ রয়েছে। যথা : (ক) আকাইদ বা বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়; (খ) আখলাক বা চরিত্র গঠনমূলক বিষয় ও (গ) আহকাম বা বিধি-বিধানগত বিষয়। আবার বিধি-বিধান প্রধানত দুই প্রকার। যেমন : (১) ইবাদত ও (২) মু'আমালাত। আর মু'আমালাত হলো বান্দার তথা মানব জাতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কীয় ব্যাপার। আর তা কয়েক শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : (১) পারিবারিক আইন; (২) সামাজিক আইন; (৩) রাষ্ট্রীয় আইন; (৪) আন্তঃরাষ্ট্রীয় আইন যা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিব্যপ্ত।[২১২] সুতরাং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আইনের মধ্যে হলো ইসলামি অপরাধ আইন। আর অপরাধ হলো প্রথমত দুই প্রকার। (১) ছগিরা বা ছোট অপরাধ; (২) কবিরা বা বড় অপরাধ। আবার বড় অপরাধের মধ্যে কিছু কিছু তাওবার সাথে, কিছু কিছু শাস্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার শাস্তি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। (১) সুনির্দিষ্ট শাস্তি, (২) হত্যার বা প্রাণহানীর সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্তি, (৩) হুমকিমূলক তা'যিরি শাস্তি। আবার হদ বা সুনির্দিষ্ট জাতীয় শাস্তি সাত প্রকার অপরাধের জন্য হয়ে থাকে। যথা : (১) ধর্মত্যাগ, (২) রাষ্ট্রদ্রোহিতা, (৩) সন্ত্রাস বা ডাকাতি, (৪) মদ্যপান, (৫) চুরি বা চৌর্যবৃত্তি, (৬) যিনা-ব্যাভিচারের অপবাদ ও (৭) যিনা-ব্যাভিচারের শাস্তি। আবার জীবন ও সম্পদ সংরক্ষণের আইন তথা জিনায়া বা হত্যা ও আহত হওয়ার বিধান তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। (১) কিসাস বা হত্যার প্রতিশোধে হত্যা, (২) দিয়াত বা রক্তপণ, (৩) মিরাছ বা অসিয়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি।[২১৩] এছাড়া তা'যিরি শাস্তি নানাভাবে হতে পারে। মারধর, বয়কট, হত্যা, আটক, নির্বাসন, শূল বা ফাঁসি, জরিমানা, জামানত ও চাকুরি থেকে বরখাস্ত ইত্যাদি।

ইসলামি আইনে শাস্তির শ্রেণিবিভাগ : ইসলামি আইনে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন অপরাধসমূহের জন্য নির্ধারিত শাস্তি তিন শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা : (১) হুদুদ বা সুনির্দিষ্ট শাস্তি; (২) কিসাস ও দিয়াত জাতীয় শাস্তি তথা হত্যার বা প্রাণহানীর সাথে সংশ্লিষ্ট শাস্তি ও (৩) তা'যির বা দণ্ডবিধি যা শাসক ও বিচারক তথা রাষ্ট্রকর্তৃক রচিত শাস্তি।

উক্ত তিন শ্রেণির শাস্তির বিস্তারিত বিবরণ নিচে উপস্থাপিত হলো :

---

২১১. ড. আনাওয়ার শুআইব আবদুস সালাম, *শারউ মান কাবলানা মাহিয়্যাতুহু ওয়া হুজিয়্যাতুহু ওয়া নাআতুহু ওয়া দাওয়াবিতুহু ওয়া তাতবিকাতুহু*(কুয়েত : কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা কমিটি, ২০০৫), পৃ. ১৫৭

২১২. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৫), খ.১, পৃ. ৩৬

২১৩. ড. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬), পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

(১) হুদুদ : حدود (হুদুদ) শব্দটি حد (হদ) শব্দের বহুবচন, যার শাব্দিক অর্থ নিষেধ করা। এজন্য আরবরা بواب (বাওয়াব) তথা দারোয়ানকে حداد (হাদ্দাদ) বলে থাকে। কেননা সে প্রবেশ থেকে নিষেধ করে। হুদুদকে ইংরেজি ভাষায় বলা হয় Obstruction[২১৪], যার অর্থ রাস্তায় প্রতিরোধ হওয়া, রাস্তা বন্ধ করা, অগ্রগতি রোধ, সরবরাহ নিষেধ করা, চলার পথে সমস্যাসমূহ, অন্তরায়সমূহ করে রাখা। Something that blocks a road, passage, entrance, etc. so that nothing can go along it, or the act of blocking something in this way : There's some sort of obstruction on the railway tracks.[২১৫]

এ জন্য হদ-এর অর্থে বলা হয়েছে– সীমাবদ্ধ করা, নির্দিষ্ট করা, সংজ্ঞা প্রদান করা, সীমানা দেয়া, ঘেরাও করা, বেঁধে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা, সীমানায় পড়া, ধার দেয়া, ধারালো করা, দণ্ড দেয়া, শাস্তি দেয়া, সাজা দেয়া, সীমা, সীমানা ও সীমান্ত।[২১৬] হদ-এর দু'টি মৌলিক অর্থ রয়েছে। একটা হল নিষেধ করা, আর দ্বিতীয়টা হল কোন বস্তুর কিনারা।[২১৭] এখানে হদ হল নিষেধ করা, বাঁধাদানকারী কিংবা দু'টি বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকারী। সুতরাং প্রত্যেক জিনিস যা মানুষকে বা কোন বস্তুকে অপর বস্তু থেকে নিষেধ করাকে হদ বলে। আরবদের ব্যবহারিক অর্থে জেলারকে হাদ্দাদ বলা হয়। কেননা সে বের হওয়াকে নিষেধ করে। আর এ পর্যায়ে আরব কবির কবিতার একটি পংক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য :

يقول لي الحداد وهو يقود إلى * السجن لا تجزع فما بك من بأس.

'হাদ্দাদ (জেলার) আমাকে এ অবস্থায় বলল– সে জেলের দিকে নিয়ে যাচ্ছে; অস্থির হবে না, তোমার কোন ভয় নেই।' আর এ পর্যায়ে হদকে হদ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা সে নিষেধ করে ও অপরাধীকে বন্দি করে রাখে।[২১৮] আর ইদ্দতে থাকা অবস্থায় নারীকে আল-হাদাত করে নামকরণ করা হয়। কেননা সে নিজেকে সৌন্দর্য থেকে বিরত রাখে।[২১৯]

ইসলামি শারি'আতের পরিভাষায়, হদ বলা হয়– আল্লাহ তা'আলার অধিকার হেতু নির্ধারিত শাস্তি।[২২০]

এ সংজ্ঞায় তা'যির দণ্ডবিধি বের হয়ে গেছে। কেননা তা অনির্ধারিত শাস্তি। যা শারি'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়; বরং মানুষ তা নির্ধারিত করে। তেমনিভাবে এ সংজ্ঞা থেকে প্রাণীর অঙ্গের কিসাসের বিধান বহির্ভূত হয়ে গেছে। যা বান্দার অধিকার নয়। তাই তা এ সংজ্ঞার আওতাধীন নয়।[২২১]

অতএব ইসলামি শারি'আতে হদ হলো– কুরআনি ভাষ্য ও হাদিসের মাধ্যমে অপরাধের জন্য প্রতিষ্ঠিত শাস্তি। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার অধিকারের লংঘন রয়েছে।[২২২]

আর এটাই বিশুদ্ধ হবে যে, আল্লাহর অধিকারের অস্তিত্ব বান্দা তথা সমাজের অধিকারের সাথে জড়িত। আর এটা এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা তা'যিরের কোন নির্দেশ প্রদান করেননি, কিংবা নিষেধ করেননি। অন্যথায় তার অস্তিত্ব থাকত না। আর তা সম্মানিত সমাজ প্রতিষ্ঠায় মর্যাদা বয়ে আনে, ফলে অবমূল্যায়ন ঘটে না। এটা নির্ধারিত শাস্তি যা আল্লাহ তা'আলার অধিকারের জন্য বাঞ্ছনীয়।[২২৩]

আল্লামা সাইয়িদ সাবিক বলেন : শারি'আতের পরিভাষায় হদ হল– 'আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের জন্য নির্ধারিত শাস্তি।' অর্থাৎ সমাজ ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এসব শাস্তি নির্ধারিত। কেননা আল্লাহর দীনের

২১৪. A. P. Cowie, *Oxford Dictionary of English Idioms*(Oxford : University Press, 1994), p. 254

২১৫. Editorial Team, *Cambridge Advanced Lerner's Dictionary*(Cambridge : Cambridge University Press, 2008), p. 979

২১৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৩-৩৯৫

২১৭. আবুল হাসান আহমদ ফারিস জাকারিয়া, *মু'জামু মাকাই' আল-লুগাত*(বৈরুত : মাকতাবাতু দারুল ফিকর, ১৯৭৯), পৃ. ৩৬২

২১৮. ড. আবদুল হালিম আভিস, *আল-হুদুদ ফিশ শারি'আতিল ইসলামিয়্যাহ*(বাগদাদ : দারু মাতবা' আল-শায়ার, ১৯৯৫), পৃ. ১২

২১৯. শাইখ কামালুদ্দিন ইবনুল হুমাম, *শারহি ফাতহুল কাদির*(কায়রো : মাতবাআতু মুস্তফা আলবাবি, ১৯৭০), পৃ. ২১০

২২০. শাইখ কাশিম আল-কুনুভি, *আনিসুল ফুকাহা ফি তা'রিফাতিল আলফাজিল মুবতাদি বাইনা ফুকাহা*(জেদ্দা : দারুল ওয়াফা, ১৪০৬ হি.), পৃ. ১৭৩

২২১. মানসুর বিন ইউনুস আল-বাহুতি, *জাদুল মুসতানকা*(তাইফ : মাকতাবাতুস সাইয়িদ আল-মুইয়্যাদ আল-হুসাইনি, ১৩৮৯ হি.), পৃ. ৩০০

২২২. ড. আবদুল কারিম বিন মুহাম্মদ আন-নামলা, *ইসবাতুল উকুবাত বিল কিয়াস*(রিয়াদ : মাকতাবাতুর রুশদ, ২০০১), পৃ. ৭৯

২২৩. ড. আবদুল কারিম বিন মুহাম্মদ আন-নামলা, *ইসবাতুল উকুবাত বিল কিয়াস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

মূল লক্ষ্য এটাই। আর এটা যখন আল্লাহর অধিকার, তখন কোন ব্যক্তি বা সমাজ তা রহিত করতে বা তার দায় থেকে কাউকে অব্যাহতি দিতে পারে না।[২২৪]

আল্লামা সালামত আলী খান বলেন : 'ইসলামি আইনে হদ হল এমন শাস্তি যা নির্দিষ্ট ও আল্লাহর হক।'[২২৫] অপরাধীর শাস্তিকে এ জন্য হদ নামকরণ করা হয় যে, তা পুনরায় করা ও অভ্যস্থ হয়ে পড়া থেকে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে অপরাধ অপরকে তার পথে চলা থেকে বাঁধা প্রদান করে।[২২৬] আর এ জন্যও হদ নামকরণ করা হয় যে, যা বিধানদাতা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যাতে বেশি কিংবা কম করা যাবে না।[২২৭]

'Hudud in Islam is like a gatekeper who obstructs from entering. It expresses the correction and specified by laws on account of right of Allah.'[২২৮] 'ইসলামে হুদুদ হল– প্রবেশ থেকে একজন দারোয়ান হিসেবে বাধা দেয়া, এটা অনুমতি প্রাপ্তকে বিশুদ্ধ করাকে বুঝায় এবং আল্লাহ তা'আলার অধিকারের ক্ষেত্রে আইন দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা।'

হদ নামকরণ এ জন্য যে, যা আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে হুমকি প্রদান করে। এর একটি অপরটি থেকে পার্থক্য করে। এ পর্যায়ে আরবদের প্রবাদ প্রচলিত আছে :

الحدود الشرعي وهو يميز بين الحلال والحرام

'শারি'আতি হুদুদ হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।'[২২৯]

আর এ সকল হুদুদ যার নিকটেও যাওয়া যাবে না। কেননা তা অশ্লীলতা– যা হারাম করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوْهَا 'এটা আল্লাহর হুদুদ, সুতরাং তোমরা এর নিকটে যাবে না।'[২৩০] আর এ হুদুদ এমন যে, যা লজ্ঘন করা যায় না। যেমন উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব ও চারজনের বেশি বিয়ে করার নির্দেশ লজ্ঘন করা যায় না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا 'এটা আল্লাহর হুদুদ, সুতরাং তোমরা তা লজ্ঘন কর না।'[২৩১]

হুদুদ জাতীয় অপরাধের শাস্তির প্রামাণ্য দলিলসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) ধর্মত্যাগের শাস্তি : ইসলামি আইনের পরিভাষায়, ইসলাম ধর্ম থেকে কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করার নাম রিদ্দা বা ধর্মত্যাগ। আর তা নিয়ত, কাজ ও কথা দ্বারা হতে পারে। চাই তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে করুক, আর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে করুক কিংবা বিদ্রোহ করে করুক না কেন। যেমন কেউ স্রষ্টাকে অস্বীকার করল, রসুল সা.-কে মিথ্যা জানল, হারামকে হালাল মনে করল কিংবা হালালকে হারাম জানল ইত্যাদি। ধম্যত্যাগ সবচেয়ে বড় কুফরি এবং এর বিধানও কঠোর। তা জীবনের সকল আমল বিনষ্ট করে দেয়। এটা যে অপরাধ তা পবিত্র কুআন দ্বারা প্রমাণিত। আর এর শাস্তি সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ধর্ম ত্যাগের শাস্তি দুই ধরনের। (১) ইহকালিন শাস্তি ও (২) পরকালিন শাস্তি। ইহকালিন শাস্তি কয়েক প্রকার। যেমন– হত্যা করা, তাওবা না করার শাস্তি, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে শাস্তি, পারিবারিক শাস্তি, উত্তরাধিকার বিনষ্ট হওয়ার শাস্তি ও অভিভাবকত্বের যোগ্যতা নষ্ট হওয়ার শাস্তি।[২৩২]

পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ إِولٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. خٰلِدِيْنَ فِيْهَا.

২২৪. সাইয়িদ সাবিক, অনূ. আকরাম ফারূক, *ফিকহুস সুন্নাহ*(ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৫), খ.২, পৃ. ২৮৮
২২৫. আল্লামা সালামত আলি খান, *ইসলামি ফৌজদারি কানুন*(মুলতান : ইমদাদিয়া লাইব্রেরি, ২০০৫), পৃ. ১০
২২৬. আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল-বা'লি, *আল-মাতলা' আ 'আলা আবওয়াবিল মুকান্না*(বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৪০১ হি.), পৃ. ৩৭০
২২৭. ইবন হাজার আল-আসকালানি, *ফাতহুল বারি*(কায়রো : দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৯৮৭), খ.১২, পৃ. ৫৮
২২৮. Anwar Ahmad Qadri, *Islamic Jurisprudence in the Modern World*(Lahore : Taj Co., 1997), p. 290
২২৯. আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দিন আল-বা'লি, *আল-মাতলা' আ 'আলা আবওয়াবিল মুকান্না*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০
২৩০. আল-কুরআন, ২ : ১৮৭
২৩১. আল-কুরআন, ২ : ২২৯
২৩২. আল্লামা বাদরুদ্দিন আল-আইনি, *উমদাতুল কারি ফি শারহি সহিহিল বুখারি*(বৈরুত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়া, ২০০১), খ.২৩, পৃ. ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

‘এবং যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে এবং কাফিররূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদেরকে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই অভিশাপ দেয়। সেখানে তারা স্থায়ী হবে।’[২৩৩] মহান আল্লাহ আরো বলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِه إِلاَّ مَنْ إِكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ ج وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

‘কেউ তার ইমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরির জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরির জন্য বাধ্য করা হয়; কিন্তু তার হৃদয় ইমানে অবিচলিত।’[২৩৪]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِه فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ ج وَاُولٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.

‘(হে মু’মিনগণ!) তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার ধর্ম ত্যাগ করবে, সে কাফির অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হোক। ইহ ও পরকালে তাদের সকল কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে, তারা জাহান্নামী হবে– সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।’[২৩৫]

উক্ত আয়াত তিনটি ধর্ম ত্যাগের শাস্তি সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। পরকালিন জীবনে তার সকল কর্ম বিফলে যাবে। ফলশ্রুতিতে সে জাহান্নামী হবে।

(খ) রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও বিদ্রোহের শাস্তি : ইসলামি আইনের পরিভাষায়, যার ইমামত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যায় কর্ম ছাড়াই তার আনুগত্য অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অস্বীকার করাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বা বিদ্রোহ বলে। বিদ্রোহ করা হারাম। রসুল সা. বলেছেন, من حمل علينا السلاح فليس منا ‘যে আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।’[২৩৬]

বিদ্রোহ সম্পর্কিত বিধান হল– যদি বিদ্রোহীদের কোন দূর্গ না থাকে তবে রাষ্ট্রপ্রধান তাদের পাকড়াও করবে এবং আনুগত্য প্রকাশ না করা পর্যন্ত তাদেরকে কারাগারে বন্দি করে রাখবে। আর যদি সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এমন প্রস্তুতি নিয়ে যে, তাদের দূর্গ ও অস্ত্র রয়েছে, তখন রাষ্ট্রপ্রধান তাদেরকে আনুগত্য করার জন্য আহ্বান জানাবে। যদি তারা আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রপক্ষের জনগণ তাদেরকে পরাভূত না করা পর্যন্ত তাদের সাথে সশস্ত্র যুদ্ধ করবে। তাদের নেতা, গোয়েন্দা ইত্যাদি সব হত্যা করা বৈধ। তবে রাষ্ট্রপক্ষ প্রথমেই তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না যতক্ষণ না তারা যুদ্ধ শুরু করে। কারণ, তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার অর্থ হল, রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধ করা। এসব আইনের প্রমাণ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰهُمَا عَلَى الأُخْرٰى فَقَاتِلُوْا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِ اللهِ ج فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ط إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

‘মু’মিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে, যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে– যদি তারা ফিরে আসে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে ফয়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচাকারীদেরকে ভালবাসেন। মু’মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।’[২৩৭]

---

২৩৩. আল-কুরআন, ২ : ১৬১-১৬২
২৩৪. আল-কুরআন, ১৬ : ১০৬
২৩৫. আল-কুরআন, ২ : ২১৭
২৩৬. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*(কায়রো : দারুল হাদিস, ১৩৭৫ হি.), খ.৭, পৃ. ১৭৩
২৩৭. আল-কুরআন, ৪৯ : ৯-১০

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপ্রধান বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও ঘোড়া ব্যবহার করে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে। বিদ্রোহীদের বিদ্রোহ দমন না হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ আটকে রাখবে। বিদ্রোহ দমন হলে তা ফেরত দিবে।[২৩৮] বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ চলাকালীন যেসব সম্পদ ও জীবন বিনষ্ট করে, তার কোন জরিমানা দিতে হবে না। ইমাম যুহরি এ ব্যাপারে বলেন, বিদ্রোহ চলাকালীন যারা হারাম যৌন সম্ভোগকে হালাল করেছে, তাদের উপর যিনার হদ কায়িম করা যাবে না। যারা হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তাদের হত্যা করা যাবে না। যারা সম্পদ ধ্বংস করেছে, তাদের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা যাবে না। কারণ তারা এ সবই করেছে, কুরআনকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে তার আলোকে বিদ্রোহ করার ফলে।[২৩৯]

তবে ইসলামি আইনজ্ঞগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, ন্যায়পন্থী বা সরকারপন্থী যারা বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে হত্যাকান্ড চালিয়েছে, তার জন্য পাপ হবে না এবং খুনের কোন কাফফারা আদায় করতে হবে না। তারাও যেসব সম্পদ ধ্বংস করেছে, সেজন্য জরিমানা দিতে হবে না। কারণ যারা ন্যায়পন্থী তারা তো ঐ সব মানুষকে হত্যা করেছে যাদের হত্যা করা হালাল ছিল। তারা তো যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছে। সম্পদের ব্যাপারেও একই বক্তব্য। যেখানে জীবনের জরিমানার প্রয়োজন পড়েনি, সেখানে সম্পদের জরিমানার প্রয়োজন হবে না এটাই তো স্বাভাবিক।

তবে, বিদ্রোহীদের দূর্গ নির্মাণের পূর্বে এবং তাদের পরাজিত হওয়ার পর যেসব সম্পদ ও জীবন বিনষ্ট হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ সে সময় তারা ইসলামি রাষ্ট্রে অবস্থান করছিল। তখন বিদ্রোহ বিরাজমান ছিল না, তাই তাদের প্রত্যেকের জীবন ও সম্পদ পবিত্র বলে গণ্য হবে এবং উভয়পক্ষের জরিমানা দিতে হবে।

(গ) সন্ত্রাস বা ডাকাতির শাস্তি : ইসলামি আইনের পরিভাষায়, সম্পদ দখলের উদ্দেশ্যে এমন ত্রাস সৃষ্টি করা সাধারণভাবে যার সহায়তা করা সম্ভব হয় না, তাকে সন্ত্রাস, ডাকাতি, ছিনতাই বা জবর দখল বলে।[২৪০] মানুষের জানমাল আল্লাহর দেয়া পবিত্র সম্পদ। এ সম্পদ রক্ষা করা প্রতিটা নাগরিকের দায়িত্ব। কেউ অন্যায়ভাবে এ পবিত্র সম্পদের ক্ষতি সাধন করলে সে আল্লাহর প্রতি অপরাধ করল। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে ডাকাতি বলে। ডাকাতি বড় ধরনের অন্যায়। এটা সমাজের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। তাই ইসলাম এহেন কর্মকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে এর শাস্তি বিধান করেছে। কুরআনের আয়াত দ্বারা এর শাস্তি প্রমাণিত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّمَا جَزٰؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম পরিচালনা করে বেড়ায় এটাই তাদের শাস্তি যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। পৃথিবীতে এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।'[২৪১]

উক্ত আয়াতে চারটি শাস্তির কথা 'অথবা' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে। সন্ত্রাস ও ডাকাতি সংক্রান্ত অপরাধের জন্য ইসলামি আইনে চার প্রকার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তাহলো : (১) হত্যা করা হবে; (২) শূলিবিদ্ধ করা হবে; (৩) দুই হাত ও দুই পা কর্তন করা হবে অথবা (৪) নির্বাসন দেয়া হবে।

---

২৩৮. আল-কাসানি, *কিতাবু বাদা'ই আস-সানা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪০

২৩৯. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৬৯

২৪০. ইবন ফারহুন, *তাবসিরাতুল হুক্কাম ফি উসুলিল আকদিয়্যাতি ওয়া মানাহিজুল আহকাম*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩), খ.২, পৃ. ২০৩-২০৪

২৪১. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি আইনজ্ঞদের মধ্যে এ বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব শাস্তির কথা বলেছেন তা কি ডাকাতির ক্ষেত্রে বর্ণিতগুলোর যে কোন একটা শাস্তি প্রযোজ্য হবে নাকি ডাকাতির ধরন ও প্রকার বুঝে বড় আকারের কিংবা ছোট আকারের শাস্তি দেয়া হবে। হানাফি, শাফি'ই ও মালিকি মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, ডাকাতির ধরন বুঝে ধারাবাহিকভাবে আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রদান করা হবে। কিন্তু ধারাবাহিকতা কি হবে সে ব্যাপারে হানাফিগণ বলেন, যদি ডাকাত ত্রাসের মাধ্যমে শুধু সম্পদ নিয়ে নেয়, তবে তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা হবে। আর যদি হত্যা করে, তবে হত্যা করা হবে। ডাকাত যদি সম্পদও নিয়ে নেয় আর হত্যাযজ্ঞও চালায়, তবে রাষ্ট্রপ্রধান তার ইচ্ছা অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। তিনি ইচ্ছা করলে তার হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করবেন অতঃপর তাকে হত্যা করবেন অথবা শূলে চড়িয়ে হত্যা করবেন। আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন, হাত-পা না কেটে হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। আর যদি ডাকাত সম্পদও না নেয় আর হত্যাও না করে, শুধুমাত্র ভয়ভীতি প্রদর্শন করে, তবে নির্বাসনে দিবেন। আর তা হলো কারাগারে বন্দি করা ও তা'যির হিসেবে শাস্তি দেয়া।[২৪২]

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন যে, ইমাম ডাকাতকে হত্যা করবেন কিংবা শূলে চড়াবেন। কিন্তু হাত-পা কর্তন করবেন না। কারণ একটা অপরাধের জন্য দুইটা হদ হতে পারে না। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পক্ষ থেকে এর জবাবে বলা হয় যে, এখানে দুইটা শাস্তিই একটা শাস্তি হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

শাফি'ই ও হাম্বলি মাযহাবের আইনজ্ঞদের মতে, যদি শুধু সম্পদ নিয়ে থাকে, তবে বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কর্তন করা হবে। আর যদি এমন হয় যে, সম্পদ নেয়নি, তবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, তাহলে হত্যা করা হবে; কিন্তু শূলবিদ্ধ করা হবে না। আর যদি হত্যা করে থাকে এবং সম্পদ নিয়ে থাকে, তবে হত্যা করা হবে এবং শূলে চড়ানো হবে। আর যদি ভয়-ভীতি দেখিয়ে থাকে, তবে নির্বাসনে দিতে হবে।[২৪৩]

ইমাম মালিকের মতে, ডাকাতির শাস্তি বিধানটা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রপ্রধানের ইজতিহাদ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি জনগণের কল্যাণে এবং ফিতনা-ফাসাদ দূরীকরণে ডাকাতির অপরাধের ধরন ও প্রকার বুঝে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিসমূহের যেটাকে কল্যাণকর মনে করেন, সেটাই কার্যকর করবেন। সেটা যেন ইমামের প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

যদি ডাকাত শুধুমাত্র ভয়ভীতি দেখিয়ে থাকে, তবে রাষ্ট্রপ্রধান নিচের বর্ণনা অনুযায়ী কুরআনে উল্লিখিত চারটা শাস্তির যে কোন একটা প্রদান করবেন–

১. যদি ডাকাতের মতামত, প্রভাব ও পরিচালনার বিষয়টা সংশ্লিষ্ট থাকে, তবে তাকে হত্যা বা শূলিবিদ্ধ করা হবে। কারণ, তার শুধু হাত ও পা কর্তন করলে ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। আর যদি তার পক্ষ থেকে পরিচালনা বা অভিমত দেয়ার মত বিষয় জড়িত না থাকে, তবে তার হাত এবং পাগুলো বিপরীত দিক থেকে কর্তন করা হবে। আর যদি উল্লিখিত কোন গুণই তার মধ্যে না পাওয়া যায়, তবে তাকে প্রহার করা হবে এবং নির্বাসনে পাঠানো হবে।
২. আর যদি ডাকাত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে থাকে, তবে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে হাত-পা কর্তনের শাস্তি ও নির্বাসনের শাস্তির মধ্যে একটাকে গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। হত্যা বা শূলিবিদ্ধকরণের যে কোন একটা গ্রহণ করতে পারেন।[২৪৪]
৩. আর যদি ডাকাত সম্পদ নিয়ে থাকে, তবে হত্যা ব্যতীত বাকি তিনটা শাস্তির যে কোন একটা শাস্তি রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন করতে পারবেন।

(ঘ) মদ্যপান ও জুয়ার শাস্তি : আল্লাহ মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাকে বিবেক দিয়েছেন। এ বিবেকের রক্ষণাবেক্ষণ প্রতিটা নাগরিকের জন্য জরুরি। কেউ যদি মদ পানের মাধ্যমে তার এ বিবেকের রক্ষণাবেক্ষণের

---

২৪২. আল-কাসানি, *কিতাবু বাদা'ই আস-সানা'ই*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৯৩

২৪৩. ইবন ইসহাক আশ-শিরাযি, *আল-মুহাযযাব ফি ফিকহিল ইমামিশ শাফি'ই*(দামিশক : দারুল কলম, ১৯৯২), খ.৫, পৃ. ৪৪৯-৪৫১

২৪৪. আদ-দাসুকি, *হাশিয়াতুদ দাসুকি*(বৈরুত : দারু ইহয়াউল কুতুবিল আরাবিয়া, তা.বি.), খ.৪, পৃ. ৩৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে ত্রুটি করে তাহলে সে আল্লাহর প্রতি অপরাধ করল। আল্লাহ তার এ অপরাধের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মদ পান ও জুয়া সামাজিক অনাচার ও অপরাধের মধ্যে অন্যতম। এ দুটো অন্যায় থেকে আরও বহুবিধ অন্যায় মানব সমাজে বিস্তার লাভ করে। এ জন্য ইসলাম এ দুটো মন্দ কর্মকে চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মদপানের অনিষ্টতা ও নিষিদ্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

‘হে মু’মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?’[২৪৫]

আর মদের শাস্তির পরিমাণ সম্পর্কে মহানবী সা.-এর হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بنعلين أربعين.

‘হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. থেকে বর্ণিত যে, রসুল সা. মদ পানের জন্য উভয় জুতা দিয়ে চল্লিশ আঘাতের দ্বারা হদ কায়িম করেন। ’[২৪৬] অন্য হাদিসে রয়েছে,

إن عمر رضي الله عنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفترين ثمانون.

‘হযরত উমর রা. এক ব্যক্তি মদ পান করায় তার মদ পানের শাস্তি সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করলেন, তখন হযরত আলি ইবন আবি তালিব রা. বললেন : আমাদের মত হল তাকে আশি বেত্রাঘাত করতে হবে। কেননা মদ পান করলে বেহুশ হয়ে যায়। আর বেহুশ হলে অশ্লীল বাক্য বলে, আর অশ্লীল বাক্যারোপ কারীদের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত।’[২৪৭]

হানাফি মাযহাবের আইনজ্ঞগণ হারাম পানীয়কে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : (১) মদ বা মদজাতীয় পানীয় পান করা ও (২) নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করে নেশাগ্রস্ত হওয়া। তাদের এ পার্থক্য অনুযায়ী নেশা হোক বা না হোক, মদ পান করলেই মদপানের হদ কায়িম করতে হবে। কারণ রসুল সা. বলেছেন, من شرب الخمر فاجلدوه ‘যে ব্যক্তি মদপান করবে তাকে কশাঘাত কর।’[২৪৮]

হানাফিদের নিকট নেশার অর্থ হল, মদ ছাড়া অন্যান্য যেসব পানীয় পান করলে নেশাগ্রস্ত হয়। আর সমস্ত আলিমগণ এভাবে দু’ভাগে ভাগ না করে বলেন, যেসব দ্রব্য বেশি পরিমাণ পান করলে বা খেলে নেশাগ্রস্ত হয়, তা কম পরিমাণ পান করাও হারাম। তা যা দিয়েই তৈরি হোক না কেন, আঙুর দিয়ে তৈরি মদের হুকুম সবগুলোর জন্য প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি তা পান করবে, তার উপর হদ ওয়াজিব হবে। রসুল সা. বলেছেন, كل مسكر خمر وكل خمر حرام ‘যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই মদ। আর যা নেশা সৃষ্টি করে, তা-ই হারাম।’[২৪৯]

মদ পানের শাস্তির পরিমাণ : অধিকাংশ ইসলামি আইনজ্ঞের মতে, মদ্যপান ও নেশা করার শাস্তি হল ৮০ টা বেত্রাঘাত। রসুল সা. বলেছেন :

إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد الْمفتري ثمانون

‘যখন কেউ মদ পান করে তখনই সে নেশাগ্রস্ত হয়। যখনই নেশাগ্রস্ত হয় তখনই আবোল তাবোল বলে, যখনই আবোল তাবোল বলে তখন সে অপবাদ দেয়। আর অপবাদকারীর শাস্তি হল ৮০ টা বেত্রাঘাত।’[২৫০]

---

২৪৫. আল-কুরআন, ৫ : ৯০-৯১

২৪৬. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৫, হাদিস নং ১৪৪৮

২৪৭. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ১৪

২৪৮. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৮৫, হাদিস নং ১৪৫০

২৪৯. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫), খ.৫, পৃ. ৪১, হাদিস নং ৫০৪৯

২৫০. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

আর শাফি'ইদের মতে, নেশাকারীর শাস্তি হল ৪০টা বেত্রাঘাত। কারণ রসুল সা. মূলত নেশার জন্য কোন নির্ধারিত পরিমাণ শাস্তি উল্লেখ করেননি। তবে হযরত আলি রা. থেকে বর্ণিত আছে, রসুল সা. মদ্যপানের জন্য জুতা ও খেজুরের ছড়ি দিয়ে ৪০টা আঘাত করতেন।[২৫১]

হযরত আলি রা. বলেন, রসুল সা. মদ্যপানকারীকে ৪০টা বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বকর রা.ও ৪০টা বেত্রাঘাত দিয়েছেন, হযরত উমর রা. ৮০টা বেত্রাঘাত দিয়েছেন; সবগুলোই সুন্নাত। তবে এসব আলোচনা থেকে বলা যায় যে, যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে কাউকে অপবাদ দেয়, তবে তাকে ৮০টা বেত্রাঘাত করতে হবে। আর যদি তা না করে, তবে তাকে ৪০টা বেত্রাঘাত করতে হবে।

(ঙ) চুরি বা চৌর্যবৃত্তির শাস্তি : চুরি হল অন্যের সম্পদ গোপনে নিয়ে নেয়া। যদি দিনের বেলা চুরির ঘটনা ঘটে, তবে চুরির কাজটি শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই গোপনে হতে হবে। আর যদি রাতের বেলা চুরি হয়, তবে শুরুটা গোপনে হলেই কাজটি চুরি বলে অভিহিত করা হবে। যদিও শেষটা হয়তবা গোপন না থাকে। চুরি বড় ধরনের অপরাধ। এটা সমাজের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে। তাই ইসলাম এহেন কর্মকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে এর শাস্তি বিধান করেছে। কুরআনের আয়াত দ্বারা এর শাস্তি প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ط وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ط إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক দণ্ড' আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। কিন্তু সীমালংঘন করার পর কেউ তাওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে অবশ্যই আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন; আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৫২]

আর রসুল সা. বলেছেন :

إنما هلك من كان قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه.

'তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত ছিল তারা ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল এ কারণে যে, যখন তাদের কোন ভদ্রলোক চুরি করত তবে তারা তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন দুর্বল লোক চুরি করত তখন তারা তার হাত কেটে দিত।'[২৫৩]

তাই চুরি সাব্যস্ত হলে তার অপরাধের শাস্তি হলো হাত কর্তন করা। আর হদ ওয়াজিব না হলে জরিমানা আদায় করতে হবে।

(চ) যিনা-ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি : কোন মানুষকে অন্যের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা বলা বা কোন মুসলিমের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলে অপবাদ দেয়াকে কাযফ তথা যিনা-ব্যভিচারের অপবাদ বলে। সচ্চরিত্রা নারীর উপর যিনার অপবাধের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার লঙ্ঘন করা হয়। এর দ্বারা আল্লাহ ও বান্দার প্রতি অপরাধ করা হয়। কাজেই যার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল, সে যদি ক্ষমা করেও দেয়, তাহলেও এর শাস্তি রহিত হবে না। কারণ তাতে আল্লাহর অধিকার বাকি থেকে যায়। সুতরাং আল্লাহর প্রতি অপরাধ করার কারণে তাকে শাস্তি পেতে হবে। যিনা-ব্যাভিচারের অপবাদের শাস্তি আল্লাহ তা'আলার বাণী দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلاَ تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ج وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ. إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا ج فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

'যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। তবে যদি এর পর তারা তাওবা করে ও নিজেদেরকে সংশোধন করে, আল্লাহ তো অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৫৪]

---

২৫১. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৩৮
২৫২. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮-৩৯
২৫৩. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১৩১ ও ১৩৭
২৫৪. আল-কুরআন, ২৪ : ৪-৫

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং কেউ যদি কারো ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, তবে তাকে ৮০ টা বেত্রাঘাত শাস্তি হিসেবে প্রদান করতে হবে।

(ছ) যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি : বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে যিনা ও ব্যাভিচার বলে। সমাজ জীবনে এটাই এক জঘন্য কদর্য পাপাচার। এটা মানুষকে পশুতে পরিণত করে। এর ফলে মানব সমাজে আল্লাহর গযব নেমে আসে। এটা এতটাই জঘন্য যে, এর আশপাশেও যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى إِنَّه كَانَ فَاحِشَةًط وَّسَاءَ سَبِيْلاً 'আর যিনার নিকটবর্তীও হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।'[২৫৫]

অবিবাহিত ব্যক্তি যিনায় লিপ্ত হলে সে তার এ কাজের দ্বারা আল্লাহর আইন লঙ্ঘন করার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি অপরাধ করল। এ ধরনের কর্ম সংঘটিত হলে ইসলামি বিধানে অবিবাহিতদের জন্য দু'ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে– (ক) একশত বেত্রাঘাত ও (খ) নির্বাসন। আর বিবাহিত পুরুষ বা নারী যিনা করলে তার বিধান হল পাথর মেরে হত্যা করা। এ সকল অন্যায়ের মাধ্যমে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি অপরাধ করে থাকে। আর তাই এ অপরাধের শাস্তি ক্ষমাযোগ্য নয়। এ শাস্তি এ জন্যই যে যাতে সমাজে এ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হতে না পারে। যিনার শাস্তি কুরআনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন :

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍص وَّ لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِىْ دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِج وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী– তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে। আল্লাহর বিদান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটা দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[২৫৬]

ইসলামি আইনে যিনা-ব্যভিচারের জন্য অবস্থাভেদে তিন ধরনের শাস্তির যে কোন একটা বা একাধিক নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হল : (১) কশাঘাত করা; (২) নির্বাসন দেয়া; (৩) কংকর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। ব্যভিচারী দুই ধরনের। যথা : (১) অবিবাহিত (২) বিবাহিত।

অবিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি : এ ব্যাপারে সকল ইসলামি আইনজ্ঞগণ একমত যে, যদি কোন অবিবাহিত নারী বা পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা স্বীকৃতি বা সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তবে ইসলামি আইনে তার শাস্তি হল ১০০ কশাঘাত।[২৫৭]

অবিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর জন্য ১০০ কশাঘাত ব্যতীত আরো কোন শাস্তি দেয়া হবে কিনা সে ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

এক. তাদের ১০০ কশাঘাতের অতিরিক্ত কোন শাস্তি দেয়া যাবে না। হানাফি মাযহাবের আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। তারা বলেন, ১০০ কশাঘাত কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত। এর বাইরে কোন শাস্তির বিধান থাকলে তা হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত, যা কুরআনের বিধানের অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে। এ ধরনের যা কিছু অতিরিক্ত হিসেবে আসবে, তা মানসুখ হবে। তাই তার উপর আমল করা যাবে না।

দুই. তাদেরকে ১০০ কশাঘাতের পাশাপাশি এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। চাই সে পুরুষ হোক বা মহিলা হোক। শাফি'ই ও হাম্বলি মাযহাবের আলিমগণ এ মত পোষণ করেন। তারা তাদের মতের সপক্ষে একটা হাদিস উল্লেখ করেন। যেখানে রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন :

خذوا عني قد جعل لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد ماة الرجم.

---

২৫৫. আল-কুরআন, ১৭ : ৩২
২৫৬. আল-কুরআন, ২৪ : ২
২৫৭. দ্র. আল-কুরআন, ২৪ : ২

Dhaka University Institutional Repository

'তোমরা আমার থেকে বিধান গ্রহণ কর। আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বিধান ফয়সালা করে দিয়েছেন। অবিবাহিত পুরুষের সাথে অবিবাহিতা নারী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ১০০ কশাঘাত এবং এক বছর নির্বাসন। আর বিবাহিতা নারীর সাথে বিবাহিত পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ১০০ কশাঘাত এবং প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা।'[২৫৮]

তিন. ১০০ কশাঘাতের পাশাপাশি পুরুষ ব্যভিচারীকে এক বছর নির্বাসন দিতে হবে। অর্থাৎ বন্দি করে রাখতে হবে। আর মহিলাকে শুধু ১০০ বশাঘাত করতে হবে। তাকে নির্বাসনে দেয়া যাবে না। কারণ তাকে নির্বাসনে দিলে পুনরায় তার ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মালিকি মাযহাবের আলিমগণ এ মত পোষণ করেন।

বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি : বিবাহিত পুরুষ হোক বা নারী সে যিনা করলে তার শাস্তি হলো রজম তথা প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যা করা। এ শাস্তির বর্ণনা রসুল সা. এর কথা ও কাজ উভয় দিক থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। হযরত উবাদাহ ইবন সামিত রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে, বিবাহিতের শাস্তি বেত্রাঘাত ও রজম।[২৫৯] অন্য এক বর্ণনায় আছে, মালিকের স্ত্রীর সাথে জনৈক শ্রমিকের যিনার ঘটনায় রসুল সা. হযরত উনাইস আসলামি রা. কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি মেয়েটি স্বীকার করে, তবে তাকে রজম কর। মেয়েটি যিনার কথা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।[২৬০] তাছাড়া রসুল সা. নিজেই যে কয়েকটি রজমের দণ্ড প্রদান করেছেন, তাও বিভিন্ন সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

অতএব উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, বিবাহিত নারী-পুরুষ যিনা করলে তার শাস্তি রজম; কিন্তু তার পূর্বে তাকে বেত্রাঘাত করতে হবে কি না– তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে কিছুটা মতভেদ আছে। তবে চার মাযহাবের ইমামগণের সর্বস্বীকৃত মত হলো– বিবাহিতদেরকে শুধু রজমই করতে হবে; বেত্রাঘাত করতে হবে না। রসুল সা. ও খুলাফা রাশিদুনের যুগে বিবাহিতদের যিনার কিছু সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোনো ঘটনায় রসুল সা. ও খুলাফা রাশিদুন রজমের পূর্বে বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন– এ মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ থেকে স্পষ্ট যে, বিবাহিতদের শাস্তি রজমের উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(২) কিসাস : কিসাস শব্দের অর্থ একই রূপ কাজ করা, পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলা। শারি'আতের পরিভাষায় কিসাস হলো অপরাধীর সাথে তার বাড়াবাড়ির অনুরূপ আচরণ করা।[২৬১] অর্থাৎ অপরাধী কোনো ব্যক্তির যেই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করবে তারও সে-ই পরিমাণ দৈহিক ক্ষতি সাধন করাই হচ্ছে কিসাস। অপরাধী তাকে হত্যা করলে প্রতিশোধ স্বরূপ সেও মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হবে এবং যখম করলে প্রতিশোধ স্বরূপ তাকেও যখম করা হবে। উল্লেখ্য যে, কিসাসের শাস্তিও হুদুদের মতোই কুরআন মাজিদে নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, হুদুদকে আল্লাহর অধিকার বা জনস্বার্থ হিসেবে বাস্তবায়ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা করলেও তা ক্ষমা হবে না এবং হদ অকার্যকর হবে না। কিন্তু কিসাসের ব্যাপারটা এর ব্যতিক্রম। কিসাসে বান্দার অধিকার প্রবল হওয়ার কারণে হত্যা প্রমাণিত হওয়ার পর হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়া হয়। সে ইচ্ছে করলে কিসাস হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ড দাবি করতে পারে; ক্ষমাও করে দিতে পারে।[২৬২] নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে ছেড়ে দিলে হত্যাকারীর সাহস বেড়ে যাবে কিংবা ব্যাপক হারে হত্যাকাণ্ডও শুরু হয়ে যাবে– এরূপ আশঙ্কা করা ঠিক নয়। কেননা, হত্যাকারীর প্রাণ সংহার করা ছিল নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য অধিকার। তারা তা ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু অপরাপর লোকদের প্রাণরক্ষা করা দেশের সরকারের দায়িত্ব। তাই ইসলামি আইন অনুযায়ী, সরকার এ দায়িত্ব পালনের জন্য হত্যাকারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অন্য কোনো শাস্তি দিয়ে এ বিপদাশঙ্কা রোধ করতে পারে। যখমের ব্যাপরটাও একই।

২৫৮. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২১৬, হাদিস নং ৪২৬৭
২৫৯. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২১৭, হাদিস নং ৪২৬৯
২৬০. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ২২৭, হাদিস নং ৪২৮৬
২৬১. আব্দুল্লাহ আল-রুকবান, *আল-কিসাস ফিন নাফস*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪০০হি.), পৃ. ১৩
২৬২. মজলিসুল ইদারাহ, *আল-মাউসুআতিল ফিকহিয়্যাহ*(কুয়েত : ওয়াকফ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩), খ.১২, পৃ. ২৫৪-২৫৭; খ.১৭, পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

(৩) তা'যির : তা'যির শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নিন্দা করা, তিরস্কার করা, সাহায্য করা, শক্তি যোগানো, সম্মান করা, বারণ করা, ফিরিয়ে রাখা, প্রচণ্ডভাবে প্রহার করা ও শিক্ষা দেয়া।[২৬৩] শারি'আতের পরিভাষায় তা'যির হলো : هو عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا. 'আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শারি'আত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা কাফফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তা'যির বলে।'[২৬৪]
আল-মাওয়ার্দি বলেন, تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود অর্থাৎ হদ্দ নির্ধারণ করা হয়নি– এ ধরনের অপরাধসমূহের শাস্তিকে তা'যির বলে।[২৬৫]

স্থান, কাল-অবস্থার নিরিখে কল্যাণের দাবি অনুপাতে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হয়ে থাকে। সুতরাং অপরাধ, অপরাধী, সময় ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক যতটুকু ও যেরূপ শাস্তি দান করা যৌক্তিক মনে করবেন, ততটুকুই দিবেন। ইসলামি সরকার যদি বিজ্ঞ ও মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শক্রমে শারি'আতের রীতিনীতি বিবেচনা করে এ সব অপরাধের শাস্তির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে বিচারকদেরকে তা মেনে চলতে বাধ্য করে, তবে তাও জায়িয। যেমন বর্তমান সময়ে এসেম্বলির মাধ্যমে দণ্ডবিধি নির্ধারণ করা হয় এবং বিচারক ও জজগণ নির্ধারিত দণ্ডবিধির অধীনে মামলা-মোকদ্দমায় রায় দেন। হুদুদ ও কিসাস জাতীয় কয়েকটি অপরাধ ছাড়া অবশিষ্ট সকল অপরাধই রা'যিরি অপরাধ।[২৬৬] তা'যিরি শাস্তি নানাভাবে হতে পারে। মারধর, বয়কট, হত্যা, আটক, নির্বাসন, শূল বা ফাঁসি, জরিমানা, জামানত ও চাকুরি থেকে বরখাস্ত ইত্যাদি।

ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তব ব্যবস্থা : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্র ও পরিসীমা অত্যন্ত ব্যাপক। সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা মানব জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কেবল দুঃস্থ, অসহায় ও অক্ষম লোকদের নিরাপত্তা বিধানই নয়; আকস্মিক বিপদ থেকে সক্ষম ও সচ্ছল লোকদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করাও সমাজের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য। আজকের বিশ্বে 'সামাজিক নিরাপত্তার যে ধারণা বিদ্যমান এর সাথে মানবতার ধর্ম ইসলাম সর্বপ্রথম পৃথিবীবাসীকে পরিচয় করিয়েছে। যথার্থ অর্থে মানব ইতিহাসে মহানবি সা.-এর প্রতিষ্ঠিত মদিনা কেন্দ্রিক রাষ্ট্রেই সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর মানুষ দীর্ঘকাল পর্যন্ত এর সুফল নানাভাবে ভোগ করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতনের সাথে সাথে ইসলামি অর্থনীতির একটি মৌলিক বিষয় সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা মুসলিমদের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে। কালক্রমে মুসলিমরা সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে হাত বাড়িয়েছে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হয়েছে। একটি সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করতে গিয়ে তারা হাজারও সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণার মূল লক্ষ্য তাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শ স্মরণ করিয়ে দেয়া; যেন তারা ইসলাম ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাকে পূর্বের ন্যায় বাস্তবায়ন করে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও কল্যাণমূলক সমাজ গড়ে তুলতে পারে। পাশাপাশি তথাকথিত আধুনিক বিশ্ব যারা নিজেদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্মদাতা বলে দাবি করে তাদেরকে দেখিয়ে দেয়া যে, তাদের এ ব্যবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার কয়েকশত বছর পূর্বেই ইসলাম এ ধারণার জন্ম দিয়েছিল এবং ইসলামের সোনালি যুগের মহান খলিফাগণ তাদের স্ব স্ব রাষ্ট্রে এর বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

ইসলামে রিযকের নিরাপত্তা বিধান : আল্লাহ তা'আলা যেদিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন সেদিন থেকেই মানুষ রিযকের তালাশে কঠোর পরিশ্রম করা শুরু করেছে। আর আল্লাহ তা'আলা মানুষের অতি প্রয়োজনীয়

---

২৬৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯২
২৬৪. মজলিসুল ইদারাহ, *আল-মাউসুআতিল ফিকহিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.১২, পৃ. ২৫৭
২৬৫. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ২৯৩
২৬৬. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়াবলী যমিনের মধ্যে লুকায়িত রেখেছেন যেগুলো ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন,

إِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرٰى. وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحٰى

'তোমার এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না রোদ্রক্লিষ্টও হবে না।'[২৬৭] এ আয়াতে রয়েছে মানুষের খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান ও বস্ত্রের কথা যা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিবেচিত। এগুলো ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে পার্থিব জীবনের উত্তম বিষয়াবলী রিযক হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যেহেতু তিনি জানেন যে, মানুষ তার সীমাবদ্ধ জ্ঞানের কারণে আল্লাহর যাবতীয় নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী অবগত হতে পারবে না; সেহেতু তিনি মানবতার জন্য সুসংবাদদানকারী এবং ভীতিপ্রদর্শনকারী রসুলগণকে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَإِنْ مِّنْ اِمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ 'এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।'[২৬৮] এ রসুলগণ মানুষকে হালাল-হারাম শিক্ষা দিয়েছেন। মানব সমাজ তাদের মাধ্যমেই তাদের জন্য কোনটা উপকারী এবং কোনটা ক্ষতিকর তা জানতে পেরেছে। নবি-রসুলগণ মানবতাকে এ কথাও শিক্ষা দিয়েছেন যে, সমস্ত বিশ্বজগত একক আল্লাহর। তিনি এর একচ্ছত্র মালিক। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

إِنْ كُلُّ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ اٰتِى الرَّحْمٰنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصٰهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا.

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে দয়াময়ের নিকট বান্দারূপে উপস্থিত হবে না। তিনি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি তাদেরকে বিশেষভাবে গণনা করেছেন এবং কিয়ামত দিবসে তাদের সকলেই তাঁর নিকট আসবে একাকী অবস্থায়।'[২৬৯]

অতএব, বুঝা যাচ্ছে সমস্ত সৃষ্টিজগত আল্লাহর অনুগত, সমস্ত রাজত্ব আল্লাহর, সকল মানুষ তাঁর গোলাম এবং বিধি-বিধান দেয়ার একমাত্র অধিকার তিনিই সংরক্ষণ করেন। সুতরাং আমাদের বুঝা উচিত যে, আমাদের সুস্থতা আমাদের ধন-সম্পদ সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার নি'আমত বা অনুগ্রহ। আর মানুষের স্বভাব হলো যেমনটি আল্লাহ বলছেন, كَلاَّ إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغٰى. أَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى 'বস্তুত মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।'[২৭০]

প্রত্যেক মুসলিমের জানা উচিত যে, সে এ সকল নি'আমতরাজির তত্ত্বাবধায়ক। সে কোনোটির মালিক নয়। সকল কিছুর মালিক আল্লাহ। কুরআন মাজিদে ঘোষণা করা হয়েছে, اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।'[২৭১]

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সম্পদ ও সব জিনিসের মালিক আল্লাহ। মানুষের দায়িত্ব হলো আল্লাহর দেয়া সম্পদ থেকে ব্যয় করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করা। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে কোথা থেকে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ব্যাপারে নিম্নলিখিত কর্তব্যসমূহ মেনে চলতে হবে :

(১) সম্পদের উৎস বৈধ হতে হবে। অতএব সুদের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা যাবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'[২৭২]
চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা নিষিদ্ধ। যদি উপার্জনকারী চোর হয় তাহলে তার হাত কাটা হবে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا 'পুরুষ চোর

---

২৬৭. আল-কুরআন, ২০ : ১১৮-১১৯
২৬৮. আল-কুরআন, ৩৫ : ২৪
২৬৯. আল-কুরআন, ১৯ : ৯৩-৯৫
২৭০. আল-কুরআন, ৯৬ : ৬-৭
২৭১. আল-কুরআন, ৫৭ : ৭
২৭২. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর।'[২৭৩] যদিও চোররা সংঘবদ্ধ কোনো চক্র হয়। এতদ্বিষয়ে মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন,

إِنَّمَا جَزَؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ.

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।'[২৭৪] অনুরূপভাবে ব্যবসায় প্রতারণা করার মাধ্যমে মাল উপার্জন করাও হারাম। মহানবি সা. বলেন, من غشنا فليس منا 'যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।'[২৭৫]

খাদ্য মজুদ করে বা আটকে রেখে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টির মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে সম্পদ উপার্জন করা হারাম। মহানবি সা. বলেন, من إحتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام والأفلاس 'যে ব্যক্তি মুসলিমদের উপর খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দারিদ্র্য দিয়ে শাস্তি দেন।'[২৭৬]

(২) সম্পদ ব্যয়ের খাত বৈধ হতে হবে। সুতরাং কেউ মদ ও জুয়ার জন্য সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু; শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'[২৭৭]

অপচয় করা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা, وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا 'তোমরা আহার করবে এবং পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না।'[২৭৮] ঘুষ প্রদানের জন্য সম্পদ খরচ করা যাবে না। হাদিসে রয়েছে, لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى والمرتشى 'ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতা উভয়কে রসুলুল্লাহ সা. লা'নত করেছেন।'[২৭৯]

(৩) কাজ করে সম্পদ উপার্জন করতে হবে। ইসলামে সম্পদের মালিকানা লাভের এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করে। রসুলুল্লাহ সা. একজন ভিক্ষুককে ভিক্ষা ছেড়ে কাঠ সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রির নির্দেশ দেন। লোকটি রসুলুল্লাহ সা.-এর কথামত কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করলে তার প্রয়োজন পূরণের পর অতিরিক্ত দশ দিরহাম জমা হয়। সে রসুল সা.-এর কাছে এসে তাকে এ কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানায় যে,

بارك الله لى يا رسول الله فى مشورتك فقال : هذا خير أن تأيى يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة.

'হে আল্লাহর রসুল সা.! আপনার পরামর্শে আল্লাহ আমাকে বরকত দিয়েছেন। তখন মহানবি সা. তাকে বললেন, কিয়ামতের দিন চেহারায় ভিক্ষার চিহ্ন নিয়ে আসার চেয়ে এটা তোমার জন্য অনেক উত্তম।'[২৮০]

যিনি মুসলিমদের জন্য কাজ করেন তিনি 'আমিন'। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِىُّ الأَمِيْنُ 'নিশ্চয়ই তোমার মজুর হিসেবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।'[২৮১]

আর রসুলুল্লাহ সা. হযরত আবু যর রা.-কে বলেছেন যখন তিনি, ইমারত (শাসনভার) চেয়েছিলেন,

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة الا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها.

'হে আবু যর! নিশ্চয়ই তুমি দুর্বল ব্যক্তি, আর প্রশাসন একটি আমানত। যে ব্যক্তি তা যথাযথভাবে ধরে রাখতে পারবে না এবং তার দায়-দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারবে না, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন

---

২৭৩. আল-কুরআন, ৫ : ৩৮
২৭৪. আল-কুরআন, ৫ : ৩৩
২৭৫. ইমাম মুসলিম রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *সহিহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১৪৩, হাদিন নং ১৮৫
২৭৬. ইমাম ইবন মাজাহ রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু ইবনে মাজাহ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৪), খ.২, পৃ. ২৮৩, হাদিস নং ২১৫৫
২৭৭. আল-কুরআন, ৫ : ৯০
২৭৮. আল-কুরআন, ৭ : ৩১
২৭৯. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১০, হাদিস নং ১৩৪১
২৮০. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৩-৫৪, হাদিস নং ৬৭৭
২৮১. আল-কুরআন, ২৮ : ২৬

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জা ও আফসোসের কারণ হবে।'[২৮২] অতএব আমল বা কাজ যখন আমানত তখন প্রত্যেক দায়িত্বশীলের উচিত কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া তা আদায় করা। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَخُوْنُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

'হে মু'মিনগণ! জেনে-শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।'[২৮৩]

রসুলুল্লাহ সা. অত্যন্ত রাগ করতেন যদি কোন কর্মচারি (আমিল) স্বীয় কল্যাণের জন্য তার পদ ও পদবীকে ব্যবহার করত। বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ সা. ইবনুল লুতবিয়াকে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠালেন। তিনি ফিরে এসে রসুলুল্লাহ সা.-কে বললেন,

هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت فى بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ ثم قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل ابعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدى لي أفلا قعد في بيت أبيه أو فى بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذى نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على عاتقه بعير اله رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.

'এটা হলো আপনাদের মাল আর এটা হলো আমাকে দেয়া হাদিয়া। তখন রসুলুল্লাহ সা. তাকে বললেন, 'তুমি কেন তোমার পিতামাতার ঘরে বসে থাক না, অতঃপর দেখ যে, কেউ তোমাকে হাদিয়া দেয় কিনা'? এ কথা বলে তিনি মিম্বারে দাঁড়ালেন, আল্লাহর প্রশংসা এবং গুণকীর্তন করে বললেন, 'আমি যে আমিলকে যাকাত আদায়ের জন্য পাঠাই তারপর সে এসে বলে এটা আমার এবং এটা আপনাদের। সে কেন তার পিতা অথবা মাতার বাড়িতে বসে থেকে দেখে না যে তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তোমাদের যে কেউ যদি যাকাত-সদাকা থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করে তবে কিয়ামতের দিন তা তার ঘাড়ে বহন করে সে উপস্থিত হবে। সেটা যদি উট হয় তাহলে সে চি চি করবে, গরু হলে হাম্বা হাম্বা করবে আর ছাগল হলে ভ্যা ভ্যা করবে। অতঃপর তিনি দু'বার বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছাতে পেরেছি।'[২৮৪]

এ কারণে হযরত 'উমর রা. তার অধীনস্থ 'আমিলদের খোঁজ-খবর নিতেন। কিন্তু তিনি যখন সিরিয়া গেলেন এবং সেখানকার লোকদের বললেন তোমরা আমার নিকট তোমাদের দরিদ্র লোকদের নাম লিখে দাও। তারা তাদের নাম লিখলেন। তালিকায় দরিদ্র জনগণের মধ্যে প্রথম নামটি ছিল তাদের ওয়ালি বা শাসক সা'ইদ ইবন 'আমের রা.-এর। বিষয়টি হযরত 'উমর রা.-কে বেশ চিন্তিত করলো। তিনি তার গভর্নরের এ তাকওয়া ও দুনিয়া বিমূখীতা দেখে কেঁদে ফেলেন এবং তিনি তার জন্য এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দেন যেন তিনি এ অর্থ দিয়ে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারেন এবং শাসনকার্য সুচারু রূপে পরিচালনা করতে পারেন।[২৮৫]

ড. ইসমাঈল বাদাবি বলেন কাজের তিনটি উদ্দেশ্য রয়েছে[২৮৬] :

প্রথম উদ্দেশ্য : শারীরিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য জরুরি রিযক উপার্জন করা; এটা ফরযে আইন।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য : ঋণ পরিশোধ করার জন্য কাজ করা, এটা জরুরি বিষয় এবং অপরিহার্য কর্তব্যসমূহের অন্যতম।

তৃতীয় উদ্দেশ্য : পরিবার-পরিজন এবং যাদের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য তাদের জন্য ব্যয় করার ও স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করার জন্য কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَه رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ 'জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।'[২৮৭]

ইসলামি শারি'আতে সকল পবিত্র, উপকারী ও কল্যাণমূলক কাজ বৈধ। এছাড়া সকল ক্ষতিকারক, অপবিত্র ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ অবৈধ। সুতরাং যে সব কাজের ভিত্তি প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা সে সব কাজ হীন ও নিকৃষ্ট

---

২৮২. ইমাম মুসলিম রহ., *অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৭২, হাদিস নং ৪৫৬৮
২৮৩. আল-কুরআন, ৮ : ২৭
২৮৪. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৭৯, হাদিস নং ৪৫৮৬
২৮৫. মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিদ আস-সাইয়্যিদ সাফতি, *দিরাসাত ফিল ইকতিসাদিল ইসলামি*(ঢাকা : দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬), পৃ. ১১
২৮৬. মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিদ আস-সাইয়্যিদ সাফতি, *দিরাসাত ফিল ইকতিসাদিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২৮৭. আল-কুরআন, ২ : ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

কাজ। যেমন– যাদু করা, মদ্যপান, কুকুর ও শুকর-এর ব্যবসা-বাণিজ্য করা সবই হারাম। বিশেষ করে মদের ব্যাপারে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له.

'মদ সম্পর্কে দশ শ্রেণির লোককে রসুলুল্লাহ সা. লা'নত করেছেন– মদ প্রস্তুতকারী, যে মদ প্রস্তুত করতে বলে, মদ পানকারী, তা বহনকারী, যার জন্য তা বহন করা হয়, যে তা পান করায়, মদ বিক্রয়কারী, এর মূল্য গ্রহণকারী, যে মদ ক্রয় করে এবং যার জন্য ক্রয় করা হয়।'[২৮৮]

হযরত 'উমর রা. বলেন,

يد رجلا إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كانه أميرهم وإذا كان أميرهم كان كانه واحد منهم.

'আমি এমন একজন ব্যক্তি চাই যে, সে যখন লোকদের মাঝে থাকবে তখন তাকে তাদের আমির মনে হবে অথচ সে তাদের আমির নয়। আর যখন সে তাদের আমির হবে তখন মনে হবে সে তাদের মতই একজন (আলাদা কেউ নয়)।'[২৮৯]

রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق 'খাদ্য-পানীয় ও পোশাক-পরিচ্ছদে ক্রীতদাসের অধিকার রয়েছে। তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের জন্য তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না।'[২৯০] অনুরূপভাবে শিশুদের তাদের সামর্থ্যের বাইরে কষ্টকর কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা এতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে। এছাড়া বৃদ্ধ, অক্ষম লোকদেরকেও কঠিন কাজ দেয়া যাবে না।

যদি শ্রমিকরা তাদের দায়িত্ব পালন করে তাহলে তাদের পারিশ্রমিক পূর্ণরূপে প্রদান করা হবে। রসুলুল্লাহ সা. বলেন, اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 'শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।'[২৯১]

ড. ইসমাঈল বাদাবির মতে মানুষের জীবনোপকরণ ও রিযক-এর মাধ্যম তিনটি :

(১) কৃষি বা চাষাবাদ যা মানবতার প্রতি রব্বুল আলামিনের প্রথম এবং প্রধান অনুগ্রহ।
(২) শিল্প বা মিল–কারখানার মাধ্যমে মানবের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উৎপাদন।
(৩) ব্যবসা-বাণিজ্য। শারি'আতের নির্ধারিত সীমারেখা অনুসরণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। প্রতারণা, মজুতদারি ও সুদ বর্জন করে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা।[২৯২]

ইসলামে সম্পদ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামে সমস্ত সম্পদ আল্লাহর এবং সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,

قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ. قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُوْنَ. قُلْ مَنْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ يُجِيْرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. سَيَقُوْلُوْنَ لِلّٰهِ قُلْ فَأَنّٰى تُسْحَرُوْنَ.

'জিজ্ঞাসা কর, এ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বল, তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? জিজ্ঞাসা কর, কে সপ্ত আকাশ এবং মহা-আরশের অধিপতি? তারা বলবে, 'আল্লাহ'। বল, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না? জিজ্ঞাসা কর, সকল কিছুর কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি আশ্রয় দেন এবং যার উপর আশ্রয়দাতা নেই, যদি তোমরা জান? তারা বলবে, 'আল্লাহর'। বল, তবুও তোমরা কেমন করে মোহগ্রস্ত হচ্ছ?'[২৯৩]

আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা তিনি আমাদের স্রষ্টা, তিনি আমাদের মালিক, সমগ্র সৃষ্টিজগতের মালিক, আমাদের সম্পদের মালিক, তিনি শারি'আতের প্রবর্তক। তাঁর শারি'আত মানা আমাদের জন্য অপরিহার্য এবং তিনি তাঁর সৃষ্টি জগত সম্পর্কে সমধিক অবহিত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

২৮৮. ইমাম আত তিরমিযী, অনু. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫৬৭, হাদিস নং ১২৯৮
২৮৯. মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিদ আস-সাইয়্যিদ সাফতি, *দিরাসাত ফিল ইকতিসাদিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
২৯০. ইমাম মুসলিম রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৭৮, হাদিস নং ৪১৭০
২৯১. ইমাম ইবন মাজাহ রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু ইবন মাজাহ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪০১, হাদিস নং ২৪৪৩
২৯২. মুহাম্মদ আস-সাইয়্যিদ আস-সাইয়্যিদ সাফতি, *দিরাসাত ফিল ইকতিসাদিল ইসলামি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
২৯৩. আল-কুরআন, ২৩ : ৮৪-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ط وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ.

'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।'[২৯৪]

এ কারণে আমাদের বুঝা উচিত যে, সমস্ত সম্পদ আল্লাহর, সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং মানুষের জন্য দেয়া শার'ই বিধি-বিধান আল্লাহ তা'আলা প্রণীত। তবে সম্পদকে তিনি ব্যক্তি সমষ্টি ও কখনও অন্য ব্যবস্থার অধীন করে দিয়েছেন। আমাদেরকে আমাদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় কর।'[২৯৫] মুসলিম উম্মাহ তাদের মালিকানাধীন সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوْفًا.

'তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ কর না; তা থেকে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে সদালাপ করবে।'[২৯৬]

ব্যক্তি মালিকানায় প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় মালিকানাধীন বিষয়ে হকদার। আর সামষ্টিক মালিকানায় সমস্ত উম্মত এবং রাষ্ট্র হকদার সেখানে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয়। যেমন– বড় বড় নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির মালিকানা। এ ছাড়া যেসব মালিকানা কোনো ব্যক্তি বা কোনো জামা'আতের জন্য বৈধ নয় সে সব মালিকানা কেবল আল্লাহর জন্য। যেমন– আসমান-যমিন, বাতাস-পানি ইত্যাদির মালিকানা। আল্লাহই এসবের নিরঙ্কুশ মালিক। কেননা মানুষ যদি এগুলোর মালিক হত তাহলে সে স্বীয় মালিকানার দ্বারা সকল মানুষকে আলো-বাতাস ও পানি হতে বঞ্চিত করে হত্যা করত। মালিকানার ব্যাপারে ইসলামের বিধান প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়। বরং তা মানবতার কাছে আল্লাহর সর্বশেষ বাণী যা অহি হিসেবে রসুলুল্লাহ সা.-এর নিকট নাযিল করা হয়েছে।

প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের তৈরি করা পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র প্রথমে চমক নিয়ে আসলেও পরিণতিতে তা চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তা জাগতিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে চিকিৎসকের ভূমিকায় আগমন করলেও পরবর্তীতে তা নিজেই রোগী হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছে।[২৯৭] মানুষ মানব রচিত এসব বিধি-বিধানের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়েছে। তাদের সমস্যা না কমে বরং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ঐসব নিয়মনীতি তাদেরকে অলস, বেকার ও অক্ষম বানিয়েছে। ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের লোকেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। সাধারণ জনগণের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র নায়করা 'সামাজিক নিরাপত্তা' নামক নতুন শ্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছে।

ইসলাম পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র বা সাম্রাজ্যবাদ কোনটাই নয়। ইসলাম হলো বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত দীন। ইসলামের মতে সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহর; মানুষ হলো তার তত্ত্বাবধায়ক। যেহেতু সে এর রক্ষণাবেক্ষণকারী, সেহেতু সে তা তার মূল মালিকের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালনা করবে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা।[২৯৮] তিনি এ ব্যাপারে যে অনন্য বিধান দিয়েছেন তা হলো :

১. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি থেকে মালিকানা রক্ষা করা।
২. ইসলামে সম্পদের মালিকানার কোন উর্ধ্ব সীমা নেই। সুতরাং যে কেউ অঢেল সম্পদের মালিক হতে পারবে। তবে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রধান যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোনো ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে দূর্নীতির মাধ্যমে এত সম্পদের মালিক হয়েছেন, তাহলে তা থেকে রাষ্ট্র প্রধানের কিছু সম্পদ নিয়ে নেয়ার অনুমতি রয়েছে। যেমনটি হযরত 'উমর রা. করেছেন হযরত খালিদ, হযরত 'আমর, হযরত আবু হুরাইরা রা.-এর সম্পদের ব্যাপারে।

---

২৯৪. আল-কুরআন, ৬৭ : ১৪
২৯৫. আল-কুরআন, ৫৭ : ৭
২৯৬. আল-কুরআন, ৪ : ৫
২৯৭. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*(ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৭), পৃ. ২৭-৩০
২৯৮. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলাম ধনীদের উপর ফকির, মিসকিন, মুখাপেক্ষী ও অক্ষম লোকদের জন্য তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় করাকে অপরিহার্য করেছে। চারটি জিনিসের মাধ্যমে তা হয়ে থাকে। যেমন :

(ক) খাদ্য : তা প্রত্যেক ক্ষুধার্তের হক। সামর্থ্য অনুসারে ধনী মুসলিম ফকির বা মিসকিনকে ক্ষুধা নিবারণ করার ব্যবস্থা করবে।

(খ) পানি : পৃথিবীর কোনো কোনো স্থানে পানি খাদ্যের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে মরু অঞ্চলে। মরু অঞ্চল ছাড়াও বিশ্বের অনেক স্থানে মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। ফলে দূষিত পানি পান করে তারা নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মারাও যাচ্ছে। তাই যারা পানি বা বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না স্বচ্ছল মুসলিমগণ তাদের পানির ব্যবস্থা করবে।

(গ) পোশাক : অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের সতর ঢাকা এবং তাদের নারীদের হিযাবের জন্য পোশাকের সংস্থান করা মুসলিম সমাজের ধনী লোকদের দায়িত্ব। তবে খুব মূল্যবান পোশাক হওয়া শর্ত নয়; শর্ত হলো সতর আবৃত করার মত পোশাকের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) বাসস্থান : রোদ-বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য বনি আদমের বাসযোগ্য একটি ঘরের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব। তা কুড়ে ঘরও হতে পারে, তাবুও হতে পারে, ইট বা পাথরের তৈরি ভবন অথবা কাঠের তৈরি বাড়িও হতে পারে।

মূলকথা হলো যে ব্যক্তি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিবে সে যেনো বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়, সতর (লজ্জাস্থান) ঢাকার জন্য পোশাক এবং বসবাসের জন্য একটি বাসস্থান পায়, সে ব্যবস্থা ইসলামি রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজকে করতে হবে। কুরআনে তা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলছেন,
إِنَّ لَكَ اَلاَّ تَجُوْعَ فِيْهَا وَلاَ تَعْرٰى. وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلاَ تَضْحٰى.

'তোমার এটাই রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেখানে পিপাসার্ত হবে না রোদ্রক্লিষ্টও হবে না।'[২৯৯]

আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে জান্নাতে এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন। এ আয়াত ইঙ্গিত করে যে, এ বিষয়গুলো মানুষের জন্য খুবই জরুরি। তাছাড়া খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান ব্যতীত মানুষ কিভাবে বাঁচবে। এ চারটি হলো মৌলিক প্রয়োজন। যুগের উন্নতির সাথে সাথে মৌলিক প্রয়োজনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. সম্পদের মালিকদের উপর যাকাতের হক রয়েছে। যে ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, তার কাছ থেকে জোর করে তার উপর নির্ধারিত যাকাত এবং তার বাকি সম্পদের একটি অংশগ্রহণ করা যাবে।

৫. 'মুদারাবা' ও 'শিরকাতে ইসলামিয়া' পন্থায় সম্পদ বাড়ানোর চেষ্টা করার মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য লোকেরা ব্যবসায়িক কাজ-কর্ম, কায়িক শ্রম ও বাজারে গমনাগমনের সুযোগ পায়। সুদ, প্রতারণা ও মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মাল গুদামজাত করা নিষিদ্ধ তথা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا 'আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।'[৩০০]

৬. মিরাছ হলো আল্লাহর বিধান; এটা প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা কোনো বিষয় নয়। ইসলামে ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সন্তানরা ও নিকটাত্মীয়রা তার সম্পদের মালিক হয়।

ইসলামে উম্মতের সব সমস্যা সমাধানের যথাযথ শার'ই বিধান রয়েছে। যে পন্থায় ইসলাম সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তা হলো :

প্রথমত : রব্বানি বিধানের শক্তি। অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-বিধানগুলো এত নিখুঁত যে, এগুলো অনুসরণ করলে যে কোনো সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব।

দ্বিতীয়ত : ইসলামি আত্মিক শক্তি। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ আমাদেরকে দেখছেন এ অনুভূতি সহকারে সমাজের প্রত্যেক মুসলিম কাজ করলে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। রসুলুল্লাহ সা. বলেন, كأنك تراه

২৯৯. আল-কুরআন, ২০ : ১১৮-১১৯
৩০০. আল-কুরআন, ২ : ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

فإن لم تكن تراه فإنه يراك 'যেন তুমি তাকে দেখছ, যদি তুমি তাঁকে না দেখ তাহলে এ কথা মনে করবে যে, তিনি তোমায় দেখছেন।'[৩০১]

তৃতীয়ত : যেহেতু আল্লাহ তা'আলা পুরুষের উপর স্ত্রীর জন্য ব্যয় করা, পরিবারের জন্য ব্যয় করা, নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করা ও বিশেষ করে পিতামাতার জন্য খরচ করা অপরিহার্য করেছেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলিম তার দায়িত্ব সুচারুরূপে আদায় করলে সামাজিক নিরাপত্তা সহজেই নিশ্চিত হবে।

চতুর্থত : মুসলিম রাষ্ট্র অভাবীর সব ধরনের প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ সা. বলেন, أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার মতো সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোনো ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।'[৩০২]

সম্মানজনক জীবন-যাপন করা প্রত্যেক মুসলিমের অধিকার। এমনকি ইসলামি আইনবিদগণ ফকিরকে কতটুকু দেয়া হবে; যথেষ্ট পরিমাণে নাকি প্রয়োজন অনুসারে এ বিষয়ে মতবিরোধ করেছেন এ বিষয়ে অধিকাংশ ফকিহ বলেছেন ফকিরকে এত অধিক পরিমাণে দিতে হবে, যেন তার নাম থেকে ফকির শব্দটি চিরতরে উঠে যায়। এর দ্বারা বুঝা যায় ইসলাম চায় প্রত্যেক ব্যক্তি সুখ-শান্তিতে বসবাস করুক এবং দরিদ্রতার কষাঘাতে কেউ জর্জরিত না হোক। আর এ জন্যই ইসলামি রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে ইসলামি প্রতিষ্ঠানসমূহ : ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো প্রতিবিধানে যেসব প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে সম্পর্কে নিচে আলোকপাত করা হলো :

বাইতুলমাল : বাইতুল মাল-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধনাগার, কোষাগার, মাল বা দৌলতের ঘর। ইসলামি পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারকে বাইতুলমাল বলা হয়।[৩০৩] রাসুলুল্লাহ সা.-এর যুগ থেকেই কোনো না কোনোরূপে বাইতুলমালের অস্তিত্ব ছিল অর্থাৎ রাসুল সা.-এর নিকট গনিমাত, চাঁদা, সদাকা ইত্যাদিরূপে যে অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হত, তিনি তা তৎক্ষণাৎ স্বীয় সাহাবিগণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। রাসুল সা.-এর যুগে বাইতুলমালের মাল সঞ্চিত করে রাখার সুযোগই হত না; তাই তার জন্য পৃথক কোনো ঘর নির্মাণ করা হয়নি; বরং বাইতুল মালের সকল প্রকারের যাবতীয় ধন-সম্পদ মসজিদে নব্বীতে জমা করে তা যথাযথ প্রাপকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হত। প্রথম খলিফা আবুবকর রা.-এর খিলাফতের যুগেও অনুরূপ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। দ্বিতীয় খলিফা 'উমর রা.-এর খিলাফতের যুগেই পরিপূর্ণভাবে প্রচলিত নিয়ম মুতাবিক বাইতুলমাল ব্যবস্থার অস্তিত্ব লাভ করে।

একদিন বিলাল রা. ও তার সঙ্গীগণ 'উমর রা.-এর নিকট নিবেদন করলেন, আমিরুল মু'মিনিন! যেরূপে গনিমতের অন্যান্য মাল লোকদের মাঝে তাৎক্ষণিকভাবে বণ্টিত হয়ে থাকে, ইরাক ও সিরিয়া থেকে আগত গনিমতের মালও সেরূপে তাৎক্ষণিকভাবে লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিন। ঠিক সেরূপে বিজিত ভূমিখণ্ডগুলিও বিজয়ীদের মধ্যে বণ্টন করে দিন। 'উমর রা. তাদের উক্ত নিবেদন এই বলে প্রত্যাখ্যান করলেন যে, এ সকল বিজয়ী লোকের পর যাদের আবির্ভাব ঘটবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জমিতে তাদেরও অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন।[৩০৪] 'উমর রা.-এর উক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে এ তত্ত্বটি নিহিত রয়েছে যে, সম্পদের সমষ্টিগত মালিকানা ও ব্যক্তি মালিকানা পরস্পর পৃথক দু'টি বিষয়। আর অর্থ-সম্পদ ও ভূ-সম্পদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে সামাজিক নিরাপত্তা ও জাতীয় কল্যাণ এবং স্বার্থ রক্ষা করা।

হিজরি ২০ সনে দিওয়ান বিভাগ বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর এর একটি নতুন অর্থের অর্থাৎ সরকারি কোষাগারের ধারণা জন্মলাভ করে। ইতিপূর্বে বাইতুলমাল শব্দটি দ্বারা এরূপ ঘরকে বুঝানো হত যেখানে অর্থ-

৩০১. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩৮-৩৯, হাদিস নং ৪৮
৩০২. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১৮৭-১৮৮, হাদিস নং ৬২৭৫
৩০৩. সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪), খ.১৫, পৃ. ৫৯৪-৬০৫
৩০৪. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ২৪

Dhaka University Institutional Repository

সমপদ ও দ্রব্যসামগ্রী তাদের স্বতন্ত্র মালিক বা প্রাপকদের মধ্যে বণ্টন করার পূর্বে সাময়িকভাবে রাখা হত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাইতুলমাল ব্যাপক ভূমিকা রাখত। এটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সম্মিলিত সম্পদের কেন্দ্রস্থল। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবীয় চাহিদা পূরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে সে জন্য বাইতুলমাল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখত। ইসলামি শারি'আহ অনুসারে এর আয়ের প্রধান উৎসগুলো নিম্নরূপ :
(১) অর্থ-সম্পদ ও গবাদি পশুর যাকাত; (২) 'উশর ও 'উশরের অর্ধেক; (৩) সদাকাতুল ফিতর; (৪) কাফফারা; (৫) খারাজ; (৬) আমওয়ালুল ফাদিলা; (৭) গনিমাতের সম্পদ; (৮) ফাই; (৯) জিযিয়া; (১০) খনিজ সম্পদের আয়; (১১) নদী ও সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ; (১২) হিবা; (১৩) ইজারার অর্থ; (১৪) মালিক ও উত্তরাধিকারবিহীন সম্পদ; (১৫) শারি'আহ মুতাবিক আরোপিত কর ও ফি; (১৬) বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের অনুদান, উপঢৌকন ও সাহায্য-সহযোগিতা ইত্যাদি।
এছাড়া প্রয়োজনে সরকার ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে ঋণও গ্রহণ করতে পারে। উল্লিখিত খাতগুলো থেকে সংগৃহীত অর্থ নিম্নোক্তভাবে ব্যবহার করা হত :

(ক) সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন-ভাতা;
(খ) বন্দি ও কয়েদিদের ভরণ-পোষণ;
(গ) ইয়াতিম ও অভিভাবকহীন শিশুদের প্রতিপালন;
(ঘ) অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান;
(ঙ) জনসাধারণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ ও
(চ) করজে হাসানা প্রদান এবং সমাজকল্যাণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি।

বাইতুল মাল অক্ষমদের সামাজিক নিরাপত্তা : ফকির শব্দ দ্বারা ঐ সমস্ত শ্রমিককেও বুঝায় যারা যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে অসহায় অবস্থায় এখানে সেখানে ঘুরাফেরা করে। কুরআনের এক জায়গায় 'ফুকারা' শব্দ ঐ সমস্ত মুহাজিরের বেলায়ও প্রয়োগ করা হয়েছে যারা কুরাইশদের যুলুম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে গিয়েছিলেন এবং এখানে পৌঁছার পর জীবিকার সন্ধান করছিলেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে,
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ إِخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا.
'এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি থেকে উৎখাত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে।'[৩০৫]
ফকিরদের মত মিসকিনদেরকেও যাকাতের অধিকারী বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ইমাম বাইযাবির মতে, মিসকিন হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যাকে নিঃস্বতা নির্জীব করে দিয়েছে।[৩০৬] এভাবে ঐ সব লোকের উপর 'মিসকিন' শব্দ প্রযোজ্য হবে যাদেরকে রোগ অথবা বার্ধক্য এমনভাবে অসার ও নিষ্কর্মা করে দিয়েছে যে, তারা কোন কাজই করতে পারে না এবং পারলেও বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক পায় তা দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয় না। যুদ্ধের দরুণ যারা অন্ধ, খঞ্জ, খোঁজা অথবা আতুরে পরিণত হয়েছে তারাও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবু হানিফার মতে মিসকিনের অবস্থা ফকিরের চেয়েও খারাপ। কেননা মিসকিন ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে অর্থাভাব একেবারে নির্জীব করে দিয়েছে। তবে উভয়কেই (ফকির এবং মিসকিন) এ পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে হবে, যাতে তারা নিঃস্ব অবস্থা থেকে সচ্ছলতার প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।'[৩০৭] ইসলাম একদিকে যেমন জনসাধারণকে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিবৃত্ত করেছে অন্যদিকে তেমনি বেকার, বিকলাঙ্গ এবং অক্ষমদেরকে সরকারি কোষাগার থেকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছে।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনে গীর্জার শাসনের অবসান হওয়ার পর এটা মেনে নেয়া হয়েছে যে, নিঃস্বদের সাহায্য করাও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব এবং অভাবগ্রস্তদের সুষ্ঠুভাবে সাহায্য করা তখন পর্যন্ত সম্ভব হতে পারে না যতক্ষণ না রাষ্ট্রীয় রক্ষণাবেক্ষণে এর যথারীতি ব্যবস্থা থাকে। এরই ভিত্তিতে ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে 'অভাবগ্রস্তদের আইন' পাস করা হয়। যদিও নীতিগতভাবে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, কোনো রাষ্ট্র তার নিঃস্ব, ইয়াতিম,

---

৩০৫. আল-কুরআন, ৫৯ : ৮
৩০৬. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৩০৭. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনূ. আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩), খ.২, পৃ. ৩০৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদ এবং নিরাশ্রয় জনসাধারণকে ভুখা অবস্থায় মরতে দিবে না। তবুও অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কোনো কোনো পদ্ধতির সাহায্যে দানে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে বরং বৃদ্ধিই পায়। উপরন্তু রাষ্ট্র যদি এ দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হয় তাহলে এতে রাষ্ট্রের শুধু দুর্নামই হয় না, সমগ্র জাতির জন্য এর ফল মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। অতএব 'অভাবগ্রস্তদের সাহায্যদান, এমন একটি সমস্যা যা শুধুমাত্র সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায়ই সমাধান করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে, নিঃস্বদের সাহায্যর্থে এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করা যার মধ্যে সার্বজনীনতা রয়েছে। কিন্তু সরকারি হস্তক্ষেপের অর্থ কখনো এ নয় যে, পারিবারিক সাহায্যদান ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। বরং সরকারি ও পারিবারিক সাহায্য দান ব্যবস্থাকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যাতে একটি অন্যটির প্রতিকূল না হয়ে বরং পরিপূরক হয়। তাহলে জাতি সামগ্রিকভাবে এ দু'ব্যবস্থার মাধ্যমেই উপকৃত হতে পারবে। অভাবগ্রস্তদের এমনভাবে সাহায্য করতে হবে যাতে আলস্য এবং কর্মবিমুখতা উৎসাহ না পায় এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জনকারীদের উপরও অযথা বোঝা না পড়ে। এটা এমন একটা লক্ষ্য যা এখন পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রই পুরোপুরিভাবে অর্জন করতে পারেনি। তবে এটা অনস্বীকার্য যে এ লক্ষ্যে সরকারি ব্যয়-খাত পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ কর আরোপ করার প্রয়োজন এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচির মাধ্যমে এর ব্যবস্থা করতে পারে।[৩০৮]

বাইতুল মাল ও জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা : বস্তুত ইসলামি রাষ্ট্রের বাইতুল মালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর সর্ব-সাধারণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন একজন নাগরিকও যাতে মৌলিক প্রয়োজন হতে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, তার ব্যবস্থা করা বাইতুল মালের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। তার অর্থ এ নয় যে, বাইতুল মাল লোকদেরকে বেকার বসিয়ে খাওয়াতে থাকবে। বরং লোকেরা সাধ্যনুযায়ী শ্রম করবে, উপার্জন করবে, সমাজের সচ্ছল অবস্থার লোকেরা তাদের দরিদ্র নিকটাত্মীয় ও পাড়া প্রতিবেশীর প্রয়োজন পূরণ করবে তারপরও যদি কেউ তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অসমর্থ থেকে যায় তাহলে তা পরিপূরণে দায়িত্ব হবে বাইতুল মালের। ইসলামি অর্থনীতিতে তা হলো নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

ইসলামি রাষ্ট্রের নাগরিকদের এ অপূরণীয় মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ কাজ করে না, মনে করতে হবে, সে এ দায়িত্ব পালন করছে না। এ প্রসঙ্গে এখানে রসুলুল্লাহ্ সা.-এর দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করা হলো :

من ولاه الله عز وجل شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقرهم احتجب الله تعالى عنه دون حاجته وخلته وفقره

'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের দায়িত্বপূর্ণ কাজসমূহ আঞ্জাম দেয়ার কর্তৃত্ব দিবেন, সে যদি জনগণের প্রয়োজন পূরণ ও অভাব মোচনের দায়িত্ব পালন থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলাও সে ব্যক্তির প্রয়োজন ও অভাব মোচন থেকে বিরত থাকবেন।'[৩০৯]

রসুলুল্লাহ সা. অন্যত্র বলেছেন,

ما من إمام يغلق بابه دون ذوى الحاجة و الخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته

'যে রাষ্ট্রনায়ক অভাবগ্রস্ত লোকদের জন্য নিজের দরজা বন্ধ করে রাখে, অভাব পুরণ করে না, আল্লাহ তা'আলাও তার অভাব, প্রয়োজন ও দারিদ্র্যতার সময় আসমানের (রহমতের) দরজাসমূহ তার জন্য বন্ধ করে দেন।'[৩১০]

এ হাদিস দু'টি থেকে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হচ্ছে যে, জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অভাব দূর করা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করা হলে আল্লাহর তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এ কারণে খুলাফায়ে রাশিদিনের পরে হযরত আমির মুয়াবিয়ার শাসনামলে এ কাজের প্রতি যখন, উপেক্ষা প্রদর্শন

৩০৮. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮
৩০৯. ইমাম আবূ দাঊদ রহ., অনূ. ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *আবূ দাউদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৬৫, হাদিস নং ২৯৩৮
৩১০. ইমাম আত তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসঊদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৭, হাদিস নং ১৩৩৬

Dhaka University Institutional Repository

করা হচ্ছিল, তখন তাকে রাসুলে কারিম সা.-এর এ কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তিনি অনতিবিলম্বে এ কাজের দায়িত্ব পালনের জন্য একজন লোক নিযুক্ত করলেন।[৩১১]

ইসলামি রাষ্ট্রের মূল কাঠামোই যে জনকল্যাণমূলক, তা খিলাফতের সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। হযরত সালমান ফারসি রা. বলেছেন,

إن الخليفة هو الذى يقضى بكتاب الله وليشفق على الرعية شفقة الرجل على أهله

'খলিফা (ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক) সে, যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে এবং জনগণের প্রতি পিতার ন্যায় দরদ সহকারে স্নেহ ও দরদ প্রদর্শন করে।'[৩১২]

সাধারণ মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলতঃ জনগণের সে কল্যাণ-কামনার অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামের দিক থেকে রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্বরূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এ দায়িত্ব পালন করবে না তার পরিণাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। রসুলুল্লাহ সা. বলেন,

ما من عبد يسترعه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة.

'যে লোককে আল্লাহ তা'আলা জনগণের শাসক বা পরিচালক বানিয়ে দিবেন, সে যদি তাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে, তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না।'[৩১৩]

বাইতুল মাল থেকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা : ইসলাম সুদি কারবারকে নিষিদ্ধ (হারাম) ঘোষণা করেছে বিভিন্ন পন্থায় সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করেছে। 'সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার নির্দেশকে নবি যুগের একেবারে শেষ দিককার নির্দেশ (হুকুম) বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশও (হুকুম) শেষ দিককার বলে মনে করা হয়। সচ্ছল লোকদেরকে 'করযে হাসানা' দানের নির্দেশ হচ্ছে রাসুলের ওফাতের বড়জোর এক বছর পূর্বেকার। তাই নবি যুগে এর জন্য কোনো বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারেনি।'[৩১৪]

হাদিস এবং ইতিহাস গ্রন্থাদি থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে বিত্তশালী সাহাবারা বিত্তহীন সাহাবাদেরকে ঋণ হিসেবে সুদবিহীন 'করযে হাসানা' প্রদান করেছিলেন। স্বয়ং রসুলুল্লাহ সা. একবার চল্লিশ হাজারের একটি ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবি রাবি'আ বলেন, রসুলুল্লাহ সা. আমার নিকট থেকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ঋণ গ্রহণ করেছিলেন।[৩১৫]

দরিদ্র এবং অভাবগ্রস্তদের দান-দক্ষিণা প্রদান যেমন প্রত্যেক ধর্মের দৃষ্টিতে পূণ্যের কাজ, তেমনি যে অর্থ বেকার পড়ে থাকে, সে অর্থ ঋণ হিসেবে অন্যকে দান করাও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি পূণ্যের কাজ। কুরআনের অনেক জায়গায় এ সম্পর্কে মুসলিমদের উৎসাহিত করা হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছে,

مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَه لَه وَلَه أَجْرٌ كَرِيْمٌ.

'কে আছে এমন ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি বহু গুণে ইহাকে বৃদ্ধি করবেন তার জন্য এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার।[৩১৬]

এছাড়া ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যয়খাতে 'করযে হাসানা' প্রদানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এখানে শুধু এতটুকু ইঙ্গিতই যথেষ্ট যে, সরকারি ব্যয়খাতেও করযে হাসানার জন্য একটি পৃথক কোটা রাখা হয়েছে। হযরত 'উমর রা. এবং অন্যান্য খলিফার যুগে এ ধরনের অসংখ্য নযির পাওয়া যায় যে, লোকেরা নিজেদের বেতনের জামানতে সরকারি 'বাইতুল মাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করত। ইসলামই প্রথম বিশ্বের নিয়মিত 'করযে হাসানা সমিতি' গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। প্রকৃতপক্ষে কোনো না কোনো সময়ে একজন সচ্ছল লোকেরও ঋণের প্রয়োজন দেখা দেয়। অতএব সে যখন অন্য একজন সচ্ছল লোকের কাছে ঋণ চায় তখন তা পায় বটে, কিন্তু এর জন্য তাকে সুদ দিতে হয়। কিন্তু নানা কারণে যখন ইসলাম সুদ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করল, তখন

৩১১. আবু 'উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৩১২. আবু 'উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩১৩. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪১০, হাদিস নং ৬৬৬৫
৩১৪. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনূ. আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৩১৫. ইমাম আন-নাসাঈ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.৪, পৃ. ৩৫৮, হাদিস নং ৪৬৮৩
৩১৬. আল-কুরআন, ৫৭ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

(করযে হাসানার ব্যবস্থা থাকার দরুণ) এ সব অভাবগ্রস্তের সুদের অভিশাপে নিপতিত হওয়ার আর কোনো কারণই থাকল না।'

খুব সম্ভব জগতের বেশির ভাগ লোকই বিনা কারণে কাউকে ঋণ দিতে চায় না। তাই এর একমাত্র সমাধান এ হতে পারে যে, স্বয়ং রাষ্ট্রই 'করযে হাসানা' প্রদান এবং তা আদায়ের ব্যবস্থা করবে, যার ফলে বিশ্ববাসী সুদখোরদের অশুচিকর পরিবেশ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে সক্ষম হবে।'[৩১৭]

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বয়ং খলিফাও 'বাইতুলমাল' থেকে ঋণ গ্রহণ করতেন এবং নির্ধারিত সময়ে তা পরিশোধ করতেও বাধ্য থাকতেন। তাবারি, ইবন সা'দ প্রমূখ ঐতিহাসিকের বর্ণনানুযায়ী খলিফা 'উমরের যখন কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজন দেখা দিত, তখন তিনি বাইতুল মালের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে ঋণ চাইতেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'অধিকাংশ সময় যখন তিনি রিক্তহস্ত থাকতেন এবং বাইতুল মালের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারি তার কাছে গিয়ে ঋণ তলব করত, তখন তিনি হয় তার কাছে আরো কিছু সময় চাইতেন, নয়তো নিজের বেতন থেকেই ঋণ পরিশোধ করে দিতেন।'[৩১৮] ইবন সা'দ প্রমূখ ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত 'উমর রা. যখন শাহাদাত বরণ করেন তখন তার কাছে বাইতুল মালের আশি হাজার দিরহাম পাওনা ছিল।'[৩১৯] অতঃপর তার পুত্ররা ঐ ঋণ পরিশোধ করেন। হযরত 'উমর রা. বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ঐ ঋণ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বর্তমান যুগের রাষ্ট্রগুলোও মাঝে-মধ্যে জনসাধারণকে সুদবিহীন ঋণদানের ব্যবস্থা করে থাকে।

বাইতুলমাল থেকে ঋণ পরিশোধ : যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা ঋণগ্রহীতার জন্য ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। রাসুলে কারিম সা. 'ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করাকে 'যুলুম' আখ্যা দিয়েছেন।'[৩২০] তিনি ঋণ পরিশোধের মানসিক দিকটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করার ইচ্ছা রাখে আল্লাহ তা'আলা সেটা পরিশোধ করে দেন। আর যে ব্যক্তি (অন্যের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে) তা বিনষ্ট করার ইচ্ছা রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা বিনষ্ট করে দেন।'[৩২১] ঋণ পরিশোধের প্রতি রসুলুল্লাহ সা.-এর কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল তা উক্ত ঘটনা থেকেই পরিস্কার বুঝা যায়, যেখানে রসুল সা. ঋণমুক্ত সাহাবির জানাযার নামায পড়িয়েছেন এবং ঋণগ্রস্ত সাহাবির জানাযার নামায নিজে না পড়িয়ে অন্য সাহাবিকে পড়িয়ে নিতে বলেছেন।

ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ না করে তাহলে ঋণদাতাকে শেষ পর্যন্ত আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। 'যদি বিচারকের (কাযির) কাছে কারো হক (পাওনা) প্রতিপন্ন হয় এবং হকদার তার ঋণগ্রহীতাকে কয়েদ করাতে চায় তাহলে বিচারক এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না; বরং ঋণগ্রহীতাকে নির্দেশ দিবেন যাতে সে তার দেনা পরিশোধ করে ফেলে। কেননা কয়েদ হচ্ছে টালবাহানার শাস্তি, অতএব এক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার টালবাহানা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যকীয়।'[৩২২] অতঃপর সে যদি দেনা পরিশোধ করতে অস্বীকার করে তাহলে বিচারক তাকে কয়েদ করবেন। কেননা তখন তার টালবাহানা প্রমাণিত হয়ে গেছে।'[৩২৩]

যদি বিচারকের সামনে একথা প্রমাণিত হয় যে, ঋণগ্রহীতা কপর্দকশূন্য এবং দেউলিয়া তাহলে তাকে কয়েদ করা যাবে না; বরং এ ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে আরো সময় দেয়া হবে। অতঃপর যখন বাদীর (ঋণদাতার) এ দাবি স্বীকার করে নেয়া হবে যে, ঋণগ্রহীতার হাতে মাল রয়েছে কিংবা সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হবে যে, ঋণগ্রহীতার হাতে সত্যি সত্যি সম্পদ রয়েছে তখন বিচারক তাকে দু'তিন মাস কয়েদখানায় রেখে অতঃপর তার অবস্থা সম্পর্কে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। অতএব ঋণগ্রহীতার টালবাহানা প্রমাণিত হওয়ার

---

৩১৭. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনূ. আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩১৮. মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪৭
৩১৯. মুহাম্মদ ইবন সা'দ আল-যাহরি, *তাবাকাতে ইবন সা'দ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৬০
৩২০. ইমাম আন-নাসাঈ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৬০, হাদিস নং ৪৬৮৮
৩২১. ইমাম আন-নাসাঈ, অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *সুনানু নাসাঈ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ৩৬০, হাদিস নং ৪৬৮৯
৩২২. ইমাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনূ. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, *আল-হিদায়া*(ঢাকা : ইফাবা, ২০১৪), খ.৩, পৃ. ১৮৯
৩২৩. ইমাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনূ. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই তাকে কয়েদ করা হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কয়েদখানায় রাখা হবে যতক্ষণ না সে যে সম্পদ গোপন রেখেছে তার তথ্য প্রকাশ করে।'[৩২৪]

এ সময়ের মধ্যে বিচারক বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে ঋণগ্রহীতার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন। যদি তার হাতে সম্পদ আছে বলে প্রমাণিত না হয় তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে।'[৩২৫] ফকিহদের মতে, কোনো দেউলিয়াকে কয়েদ করা যুলুমেরই নামান্তর।[৩২৬]

যখন বিচারক ঋণগ্রহীতাকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেন তখন তার উপর হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই ঋণদাতার থাকে না। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ বলেন, যখন ঋণগ্রহীতাকে বিচারক কপর্দকহীন বা দেউলিয়া বলে ঘোষণা করেন তখন তার এবং তার ঋণদাতাদের মধ্যে অন্তরায়ের সৃষ্টি করা হবে। কিন্তু যখন ঋণদাতারা এ মর্মে সাক্ষ্য পেশ করবে যে, ঋণগ্রহীতার কাছে সত্যি সত্যি সম্পদ রয়েছে তখন উপরোক্ত অন্তরায় উঠে যাবে।[৩২৭]

বাইতুল মালের আয় এবং কুরআন কর্তৃক ধার্যকৃত ব্যয় : ইসলামি আইনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কেন্দ্র হলো বাইতুল মাল। এ বাইতুল মালের আয় ও কুরআন কর্তৃক ধার্যকৃত ব্যয়ের খাতগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

মালে গনিমতের ব্যয় : জাহিলি যুগের আরবরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে মালে গনিমত পেত, তার সিংহ ভাগের অধিকারী হতেন স্বয়ং গোত্রপ্রধান এবং বাকিটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত।

বদর যুদ্ধেই মুসলিমগণ সর্বপ্রথম মালে গনিমতের অধিকারী হয়। এ সর্বজনীন সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুসলিমদেরকে মৌখিকভাবে কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশটি শুনিয়ে দেন।

'হে মুহাম্মদ! লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়।'[৩২৮] অতএব রসুলুল্লাহ সা. তা মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন।[৩২৯] বাইতুল মালের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন পর্যন্ত মালে গনিমতের খুমুস গ্রহণ করা হত না। রসুল সা. তাঁর বিবেচনা অনুযায়ীই মুসলিমদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিতেন।[৩৩০] কিন্তু বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন, 'তোমরা জেনে রাখ যে, যুদ্ধে তোমরা যা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের।'[৩৩১]

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সদাকার ন্যায় মালে গনিমতের বণ্টন পদ্ধতিও বলে দেন। তাই বদর যুদ্ধের পর রসুল সা. সর্বপ্রথম যে মালে গনিমতকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেন তা হলো বনু কাইনুকার মালে গনিমত।[৩৩২]

রসুলুল্লাহ সা. কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মালে গনিমতের সিংহভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে বাকি পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুল মালে জমা করেন। প্রসঙ্গত দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ্যযোগ্য। আর তা হলো :

প্রথমত: বাইতুল মাল প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকেই নিঃস্বদের প্রতি কখনো উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়নি। বৃটেন অর্থনৈতিক উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছার পরই সরকারি ব্যয় বরাদ্দের সময় গরিব এবং নিঃস্বদের অবস্থার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেখানকার বেকাররা ডোল (Dole) নামক

---

৩২৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮), খ.১, ভাগ ২, পৃ. ৬০৬-৬০৭

৩২৫. ইমাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯১

৩২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, খ.১, ভাগ ২, পৃ. ৬০৭

৩২৭. ইমাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী, অনু. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৯২

৩২৮. আল-কুরআন, ৮ : ১

৩২৯. ইবন জারির, *তাফসির আত-তাবারি*(বৈরুত : দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ১৯৬৯), খ.৯, পৃ. ১০৯

৩৩০. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৩৩১. আল-কুরআন, ৮ : ৪১

৩৩২. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

একটি আর্থিক সাহায্য পেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেখানে 'বেভারেজ স্কিম'-কে মোটামুটি কার্যকরী করা হচ্ছে এবং বিত্তহীনদের অভাব-অভিযোগ দূর করার প্রচেষ্টা চলছে। কিন্তু কুরআন প্রথম অবস্থায়ই বাইতুল মাল থেকে গরিব ও নিঃস্বদের সাহায্যদান এবং সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে। বাইতুল মালে, মালে গনিমতের যে খুমুস দাখিল করা হত তার মধ্যেও একটি নির্দিষ্ট খাত ছিল– যার দ্বারা ইয়াতিম এবং মুসাফিরদেরকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হত। কিন্তু যেহেতু মালে গনিমত কোনো স্থায়ী আমদানি (আয়) নয়, তাই স্থায়ী আমদানি (যেমন– সদাকা)-এর মধ্যেও নিঃস্ব এবং বেকারদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা ছিল। সদাকা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল।

দ্বিতীয়ত: প্রাচীন আরবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যেসব নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল রসুলুল্লাহ সা. তার বিপরীত নিয়ম-নীতি প্রচলন করেন। তিনি মালে গনিমতের সিংহ ভাগ অর্থাৎ চার-পঞ্চমাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন এবং বাইতুল মালের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য মাত্র এক-পঞ্চমাংশ রাখতেন। এ পঞ্চমাংশ সম্পর্কেও তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'তোমাদের মালে গনিমতের মধ্যে আমার অংশ হলো মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ এবং এ অংশও তোমাদেরকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়।[৩৩৩]

এভাবে বাইতুল মালের খুমুস আয়ের একটি বিরাট অংশ জনকল্যাণমূলক কাজ অর্থাৎ নিঃস্ব, ইয়াতিম এবং মুসাফিরদের সাহায্যার্থে ব্যয় করা হত এবং মোট মালে গনিমতের পাঁচ ভাগের এক ভাগ এর পাঁচ অংশের এক অংশ অর্থাৎ পঁচিশভাগের এক ভাগ রসুলুল্লাহ সা.-এর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় করা হত।[৩৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহর যুগে খুমুসকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হত– একভাগ আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের জন্য, একভাগ 'যাবিল কুরবার' (আত্মীয়-স্বজন) জন্য এবং তিনভাগ, মিসকিন ও মুসাফিরদের জন্য।' হযরত আবু বকর, 'উমর এবং 'উসমান রা. খুমুসকে মোট তিন ভাগে ভাগ করতেন। তারা রাসুলের অংশ ও 'যাবিল কুরবা'-এর অংশ বাতিল করে দন।' অতঃপর হযরত আলি রা. হযরত আবু বকর, 'উমর এবং 'উসমান রা.-এর বণ্টন পদ্ধতিকেই বহাল রাখেন।[৩৩৫]

হাসান ইবন মুহাম্মদ ইবন আল হানাফিয়া বলেন, রসুলে কারিমের ওফাতের পর তাঁর এবং 'যাবিল কুরবা'র অংশ নিয়ে মতভেদ শুরু হয়। কেউ কেউ বলেন, 'রসুলে কারিমের অংশ তাঁর পর তাঁর খলিফারই পাওয়া উচিত।' আবার কেউ কেউ বলেন, 'যাবিল কুরবা'র অংশটি রসুলুল্লাহ্র আত্মীয়-স্বজনদের পাওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ দু'টি অংশ অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্মের (যুদ্ধ সরঞ্জামাদি) ক্রয় বাবদ ব্যয় করা হবে।'[৩৩৬]

ইসলামি সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিবিন্যাস : সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে নিয়োজিত ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা : (ক) অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ) প্রতিষ্ঠান; (খ) আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) প্রতিষ্ঠান ও (গ) ঐচ্ছিক (নফল) প্রতিষ্ঠানসূহ।

(ক) অত্যাবশ্যকীয় (ফরজ) প্রতিষ্ঠান : অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠনগুলো হলো : (১) যাকাত; (২) 'উশর বা অর্ধেক 'উশর; (৩) কাফফারা; (৪) ফিদিয়া ও (৫) মোহর।

(খ) আবশ্যকীয় (ওয়াজিব) প্রতিষ্ঠান : আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো হলো : (১) সদাকাতুল ফিতর; (২) নাফাকাত; (৩) নাজর বা মান্নত; (৪) উদহিয়া বা কুরবানি ও (৫) আকিকা।

(গ) ঐচ্ছিক (নফল) প্রতিষ্ঠান : ঐচ্ছিক প্রতিষ্ঠানগুলো হলো : (১) নফল সদাকা; (২) হিবা; (৩) অসিয়াত; (৪) ওয়াকফ (৫) জারাইর; (৬) মিনাহ ও (৭) সারাইব। নিচে প্রত্যেকটি সম্পর্কে ধারাবহিকভাবে আলোকপাত করা হলো :

(১) যাকাত : যাকাত শব্দটি মাসদার বা ক্রিয়ামূল। বলা হয় : زكا 'যে জিনিস ক্রমশ বৃদ্ধি পায় ও পরিমাণে বেশি হয়।' زكا فلان অমুক ব্যক্তি যাকাত দিয়েছে। এর অর্থ হলো সুস্থ ও সুসংবদ্ধ হয়েছে। অতএব 'যাকাত'

৩৩৩. ইমাম বুখারি রহ., *সহিহ আল-বুখারি*(নয়া দিল্লী : ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭), কিতাবুল জিহাদ
৩৩৪. আবু 'উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫
৩৩৫. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১১
৩৩৬. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে البركة والنماء والطهارة والصلاح 'বরকত' পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধতা ও সুসংবদ্ধতা।[৩৩৭]

'লিসানুল আরব' গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ : الطهارة والنماء والبركة والمدح পবিত্রতা, ক্রমবৃদ্ধি, আধিক্য ও প্রশংসা। এসব কয়টি অর্থই কুরআন ও হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। ওয়াহিদি প্রমুখ বলেছেন, বাহ্যত زكا এর মৌলিক অর্থ হচ্ছে আধিক্য ও প্রবৃদ্ধি। আরবিতে বলা হয় زكا الزرع يزكو زكاء কৃষি ফসল বৃদ্ধি পেয়েছে। আর যে জিনিসই বৃদ্ধি পায়, তাই 'যাকাত' হয়। কৃষিফসল ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া তখনই সম্ভব যখন তা আবর্জনা মুক্ত হয়। তাই 'যাকাত' শব্দটিতে পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতার ভাবধারা বিদ্যমান। ব্যক্তির গুণ বর্ণনায় 'যাকাত' শব্দ ব্যবহৃত হলে তা হবে সুস্থতা-সুসংবদ্ধতা অর্থে। তখন ব্যক্তির মধ্যে কল্যাণের আধিক্য হওয়া বুঝাবে। যেমন বলা হয় : رجل زكى অর্থাৎ পবিত্র জাতির মধ্যে চরম মাত্রার কল্যাণসম্পন্ন ব্যক্তি।[৩৩৮]

শারি'আতের পরিভাষায় যাকাত : الزكاة فى الشرع : تطلق على الحصة المقدرة من المال التى فر ضها الله للمستحقين كما تطلق على نفس إخراج هذه الحصة শারি'আতের দৃষ্টিতে 'যাকাত' শব্দটি ব্যবহৃত হয় সম্পদের ঐ নির্দিষ্ট অংশ বুঝানোর জন্য ধনীদের সম্পদে আল্লাহ যা গরিবদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এমনিভাবে এ অংশ বের করাকেও যাকাত বলা হয়।[৩৩৯]

ধন-সম্পদের এ বেরকৃত অংশকে যাকাত এজন্য বলা হয় যে, তা সেই মালকে বৃদ্ধি করে যে মাল থেকে তা বের করা হয়েছে। প্রকৃত অর্থেই তা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়, বিপদাপদ থেকে রক্ষা পায়। ইমাম নববি রহ. ওয়াহিদি থেকে একথা বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবন তাইমিয়া বলেছেন, যাকাত দানের মাধ্যমে যাকাত দাতার হৃদয় পবিত্র হয়, তার সম্পদ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয় এবং প্রকৃত অর্থেই তা বেড়ে যায়।[৩৪০] ক্রমবৃদ্ধি ও পবিত্রতা কেবল মাল বা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা যাকাত দাতার অন্তরকেও পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করে। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا 'তাদের সম্পদ থেকে সদাকা গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।'[৩৪১] আযহারি বলেছেন, যাকাত দরিদ্রদেরকেও প্রবৃদ্ধি দান করে। এটি যাকাতের অর্থের দিকে একটি সুন্দর দৃষ্টিপাত যে, যাকাত ধনীদের পাশাপাশি তার গ্রহীতাকেও বস্তুগত ও আত্মিক দিক দিয়ে যথাক্রমে প্রবৃদ্ধি ও পবিত্রতা দান করে।[৩৪২]

বিভিন্ন মালের যাকাত সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিরাট উৎস : যাকাতের উৎস দুর্বল বা সংকীর্ণ নয় বরং তা বিশাল এবং প্রশস্ত। নগদ অর্থ, ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য, পশু-পাখি ছাড়াও কৃষি পণ্যের যাকাত যেমন তরকারি, ফল, শাক-সবজি প্রভৃতির উপর এক দশমাংশ অথবা বিশভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ সা.-এর বাণী হলো, فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقى بالنضح نصف العشر 'বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ছাড়া উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ উশর।'[৩৪৩]

বর্তমান যুগে ভবন ও ফ্যাক্টরিকে কৃষি জমির সাথে কিয়াস করতে হবে। বিভিন্ন হাদিসে এসেছে যে, মধুর উপরও মোট উৎপাদনের বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে এবং অন্যান্য প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন রেশম গুটি ও দুগ্ধদানকারী গাভী এবং মহিষ প্রভৃতিকে এর উপর কিয়াস করতে হবে। কিয়াস সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট ইসলামি শারি'আতের মূল বিষয়ের একটি, যা আল্লাহ তা'আলা হক ও ইনসাফের সাথে নাযিল করেছেন। এ জন্য যেভাবে দু'টি ভিন্ন বস্তুকে যেমন এক বলা যায় না, তেমনি দু'টি একই ধরনের বস্তুর মধ্যে পার্থক্যও করা যায় না। প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং ঋণ ইত্যাদি থেকে মুক্ত নগদ অর্থ ও ব্যবসায়ের মালের উপর প্রত্যেক নিসাবধারী মুসলিমের শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত ফরয হয়। দুধপ্রাপ্তি যোগ্য এবং বংশ

---

৩৩৭. সম্পাদনা বোর্ড, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৬), পৃ. ৩৯৮
৩৩৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১), খ.১, পৃ. ৪১
৩৩৯. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪২
৩৪০. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪২
৩৪১. আল-কুরআন, ৯ : ১০৩
৩৪২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪২
৩৪৩. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫২, হাদিস নং ১৩৯৬

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারের জন্য রক্ষিত প্রাণী যেমন উট, গাভী, বকরি প্রভৃতির উপরও প্রায় একই পরিমাণ যাকাত ফরয হয়ে থাকে। শর্ত হলো নিসাব পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছতে হবে এবং বছরের বেশির ভাগই বিনামূল্যে ঘাস ও পানি খাইয়ে চরান হয় এমন হতে হবে। কিন্তু হযরত ইমাম মালিক রহ. চতুস্পদ জন্তুর যাকাত ঐ অবস্থাতেও ওয়াজিব হবে বলেছেন যখন তার মালিক সারা বছর খাইয়েছে এবং পানি পান করিয়েছে। কতিপয় সাহাবা এবং তাবি'ইন ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. এ মতেরই সমর্থক।

খননকৃত পুরাতাত্ত্বিক সম্পদের উপরও পাঁচ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হয়। ফকিহদের মতে, খনিজসম্পদও এ নির্দেশের আওতায় আসবে। যদিও এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ পঞ্চমাংশ যাকাতের মত বণ্টন করে দিতে হবে অথবা তাকে ফাই এর মালের মত রাষ্ট্রের সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।[৩৪৪]

যাকাত এর ব্যয়-বণ্টন : মালে ফাই এবং মালে গনিমতের খুমুসের ন্যায় যাকাতের ব্যয়ের খাতও কুরআন মাজিদে বর্ণনা করা হয়েছে। সদাকার মধ্যে দু'টি দিক রয়েছে। যেমন : (১) আদায় ও (২) বণ্টন।[৩৪৫]

যারা যাকাত পাওয়ার যোগ্য তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

'সদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট, কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রাজ্ঞাময়।'[৩৪৬]

ফকিহগণ যাকাতের সম্পদে ফকিরদের অধিকার প্রশ্নে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তারা যাকাতের মালকে সাধারণভাবে ব্যবহার বৈধ মনে করেননি। যেমন : সৈন্যদের বেতন ইত্যাদি বাবদ যাকাতের মাল ব্যবহার করা যায় না। তবে সরকারের বাজেটে যদি ঘাটতি দেখা দেয় এবং যাকাতের বাইতুল মালে যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে সেখান থেকে ধার নিয়ে সরকারি বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা যায়। অতঃপর যখন সরকারি বাজেটে উদ্বৃত্ত হবে তখন যাকাতের বাজেট থেকে ধারকৃত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু হানিফার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান বলেছেন, ইসলামি রাষ্ট্রের শাসকদের যাকাত ও সদাকার সম্পদ থেকে ব্যয়ের প্রশ্নে আল্লাহর ভয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে। প্রত্যেক ফকিরকে সদাকা বা যাকাতের সম্পদ থেকে তার হক দিয়ে দিবে। এমনকি তাকে ও তার পরিবারকে ধনী বানিয়ে দিবে। যদি কিছু মুসলিম গরিব থাকে এবং বাইতুল মালে সদাকা প্রভৃতি না থাকে তাহলে মুসলিম শাসক খারাজের বাইতুল মাল থেকে তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারে। এতে সদাকার বাইতুল মালের উপর কোনো ঋণ আরোপিত হবে না। অর্থাৎ তা পরিশোধ করতে হবে না। এজন্য যখন শাসকেরা সদাকার বাইতুল মাল থেকে কোনো অংশ অন্য খাতে ব্যয় করবেন তখন তা বাইতুল মালের ঋণ হিসেবে গণ্য হবে, কেননা তাতে ফকিরদের অধিকার রয়েছে। মহানবি সা. বলেন, أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته 'যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় আর সে যদি ঋণ পুরা করার মতো সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তা আদায় করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোনো ধন-সম্পদ রেখে মারা যায়, তা হবে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।'[৩৪৭]

তিনি আরো বলেন, من ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه 'যে লোক ঋণগ্রস্থ হয়ে অথবা সহায়-সম্বলহীন অক্ষম সন্তানাদি রেখে মারা যাবে, পরে তারা যেন আমার নিকট আসে। কেননা এরূপ অবস্থায় আমিই তাদের অভিভাবক।'[৩৪৮] অন্য হাদিসে রয়েছে, من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فعلينا 'যে লোক ধন-সম্পদ রেখে

৩৪৪. ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, *মাশকালাতুল ফাকরি ওয়া কাইফা 'আলাজাহাল ইসলামু*(কায়রো : মাকতাবা আল-ওয়াহবা, ২০০৩), পৃ. ৬৪-৬৬
৩৪৫. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
৩৪৬. আল-কুরআন, ৯ : ৬০
৩৪৭. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১৮৭-১৮৮, হাদিস নং ৬২৭৫
৩৪৮. ইমাম মুসলিম রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১২২, হাদিস নং ৪০১৪

Dhaka University Institutional Repository

মারা যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। আর যে লোক দুর্বহ বোঝা, অসহায় সন্তানাদি ও পরিবার রেখে যাবে, তা বহনের দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।’[৩৪৯]

মুসনাদে আহমাদে মালিক ইবন আওস থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ‘উমর রা. বলেছেন,

والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال نصيب والله لئن بقيت لهم لأوتين الراعى بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه

‘আল্লাহর কসম! রাষ্ট্রীয় সম্পদে কোনো লোকই অপর কারো তুলনায় অধিক পাওয়ার অধিকারী নয়। আমিও কারো অপেক্ষা বেশি অধিকার সম্পন্ন নই। আল্লাহর শপথ! এ সম্পদে প্রত্যেকটি মুসলিমেরই প্রাপ্য অংশ রয়েছে। আল্লাহর কসম! আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে সান‘আর রাখালকেও এ সম্পদ থেকে তার অংশ অবশ্যই প্রদান করব। অথচ সে তার নিজের স্থানে পশু-পালনের কাজে ব্যস্ত থাকবে।’[৩৫০]

হযরত ‘উমর রা.-এর এ হাদিস প্রসঙ্গে ইমাম শাওকানি বলেছেন, এ হাদিসই দলিল যে, মুসলিম জাহানের শাসক সাধারণ মানুষের মতই। এ ব্যাপারে অন্য কারো চেয়ে তার বেশি মর্যাদা নেই। গনিমতের সম্পদ প্রভৃতি থেকে তাকে আগে অথবা বেশি দেয়া যায় না। এমনিভাবে এ হাদিস এ কথারও দলিল যে, ইসলামি রাষ্ট্রের ছায়ার অধীনে প্রত্যেক মানুষ সে যতদূরেই থাকুক না কেনো এবং তার মর্যাদা যত ছোটই হোক না কেনো সে সামষ্টিক সম্পদ থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার অধিকার ও প্রয়োজনানুযায়ী তার অংশ পেয়ে যাবে।[৩৫১]

হযরত ‘উমর রা. হযরত খালিদকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, ‘এ ধন-সম্পদ সরকারি ব্যবস্থাধীন। তা একান্তভাবে গরিব জনগণের জন্য এবং তা তাদের জন্য জমা রেখে তাদের জন্যই ব্যয় করতে হবে।[৩৫২]

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রণীত কিতাবুল খারাজে যে চুক্তির বিবরণ রয়েছে, যা হযরত খালিদ ইবন ওয়ালিদ রা. ইরাকের হীরা এলাকার খ্রিস্টানদের সাথে সম্পাদন করেছিলেন। এ রাজনৈতিক দলিলে পরিস্কারভাবে লেখা ছিল যে, তাদের দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা, রোগ ও বার্ধক্য তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে এবং তাদের খরচ মুসলিমদের বাইতুল মাল থেকে দেয়া হবে। ইতিহাসে এ সামাজিক নিরাপত্তার এটাই প্রথম উদাহরণ। যা বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

দামিশক সফরের সময়ও হযরত ‘উমর রা. অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বাইতুল মাল থেকে বৃত্তি নির্ধারণ করার আদেশ জারি করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি একজন ইয়াহুদির জন্য বাইতুল মাল থেকে ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন এবং বাইতুল মালের খাজাঞ্চিকে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘তার এবং তার মত লোকদের জন্য বাইতুল মাল থেকে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার জন্য।’[৩৫৩]

এতে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের অমুসলিম বাসিন্দাদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রসঙ্গে স্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এভাবে ইসলামি রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের ভারণ-পোষণ এমন এক সুন্নাত হয়ে গিয়েছিল যা ভবিষ্যতের ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হয়ে গিয়েছিল। কেননা শারি‘আতের আলোকে রচিত খুলাফায়ে রাশিদার নীতিই ইসলামের অংশ এবং তা মানা মুসলিমদের জন্য ফরয। যেমন রাসুলের সুন্নাত মানাও ফরয। এ প্রসঙ্গে রাসুলের বাণী হলো,

من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد.

‘তোমাদের মধ্যে আমার পরে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মত-পার্থক্য দেখতে পাবে। এমতাবস্থায় তোমাদের উচিত হবে আমার ও আমার খুলাফায়ে রাশিদার সুন্নাতের অনুসরণ করা, যারা সত্য ও ন্যায়ের অনুসারী। তোমরা তাদের দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করবে।’[৩৫৪]

হযরত ‘উমর ইবন আবদুল আযিয রহ. তার বসরার শাসনকর্তা আদি ইবন আরতাতকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এ চিঠিতে তিনি তাকে বসরার জনগণকে বিশেষ করে বৃদ্ধ যিম্মি, কর্মশক্তিহীন, অক্ষম এবং উপার্জন-উপায়হীন লোকদেরকে প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বাইতুল মাল থেকে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

---

৩৪৯. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ১৮৭-১৮৮, হাদিস নং ৬২৭৫

৩৫০. ইমাম ইবন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*(কায়রো : মাতবা‘আ আশ-শারকিল ইসলামি, ১৮৯৫), পৃ. ৪২

৩৫১. আশ-শাওকানি, *নাইলুল আউতার*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৭৯

৩৫২. আলি ইবন আবু বকর আল-হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ*(কায়রো : মাকতাবাত আল-কুদ্স, ১৩৫২ হি.), পৃ. ৩৪৯

৩৫৩. আলি ইবন আবু বকর আল-হাইসামি, *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মামবাউল ফাওয়ায়িদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

৩৫৪. ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ*(বৈরুত : লেবানন, দারুল ফিকর, ১৯৯৪), খ.৫, পৃ. ৩৮৮, হাদিস নং ৪৫৫২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ পারস্পরিক গভীর সম্পর্কযুক্ত একটি পরিবার। এ সমাজের ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর সম্পর্ক অর্থনৈতিক উৎপাদনের সম্পর্কের চেয়েও গভীর ও মযবুত। এ সম্পর্কের বুনিয়াদ হল ইমান ও ইসলাম। যা সমাজের সকল ব্যক্তিকে একই লক্ষ্যে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর এ এক লক্ষ্যের অভিসারী হওয়ার কারণে তাদের আকিদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আবেগ-অনুভূতি, আইন-কানুন এবং শুরু ও শেষের এক গভীর ঐক্য সৃষ্টি হয়। এজন্য ইসলাম সমাজকে একটি শরীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি হলেন শরীররূপী সমাজের মাথা। শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গের ন্যায় এরা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। একে অপরের সাহায্যকারী, সাহায্যের অধিকারী।

সরকারের দায়িত্ব শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয় যে, সে শুধু ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের সমস্যা থেকে হিফাযত করবে; বরং তার দায়িত্বের পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত। বস্তুত ইসলামে আমির বা ইমাম হলেন পরিবারের পিতা বা অভিভাবকের ন্যায়। এজন্যই রসুল সা. হাদিসে তাদের উভয়কে একত্রিত করেছেন। রসুল সা. বলেন,

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته والرجل فى أهل بيته راع وهو مسئول عن رعيته

'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজের প্রজা সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। শাসক বা আমির জাতির দায়িত্বশীল এবং নিজের প্রজা সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আর ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল তাকে তার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।'[৩৫৫]

পিতার দায়িত্ব শুধু পরিবারের হিফাযত করা নয়; বরং সে তাদের ভরণ-পোষণ, প্রশিক্ষণ এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের মধ্যে ইনসাফ কায়েম করার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। এমনিভাবে জাতির শাসককে সে সকল প্রজাদের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে যাদেরকে আল্লাহ তার অধীন করেছেন। হযরত 'উমর রা. বলতেন,

لو مات جمل ضياعا على شاطئ الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه

'ফুরাত নদীর তীরে একটি উটও যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে মারা যায়, তাহলেও আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ হয়ত আমার নিকট কৈফিয়ত চাইবেন, উটটির চলার পথ কেন সমতল করনি?'[৩৫৬]

'উমর ইবন রা. খলিফা হিসেবে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে কত বেশি সচেতন ছিলেন, তা তার উপরিউক্ত ভাষণ থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুত ইসলাম যে রাষ্ট্রপ্রধানের উপরই সকল মানুষের প্রয়োজন পূরণের ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব অর্পণ করে, এ তারই বহিঃপ্রকাশ ও অকাট্য প্রমাণ।

যখন জনগণ হযরত উমর ইবন আব্দুল আযিযের নিকট বাই'আত করল এবং তার খিলাফত কায়েম হয়ে গেল তখন তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তার গোলাম তাকে বলল, 'কোন কারণে আপনি এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন? অথচ এ সময় তো দুশ্চিন্তা ও চিন্তা-ভাবনার সময় নয়।' তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক! আমি কেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হব না। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমে বসবাসকারী মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের হক আদায়ের জন্য আমার কাছে দাবি জানাচ্ছে। তারা তাদের হক বা অধিকারের ব্যাপারে আমাকে লিখুক বা না লিখক।' খুলাফায়ে রাশিদার দায়িত্বনুভূতি সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তিনি পূর্ব বা পশ্চিমে বসবাসকারী প্রত্যেক উম্মতের ব্যাপারে নিজেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করেছেন এবং অনুভূতি রাখতেন যে প্রত্যেক উম্মাত বিশেষ করে অসহায়, দুর্বল, রোগী, বৃদ্ধ, বিধবা এবং ইয়াতিমের অধিকার আদায় তার উপর ফরয। সে নিজের অধিকারের কথা লিখিতভাবে বা সাক্ষাৎ করে জানিয়ে থাকুক বা না থাকুক।

ন্যায় ও ইনসাফ কায়িম, ভাল ও উত্তম কাজের দা'ওয়াত প্রদান, ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাই হল ইসলামি রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য। ন্যায় ও ইনসাফ এবং ভাল কাজের বিপরীতধর্মী ব্যাপার হলো দুর্বল ও অসাহয় লোক ভুখা থাকবে এবং ফকির-মিসকিন খানা-পিনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থানের মত জীবনের মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকবে। অথচ সমাজের বিত্তশালীদের নিকট যথেষ্ট সম্পদ অহেতুক

৩৫৫. ইমাম বুখারী রহ., *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৪০৫, হাদিস নং ৬৬৫৩
৩৫৬. মুহাম্মদ ইবন সা'দ আল-যাহরি, *তাবাকাতে ইবন সা'দ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৩০৫

Dhaka University Institutional Repository

পড়ে থাকবে– এটা কোনোক্রমেই হতে পারে না। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষার সমস্যা সমাধান এবং ফকিরদের সচ্ছল জীবন প্রদানে বিভিন্ন মাধ্যম অবলম্বনও ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব। যাতে সমাজে পারস্পরিক নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জিত হয়। এ মাধ্যম স্থান, কাল ভিন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হতে পারে এবং ইসলামি উম্মাহর ক্ষমতাবান ও বিজ্ঞ লোকদের জন্য ইজতিহাদের পথও খোলা রয়েছে। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষা সমস্যা সমাধানে উদাহরণ স্বরূপ অনেক পন্থার মধ্যে শুধু একটি পন্থার কথাই উল্লেখ করাই যথেষ্ট। এ পন্থা হযরত ‘উমর রা. অবলম্বন করেছিলেন। তিনি মদিনার নিকট ‘রাবযাহ’ নামক এক খন্ড জামি সরকারি মালিকানায় আনলেন। যাতে মুসলিমদের গবাদি পশু চরতে পারে। কিন্তু তিনি সরকারি মালিকানায় আনাই যথেষ্ট মনে করলেন না। বরং তিনি ফকির-মিসকিন এবং কম আয়ের মুসলিমদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলেন। যাতে তারা বিনা ব্যয়ে চারণ ভূমিকে নিজেদের গবাদি পশু সম্পদ ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারেন এবং সরকারের কাছে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা না চায়। এ উদ্দেশ্যে হযরত ‘উমর রা.-এর নির্দেশ সুস্পষ্ট রয়েছে। তিনি চারণভূমিটির তত্ত্বাবধায়ক হুনির প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, হে হুনি, মানুষের সাথে নরম ব্যবহার এবং মযলুমের দু‘আকে ভয় কর। কেননা তাদের দু‘আ কবুল করা হয়। কম উট এবং কম বকরির মালিকদেরকে চারণ ভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দিবে। ইবন ‘আফফান ও ইবন ‘আওয়াফের গবাদি পশুকে (অর্থাৎ উম্মাতের আমিরদের উট ও ভেড়া বকরি) থাকতে দিও না। কেননা তাদের গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেলে তারা নিজেদের অন্য ক্ষেত এবং খেজুরের বাগানের দিকে ফিরিয়ে নিবে। অর্থাৎ তাদের নিকট অন্য সম্পদ এবং আমদানির মাধ্যম রয়েছে। আর এ সব মিসকিনের (কম উট এবং বকরির মালিক) গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলে নিজের সন্তান-সন্ততিসহ আমার কাছে এসে চিৎকার দিয়ে বলবে, ‘হে আমিরুল মু’মিনিন। আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করব? আমি কি তাদের বাবা নই? এ জন্য তাদের ধন-সম্পদ সরবরাহ করা থেকে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।’[৩৫৭]

হযরত ‘উমর রা.-এর উল্লিখিত নির্দেশে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশই রয়েছে। এ নির্দেশে তিনটি বিষয় পাওয়া যায়। প্রথমত মুসলিম সরকারের জন্য এটা আবশ্যক যে, সকল কম সম্পদ ও কম আয়ের মুসলিমদের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখবে এবং তাদের জন্য এমন সুযোগ সৃষ্টি করবে যাতে তারা কাজ করে রোজগার করতে পারে এবং ধনী হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যদি ধনী ও বিত্তশালীদের উন্নয়নের প্রশ্নটি খাটোও করতে হয় এবং তাদের সম্পদ লাভের ও আয়ের কিছু কিছু মাধ্যম থেকে বঞ্চিতও করতে হয় এবং তাদের আয় বৃদ্ধি ও উন্নয়নে বাধাও দিতে হয় তাহলে তাই করতে হবে। যেমন হযরত ‘উমর রা.-এর এ কথা স্পষ্ট। কথাটি তিনি বলেছিলেন চারণভূমির তত্ত্বাবাধয়ককে। তিনি বলেছিলেন, কম উট ও বকরির মালিকদেরকে চারণভূমিতে প্রবেশের অনুমতি দিও এবং ইবন আফফান ও ইবন ‘আওফের গবাদি পশুকে থাকতে দিও না।

দ্বিতীয়ত: ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির এ অধিকার রয়েছে যে, যদি তার আয়ের মাধ্যম ধ্বংস হয়ে যায় এবং রুটি-রুজির কোনো মাধ্যম না থাকে তাহলে সে তৎকালীন শাসকের সামনে হাজির হয়ে নিজের ও নিজের সন্তানদের জন্য চিৎকার দিতে পারবে। ইসলামি রাষ্ট্রের সাধারণ কোষাগার থেকে সাহায্য প্রদানের দাবিও সে করতে পারবে। তৎকালীন শাসকের অথবা সরকারের তার দাবি পূরণ এবং তার ও তার পরিবারের প্রয়োজন পূরণ ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। যেমন হযরত ‘উমর রা. বলেছেন, এবং এ সব মিসকিনের গবাদি পশু ধ্বংস হয়ে গেলে সে তার নিজের সন্তানদের সাথে নিয়ে আমার কাছে এসে চিৎকার দিবে যে, হে আমিরুল মু’মিনিন! আমি কি সন্তানদেরকে পরিত্যাগ করব?

তৃতীয়ত: এখান থেকে বাস্তবসম্মত হিকমত লাভ করা যায়। সে হিকমত হলো, ফকির-মিসকিনদের মধ্যে যারা কাজ করার ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কোনো কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে এবং কম আয়ের মুসলিমের আয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যাতে ফকির ও স্বল্প আয়ের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় এবং শ্রমের কারণে সরকারি সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী না থাকে ও বাইতুল মালের উপর বোঝা হয়ে না যায়। এ কথা

---

৩৫৭. আবু ‘উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

Dhaka University Institutional Repository

হযরত 'উমর রা.-এর সেই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, ধন সম্পদের চেয়ে ঘাস সরবরাহ করা আমার পক্ষে সহজ।

ফকির ও মিসকিন : যাকাত ব্যয়ের আটটি খাতের মধ্যে প্রথম দুটি হচ্ছে : ফকির ও মিসকিন। যাকাতের সম্পদে তাদের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ থেকেই যাকাত ব্যবস্থা প্রচলণের লক্ষ্য বোঝা যায়। ইসলামি সমাজে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন স্থায়ী হতে পারে না। এর বড় প্রমাণ যাকাত ব্যয়ের খাত বিষয়ে কথা শুরু করে কুরআন মাজিদ সর্বাগ্রে ফকির-মিসকিনদের কথা বলছে। আরবি কথনরীতির নিয়ম হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার আগে বলা। দারিদ্র্য দূর করা ও ফকির-মিসকিনদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানই যাকাত ব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য। সে কারণে নবি কারিম সা. কোন কোন হাদিসে শুধু এ কথাটিরই উল্লেখ করেছেন। তিনি হযরত মুআ'যকে যখন ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন, তখন তাকে বললেন,

أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

'তাদের জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে তাদের গরিব লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হবে।'[৩৫৮]

কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত 'ফকির' ও 'মিসকিন' বলতে কাদেরকে বুঝায়? এরা কি দুই শ্রেণির লোক না কি একই শ্রেণির। ইমাম আবু ইউসুফ ও মালিকি মাযহাবের ইবনুল কাসিমের মতে এরা একই পর্যায়ের। কিন্তু জমহুর ফিকাহবিদদের মতে– এরা আসলেই দু'ধরনের লোক; একই প্রজাতিভুক্ত। আর সে প্রজাতি হচ্ছে অভাব-অনটনে লাঞ্চিত জনগণ। একই আয়াতে একই প্রসঙ্গে শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে, তাৎপর্য নির্ধারণে এ বিষয়টির প্রতি অবশ্যই গুরুত্বারোপ করতে হবে। এ ঠিক 'ইসলাম' ও 'ইমান' শব্দদ্বয়ের ব্যবহারের মত। বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, এ দু'টি শব্দ এক স্থানে ব্যবহৃত হলে তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হবে। তখন প্রতিটি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ হবে। আর এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হলে অর্থ হবে অভিন্ন। এ দৃষ্টিতেই প্রশ্ন উঠেছে, এখানে 'ফকির' ও 'মিসকিন' এ শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য কি?

ইমাম তাবারি রহ. বলেছেন, 'ফকির' দ্বারা উদ্দেশ্য সে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি, যে নিজেকে সবধরনের লাঞ্চনা থেকে রক্ষা করে চলছে, যে কারো কাছে কিছু চায় না। আর 'মিসকিন' সে অভাবগ্রস্ত ও লাঞ্চনাগ্রস্ত ব্যক্তি যে, ভিক্ষা করে।'[৩৫৯] তার এ ব্যাখ্যাকে আরো শক্তিশালী করেছে কুরআনের শব্দ المسكنة শব্দটি লাঞ্চনার অর্থ প্রকাশ করে। যেমনটি আল্লাহ ইয়াহুদিদের ব্যাপারে বলেছেন, 'তারা লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যগ্রস্ত হল।'[৩৬০] সহিহ হাদিসে বলা হয়েছে,

ليس المسكين الذى ترده التمر والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان إنما المسكين الذى يتعفف

'একটি খেজুর কি দু'টি খেজুর আর এক গ্রাস খাদ্য কি দু'গ্রাস খাদ্য যাকে দ্বারে দ্বারে ঘুরাতে থাকে, সে প্রকৃত মিসকিন নয়। মিসকিন সে ব্যক্তিই যে ভিক্ষা করা থেকে বিরত থাকে।'[৩৬১]

গোপনে আত্মসম্মান রক্ষাকারী দরিদ্ররা যাকাত পাওয়ার যোগ্য : অধিকাংশ মানুষ মনে করে, যারা মানুষের কাছে ভিক্ষা করাকে নিজেদের পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা নিদেজের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতার কথা প্রকাশ করে বেড়ায়, সভাস্থল, বাজার ও মসজিদের দরজায় যারা সকাল-সন্ধ্যায় নিজেদের হাত প্রসারিত করে দেয়, তারাই মিসকিন, তারাই দরিদ্র। প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মনে এ ধারণাই বিদ্যমান। এমনকি রসুল সা.-এর যুগেও লোকদের অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল। তাই তিনি মানুষদেরকে সতর্ক করে দিয়ে প্রকৃত অভাবী ও মিসকিন-এর পরিচয় তুলে ধরেছেন যারা সত্যিকার অর্থে সমাজের সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত। রসুল সা. এ ব্যাপারে বলেছেন,

'সে ব্যক্তি মিসকিন নয়, যাকে একটি খেজুর বা দু'টি খেজুর অথবা এক মুষ্টি বা দুই মুষ্টি খাবার ফিরিয়ে দেয়। প্রকৃত মিসকিন সে ব্যক্তি যে আত্মসম্মানের কারণে ভিক্ষা করে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'যারা লোকদের জড়িয়ে ধরে ভিক্ষা চায় না।'[৩৬২] অর্থাৎ কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় না, ভিক্ষা দিতে লোকদের বাধ্য

৩৫৮. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৩, হাদিন নং ১৩১৩
৩৫৯. ড. ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৫
৩৬০. আল-কুরআন, ২ : ৬১
৩৬১. ইমাম বুখারী রহ. অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ২৯৬, হাদিস নং ৪১৮৩
৩৬২. হাফিজ ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*(কায়রো : দারুত তাক্বওয়া, তা.বি.), খ.১, পৃ. ৩২৪

Dhaka University Institutional Repository

করে না। চূড়ান্তভাবে ঠেকে না গেলে। নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে চায় সে মানুষদেরকে দিতে বাধ্য করে এবং কাঁদ কাঁদ হয়ে ভিক্ষা চায় সে মিসকিন নয়। এর দ্বারা ঐ সকল মুহাজিরদের গুণ বর্ণনা করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের সবকিছু পরিত্যাগ করে মদিনায় চলে এসেছে। এদের ধন-সম্পদ ও আয়-উপার্জন কিছুই নেই, যা দ্বারা তারা নিজেদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।[৩৬৩] এ সকল লোকের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তা প্রাপ্য অভাবগ্রস্ত লোকদের; যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘুরাফিরা করতে পারে না; যাচঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে; তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে যাচঞা করে না।'[৩৬৪]

হযরত হাসান বসরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এ ব্যক্তির ঘরবাড়ি আছে, খাদিম আছে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে কি না? জবাবে তিনি বলেছেন, সে যদি অভাব বোধ করে তাহলে যাকাত গ্রহণ করতে পারে, তাতে তার কোনো দোষ নেই।[৩৬৫]

মুসলিম বন্দিকে দাসমুক্তির অংশ দিয়ে মুক্ত করণ : কুরআনের ব্যবহৃত শব্দ فى الرقاب কেবল ক্রীতদাসকেই বুঝায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ শব্দটির সাধারণ প্রয়োগে মুসলিম বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত করা ও তাদের মুক্তির জন্য এ অংশের যাকাত ব্যয় করা যাবে কিনা? যাদের উপর কাফির শত্রুরা ঠিক সেভাবেই প্রভুত্ব করে যেমন করে মনিব মালিক তার ক্রীতদাসের উপর। আসলে এ মুসলিম বন্দিরা ঠিক ক্রীতদাসদের মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যেই নিপতিত হয়ে থাকে। মুসলিম বন্দি প্রজাদের বেলায় মুসলিম রাষ্ট্রের কর্তব্য জনসাধারণের কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে অর্থদান করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা।[৩৬৬] কুর'আনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, যাকাতের কিয়দংশ ব্যয় করা হবে কিছু মস্তক রক্ষা করার জন্য: 'সদাকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য।'[৩৬৭] অর্থাৎ বন্দি ও দাসগণকে মুক্ত করার কথা বলা হয়েছে।[৩৬৮]

এ মর্মে বুখারি ও মুসলিমের হাদিসে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। যেমন ইমাম বুখারি বর্ণনা করেন,

عن ابى موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكوا العانى يعنى الأسير واطعموا الجائع وعودوا المريض

'হযরত আবু মুসা রা. থেকে বর্ণিত, রসুল সা. বলেছেন, তোমরা বন্দি মুক্ত করে দাও, ক্ষুধার্তকে খাওয়াও এবং রোগীর সেবা কর।'[৩৬৯] হযরত 'উমর রা. হুকুম দিলেন, 'অমুসলিমদের হাতে বন্দি প্রত্যেক মুসলিমকে 'বাইতুল মাল' থেকে অর্থের বিনিময়ে মুক্ত করতে হবে।'[৩৭০] ইমাম আহমাদের মতানুযায়ী তা সম্পূর্ণ জায়িয। মুসলিম বন্দিকে যাকাতের টাকা দিয়ে মুক্ত করা অবশ্যই শারি'আহ সম্মত কাজ। কেননা তাতেও 'ঘাড়'-কে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা হয়।[৩৭১]

ইবনুস সাবিলকে যাকাতের অংশ প্রদান করা : জমহুর আলিমগণের মতে ' ইবনুস সাবিল' বলে বুঝানো হয়েছে সে পথিক-মুসাফিরকে, যে এক শহর থেকে অন্য শহরে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে চলে যায়। 'সাবিল' অর্থ পথ, পথিককে 'ইবনুস সাবিল' বলা হয় এজন্য যে, পথিকের জন্য পথই হয় অবিচ্ছিন্ন সাথী।

তাবারি মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, ইবনুস সাবিল বা পথিক ব্যক্তির যাকাতের সম্পদে একটা হক রয়েছে। সে যদি ধনী হয় তবুও– যদি সে তার নিজের ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইবন যাইদ বলেছেন, 'ইবনুস সাবিল' মানে মুসাফির, পথিক– সে ধনী হোক, কি দরিদ্র উভয় অবস্থায়ই, যদি সে স্বীয়

---

৩৬৩. ইবন কাছির, *তাফরিল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৩২৪
৩৬৪. আল-কুরআন, ২ : ২৭৩
৩৬৫. আবু 'উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৬
৩৬৬. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১২১
৩৬৭. আল-কুরআন, ৯ : ৬০
৩৬৮. ইবন কাছির, *তাফসিরুল কুরআনিল আযিম*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪৩৯
৩৬৯. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ২১৬, হাদিস নং ২৮৩২
৩৭০. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
৩৭১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয় ব্যয়ের ব্যাপারে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, সম্পদ হারিয়ে ফেলে অথবা অন্য কোনো ধরনের বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়ে অথবা তার হাতে যদি কোনো সম্পদই না থাকে, তাহলে তার এ হক অবশ্যই প্রাপ্য।[৩৭২]
কুরআন মাজিদে 'ইবনুস সাবিল' শব্দটি দয়ার পাত্র হিসেবে– সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিকারীরূপে আট বার উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনের মাক্কি অংশের সুরা আল-ইসরায় আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় করবে না।'[৩৭৩]

সুরা আর-রুম-এ বলা হয়েছে, 'আত্মীয়-স্বজনকে দিবে তার হক এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে তাদের জন্য তা শ্রেয়।'[৩৭৪]

কুরআনের মাদানি সুরাসমূহে 'ইবনুস সাবিল'-কে ফরয কিংবা নফল অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'লোকে কি ব্যয় করবে সে সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে। বল, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন এবং মুসাফিরদের জন্য।'[৩৭৫]
নিঃস্ব পথিকের ব্যাপারে কুরআনে এতটা গুরুত্ব প্রদানের মূলে নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা হচ্ছে, ইসলাম মানুষকে দেশভ্রমণ ও বিদেশ গমণের উপদেশ দিয়েছে নানাভাবে ও বিবিধ কারণে। ইসলাম এ সব সফরের জন্য আহ্বান জানিয়েছে, উৎসাহ দিয়েছে। পৃথিবীতে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্যে মুসলিমদের এ সব পরিভ্রমণে উদ্বুদ্ধ করেছে। ইসলামের মহান শিক্ষার বাস্তবায়ন এভাবেই সম্ভবপর হতে পারে। এ ছাড়া আরো কয়েক ধরনের বিশ্বপরিভ্রমণ রয়েছে। আর ইসলামের বৈশিষ্ট্যই এখানে যে, এসব সফরে গমণকারী লোকদের প্রতি তা খুব বেশি ও বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। আরও বিশেষ করে তাদের প্রতি যারা এ সফরে বের হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছে এবং তার আপন লোকজন ও ধন-সম্পদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
ইসলাম সাধারণভাবেই এ সবের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং বিশেষ করে যাকাতের অংশ জনগণের দেয়া সম্পদ থেকে তাদের প্রয়োজন পরিমাণ দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর তা করে বিদেশ ভ্রমণের পক্ষে ইসলামের উৎসাহ দানকে শক্তিশালী করেছে, শারি'আহসম্মত উদ্দেশ্যে বিদেশ ভ্রমণের কাজটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভ্রমণকারীদের অপরিচিত পরিমণ্ডলে সম্মান ও মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী বানিয়েছে। মুসলিম সমাজের সকল অংশই যে পরস্পর সম্পৃক্ত, দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ তার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে। এ সমাজের লোকেরা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে, একের বিপদ বা অসুবিধায় অপর লোক বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেয়। সে ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশীদের মধ্যে ইসলামে কোন পার্থক্যই করা যেতে পারে না।
নিজের জন্য ঋণ গ্রহণকারীকে সাহায্য দেয়ার শর্ত : এ প্রকার ঋণ গ্রহণকারীকে চারটি শর্তে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সাহায্য দেয়া যাবে। শর্ত চারটি হলো :

১. ঋণ পরিশোধ করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন থাকতে হবে। সে যদি ধনী হয়, নগদ টাকা ও জিনিসপত্র দিয়ে তা শোধ করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে যাকাত থেকে কোনো অংশ দেয়া যাবে না। যদি ঋণের কিছু অংশ শোধ করার মত টাকা তার থাকে তাহলে তাকে অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ পরিমাণ টাকা দেয়া যাবে। যদি সে কোনো কিছুর মালিক না হয়, কিন্তু কাজ ও উপার্জনের মাধ্যমে তা পরিশোধ করতে সক্ষম হয় তাহলেও তাকে যাকাত দেয়া যাবে। কেননা কাজ বা উপার্জন করে পরিশোধ করতে অনেক সময় লাগবে, এ সময়ের মধ্যে ঋণ শোধের প্রতিবন্ধক কোন কিছু ঘটতে পারে।

২. লোকটি এমন হতে হবে যে, সে ঋণ করেছে আল্লাহর ইবাদত পালন বা কোনো মুবাহ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করার জন্য। যদি সে কোনো পাপের কাজ করার জন্য ঋণ করে থাকে, যেমন– মদপান, ব্যভিচার, জুয়া, হাস্য-কৌতুক, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের হারাম কাজ করার জন্য, তাহলে

৩৭২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭০
৩৭৩. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬
৩৭৪. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৮
৩৭৫. আল-কুরআন, ২ : ২১৫

Dhaka University Institutional Repository

তাকে যাকাত থেকে দেয়া যাবে না। অনুরূপভাবে নিজের ও পরিবারের জন্য ব্যয় করার সময় যদি সে অপচয়-অপব্যয় করে থাকে তাহলে তাকে ঋণ দেয়া যাবে না। যদিও সে অপচয় কোনো মুবাহ পর্যায়ের কাজেও হয়। কেননা মুবাহ কাজে ঋণী হয়ে যাওয়ার পরিমাণ অপচয় করা মুসলিমের জন্য হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বনি আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে, আহার করবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।'[৩৭৬] পাপ কাজে ব্যয় করার জন্য ঋণ গ্রহণকারীকে যাকাত দেয়া যাবে না এ কারণে যে, তা দিলে আল্লাহর নাফরমানির কাজে তাকে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহর সীমালঙ্ঘনে তার অনুসরণ করতে অন্যদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

৩. ঋণটা সাম্প্রতিক হতে হবে। ঋণ যদি দীর্ঘ মেয়াদি হয়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা? তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে। কেননা সে তো 'গারিমুন' বা ঋণগ্রস্ত। কুরআনের আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। কেউ বলেছেন, দেয়া যাবে না। কেননা বর্তমানে সে ঋণ আদায়ে বাধ্য নয়। কেউ বলেছেন, যদি ঋণের মেয়াদ সে বছরই শুরু হয়, তাহলে দেয়া যাবে, অন্যথায় সে বছরের যাকাত থেকে তাকে দেয়া যাবে না।
৪. ঋণটা এমন হতে হবে যার কারণে ঋণগ্রহীতাকে বন্দি করা যেতে পারে। তবে কাফফারা ও যাকাত দেয়ার দরুন গৃহীত ঋণ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা যে ঋণের কারণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বন্দি করা যেতে পারে, তা হচ্ছে মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করা ঋণ। যাকাত ও কাফফারা পর্যায়ের কাজগুলো হলো আল্লাহর জন্য।

এগুলো হলো মালিকি মাযহাবের অভিমত। সকল ফিকাহ শাস্ত্রবিদই এ শর্তগুলো আরোপ করেননি। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী যে ঋণের দাবি মানুষের পক্ষ থেকে করা হয় এমন প্রত্যেক ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।[৩৭৭]

দ্বিতীয়ত : অন্যের কল্যাণে বা সমাজ-সমষ্টির কল্যাণে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি : ঋণগ্রস্তদের দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে, সমাজের এমন এক শ্রেণি যারা ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও সম্মানিত, যারা বড় হৃদয়বান, উদার ও দৃঢ়তাসম্পন্ন। আরব এবং ইসলামি সমাজেই এ ধরনের লোক পাওয়া যায়। এরা পারস্পরিক অবস্থার সংশোধন ও উন্নয়নের কাজে নেমে অনেক সময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। যেমন– একটি বিশাল জনসমষ্টির দু'টি গোত্র বা দু'গ্রামের লোকেরা রক্তপণ ও ধন-সম্পদ নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়। এর কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। তখন একজন অগ্রসর হয়ে বিবদমান জনসমষ্টির মাঝে সন্ধি করিয়ে দিতে চেষ্টা চালায়। সে সময় সে বিবাদের নিরসনকল্পে পারস্পরিক বিবাদের কেন্দ্রবিন্দু কোনো ধন-সম্পদের দায়িত্ব নিজের যিম্মায় নিয়ে নেয়। এটা দীর্ঘকাল যাবত প্রচলিত একটি প্রথা। এরূপ অবস্থায় যিম্মার বোঝাটা যাকাতের 'গারিমুন' এর খাত থেকে বহন করা যাবে যেন সমাজের সংশোধন প্রয়াসী কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দ নিজেদের উপর এ বোঝা চাপিয়ে নিয়ে নিষ্পিষ্ট হতে বাধ্য না হন কিংবা সে জন্য তাদের সংশোধন সংকল্পও ব্যাহত ও পর্যুদস্ত না হয় অথবা তার তার প্রতি অনীহা ও অনুৎসাহের সঞ্চার না হয়। এ কারণে ইসলামি শারি'আত ব্যাপারটিকে এভাবে সমাধান করার ব্যবস্থা দিয়েছে। এদের জন্য যাকাতের একটা অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

জনসমষ্টির পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসায় সে লোকেরাও পড়বে যারা সামষ্টিক শারি'আহসম্মত ভাল কাজের জন্য দায়িত্ব সহকারে কাজ করবে। যেমন– ইয়াতিমদের জন্য প্রতিষ্ঠান, দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদ নির্মাণ, মুসলিমদের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত কোন মাদরাসা–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনো কল্যাণময় বা সামষ্টিক সেবামূলক কাজ প্রভৃতি। এসব কাজের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। 'গারিমুন' শব্দ দ্বারা কেবল পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসাকারী লোকদেরই বুঝতে হবে অন্য কেউ তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না, এমন কথা শারি'আত থেকে জানা যায় না। তারা যদি 'গারিমুন' শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নাও হয় তবুও 'কিয়াস'-এর

৩৭৬. আল-কুরআন, ৭ : ৩১
৩৭৭. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৫-৬২৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহায্যে এ বিধান অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তার অর্থ, যে লোক উক্তরূপ সামষ্টিক কল্যাণকর কাজ করার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে, সে ধনী হলেও তাকে যাকাত তহবিল থেকে তার ঋণ পরিশোধ পরিমাণ অর্থ অবশ্যই দিতে হবে। প্রথম প্রকারের লোকেরা যখন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তাদের সাহায্য করার বৈধতা স্বীকৃত হয়েছে, তাহলে এ দ্বিতীয় শ্রেণির লোকেরা তো অধিক উত্তমভাবে সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। কেননা তারা সামষ্টিক কল্যাণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে।[৩৭৮]

ইমাম আবু দাউদ রহ. নবি কারিম সা. এর একটি বাণী উদ্ধৃত করেছেন। রসুল সা. বলেছেন,

لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل إشتر اها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فاهداها المسكين للغنى

'যাকাত ধনীলোকের জন্য বৈধ নয়। তবে পাঁচজনের (যদিও তারা ধনী) জন্য বৈধ। সে পাঁচজন হলো– আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধকারী, যাকাতের কর্মচারী, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, কেউ যদি স্বীয় মালের বিনিময়ে তা (যাকাত) ক্রয় করে নেয়, এমন ব্যক্তি যার মিসকিন প্রতিবেশী ছিল, সে মিসকিনকে যাকাত দিয়েছে, অতঃপর সেই মিসকিন ব্যক্তি কোন ধনীকে হাদিয়া (উপহার) হিসেবে দিয়েছে (এ ধনী ব্যক্তির জন্য তা বৈধ)।[৩৭৯]

কুবাইচা ইবনুল মাখারিক আল হিলালি বলেছেন, 'আমি একটা বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করলাম। পরে আমি রাসুলে কারিম সা.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সে ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করলাম। তিনি সা. বললেন, অপেক্ষা কর, আমাদের কাছে যাকাতের মাল আসুক, তখন আমি তোমাকে সেখান থেকে দেয়ার জন্য আদেশ করব। অতঃপর তিনি বললেন, হে কুবাইসা! তিনজনের যে কোনো একজন ছাড়া অন্যদের জন্য ভিক্ষা করা বৈধ নয়। তারা হচ্ছেন এমন ব্যক্তি যে, যার উপর এমন ঋণের বোঝা চেপেছে যে, তার জন্য ভিক্ষা করা হালাল হয়ে গেছে, যতক্ষণ সে সেই পরিমাণ না পাচ্ছে। তা পেয়ে গেলে সে ভিক্ষা থেকে বিরত থাকবে। দ্বিতীয় এমন ব্যক্তি যে, বড় দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে গেছে, তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তার জন্য ভিক্ষা বৈধ, যতক্ষণ না সে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাত্রার মালিক হচ্ছে। তৃতীয় ব্যক্তি যে, অভুক্ত রয়েছে। এমনকি তার নিকটবর্তী যে কোনো তিনজন বলতে শুরু করেছে যে, অমুক ব্যক্তি না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। এ ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা বৈধ। যতক্ষণ না সে তার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনে ফিরে আসে। হে কুবাইচা! এ তিন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো জন্য ভিক্ষা করা ঘুষ ছাড়া কিছুই নয়। এরা ব্যতীত অন্য যে কেউ ভিক্ষা করে সে ঘুষের ন্যায় হারাম খায়।[৩৮০]

যাকাত থেকে 'করযে হাসানা' দেয়া : যাকাতের টাকা করযে হাসানা হিসেবে দেয়া যাবে কি না? যদি করযে হাসানা প্রার্থীদের ঋণগ্রস্তদের মতই মনে করা হয়? আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভির মতে, যাকাত পর্যায়ের সহিহ কিয়াস ও ইসলামের সাধারণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে 'গারিম'-দের জন্য নির্দিষ্ট যাকাত তহবিল থেকে চাহিদাগ্রস্ত লোকদের 'করয' দেয়া সম্পূর্ণ জায়িয। তবে সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং একটি নির্দিষ্ট তহবিল গঠন করতে হবে। সুদি কারবার প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থাস্বরূপ যাকাতকে এভাবে বণ্টন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা 'করযে হাসানা' দান সুদি কারবারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

আবু জুহরা, খাল্লাফ ও হাসান এ আধুনিক ইসলামি চিন্তাবিদত্রয় যাকাত সম্পর্কে উপরিউক্ত মত প্রকাশ করেছেন। তারা এর কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন যে, ভাল কাজের জন্য গৃহীত ঋণ যদি যাকাতের টাকা থেকে আদায় করা যায়, তাহলে সুদমুক্ত ঋণ 'করযে হাসানা' তা থেকে আরো উত্তমভাবে করা যাবে। যা শেষ পর্যন্ত বাইতুল মালে ফিরে আসবে।[৩৮১]

ঋণগ্রস্তদের জন্য যাকাত তহবিল থেকে প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা : ঋণগ্রস্তদের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা অনন্য। ইসলামের নবি মুহাম্মদ সা.-কে যখন আল্লাহ তা'আলা বিপুল বিজয় ও ধন-দৌলত দান করলেন, বাইতুল মালের আয় যখন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে গেল, তখন তিনি নিজেই মুসলিমদের ঋণ পরিশোধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। আবু হুরাইরা রা. এ বিষয়ে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'রসুল সা.-এর

---

৩৭৮. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩০-৬৩১

৩৭৯. ইমাম আবূ দাউদ রহ., অনূ. ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪২১, হাদিস নং ১৬৩৫

৩৮০. আল-মুনযিরি, *আত-তারগিব ওয়াত তারহিব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, হাদিস নং ৪৭৭

৩৮১. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি, *ফিকহুয যাকাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৪

Dhaka University Institutional Repository

সম্মুখে যখন কোনো মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামাজের জন্য নিয়ে আসা হত, যার উপর ঋণের বোঝা রয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, সে কি ঋণ পরিশোধ করার মত কোনো সম্পদ রেখে গেছে? যদি বলা হত সে ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে গেছে, তাহলে তিনি তার জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় তিনি বলতেন, 'তোমরাই তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ে নাও।' অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ব্যাপক বিজয় দান করলেন, তখন তিনি বললেন, মু'মিনদের জন্য আমি তাদের নিজেদের তুলনায় অধিক উত্তম। যে লোক ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তা শোধ করার দায়িত্ব আমার উপর বার্তাবে।'[৩৮২]
লোকদের যাকাতের মালে 'গারিমুন' এর জন্য যে অংশটি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে, তা পাওনাদারদের ঋণের এ বোঝা শেষ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই আল্লাহর নির্ধারণ বিশেষ। ইসলামি আইন প্রণয়ন ও তার পদ্ধতি এটাই। ইসলাম ঋণগ্রস্তদের গলদেশ ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করে। তাকে ধ্বংসের অতল তলদেশ থেকে উদ্ধার করতে চায়। ঋণের কারণে তাকে নিঃস্ব, নির্যাতিত অবস্থায় ফেলে রাখতে চায় না, চায় না ব্যক্তি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করুক। ইসলাম ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোনো সমাজবিধান ঋণগ্রস্ত নাগরিকদের ঋণের বোঝার কঠিন দুঃসহ চাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এরূপ কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে বলে জানা যায় না; এটা কেবল মহান আল্লাহর নির্ধারিত বিধান।
নব মুসলিম : নব মুসলিমের মন জয়ের খাতটি যদিও ধনী-গরিব নির্বিশেষে নবদীক্ষিত সকল মুসলিমের জন্য উন্মুক্ত তথাপি এখানেও সাময়িক আর্থিক অভাবে নিমজ্জিত নব মুসলিম থাকতে পারে। নতুন ইসলাম গ্রহণকারী লোকেরা অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয় বলে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতে হয়। তবেই তারা ইসলামে স্থির ও অটল হয়ে থাকবে বলে আশা করা যায়। কেননা নতুন ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি তার পূর্বতন ধর্ম ত্যাগ করেছে, তার পিতা-মাতা ও বংশ-পরিবারের নিকট তার প্রাপ্য ধন-সম্পদের দাবি থেকে পরিত্যাজ্য হয়েছে। তার বংশের বহু লোকই তার সাথে শত্রুতা করা শুরু করে দিবে, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে তার জীবিকার সব পথও বন্ধ বা বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে, সে নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবেও যাকাত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। এরূপ পৃথিবীর স্বার্থ ত্যাগকারী ও আল্লাহর জন্য নিজেকে বিলীনকারী ব্যক্তি ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নিকট থেকে বিপুল উৎসাহ ও সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার অধিকারী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
এসব দরিদ্র জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন এবং স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা দানই যাকাতের অন্তর্নিহিত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য। উপমহাদেশের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি রহ. যাকাতের বহুমাত্রিক তাৎপর্যকে এভাবে তুলে ধরেন, 'যাকাত দু'টি লক্ষ্যে নিবেদিত: আত্মশৃঙ্খলা অর্জন ও সামাজিক দারিদ্র্য নিরসন। ধন-সম্পদ কৃপণতা, স্বার্থপরতা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি ও নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। ব্যক্তির ধন-সম্পদের ঐচ্ছিক বিতরণ এর উত্তম প্রতিষেধক। তা কৃপণতা নির্মূল ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করে। তা সামাজিক সংঘাতকে নিরসন করে মানুষে মানুষে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এ বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক উন্নতি নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি রচনা করে। যাকাত সামজিক সাম্প্রদায়িক দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে ফলদায়ক শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। কারণ নিরাপদ পৌরকাঠামো একটি সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। বস্তুত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হতে পারে। রাষ্ট্রকেই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ব রাষ্ট্র তখনই সন্তোষজনকভাবে পালন করতে পারবে, যখন প্রচলিত সরকারি রাজস্বের সাথে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ধনীলোকদের নিকট থেকে যাকাত হিসেবে আদায় হবে।'[৩৮৩]
যখন সুরা তাওবার ৬০ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করা হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যাকাতের লক্ষ্যসমূহের একটা দীনি রাজনৈতিক রূপ রয়েছে। কেননা তা দীন ও রাষ্ট্র হিসেবেই ইসলামের সাথে মিলিত হয়। যাদের হৃদয় সন্তুষ্ট করতে হবে এবং আল্লাহর পথে প্রধানত এ দু'টি অংশই সেদিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে।
এ দুই ব্যয়খাত দাবি করছে, দীন-ইসলাম একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান, এ রাষ্ট্র যাকাতসমূহ ধন-সম্পদের মালিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করবে তার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের মাধ্যমে। পরে তা ব্যয় করা হবে ইসলামের

৩৮২. আল্লামা আলাউদ্দিন আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫), খ.৬, পৃ. ১১৮-১২২
৩৮৩. মোঃ আবুল কাশেম ভূঁইয়া, *সামাজিক নিরাপত্তায় যাকাত*(ঢাকা : ইফাবা, ২০০৬), পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

দা'ওয়াত প্রচার ও তার কালিমার বিস্তার সাধনের কাজে, তার ভূমিকা শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য আর তা হবে লোকদের হৃদয় আকৃষ্টকরণ এবং জাতিসমূহকে সেদিকে দা'ওয়াত দেয়ার দ্বারা। কেননা আল্লাহর পথের দিকে রয়েছে ইসলামের উদাত্ত আহ্বান। এখানে মুসলিম সমাজ ও ইসলামি উম্মাহর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের সাথে যাকাতের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

যাকাত মূলত আর্থিক 'ইবাদত হলেও এর উপযোগিতা ও তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। যাকাত একজন মুসলিমের ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক উন্নতি সাধন করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে। নিয়মিত যাকাত প্রদানে পূণ্য বা সাওয়াব বৃদ্ধি পায়, পাপ মোচন হয়, সম্পদের পরিশুদ্ধতা আসে, কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। যাকাত, তাদের অনুগ্রহ বা করুণা কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব এবং গ্রহীতার হীনমন্যতা বুঝায় না। বরং তা গ্রহীতার অধিকার। ড. হাম্মুদাহ আবদালাতি প্রসঙ্গটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন,

> To the Quranic word Zakah and the meaning it conveys, there is no equvalent in any other language as far as we know. It is not just a form of charity or alms-giving or tax or tithe. Nor is it simply an expression of kindness; It is all of these combined and much more. It is not merely a diduction of a certain percentage from one's property, but an abundant enrichment and spiritual investment. It is not simply a voluntary contribution to some one or some cause; nor a government tax that a shrewd clever person can get away with. Rather, it is a duty enjoined by God and dertaken by Muslimes in the interest of society as a whole. The Quranic word Zakah not only includes charity, alms, tithe, kindness, official voluntary contribution etc. But in also combines with all these Gods ... needness and spiritual as well as moral motives.[৩৮৪]

যাকাত স্বাভাবিক সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুষ্ঠু কাঙ্খিত অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পদের যথাযথ বণ্টনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করে। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উপর রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকে বিধায় বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালক শক্তির হাতে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এখানেও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণিই যাচ্ছেতাইভাবে সম্পদকে ভোগ করে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ মানুষ তথা সর্বহারারা তাদের ন্যায্য আর্থিক পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা একনায়কত্বের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দুর্বিসহ দিনাতিপাতে বাধ্য হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ হিসেবে যাকাত বণ্টন সংক্রান্ত কাজগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারে :

- যাকাত ফান্ড থেকে দুস্থ নারী-পুরুষ, গরিব, পঙ্গু, কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ, এতিম এবং এ ধরণের অসহায় ও অভাবী লোকদের নিয়মিত স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থাকরণ করা যাতে তারা সকলেই মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পুরণে সক্ষম হয়।
- কর্মে সক্ষম অভাবী জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।
- পথিক ও প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সঙ্গতকারণ সাপেক্ষে ঋণী ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত হয়ে মানবোচিত জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা।
- দরিদ্র লোকদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।
- গরিব ও সর্বহারাদের পরিবার-পরিজনদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করা।
- গরিব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।

---

৩৮৪. Hammudah Abdalati, *Islam in Focus*(Cairo : Amana Publications, 1998), p. 95

Dhaka University Institutional Repository

- ইসলামি জীবন বিধান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।
- বেকারদের নিয়মিত ভাতা প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৩৮৫]

ইসলাম হলো ফিতরাতের ধর্ম বা স্বভাবজাত জীবনবিধান। এর বিধি-বিধান বা নিয়ম-কানুন শুধু তাত্ত্বিক নয়; বরং ইসলামের নবি হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনাচার ও তাঁর সঙ্গীদের কাজ-কর্মে তা প্রোজ্জ্বল। আল্লাহ তা'আলা সমাজের দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণির 'সামাজিক নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার জন্য যাকাতের বিধান নাযিল করেছেন। হযরত মুহাম্মদ সা. তাঁর নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে তাঁর শিক্ষায় আলোকিত হয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রা. বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিঃস্ব, বঞ্চিত, অসহায়, সর্বহারাদের অধিকার রক্ষায় তলোয়ার হাতে নিয়ে যুদ্ধ করে শোষক শ্রেণিকে পরাস্ত করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। গরিবের অধিকার যাকাত আদায়ে তথা তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন এবং তাতে তিনি শতভাগ সফল হয়েছেন। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ ও মুজাদ্দিদ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভি এ সম্পর্কে বলেন, 'সম্ভবত ইতিহাসে হযরত আবু বকর রা. পরিচালিত ইসলামি রাষ্ট্রই প্রথম রাষ্ট্র যা ফকির, মিসকিন ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির অধিকার আদায়ের ব্যাপারে লড়াই করে। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এদেরকে শোষণ করে আসছিল। কিন্তু কেউই তাদের পক্ষ হয়ে এর প্রতিকার করেনি। শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে কেউই তাদের কাতারে এসে দাঁড়ায়নি।'[৩৮৬]

হযরত আবু বকর রা. সাহাবায়ে কিরাম রা.-কে সাথে নিয়ে এ শক্তিশালী শ্রেণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গরিবদের হক প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের কারণে যাকাত দারিদ্র্য-বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা রাখে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর রা. এ অসহায় শ্রেণির অবস্থা উন্নয়নে নিজে সারাদিন প্রশাসনিক কাজ করে রাতের বেলা নিদ্রা ত্যাগ করে ঘুরে বেড়াতেন। নিজে আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে অভাবী পরিবারে পৌঁছে দিতেন। পরবর্তীতে উমাইয়া খলিফা হযরত 'উমর ইবন আব্দুল আযিযের সময় অবস্থা এমন হলো যে, যাকাত নেয়ার মত আর কাউকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এ প্রসঙ্গে ড. হাম্মুদা আবদালাতি বলেন, 'It is authentically reported that there were times in the history of Islamic administration when there was no person eligible to receive Zakah; every subject Muslim, Christian and Jew of the vast Islamic empire had enough to satisfy his needs and the rulers had to deposit the Zakah collections in the public treasury.'[৩৮৭]

(২) 'উশর বা অর্ধেক 'উশর : 'উশরের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে এক-দশমাংশ এবং প্রচলিত ভাষায়– ইসলামি রাষ্ট্র মুসলিমদের কল্যাণেই মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদিত শস্যের যে মাশুল আদায় করে তাকেই 'উশর' বলা হয়। বাইতুল মালের আয়ের অন্যতম উৎস হচ্ছে 'উশর। যদি কোনো গোত্র বা জাতি ইসলাম গ্রহণ করে তাদের আবাদি জমি, আরবদের জমি, মুজাহিদিন ও গনিমতের সম্পদ হিসেবে প্রাপ্ত জমি, পরিত্যক্ত ও কোনো মুসলিম কর্তৃক আবাদকৃত জমি এবং উত্তরাধিকারহীন যিম্মির মৃত্যুর পর মুসলিমদের দখলে আসা জমিকেও 'উশরি জমি বলা হয়।[৩৮৮]

রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যিম্মি প্রজাকে পাট্টার উপর যে সরকারি জমি দেয়া হত তাকে বলা হত খারাজি জমি। এজন্য যিম্মি কৃষককে প্রতি বছর বাইতুল মালে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খারাজ নামক কর জমা দিতে হত। কিন্তু মুসলিমগণ আইনগতভাবে যে সমস্ত জমির মালিক ছিল সেগুলোকে বলা হত 'উশরি জমি। ইসলামি রাষ্ট্র

---

৩৮৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন : *যাকাত কি ও কেন*(ঢাকা : ইসলামিক ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫), পৃ. ১৯-২০

৩৮৬. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ১০৮

৩৮৭. Hammudad Abdalati, *Islam in focus*, ibid, p. 97

৩৮৮. মাওলানা হিফযুর রহমান, অনু. মাওলানা আবদুল আউয়াল *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৮), পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম কৃষকদের কাছ থেকে তাদের কৃষি উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসেবে ‘উশর বা অর্ধ ‘উশর আদায় করত।

ফকিহগণ ইসলামি রাষ্ট্রের ভূ-সম্পত্তিকে মোট চার ভাগে ভাগ করেছেন। (১) যে জমির মালিকরা ইসলাম গ্রহণ করেছে তা ‘উশরি জমির অন্তর্ভুক্ত। (২) যে জমি মুসলিমরা আবাদ করে তাও ‘উশরি জমির অন্তর্ভুক্ত। (৩) যে জমি মুসলিমরা তরবারির জোরে দখল করেছে, তাও ‘উশরি জমির অন্তর্ভুক্ত। (৪) যে জমির মালিকদের সাথে মুসলিমদের আপোষ-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা ‘ফাই’ এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর উপর খারাজ ধার্য করা হয়।[৩৮৯] মোটকথা, ‘উশর একটি উৎপাদনশীল কর যা জমির উৎপাদনের উপর ধার্য করা হয়।

কৃষি উৎপাদন থেকে কর আদায় করা সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, ‘যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিন তার হক প্রদান করবে।’[৩৯০] অন্যত্র বলা হয়েছে, ‘হে মু’মিনগণ, তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপাদন করে দিই তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা ব্যয় কর।’[৩৯১]

হাদিসে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবি কারিম সা. বলেছেন,

فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر وفيما سقى بالسواني والنضح نصف العشر

‘যে জমি বৃষ্টি, ঝর্ণা কিংবা নদীর পানিতে সেচ কার্য দ্বারা হয়ে থাকে কিংবা যা স্বতই সিক্ত থাকে তার ফসলের এক-দশমাংশ (‘উশর) হিসেবে ভূমিকর প্রদান করতে হবে। আর যে জমিতে (কূপ খনন করে) কৃত্রিমভাবে পানি সেচ করা হয় তার ফসলের বিশ ভাগের একভাগ (অর্ধ ‘উশর) প্রদান করতে হবে।’[৩৯২]

মুফাসসিরগণ শুধু তরি-তরকারি বা ফলমূলই নয় বরং খনিজ সম্পদকেও ‘আমি যা ভূমি থেকে তোমাদের জন্য উৎপন্ন করি-এর অর্থাৎ জমির উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।’[৩৯৩]

স্বয়ং রসুলুল্লাহ সা. ‘উশর আদায়ের হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মু‘আয ইবন জাবাল (সরকারি কর্মচারি হিসেবে) যখন ইয়ামানে ছিলেন তখন রসুলুল্লাহ সা. তাকে লিখেন, ‘যে জমি প্রবাহিত পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে ‘উশর বা এক-দশমাংশ এবং যে জমি চরকা অথবা বালতির পানি দ্বারা সিক্ত হয় তাতে নিসফে ‘উশর বা বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য হবে।’[৩৯৪] বালতি অথবা চরকা দ্বারা সিক্ত জমির উপর অর্ধ ‘উশর ধার্যকরার যে কারণ ফকিহগণ বর্ণনা করেছেন তা হলো, ‘এ সমস্ত জমিতে অধিক শ্রম ও বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে সমস্ত জমি বৃষ্টি অথবা নদীর পানি দ্বারা সিক্ত হয় সেগুলোতে অল্প পরিশ্রম ও বিনিয়োগেই ফসল উৎপাদন হয়।’[৩৯৫]

মোটকথা, মুসলিমদের মালিকানাধীন জমির উৎপাদন থেকে আদায়কৃত করকেই ‘উশর বলা হয়। কৃষি উৎপাদন দু’রকমের হয়। যথা : (ক) ক্ষেতের উৎপাদন ও (খ) বাগানের উৎপাদন।

মোটকথা, দু’টি শর্তে ফলের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। প্রথম শর্ত এই যে, ফল যেন উপকারী এবং খাদ্যোপযোগী হয়। যদি এর আগেই কেউ (গাছ থেকে ফল) পেড়ে ফেলে তা হলে ওয়াজিব হবে না। কোনো আবশ্যক ছাড়াই শুধু যাকাত ফাঁকি দেয়ার জন্য এরূপ করা মাকরূহ (দোষণীয়)। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, উৎপাদনের পরিমাণ যেন অন্তত পাঁচ ওয়াসাক হয়। এর কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

উল্লেখ্য, এক ওয়াসাক ষাট সা‘ এবং এক সা‘ $৫\frac{১}{৩}$ ইরাকি রতলের সমান। ইমাম আবু হানিফার মতে, ফলের পরিমাণ অল্প হোক কিংবা অধিক যাকাত ওয়াজিব হবেই। তিনি মোটামুটি হিসেবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করতেও নিষেধ করেছেন। ইমাম শাফিয়ি‘র মতে, মোটামুটি হিসেবে ফলের পরিমাণ নির্ধারণ করা বৈধ এজন্য

---

৩৮৯. আল-মাওয়ার্দি, *আল আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৯০. আল-কুরআন, ৬ : ১৪১

৩৯১. আল-কুরআন, ২ : ২৬৭

৩৯২. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৫২, হাদিস নং ১৩৯৬

৩৯৩. আব্দুল্লাহ ইবন উমর আল-বায়যাভি, *আনওয়ারুত তানযিল ওয়া আসরারুত তা'বিল*(কায়রো : দারুল কুতুব আল-আরাবিয়া, তা.বি.), খ.১, পৃ. ১২৪

৩৯৪. আবু ‘উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬; বালাযুরি, *ফুতুহুল বুলদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৩৯৫. বুরহানউদ্দিন ইবন আবুবকর, *আল-হিদায়া*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ., কিতাবুয যাকাত

Dhaka University Institutional Repository

যে, এর দ্বারা যাকাতের পরিমাণ এবং তা প্রাপকদের প্রাপ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। রসুলুল্লাহ সা. এ কাজের জন্য কর্মচারি নিয়োগ করেছিলেন।[৩৯৬]

রসুলুল্লাহ সা. খাইবারের খেজুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহাকে প্রেরণ করেন। রসুলুল্লাহ সা. ফল এবং আঙ্গুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণের জন্য লোক (কর্মচারি) প্রেরণ করতেন।[৩৯৭]

আঙ্গুর এবং খেজুরের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তখনই যখন তা খাদ্যের উপযোগী অর্থাৎ 'বাসার' (বেশ কিছু বড়) এবং এনাবে (পরিপক্ক) পরিণত হবে। পরিমাণ নির্ধারণের পর সেগুলোকে 'তামার' (শুষ্ক খেজুর) এবং যাবিবে (মুন্নাকা) রূপান্তরিত করে দেয়া হবে।'[৩৯৮]

খেজুর এবং আঙ্গুর যথাক্রমে তামার এবং মুনাক্কায় পরিণত হয়ে একদম শুষ্ক হওয়ার পর সেগুলো থেকে যাকাত আদায় করা হবে। আর যদি তাজা অবস্থায় গাছ থেকে পাড়া হয় তা হলে বিক্রিত মূল্যের এক-দশমাংশ আদায় করা হবে। 'খেজুরের বিভিন্ন জাতকে একই জাত মনে করা হবে। আঙ্গুরের বেলায়ও অনুরূপ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। কেননা এগুলোর জাত মূলত একই। কিন্তু খেজুর এবং আঙ্গুরকে একই জাতের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। কেননা এ দু'টি জিনিস মূলত দু'জাতের।'[৩৯৯]

মোটামুটি পরিমাণ নির্ধারণের পর যাকাত আদায়ের সময় আসার পূর্বেই যদি কোনো বিপদাপদ অথবা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় ফসল নষ্ট হয়ে যায় তাহলে যাকাত মাফ করে দেয়া হবে। আর যাকাত আদায়ের সময় আসার পর যদি নষ্ট হয় তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে।[৪০০]

(৩) কাফফারা : কোনো অবাঞ্ছিত কাজ বা পাপকর্ম হয়ে গেলে সে পাপ স্খলনের জন্য শারীরিক বা আর্থিক যে জরিমানা দিতে হয় তাকে কাফফারা বলে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে,[৪০১] জিহার[৪০২] করলে শার'ই ওজর ছাড়া রমাদানের রোযা ভাঙ্গলে কাফফারা আদায় করতে হয়। এর মাধ্যমে দরিদ্রদের মধ্যে সম্পদ হস্তান্তর করা সম্ভব হয় এবং তা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হয়।

(৪) ফিদিয়া : যে সকল লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ কিংবা দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছে অভতা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সে সকল লোকের বেলায় রোযা না রেখে রোযার বদলায় ফিদিয়া দেয়ার সুযোগ রয়েছে। একটি রোযার ফিদিয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। অর্ধ সা' প্রায় দুই কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার মূল্য কোনো মিসকিনকে দান করলে ফিদিয়া আদায় হয়ে যায়। ফিদিয়ার মাধ্যমেও দরিদ্র লোকেরা উপকৃত হয় এবং তা তা সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে সহায়ক হয়।[৪০৩]

(৫) মোহর : বিবাহের জন্য স্বামী স্ত্রীকে যে অর্থ প্রদান করতে বাধ্য তাকে মোহর বলে।[৪০৪] ইসলামি শারি'আহ মুতাবিক স্ত্রীকে এ সম্পদ পরিশোধ করা অবশ্য কর্তব্য– ফরজ। মোহর স্ত্রীদের মৌলিক অর্থনৈতিক অধিকার। আল-কুরআনে বলা হয়েছে : 'তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে; তারা সন্তুষ্টচিত্তে মোহরের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ করবে।'[৪০৫] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'হে নবি! আমি তোমার জন্য বৈধ করেছি তোমার স্ত্রীদের যাদের তুমি মোহর প্রদান করেছ।'[৪০৬] মোহরের অর্থ দরিদ্র, বিত্তহীন, নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে। ইসলাম নারীদের মোহরের অধিকার দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করেছে। বস্তুতঃ মোহরই হতে পারে দরিদ্র নারীদের জন্য প্রথম সুদমুক্ত পুঁজি ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের জড়িত করার আর্থিক সোপান।

---

৩৯৬. আল-মাওয়ার্দি, *আল আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩
৩৯৭. ইমাম তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৬, হাদিস নং ৬৪১
৩৯৮. ইমাম তিরমিযী রহ., অনূ. মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ২৫, হাদিস নং ৬৪০
৩৯৯. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪১১
৪০০. আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, খ.১, পৃ. ৪১১
৪০১. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর সরকার কাঠামো*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৪), পৃ. ২৭৯; আল-কুরআন, ৫ : ৮৯
৪০২. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; আল-কুরআন, ৫৮ : ২-৪
৪০৩. ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এর সরকার কাঠামো*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯; আল-কুরআন, ২ : ১৮৪
৪০৪. সম্পাদনা বোর্ড, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*(দেওবন্দ : কুতুবখানা হুসাইনিয়া, ১৯৯৬), খ.১, পৃ. ৮৮৯
৪০৫. আল-কুরআন, ৪ : ৪
৪০৬. আল-কুরআন, ৩৩ : ৫০

Dhaka University Institutional Repository

(৬) সদাকাতুল ফিতর : রমযান মাস শেষ হওয়ার পর 'ঈদুল ফিতরের দিন অর্থাৎ শাওয়াল মাসের প্রথম দিন প্রত্যেক ধনী মুসলিম গরিবদেরকে যে খাদ্য বা অর্থ প্রদান করে তাকে 'সদাকাতুল ফিতর' বলা হয়। মুহাদ্দিসরা তাকে 'যাকাতুল ফিতর'ও বলে থাকেন। হাদিস ও অন্যান্য প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ সা. দ্বিতীয় হিজরিতে যাকাত ফরয হওয়ার আগেই 'সদাকাতুল ফিতর' আদায় করার আদেশ জারি করেছিলেন।[৪০৭] এ সদাকা প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। ফিতরা রমযান পূর্ণ করার পর এবং 'ঈদুল ফিতরের পূর্বে আদায় করতে হয়। ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার পিছনে দু'টি হিকমত রয়েছে :

(১) রমাদান মাসে রোযাদার কর্তৃক সংঘটিত ছোট-খাট পাপ এর দ্বারা মাফ হয় অর্থাৎ ফিতরা হলো গুনাহের ক্ষতিপূরণ।

(২) ফকির-মিসকিনকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করা যে, মুসলিম সমাজ তাদেরকে এ আনন্দের দিনে ভুলে যায়নি; বরং তাদের কথা খেয়াল রেখেছে, ঈদের দিনে তাদেরকে ভাই-বোন বানিয়ে নিয়েছে এবং নিজেদের আনন্দে তাদেরকে শরিক করেছে।

عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين

'হযরত ইবন 'আব্বাস রা. বলেছেন, রসুলুল্লাহ সা. সদাকাতুল ফিতর– রোযাকে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা ও আচরণ থেকে পবিত্র করর উদ্দেশ্যে এবং মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য ফরজ করেছেন।'[৪০৮]

তিনি সা. ফিতরার পরিমাণও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে,

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

রসুলুল্লাহ সা. প্রত্যেক গোলাম, আযাদ, পুরুষ, নারী, প্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের উপর সদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ যব আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন এবং লোকজনের ঈদুল ফিতরের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[৪০৯] খেজুর এবং যব ছাড়া অন্যান্য দ্রব্য দ্বারাও ফিতরা হিসেবে দেয়া যাবে।

عن أبى سعيد الخدرى يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أوصاعا من شعير أوصاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب

আবু সাইদ খুদরি রা. বলেন, আমরা সদাকাতুল ফিতর হিসেবে এক সা' পরিমাণ খাদ্য অথবা এক সা' পরিমাণ যব অথবা এক সা' পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা' পরিমাণ পনির অথবা এক সা' পরিমাণ কিসমিস প্রদান করতাম।'[৪১০]

'ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সদাকাতুল ফিতর দিয়ে দেয়া মুস্তাহাব। কেননা রসুলুল্লাহ সা. ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই তাঁর সদাকাতুল ফিতর আদায় করে দিতেন। এর ফলে ফকির-মিসকিনরা ঘরে ঘরে সাওয়াল করতে গিয়ে নামায থেকে গাফিল (অন্যমনস্ক) হয়ে না পড়ে; বরং আনন্দচিত্তে অন্যান্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে ঈদগাহে যেতে সক্ষম হয়।[৪১১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ইসলামের স্বর্ণযুগে সাহাবা কিরাম সদাকাতুল ফিতরকেও একটি সুশৃঙ্খল দানে রূপ প্রদান করেন। অধিকাংশ সাহাবা ঈদের দু'একদিন পুর্বেই তাদের সদাকাতুল ফিতর বাইতুল মালে পাঠিয়ে দিতেন।

كان ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين

আব্দুল্লাহ ইবন 'উমর রা. প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলের পক্ষ থেকেই ঈদুল ফিতরের এক-দু' দিন পূর্বেই সদাকাতুল ফিতর আদায় করতেন।[৪১২] ইমাম বুখারি লিখেছেন, 'লোকেরা তাদের সদাকা সরাসরি ফকির-মিসকিনকে না দিয়ে ইমাম কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারিকে দিয়ে দিত, যাতে সব মাল একত্রিত হয়ে পরবর্তী সময়ে

---

৪০৭. মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক*(কায়রো : দারুল মা'আরিফ, ১৯৬৭), খ.২, পৃ. ৩৯৬

৪০৮. ইমাম আবু দাউদ,অনূ. ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক *আবূ দাঊদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৪০৪, হাদিস নং ১৬০৮

৪০৯. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬২, হাদিস নং ১৪১৫

৪১০. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৩, হাদিস নং ১৪১৮

৪১১. বুরহানউদ্দিন ইবন আবুবকর, *আল-হিদায়া*(করাচি : কালাম কোম্পানি, তা.বি.), খ.১, কিতাবুয যাকাত, বাবুস্ সাদাকাতিল ফিতর

৪১২. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৫, হাদিস নং ১৪২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম কর্তৃক গরিবদের মাঝে সুচারুরূপে বণ্টিত হয়।'[৪১৩] স্বয়ং রসুলুল্লাহ সা. সদাকাতুল ফিতর একত্র করার জন্য আবু হুরাইরা রা.-কে কর্মচারি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন।[৪১৪]

ফিতরার ব্যয়খাত : এ ব্যাপারে সকল ইমামই একমত যে, সদাকাতুল ফিতর অভাবগ্রস্ত মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হবে। কেননা রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, তাদেরকে ঐদিন (ঈদের দিন) সাওয়ালের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে নিষ্কৃতি দাও।[৪১৫]

যিম্মি ফকিরদেরকে ফিতরা দেয়া জায়িয কি না? এ সম্পর্কে ফকিহগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। জমহুর ফুকাহার মতে জায়িয নয়; কিন্তু ইমাম আবু হানিফার মতে জায়িয। জমহুর ফুকাহার মতে, দারিদ্র্য এবং ইসলাম এ দু'শর্তেই গরিবদেরকে সদাকাতুল ফিতর দেয়া হয়। অতএব যিম্মিরা তা পেতে পারে না। ইমাম আবু হানিফার মতে দারিদ্র্যের কারণে সদাকাতুল ফিতর দেয়া হয়। অতএব যিম্মি গরিবরাও সদাকা পাওয়ার যোগ্য।'[৪১৬]

সদাকাতুল ফিতর ব্যক্তিগত দান হলেও মহানবি সা. মদিনা রাষ্ট্রে তা আদায় করে দরিদ্র ও গরিব-দুঃখীদের মাঝে বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

(৭) নাফাকাত : ব্যয়, খরচ, মহার্ঘ্য ইত্যাদি অর্থে নাফাকাত শব্দ ব্যবহৃত হয়।[৪১৭] শারীরিক ও মানসিকভাবে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব হচ্ছে নিজের এবং নিজের পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ করা। আত্মীয়-স্বজন, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ, প্রতিবেশীকেও এর আওতায় আনা হয়েছে। এমন কোনো মানুষ নেই যার কোনো দরিদ্র আত্মীয় নেই। দারিদ্র্য বিমোচনে ও সামাজিক নিরাপত্তা বাসতবায়নে নাফাকাত বিরাট ভূমিকা পালন করে থাকে।

(৮) নাজর বা মানত : নাজর-এর অর্থ নজরানা, মানত, উৎসর্গ, প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি।[৪১৮] কোনো বৈধ মনোবাসনা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানত করা হয়। মনোবসনা পূর্ণ হলে সে মানত আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। মানতের মাধ্যমে সমাজের গরিব-দুখীরাই আর্থিকভাবে উপকৃত হয়।

(৯) উদহিয়া বা কুরবানি : উদহিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ, কুরবানি, কুরবানির পশু, আত্মত্যাগ, অপরের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করা।[৪১৯] ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহকে নিজের জীবন ও সম্পদের প্রকৃত মালিক স্বীকার করে সে মহান মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরই সম্পদ তাঁরই পথে ত্যাগ করার নিদর্শনস্বরূপ নির্দিষ্ট পন্থায় পশু কুরবানি করার নামই হচ্ছে উদহিয়া বা কুরবানি। কুরবানির অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করা। মানুষ যে যাবতীয় ধন-সম্পদ ও নি'আমতের জন্য আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ, কুরবানি করে সে তারই নিদর্শন উপস্থাপন করে। কুরবানির গোশত নিজে খাওয়া যায়, আত্মীয়-স্বজন ও গরিব-দুখীদের মধ্যেও বণ্টন করা যায়। কুরবানির পশুর চামড়ার বিক্রিত অর্থ দরিদ্রদের মাঝেই বণ্টিত হয়। ইয়াতিম-অসহায়দের দান করা যায়। গরিবদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পুনর্বাসনের জন্য কেউ কোনো প্রকল্প গ্রহণ করলে তাতেও দান করা যায়। ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক বর্তমানে হজের সময় কুরবানিকৃত পশুর গোশত কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করে পরে বিভিন্ন মুসলিম দেশে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টনের জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রেরণ করে থাকে।

(১০) আকিকা : সন্তান জন্মের পর সন্তানের কল্যাণ কামনায় হালাল গৃহপালিত পশু জবেহ করাকে আকিকা বলে। আকিকার গোশত সন্তানের পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই খেতে পারে। এ গোশত অভাবগ্রস্তদের মাঝেও বণ্টন করা যায়। আকিকার পশুর চামড়া দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের দান করে দিতে হয়। এতে গরিব লোকেরা উপকৃত হয়।

---

৪১৩. ইমাম বুখারী রহ., অনু. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬৫, হাদিস নং ১৪২৩

৪১৪. মুহাম্মদ ইবন জারির আত-তাবারি, *তারিখ আর-রুসুল ওয়াল মুলুক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮১

৪১৫. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনূ. আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২৭৭

৪১৬. আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবি, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৮১ ইং), খ.১, পৃ. ২৫৬

৪১৭. সম্পাদনা বোর্ড, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৯৪২-৯৪৩

৪১৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*(ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭), পৃ. ১০৬১

৪১৯. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

Dhaka University Institutional Repository

(১১) নফল সদাকা : যদি কোনো ধন-সম্পদ বিনা প্রতিদানে কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কাউকে প্রদান করা হয় তাকে সদাকাতে নাফিলা বলে। দরিদ্র ও অভাবগুস্তদের অভাব মোচনের জন্য সদাকাতকে মহানবি সা. 'আমলে খাইর' বা সৎকাজ বলে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ ধরনের সদাকাহর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। তাকে ইসলামের একটি বিশেষ নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪২০]

(১২) হিবা : যদি কোনো সম্পত্তি কোনো প্রতিদান গ্রহণ ব্যতীত সঙ্গে সঙ্গে গ্রহীতাকে হস্তান্তর করা হয় কাহলে তাকে হিবা বলে। হিবা দানের অন্যতম প্রকার। হিবা জনকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের একটি উত্তম উপায়। মহানবি সা. হিবার মাধ্যমে দান করা বৈধ বলে তা করতে উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।

(১৩) অসিয়াত : অসিয়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ উপদেশ, পরামর্শ, সুপারিস, আদেশ, উইল, নির্দেশ, অঙ্গীকার।[৪২১] তবে ইসলামি পরিভাষায় মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির সম্পদে মালিকানা প্রদানকে অসিয়াত বলে।[৪২২] মৃত্যুর সময়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারণভাবে স্বীয় সম্পদের একাংশ দান করে যাওয়ার না অসিয়াত বা উইল। মহানবি সা. সম্পদের তিন ভাগের একভাগ অসিয়াত করতে বলেন; এর বেশি নয়। অন্য কথায় অসিয়াত সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত করা যাবে। এর বেশি অসিয়াত করলে অতিরিক্ত অংশ বাতিল বলে গণ্য হবে। অসিয়াত এমন একটি সমাজকল্যাণমূলক কাজ যা দ্বারা বিত্তবানরা জীবনের শেষ মুহূর্তে সৎকাজ হিসেবে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের আর্থিক উপকার করতে পারে। মৃতের সম্পদে মালিকানা প্রদান অর্থে অসিয়াত শব্দটি আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪২৩]

(১৪) ওয়াকফ : আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে ওয়াকফ হলো একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। এজন্য ইসলামে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এর প্রচলন ও প্রসারের জন্য বেশ উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ সা.-এর সাহাবাগণ কার্যকর নযির স্থাপন করে একে অত্যন্ত সুদৃঢ় করেছেন। বিত্তবানদের নিত্যদিনের জীবনের চিত্র আমাদের সামনে রয়েছে। একব্যক্তি নিজের উপার্জিত অথবা অন্য কোনো বৈধ উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ নিজের জন্য হয়ত প্রয়োজনাতিরিক্ত মনে করে। তা সত্ত্বেও সম্পদের মমতা ও আকর্ষণ অধিকাংশ সময় তাকে অভাবী ও গরিব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখে। কিন্তু যখন তার জীবনের অন্তিম সময় এসে উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর লৌহকঠিন থাবার নিকট পরাজিত হয়ে পড়ে, কেবল তখনই সে অনুতপ্ত হয়ে ধন-সম্পদের আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের দৃশ্য সকাল-বিকাল প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও অন্তিম সময় আসার পূর্বে বিত্তবানরা এ ব্যাপারে কল্পনাও করে না। অথচ কত ইয়াতিম, অনাথ ও অন্যান্য গরিব-দুঃখীর করুণ ফরিয়াদ বিত্তবানদের লোভের সুরক্ষিত দুর্গের প্রাচীরে বার বার আঘাত করে মৃত্যুবরণ করে। এ জন্য ইসলাম বিত্তবানদের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে গাফিলতি দূর করা এবং তাদের মধ্যে বলিষ্ঠ প্রেরণা ও উন্নত চরিত্র সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছে। মনোযোগ আকর্ষণ করেছে যে, বিত্তবানদের ধন-সম্পদ ভাল কাজে ব্যয় করা ও সামাজিক জীবন উন্নত করার একটি পন্থা হলো মানুষ মৃত্যুর লৌহকঠিন অবস্থা সবার আয়ত্তে আসার আগে সুস্থ-স্বজ্ঞান অবস্থায় তার সম্পদের একটি অংশ সদাকায়ে জারিয়া হিসেবে দান করবে। আর এরূপ দানের নাম হল 'ওয়াকফ'। অন্য কথায় যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা থেকে আল্লাহর রাস্তায় তথা জনসাধারণের জন্য দিয়ে দেয়া হয় তাকে ইসলামি পরিভাষায় 'ওয়াকফ' বলে। একে 'সদাকায়ে জারিয়া'ও বলা হয়।

বস্তুত হযরত 'উমর রা. যে সব বিষয় উল্লেখ করেছেন তাই হল ওয়াকফের সঠিক সংজ্ঞা। অর্থাৎ কোনো সম্পত্তি কিংবা কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার নামে ওয়াকফ করা হলে তার আয় ফকির, গরিব, মুসাফির, ঋণগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতিমদের মধ্যে বণ্টন করতে হবে। তাকে বিক্রি বা হিবা বা ওয়াকফকারীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না।

---

৪২০. আল-কুরআন, ২ : ১৯৫, ২৫৪; ৩০ : ৩৮; ৫১ : ১৯

৪২১. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *আল-মু'জামুল ওয়াফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩০

৪২২. সম্পাদনা বোর্ড, *আল-মু'জামুল ওয়াসিত*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ১০৩৮

৪২৩. আল-কুরআন, ৪ : ১২; ২ : ১৮০; ২ : ২৪০; ৫ : ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের– ‘কে আছে যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে?’[৪২৪] এবং ‘তোমরা যা ভালবাস তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনও পূণ্য লাভ করবে না।’[৪২৫]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত তালহা রা. নবি সা.-এর খিদমতে আরজ করলেন, ‘হে আল্লাহর রসুল! আমার অমুক বাগানটি যা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়, তা আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করছি।’ রসুল সা. বললেন, ‘তুমি এটা তোমার সম্প্রদায়ের অভাবীদের জন্য (ওয়াকফ) করে দাও।’[৪২৬]

রসুল সা. হযরত ‘উমরকে উৎপাদিত দ্রব্য ইত্যাদি এবং হযরত তালহাকে বাগান আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করার নির্দেশ দিয়ে কল্যাণমূলক ওয়াকফের জন্য এক শারয়ি‘ ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছেন। এ ভিত্তি প্রত্যেক যুগের মুসলিম সমাজে এক প্রভাব বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করে আসছে। তাছাড়া তা মুসলিমদের অন্তরে নেক কাজ করার আবেগ জাগ্রত করার এক আলোকময় উদাহরণ ও দলিল হিসেবেই উপস্থাপিত হয়েছে। আর সে কারণেই মুসলিম সমাজে প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এমন কোনো প্রয়োজন ছিল না যার জন্য সমাজের বিত্তশালীরা নিজেদের সম্পদের একটি অংশ ওয়াকফ করেননি।

এ ধরনের ওয়াকফ নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষভাবে ইসলামি ব্যবস্থার এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে। এর অর্থ দিয়ে ফকির এবং অক্ষমদের জন্য আশ্রয়স্থল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ আশ্রয়স্থল থেকে তারা তাদের ক্ষুধা ও লজ্জা নিবারণ করতে পারত। দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফকির, মিসকিন ও অভাবীদেরকে এ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে ফ্রি চিকিৎসা দেয়া হত। এ ছাড়া তাদের জন্য সফর ইত্যাদির সুযোগ করে দেয়া হত।

মুসলিমরা অনুসন্ধান করে বেড়াত যে, কোনো সমাজের এমন কোনো প্রয়োজন আছে কি না যা পূরণ করা যায়? অতঃপর তারা এজন্য নিজের সম্পদের কিছু অংশ ওয়াকফ করে দিতেন। এমনকি তারা অসুস্থ পশুর চিকিৎসা, মালিকহীন কুকুরের খাদ্য প্রভৃতির জন্য আওকাফ (ওয়াকফের বহুবচন) কায়িম করতেন। নির্বাক পশুদের জন্য যদি মুসলিমদের মনে এত দয়া থেকে থাকে তাহলে আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের জন্য তাদের মনের অবস্থা কি রকম ছিল তা বলাই বাহুল্য।

মুসলিম সমাজে ইয়াতিম, অসহায়, অন্ধ, বেকার, সবধরনের অক্ষম ও দূর্যোগ-দুর্বিপাকে আক্রান্ত অভাবীদের জন্য যদি ওয়াকফের এক ব্যাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাতে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। আমরা এখানে মিশরের মামলুক যুগের এক ঐতিহাসিক ঘটনা পেশ করাকেই যথেষ্ট মনে করি। এ ঘটনাটি হলো– ‘কালাউন হাসপাতাল ওয়াকফের দলিল’। ওয়াকফনামাটি একটি সরকারি দলিল। এ দলিলে ওয়াকফকারী নিজের ওয়াকফ সম্পর্কে প্রত্যেক জিনিস লিপিবদ্ধ এবং তার সীমা নির্ধারণ করেন। মুসলিমদের মধ্য থেকে কয়েকজন ন্যায়পরায়ণ লোককে তার সাক্ষী করেন। যাতে যার তত্ত্বাবধানে ওয়াকফ সম্পত্তি চলবে সে তার পূর্ণ ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করতে পারেন। ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ককে ‘নাযির’ নামে অভিহিত করা হয়।

(১৫) জারাইর : প্রয়োজন মত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। মহানবি সা. এ ক্ষেত্রেও নিজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন এবং সকল উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন।[৪২৭]

(১৬) মিনাহ : দারিদ্র্য বিমোচনে ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ আর একটি কর্মসূচি হচ্ছে মিনাহ। এ কর্মসূচিতে উৎপাদনমুখি কোনো সম্পদ অভাবী-দরিদ্র কোনো ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিদান ছাড়া প্রদান করা হয়। মহানবি সা. স্বয়ং এ কর্মসূচির শুভ সূচনা করেন। মদিনার সামর্থ্যবান আনসার সাহাবাবৃন্দ মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিরদেরকে এ পদ্ধতিতে সহায়তার হাত প্রসারিত করেছিলেন। হাদিস থেকে ছয় ধরনের মিনাহ-এর কথা জানা যায়। এর মধ্যে অর্থ, ভারবাহী পশু, কৃষি জমি, ফলের বাগান এবং বাড়ি রয়েছে।[৪২৮]

---

৪২৪. আল-কুরআন, ৫৭ : ১১

৪২৫. আল-কুরআন, ৩ : ৯২

৪২৬. আবু ‘উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬১

৪২৭. ডঃ হাসান জামান, *ইসলামী অর্থনীতি*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৭৭), পৃ. ৪৬

৪২৮. Dr. Ziauddin Ahmed, *Islam : Poverty and Income Distribution*(UK : The Islamic Foundation, 1991), 9. 44

Dhaka University Institutional Repository

(১৭) সারাইব : দুরাবস্থা, দুর্ভিক্ষাবস্থা, জনকল্যাণ এবং জনগণের বেকারত্ব দূর করার জন্য যাকাত, সদাকাত ছাড়াও যে কর (আর্থিক সাহায্য) সরকারের পক্ষ থেকে বিত্তবানদের উপর আরোপ করা হয় তাকে 'সারাইব' বলে। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কর বলতে যা বুঝানো হয় ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তার অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে জনগণের উপর যে সব কর ধার্য করা হয়, সাধারণত এগুলো অনেক ক্ষেত্রে ইনসাফ বা ন্যায়ভিত্তিক নয়; রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র পরিচালকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই বর্তমানে এসব কর ধার্য করা হয়। এ সবের সাথে জনস্বার্থের সম্পর্ক খুব একটা নেই বললেই চলে।

(১৮) গনিমত : জাহিলি যুগের আরবরা যুদ্ধের মাধ্যমে যে মালে গনিমত পেত, তার সিংহ ভাগের অধিকারী হতেন স্বয়ং গোত্র প্রধান এবং বাকিটা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হত। বদর যুদ্ধেই মুসলিমরা সর্বপ্রথম মালে গনিমতের অধিকারী হয়। এ সার্বজনীন সম্পদ কিভাবে বণ্টন করা হবে সে সম্পর্কে রসুলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মুসলিমদেরকে মৌখিকভাবে কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশটি শুনিয়ে দেন। সুরা আল-আনফালে ইরশাদ হয়েছে,

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الأَنْفَالِ ط قُلِ الأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ج فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَأَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَه إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

'(হে মুহাম্মদ!) লোকে তোমাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে; বল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ এবং রাসুলের; সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও।'[৪২৯] অতএব রসুলুল্লাহ সা. তা মুসলিমদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন।[৪৩০] বাইতুল মালের বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তখন পর্যন্ত মালে গনিমতের খুমুস গ্রহণ করা হত না। রসুল সা. তাঁর বিবেচনা অনুযায়ীই মুসলিমদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিতেন।[৪৩১] কিন্তু বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দেন,

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَه وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ.

'আর জেনে রাখ, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের।'[৪৩২]

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সদাকার ন্যায় মালে গনিমতের বণ্টন পদ্ধতিও বলে দেন। তাই বদর যুদ্ধের পর রসুল সা. সর্বপ্রথম যে মালে গনিমতকে পাঁচ অংশে বিভক্ত করেন তা হল বনু কায়নুকার মালে গনিমত।[৪৩৩] রসুলুল্লাহ সা. কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মালে গনীমতের সিংহভাগ অর্থাৎ পাঁচ ভাগের চার অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করে বাকি পাঁচ ভাগের এক ভাগ বাইতুল মালে জমা করেন।

(১৯) ফাই : মুসলিম বাহিনীর প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যদি অমুসলিমরা নিজেদের ধন-সম্পদ ফেলে পালিয়ে যায় তাদের রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদকে 'ফাই' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ফাইয়ের সম্পদ বাইতুল মালের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সব সম্পদ গনিমতের মাল লাভকারী ও মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করা যাবে না। কেননা এ সব বিনা যুদ্ধেই লাভ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আল্লাহ ইয়াহুদিদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তার রসুলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৪৩৪]

মালে ফাই-এর ব্যয় : যে সমস্ত মাল যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই অমুসলিমদের কাছ থেকে লাভ করা হয় তাই হচ্ছে মালে ফাই। চতুর্থ হিজরিতে রসুলুল্লাহ সা. বনু নাযিরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। ফলে তাদের বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-কৃষি এবং পরবর্তী সময়ে বনু কুরাইযার এলাকা, তাদের মাল-আসবাব এবং খাইবারেরও কয়েকটি এলাকা যুদ্ধ ছাড়াই রসুলুল্লাহর অধিকারে আসে। যেহেতু মালে ফাইয়ের প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য মালে

---

৪২৯. আল-কুরআন, ৮ : ১

৪৩০. ইবন জারির, *তাফসির আত-তাবারি*(বৈরুত : দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়া, ১৯৬৯) খ. ৯, পৃ. ১০৯; আল কাসিম ইবন সালাম আবু 'উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*(ইসলামাবাদ : ইদারাতু তাহকিকাতে ইসলামি, ১৯৮৬ ইং), পৃ. ৩১৫

৪৩১. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ১৩৩

৪৩২. আল-কুরআন, ৮ : ৪১

৪৩৩. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৪৩৪. আল-কুরআন, ৫৯ : ৬

Dhaka University Institutional Repository

গনিমত থেকে আলাদা, তাই রসুলুল্লাহ সা. কুরআনের আয়াতের আলোকে তাকে সরকারি সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَه عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'আল্লাহ ইয়াহুদিদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে ফাই দিয়েছেন, তার জন্য তোমরা অশ্বে কিংবা উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি; আল্লাহ তো যার উপর ইচ্ছা তাঁর রসুলদেরকে কর্তৃত্ব দান করেন; আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।'[৪৩৫]

রসুলুল্লাহ সা. মালে ফাইকে সরকারি মালিকানাধীন সম্পত্তি ঘোষণা করে তা নিজের ব্যবস্থাধীনে রাখেন এবং পরবর্তী সময়ে নিজ অধিকার বলে বনু নাযিরের কিছু এলাকা মুহাজির এবং নিঃস্ব আনসারদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। মালে ফাইয়ের ব্যয় সম্পর্কে হযরত 'উমর রা. বলেন, বনু নাযিরের ধন-সম্পদ এমনি ধরনের ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা যুদ্ধ ছাড়াই সেগুলো তাঁর রসুলকে দান করেন। এজন্য মুসলিমদেরকে উট-ঘোড়া দৌড়াতে হয়নি (যুদ্ধ করতে হয়নি)। অতএব রসুল সা. সেগুলোকে নিজেই গ্রহণ করেন। তিনি এ থেকে সারা বছরের খরচাদি বের করে তার পরিবার-পরিজনকে দিতেন এবং যা কিছু অবশিষ্ট থাকত তা অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া (যুদ্ধের জন্য) এবং আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য খরচ করতেন।[৪৩৬]

মালে গনিমতের শুধু এক-পঞ্চমাংশ (খুমুস) রাষ্ট্রীয় বাইতুল মালে আসত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যয় হত। কিন্তু মালে ফাইয়ের সমস্তটাই বাইতুল মালে জমা করা হত। মালে ফাই-এর খুমুসের (পাঁচ ভাগের এক অংশ) ব্যয় সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আর বাকি পাঁচ ভাগের চার ভাগ রাষ্ট্রনায়কের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। মালে গনিমত এবং মালে ফাইয়ের খুমুসের ব্যয়ের খাত একই।'[৪৩৭]

ইমাম আবু হানিফার মতে, 'ফাই-এর মধ্যে খুমুস নেই। কিন্তু তার এ উক্তি কুরআনি দলিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মনে হয়।'[৪৩৮]

কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

مَا أَفَاءَ اللهُ عَلٰى رَسُوْلِه مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لاَ يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.

'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রসুলকে যে ফাই দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসুলের, রাসুলের স্বজনগণের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে।'[৪৩৯]

অতএব খুমুসকে পাঁচটি সমান অংশে বিভক্ত করা হত। এক অংশ রসুলুল্লাহর জন্য– যা তিনি জীবিত অবস্থায় নিজের এবং নিজের পরিবার পরিজনের জন্য এবং মুসলিমদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর ওফাতের পর এ সম্পর্কে উলামাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। যারা নবিদের উত্তরাধিকারের পক্ষপাতী তারা বলেন, এ অংশ রসুলুল্লাহ সা.-এর উত্তরাধিকারীরাই পাবে। আবু সওরের মতে এ অংশ ইমামেরই (রাষ্ট্রনায়ক) প্রাপ্য। কেননা রাসুলের ওফাতের পর তিনিই তো তাঁর মূল উত্তরাধিকারী। ইমাম আবু হানিফার মতে, 'রাসুলের ওফাতের সাথে সাথে তাঁর উত্তরাধিকারও বাতিল হয়ে গেছে।' ইমাম শাফি'য়ির মতে, 'এ অংশ মুসলিমদের কল্যাণার্থে, যেমন– সৈন্যদের বেতন, সওয়ারি এবং অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়, দূর্গ এবং পুল মেরামত, কাজি এবং ইমামদের বেতন প্রভৃতি বাবদ ব্যয় করা হবে।'[৪৪০]

---

৪৩৫. আল-কুরআন, ৫৯ : ৬
৪৩৬. ইমাম বুখারি, *সহিহ আল-বুখারি*(নয়া দিল্লী : ইসলামিয়া বুক সার্ভিস, ১৯৯৭), কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ২৮৯৩
৪৩৭. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ১২১
৪৩৮. আল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবন রুশদ আল-কুরতুবি, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ*(বৈরুত : দারুল মা'রিফা, ১৯৮১ ইং), খ.৫, পৃ.৪২২
৪৩৯. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭
৪৪০. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ১২২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অংশ যাবিল কুরবাদের জন্য। ইমাম আবু হানিফার মতে, এখন ওদের এ অংশও বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু ইমাম শাফি'য়ির মতে বাতিল হয়নি। 'যাবিল কুরবা' দ্বারা শুধু আবদে মানাফ, বনু হাশিম এবং বনু আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরকে বুঝায়; অন্যান্য কুরাইশ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এতে ছোট-বড়, বিত্তহীন-বিত্তশালী সকলে সমান অংশ পাবে, অবশ্য পুরুষ লোকেরা পাবে স্ত্রী লোকদের দ্বিগুণ।'[৪৪১]

'তৃতীয় অংশ অভাবগ্রস্ত ইয়াতিমদের জন্য। যে সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের পিতা মারা গেছেন তাদেরকে 'ইয়াতিম' বলা হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর আর কেউ ইয়াতিম থাকে না।'

চতুর্থ অংশ মিসকিনদের জন্য। মিসকিন হচ্ছে মালে ফাইয়ের ঐ সমস্ত অধিকারী যাদের জীবিকার সংস্থান নেই। মালে ফাইয়ের মিসকিন সদাকার মিসকিন হতে ভিন্ন।[৪৪২] সদাকা মালদার মুসলিমদের থেকে নিয়ে নিঃস্ব মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু মালে ফাই থেকে মুসলিম, অমুসলিম সকল মিসকিনই সমানভাবে সাহায্য পায়।

পঞ্চম অংশ ইবনুস সাবিলদের জন্য। ইবনুস সাবিল বলতে ঐ সমস্ত মুসাফিরকে বুঝায় যাদের কাছে পাথেয় নেই। যারা সফরে বের হবে এবং যারা ইতোমধ্যে বের হয়ে গেছে– তারা সকলেই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

'বাকি চার-পঞ্চমাংশ মাল বণ্টনের ব্যাপারে দু'টি উক্তি আছে। যেমন– (১) এটা শুধু সেনাবাহিনীর জন্য। এ থেকে সৈন্যদের বেতন দেয়া হবে এবং অন্য কেউ এর অংশীদার হবে না। (২) জনকল্যাণমূলক কাজ, সৈন্যদের বেতন এবং যে কাজ মুসলিমদের জন্য জরুরি তাতেই ব্যয় করা হবে। মালে ফাইকে সদাকার অধিকারীদের মধ্যে এবং সদাকাকে মালে ফাইয়ের অধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা জায়িয হবে না।'[৪৪৩]

ইমাম মাওয়ারদির ধারণা এ যে, 'খুব সম্ভব হযরত 'উসমানের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলার কারণ এ ছিল যে, তিনি সর্ব প্রকার 'দান' (আতিয়া) 'মালে ফাই' থেকে করতেন এবং সদাকা ও ফাইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না।'[৪৪৪]

যদি ইমাম (রাষ্ট্রনায়ক) মুসলিমদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কোন সহানুভূতি লাভ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। যেমন– পত্রবাহক, রাষ্ট্রদূত এবং মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে (যাদের মন জয় করা হয়) সাহায্য করা। তাহলে তিনি সে উদ্দেশ্যও মালে ফাই খরচ করতে পারেন।'[৪৪৫]

মালে ফাইয়ের এক পঞ্চমাংশ কিভাবে খরচ করা হবে কুরআন মাজিদে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে; কিন্তু চার-পঞ্চমাংশ কিভাবে ব্যয় করা হবে তার কোনো বর্ণনা দেয়া হয়নি। অতএব ইমাম তার ইজতিহাদ এবং এখতিয়ার অনুযায়ী এগুলো ব্যয় করবেন। মালে গনিমত এবং মালে ফাইয়ের এক-পঞ্চমাংশ ব্যয় করা সম্পর্কে যখন ফকিহদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে তখন এর শেষ মীমাংসা রাষ্ট্রনায়কের মতামতের উপরই নির্ভর করবে।

(২০) জিযিয়া : পূর্বতন ঐশী গ্রন্থধারী, অনারব মুশরিকরা যদি পরাজিত হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি জানায় এবং নিজেদের জান-মাল ও মান-সম্মান রক্ষার শর্তে বার্ষিক কিছু কর প্রদান করে ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে নেয় এরূপ করকে 'জিযিয়া' বলা হয়। জিযিয়ার বিধান প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

'যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনে না ও শেষদিনেও না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন অনুসরণ করে না; তাদের সহিত যুদ্ধ কর যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।'[৪৪৬]

---

৪৪১. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*(কুয়েত : দারু ইবন কুতাইবা, ১৯৮৯), পৃ. ১২২
৪৪২. প্রাগুক্ত।
৪৪৩. প্রাগুক্ত।
৪৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩
৪৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৪৪৬. আল-কুরআন, ৯ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

(২১) খুমুস : গনিমতের সম্পদ বণ্টনের আগে এবং রিকায (মাটির নিচে প্রোথিত ও খনি থেকে আহরিত সোনা-রূপা ইত্যাদি) থেকে উপকৃত হওয়ার পূর্বে সে সবের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই আলাদা করে নিতে হবে। এটা রাষ্ট্রের বাইতুল মালের প্রাপ্য। এ এক-পঞ্চমাংশকেই 'খুমুস' বলা হয়। পবিত্র কুরআনে গনিমতের সম্পদের উল্লেখ প্রসঙ্গে বাইতুল মালের প্রাপ্য এ এক-পঞ্চমাংশ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে,

'আর জেনে রাখ যে, যুদ্ধে যা তোমরা লাভ কর তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহর, রাসুলের, রাসুলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, মিসকিনদের এবং পথচারীদের যদি তোমরা ইমান রাখ আল্লাহ এবং তাতে যা মীমাংসার দিন আমি বান্দার উপর নাযিল করেছিলাম, যে দিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।'[৪৪৭]

বিশুদ্ধ বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, রিকায বা প্রোথিত বস্তুতেও খুমুসের বিধান রয়েছে। রসুল সা. বলেছেন, وفى الركاز الخمس 'রিকাযের মধ্যে খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ) ওয়াজিব।'[৪৪৮]

আরবি ভাষায় আভিধানিক অর্থে রিকায বলা হয় প্রোথিত বস্তুকে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ রহ. নবি কারিম সা. থেকে বর্ণিত একটি উদ্ধৃতিতে 'রিকায'-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ কথাও বলেছেন, নবি সা.-এর নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসুল! 'রিকায' কি বস্তু? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব সোনা-রূপা সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখে দিয়েছেন (অর্থাৎ খনি)।'[৪৪৯]

(২২) আশুর : ইরান ও রোমান সাম্রাজ্যের বিধান ছিল, যদি কোনো মুসলিম ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে তাদের দেশে যেত, তারা তাদের নিকট থেকে নির্ধারিত হারে কাস্টমস বা শুল্ক আদায় করত। বছরে যতবার তারা যাতায়াত করত ততবারই তাদেরকে এ শুল্ক প্রদান করতে হত। অপরদিকে অমুসলিম বণিকেরা ইসলামি রাষ্ট্রে আসলে এ ধরনের শুল্ক দিতে হত না। তাতে করে মুসলিম বণিকদের লোকসান দিতে হত কিন্তু অমুসলিম বণিকেরা লাভবান হত। একবার এ ব্যাপারটির প্রতি দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর রা.-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার পর তার প্রাদেশিক গভর্নরদের এ মর্মে পত্র লিখেন, 'তোমরাও বাণিজ্যিক পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করবে। শুধু অমুসলিম বণিকদের নিকট থেকেই নয়, বরং মুসলিম ও যিম্মিদের মধ্যেও যারা 'দারুল হারব' এবং দারুল ইসলামে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য করবে, তাদের সকলের নিকট থেকেই শুল্ক আদায় করতে হবে। তবে একবার যে ব্যবসায়ীর নিকট থেকে শুল্ক আদায় করা হবে, সারা বছর সে যতবারই যাতায়াত করুক না কেন, দ্বিতীয়বার আর শুল্ক নেয়া যাবে না। অবশ্য মুসলিম, যিম্মি ও অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির বণিকের নিকট থেকে শুল্ক আদায়ের বেলায় কিছুটা পরিমাণগত পার্থক্য থাকবে। তবে শুল্ক দু'শ দিরহাম কিংবা বিশ মিসকাল (বিশ মিসকাল মুদ্রাকারে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের সমান) মূল্যের পণ্য হলে দিতে হবে। এর চেয়ে কম হলে শুল্ক থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে আদায়কৃত শুল্ককে 'আশুর' বলা হয়। এ শুল্ক আদায়ের পরিমাণ হলো, মুসলিম ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ, যিম্মিদের বিশ ভাগের এক ভাগ, হারবি বা বিধর্মী রাষ্ট্রের অমুসলিম বণিকদের ব্যবসা পণ্যের দশ ভাগের এক ভাগ।[৪৫০]

(২৩) লা-ওয়ারিস সম্পদ : লা-ওয়ারিস সম্পদও ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি উৎস। যেহেতু রাষ্ট্রকে দেশের সমগ্র জনসাধারণের প্রতিনিধি মনে করা হয়, তাই আইনসম্মতভাবেই মৃত ব্যক্তির লা-ওয়ারিস সম্পদ জাতীয় সম্পদের অংশ হিসেবে পরিগণিত হবে। ইসলামি আইনও রাষ্ট্রের এ অধিকারকে সমর্থন করেছে। অতএব বাইতুল মালই হবে লা-ওয়ারিস মালের নিরঙ্কুশ অধিকারী।

কোনো মুসলিম কিংবা যিম্মির যদি মৃত্যু হয় এবং তার কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদ বাইতুল মালে জমা হবে। অনুরূপ যদি কোনো যিম্মি বিদ্রোহী হয়ে কিংবা কোনো মুসলিম যদি

---

৪৪৭. আল-কুরআন, ৮ : ৪১

৪৪৮. ইমাম বুখারী রহ., অনূ. সম্পাদনা পরিষদ, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ৬০, হাদিস নং ১৪১১

৪৪৯. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৫০. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; আবু উবাইদ, *কিতাবুল আমওয়াল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩-৫২৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হারব বা বিধর্মী রাষ্ট্রে পালিয়ে যায়, তবে তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং বাইতুল মালের মালিকানায় চলে যাবে।[৪৫১]

(২৪) ভূমি রাজস্ব : ইমাম কিংবা খলিফা যেসব সরকারি জমি বার্ষিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে চাষাবাদ করার জন্য প্রদান করেন, সেসব থেকে আদায়কৃত কর বা রাজস্বকে বলা হয় 'কিরাউল আরদ'। যে সব সরকারি জমি থেকে 'উশর কিংবা খারাজ আদায় করা হয় না, বরং ভাড়ার বিনিময়ে চাষাবাদ করার জন্য দেয়া হয়, ইসলামি পরিভাষায় এ ধরনের জমিকে 'আরদুল মুমলিকা' (খাস জমি) কিংবা 'আরদুল হাউজাহ' (দখলিকৃত জমি) বলা হয়। সাধারণত দু'ধরনের জমি করাউল আরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। (১) উত্তরাধিকারী না থাকার দরুণ যেসব জমি বাইতুল মালে জমা হয়ে যায় এবং (২) সামরিক অভিযানে বিজয় লাভের পর যে সব জমি সাধারণ মুসলিমদের জন্য ওয়াকফ হিসেবে পরিগণিত হয়ে নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে কৃষকদের চাষাবাদের জন্য দেয়া হয়।[৪৫২] 'উশর ও খারাজ সম্পর্কিত কুরআনের যেসব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, 'কিরাউল আরদ'-এর বিধানও সেসব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

মিশরের শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল 'আস খলিফা হযরত 'উমর রা.-কে মিশরের ঐ সমস্ত রাহিব (পুরোহিত) যারা লা-ওয়ারিস অবস্থায় মারা যায় তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে লিখেছিলেন, 'যদি এদের কোনো ওয়ারিস থাকে তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসদের হাতেই সমর্পণ কর, আর যদি ওয়ারিস না থাকে তাহলে তা বাইতুল মালে দাখিল করে নাও।'[৪৫৩]

লা-ওয়ারিস মালের উপর হোক তা স্থাবর বা অস্থাবর, তাতে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন 'যার কোনো উত্তরাধিকারী নেই তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার পক্ষ থেকেই সদাকা হিসেবে গরিব-মিসকিনদের মধ্যে খরচ করা উচিত।' ইমাম শাফিয়ি' বলেন, 'লা-ওয়ারিস সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণার্থেই ব্যয় করা হয়। কেননা প্রথমে এর মালিক ব্যক্তি বিশেষ হলেও বাইতুল মালে প্রবিষ্ট করার পর তা সর্বসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়।'[৪৫৪] লা-ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারীবিহীন ব্যক্তি নিহত হলে তার রক্তমূল্যও বাইতুল মালে জমা করা হয়।

(২৫) খারাজ : বিজিত দেশের যেসব খলিফা বিজিত দেশের কৃষি জমিকে তাদের অধিকারেই থাকতে দিয়েছেন, যেসব অমুসলিমদের সাথে আপোষ ও সন্ধি হয়েছে এবং তারা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও আশ্রয় লাভ করে যিম্মিত্ব গ্রহণ করেছে তাদের জমি-জমাকে খারাজি জমি বলা হয় আর খলিফা এসব জমির উপর যে কর ধার্য করেন তাকে বলা হয় খারাজ।[৪৫৫] খারাজের অর্থ হচ্ছে, ভূমি ব্যবহার করার সে সরকারি বিনিময়, যা ইসলামি রাষ্ট্র তার যিম্মি প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করে থাকে। ভূমি জরিপ এবং ভূমির উৎপাদনকে যাচাই করার পর সরকার নিজ বিবেচনা অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। ইসলাম পূর্ব যুগে মিশর, সিরিয়া, ইরাক এং ইরানের প্রজাসাধারণের কাছ থেকে খারাজ এবং জিযিয়া এ দু'ধরণের করই আদায় করা হত। রোমীয় এবং ইরানি উভয় সাম্রাজ্যেই এ কর প্রচলিত ছিল।

রসুলুল্লাহ সা.-এর যুগে যে সমস্ত ভূ-সম্পত্তি বণ্টন করা হত না সেগুলো সরকারি ভূ-সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হত। ঐ সম্পত্তিগুলো স্বয়ং রসুলুল্লাহ সা.-এর ব্যবস্থাধীন থাকত। তিনি সেগুলোর উৎপাদন থেকে নিজের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। অতঃপর যা অবশিষ্ট থাকত তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন।

অতঃপর হযরত 'উমরের খিলাফতকালে মিশর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি অঞ্চল বিজিত হলে তিনি বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত সাহাবা কিরাম রা.-এর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, বিজিত ভূ-সম্পত্তিগুলো সাবেক মালিকদের হাতেই রাখা হবে এবং তাদেরকে এগুলো থেকে বেদখল করা হবে না। এ ভূ-সম্পত্তির খাজনা

৪৫১. আল-কাসানি, *বাদায়িউস সানা'য়ি ফি তারতিবিশ শারা'য়ি*(কায়রো : মাতবাআতুল জামালিয়া, ১৯১০), খ.৭, পৃ. ১৩৬
৪৫২. ইবন 'আবিদিন, *আদ-দুররুল মুখতার*(রিয়াদ : দারু আলামিল কুতুব, ২০০৩), খ.৩, পৃ. ২৫৮
৪৫৩. আলাউদ্দীন আলি আল মুত্তাকি ইবন হিসামুদ্দিন আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল*(বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯), পৃ. ১৫২
৪৫৪. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৪৫৫. মাওলানা হিফযুর রহমান, অনূ. মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*(ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৮), পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুধু বিজয়ীরাই নয়; বরং বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুসলিমই উপকৃত হতে থাকবে।[৪৫৬] হযরত ‘উমর রা. ছিলেন সে জাতীয় ব্যবস্থাপক, যাদের সম্পর্কে প্রফেসর ডাল্টন বলেছেন, ‘প্রকৃত ব্যবস্থাপক শুধু বর্তমানের নয়; বরং ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করেন। মানুষ পৃথিবীতে আসে আবার চলে যায়, কিন্তু মানুষ যে মিল্লাতের একটি বৃহৎ জাতীয় স্বার্থের জন্য বর্তমানের একটি ক্ষুদ্র স্বার্থকে তিনি বলি দিতে প্রস্তুত থাকেন।’[৪৫৭]
মোটকথা হযরত ‘উমর রা. বিজিত ভূ-সম্পত্তি বণ্টন না করে জনস্বার্থের খাতিরেই সাবেক কৃষকদের দখলে তা রেখে দেন এবং কৃষকরা নির্ধারিত হারে সরকারি রাজস্ব প্রদান করতে থাকে। ইসলামি আইনের পরিভাষায় উপরিউক্ত ভূ-সম্পত্তিকে ‘খারাজি আরদিয়াত’ বলা হত। ‘খারাজি আরদিয়াতে’র মালিক ছিল বাইতুল মাল অর্থাৎ সমগ্র মুসলিম সমাজ।

হযরত ‘উমর রা. ইরাকের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রতি জারিবে এক কাফিয এবং এক দিরহাম ভূমিকর নির্ধারণ করেন। তিনি এ ব্যাপারে কিসরা ইবন কুবাযের (শাহ ইরান) অভিমতই গ্রহণ করেছিলেন।[৪৫৮]
এভাবে হযরত ‘উমর রা. আবশ্যকীয় সংস্কার সাধনের পর মিশরে বহুযুগ থেকে প্রচলিত ফির‘আউনি এবং রোমীয় ভূমিকর ব্যবস্থা বহল রাখেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত ‘উমর রা. কৃষকদেরই জমির মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। কেননা তাদেরকে নিজ নিজ অধিকৃত জমি থেকে বেদখল করাকে তিনি আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[৪৫৯]

মূলত ইসলাম হলো পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম হলো সামাজিকতার ধর্ম। শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার ধর্ম। আর কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে প্রণীত আইনই হলো ইসলামের আইন। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার মনোনীত দীন, যার বিভিন্ন বিধান রসুলুল্লাহ সা. এর উপর বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। শারি‘আহর সম্মিলিত রূপ হলো আল-কুরআন। অতএব ইসলামি আইন হচ্ছে কুরআনেরই আইন। অন্য কথায় বলা যায়, ইসলামি আইনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আল-কুরআন। এছাড়া সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসও ইসলামি আইনের অন্যতম উৎস। সৃষ্টির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণই ইসলামি আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সামাজিক নিরাপত্তা বিধান হলো ইসলামি আইনের কাম্য; শাস্তি প্রদান এর উদ্দেশ্য নয়।

---

৪৫৬. ইমাম আবু ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*(বৈরুত : দারুল মা‘রিফা, ১৯৭৯), পৃ. ১২-১৩
৪৫৭. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, অনূ. আবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ২০৪
৪৫৮. আল-মাওয়ার্দি, *আল-আহকামুস সুলতানিয়া*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১
৪৫৯. ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটা জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ'[১]। ভূ-রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ, উত্তরে পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্ব সীমান্তে আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম, দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে মায়ানমারের চীন ও রাখাইন রাজ্য এবং দক্ষিণ উপকূলের দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের ভূখণ্ড ভৌগোলিকভাবে একটা উর্বর ব-দ্বীপের অংশ বিশেষ। পার্শ্ববর্তী দেশের রাজ্য পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরাসহ বাংলাদেশ একটা জাতিগত ও ভাষাগত 'বঙ্গ' অঞ্চলটার অর্থ পূর্ণ করে। 'বঙ্গ' ভূখণ্ডের পূর্বাংশ পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল; যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পৃথিবীতে যে কয়টা দেশ জাতিরাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ থেকে ধীরে ধীরে মধ্যম আয়ের দেশের দিকে ক্রমধাবমান। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দের বন্ধনে আবদ্ধ সুন্দর একটা সামাজিক ব্যবস্থার দেশ বাংলাদেশ। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলাদেশে রয়েছে অবাধ ধর্মীয় স্বাধীনতা। কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। নিচে বাংলাদেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরা হল :

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান : বাংলাদেশের বর্তমান সীমান্ত তৈরি হয়েছিল ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাবসানের সময় বঙ্গ এবং ব্রিটিশ ভারত বিভাজন করা হয়েছিল। বিভাজনের পরে বর্তমান বাংলাদেশের অঞ্চল তখন পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত ছিল, যেটা নবগঠিত দেশ পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। পাকিস্তান অধিরাজ্যে থাকাকালীন পূর্ব বাংলা-কে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিবর্তিত করা হয়েছিল। শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[২] স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় ঘটেছে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ; এছাড়াও প্রলম্বিত রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও পুনঃপৌনিক সামরিক অভ্যুত্থান বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বারবার ব্যাহত করেছে। গণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও বিদ্যমান। সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও গত দুই দশকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উর্বর অববাহিকায় অবস্থিত এ দেশে প্রায় প্রতি বছর মৌসুমি বন্যা হয়; আর ঘূর্ণিঝড়ও অতি সাধারণ ঘটনা। জলবায়ু ও প্রকৃতি বাংলাদেশবাসীকে কিছুটা আয়েসি করে তুললেও নদী ও সমুদ্র তাকে দিয়েছে আত্মরক্ষার সহজ প্রবণতা ও প্রতিরোধক্ষমতা এবং তার মনে সৃষ্টি করেছে এক ধরনের কল্পনাবিলাসিতা।[৩] নিম্ন আয়ের এ দেশটার প্রধান সমস্যা পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য গত দুই

---

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(ঢাকা : আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮), পৃ. ২

২. ড. এ.এইচ.এম. মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : সামী-সীমান্ত পাবলিকেশন্স, ২০১৬), পৃ. ২৯৬

৩. মুনতাসীর মামুম ও মো. মাহবুবুর রহমান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৩), পৃ. ৩৭

দশকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে; সাক্ষরতার হার দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অর্জিত হয়েছে অভূতপূর্ব সাফল্য। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মানব সম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তবে বাংলাদেশ এখনো বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করছে যার মধ্যে রয়েছে পরিব্যাপ্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতি, বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা। তাছাড়া একটা সর্বজন গ্রহণযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থার রূপ নিয়ে নতুনভাবে সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি হওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ সংকট।

বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক পরিচয় জানার আগে এর প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত ও আনুষঙ্গিক প্রত্যয় সম্পর্কে জানা জরুরি।[৪] কেননা, অতীত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে বর্তমান। আর বর্তমানকে নিয়েই ভবিষ্যতের পরিকল্পনা প্রণীত হয়। মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। ইতিহাস ও ভূগোলের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্রের কথা সর্বজন স্বীকৃত সত্য প্রত্যয়। মানুষের অতীত কার্যক্রমের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু মানুষের কর্মকাণ্ড এক বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশে সংগঠিত হয়, তাই ভূগোলই ইতিহাসের ভিত্তি। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ভৌগোলিক পরিচয় প্রদানের প্রয়াস। বাংলার প্রাথমিক যুগের ভৌগোলিক পরিচয় পুনর্গঠনের তথ্য অপ্রতুল। তখন 'বাংলা' বলতে কোন ভূখণ্ডকে বুঝানো হত তা স্পষ্ট নয়।[৫] আদিকাল থেকে ১৪০০ খ্রি. পর্যন্ত সে সময়ের প্রায় শেষদিকে 'বাংলা' বলতে যে বিস্তৃত ভূখণ্ডকে বুঝানো হত তা নিয়েই এখানে আলোকপাত করা হল।

বাংলাদেশের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এখানে প্রাথমিক পর্যায়ে একই ভূখণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন ভৌগোলিক নামের অবস্থিতি ছিল। মোটামুটিভাবে ১৯৪৭-এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ডই আমাদের আলোচনার বিষয়; বর্তমানে এ ভূখণ্ড বাংলাদেশ। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এবং ভূগোলবিদগণও এ উপমহাদেশের মধ্যে 'বাংলা'কে একটা ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করেছেন।[৬] প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এ বাংলা। পূর্বে ত্রিপুরা, গারো ও লুসাই পর্বতমালা; উত্তরে শিলং মালভূমি ও নেপাল তরাই অঞ্চল; পশ্চিমে রাজমহল ও ছোটনাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এ বিস্তৃত সমভূমির দক্ষিণ দিক সাগরাভিমূখে ঢালু এবং গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-মেঘনার জলরাশি দ্বারা বয়ে আনা বিপুল পরিমাণ পলি সাগরে উৎসারিত হচ্ছে। সমুদ্র উপকূলবর্তী নিম্নভূমি জঙ্গলাকীর্ণ। এর পিছনেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল সমভূমি, যার গঠনে গঙ্গা-ব্রক্ষ্মপুত্র-মেঘনা প্রবাহের অবদান রয়েছে। এ বিস্তৃত সমতলভূমির মধ্যে ত্রিপুরা অঞ্চল (৩০০০ বর্গমাইল) নিকটবর্তী প্লাবন ভূমির তুলনায় গড়ে ৬ ফুট উঁচু আর এর মাঝামাঝি রয়েছে ময়নামতি পাহাড়। সিলেট অঞ্চলেও গড়ে প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং এরই দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত প্লাইস্টোসিন যুগে সুগঠিত মধুপুর উচ্চভূমি। এ উচ্চভূমির উত্তর-পশ্চিম বিস্তৃতিই হচ্ছে 'বরেন্দ্র' বা 'বারিন্দ' এলাকা। পশ্চিমে রাজমহল ও ছোট নাগপুর পাহাড় সংলগ্ন উত্তর থেকে দক্ষিণাভিমুখে বিস্তৃত প্লাইস্টোসিন ভূভাগ রয়েছে।[৭] নীহাররঞ্জন রায়ের ভাষায়– 'এ প্রাকৃতিক সীমাবিবৃত ভূমিখণ্ডের মধ্যেই প্রাচীন বাংলার গৌড়-পুন্ড্র, বরেন্দ্রি, রাঢ়া, সুহ্ম, তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ-বঙ্গাল ও হরিকেল প্রভৃতি জনপদ; ভাগিরথি, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, মেঘনা এবং আরও অসংখ্য নদ-নদী বিধৌত বাংলার গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পাহাড়, কান্তার। এ ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালির

৪. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ১১

৫. Dr. Abdul Momin Chowdhury, *Bangladesh Historical Studies and Itihas Samiti Patrika on Geography of Ancient Bengal : An Approach to its Study*(Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 1977), vol. III, 1977, pp. 31-53

৬. A.T.A. Learmonth & B. H. Farmer, *India, Pakistan and Ceylon, The Regions*(London : B.I. Publications, 1972), pp. 571-599

৭. J.P. Morgan & W.G. McIntire, *Quarternary Geology of the Bengal Basin, East Pakistan and India*(New York : The Society, 1959), vol. LXX, pp. 319-342

কর্ম-কৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম ও নর্মভূমি। একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈলভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র; মাঝখানে সমভূমির সাম্য– ইহাই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।[৮] এখানে 'বাংলা' নামটার উৎপত্তি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বিবৃত হলো :

ইংরেজ শাসনকালের 'বেঙ্গল', যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রযুক্ত ছিল, যা উপরে আলোচিত ভূখণ্ডকেই বুঝাত। ইংরেজদের 'বেঙ্গল' অন্যান্য ইউরোপীয়দের (বিশেষ করে পর্তুগিজদের) 'বেঙ্গালা' থেকেই নেয়া হয়েছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরাপীয়দের লেখনীতে 'বেঙ্গালা' নামে দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিজার ফ্রেডারিক 'বেঙ্গালা' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত চাটিগামের ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত 'সোন্দিব' দ্বীপের উল্লেখ করেছেন। দুজারিক প্রায় ২০০ লিগ উপকূল বিশিষ্ট 'বেঙ্গালা' দেশের উল্লেখ করেছেন। স্যামুয়েল পর্চাস-এর বর্ণনায়ও 'বেঙ্গালা' রাজ্যের উল্লেখ রয়েছে।[৯] র‌্যাল্‌ফ ফিচ্‌ 'বেঙ্গালা' দেশে 'চাটিগান', 'সতগাম' (সপ্তগ্রাম), 'হুগেলি' (হুগলি) এবং 'তান্ডা' (রাজমহলের নিকটবর্তী) শহরের উল্লেখ করেছেন।[১০] পূর্ববর্তী ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা 'বেঙ্গালা, বেঙ্গেলা, বাঙ্গালা' রাজ্য ও ঐ নামের একটা শহরের কথা উল্লেখ করেছেন। মার্কোপোলা উপমহাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বাঙ্গালা নামে প্রদেশের বৈশিষ্ট্যসূচক ভাষাভাষী প্রতিমা উপাসক জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন।[১১] ওভিংটনের বর্ণনায় আরাকানের উত্তর-পশ্চিমে 'বেঙ্গালা' রাজ্যের এবং ঐ রাজ্যের সীমান্তবর্তী প্রথম শহর চাটিগামের উল্লেখ রয়েছে।[১২]

ব্ল্যেভের ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ এবং সসেনের ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রে চট্টগ্রামের নিকটবর্তী 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি প্রমাণ করে।[১৩] রেনেল এ নামের শহরের উল্লেখ করেছেন; কিন্তু এর অবস্থিতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না।[১৪] গ্যাস্টালদির মানচিত্রে চাটিগামের পশ্চিমে 'বেঙ্গালা'র অবস্থিতি দেখান হয়েছে।[১৫] পর্তুগীজ-ভার্থেমা, বার্বোসা বা জাও দ্যা ব্যারোসের বর্ণনায় 'বেঙ্গালা রাজ্য ও 'বেঙ্গালা' শহরের উল্লেখ রয়েছে।[১৬] 'বেঙ্গালা' শহরের অবস্থিতি সম্পর্কে পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও 'বেঙ্গালা' রাজ্য যে এ 'বাংলাদেশ' অঞ্চলকে বুঝাত সে বিষয়ে তেমন কোনো সন্দেহ নেই।[১৭] মোগল আমলে এ ভূভাগই 'সুবা বাঙ্গালা' বলে চিহ্নিত হয়েছিল। আবুল ফজল এ প্রদেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে তেলিয়াগড় পর্যন্ত ৪০০ ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে হুগলি জেলার মান্দারণ পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। কামরূপ ও আসাম সুবা বাঙ্গালার সীমান্তে অবস্থিত ছিল।[১৮]

আবুল ফজল 'বাঙ্গালাহ' নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'বাঙ্গালাহ'র আদিনাম ছিল 'বঙ্গ'। প্রাচীনকালে এখানকার রাজারা ১০ গজ উঁচু ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রকাণ্ড 'আল' নির্মাণ করতেন; এ

---

৮. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*(কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, সং.৮, ১৪২১ ব.), পৃ. ৮৬-৯২
৯. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1913), vol.32, p. 437
১০. John Horton Ryley, *Ralph Fitch*(London : T.F. Unwin, 1899), pp. 100, 111, 113 & 118
১১. Sir Henry Yule, *The book of Ser Marco Polo*(London : John Murray, 1903), vol.II, pp. 114-115, 128
১২. John Ovington, *A Voyage To Suratt in the year 1689*(London : Oxford University Press, 1929), pp. 553-554
১৩. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1873), part I, IV, p. 233
১৪. James Rennell, *Memoir of a map of Hinduoostan*(London : University of California, South Branch, 1788), p. 57
১৫. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1908), p. 291
১৬. John Winter Jones, *The travels of Ludovico di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Deserta and Arabia Felix, in Persia, India, and Ethiopia*(London : The Hackluyt Society, 1863), p. 210
১৭. James Taylor, *A Sketch of the Topography & Statistics of Dacca*(Calcutta : G.H. Huttmann Military Orphan Press, 1840), pp. 92-93
১৮. Colonel H.S. Jarrett revised by Sir Jadunath Sarkar, *Ain-i-Akbari of Abul Fazal-i-Allami*(Calcutta : Royal Asiatic Soceity of Bengal, 1949), vol. II, p. 116

থেকেই ‘বাঙ্গাল’ এবং ‘বাঙ্গালাহ’ নামের উৎপত্তি।[১৯] তবে নামের উৎপত্তি সম্পর্কে আবুল ফজলের এ ব্যাখ্যা সকলেই স্বীকার করে নেননি। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, এ অনুমান সত্য নহে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং আরও প্রাচীন কাল হতেই বঙ্গ ও বাঙ্গাল দু'টো পৃথক দেশ ছিল এবং অনেক প্রাচীন লিপি ও গ্রন্থে এ দু'টো দেশের একত্র উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হতেই ‘আল’ যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হয়েছে, এটা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হতেই যে কালক্রমে সমগ্র দেশের ‘বাংলা’ এ নামকরণ করা হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। বর্তমানকালে বাংলাদেশের অধিবাসীগণকে ‘বাঙ্গাল’ নামে অভিহিত করা হয়। তা সে প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করে আসছে।[২০] এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় আবুল ফজলের ব্যাখ্যাকে একেবারে অযৌক্তিক মনে করেননি।

নদীমাতৃক বারিবহুল দেশের বন্যা ও জোয়ারের স্রোত রোধের জন্য ছোটবড় বাঁধ (‘আল’) বাঁধা কৃষি ও বাস্তুভূমির যথার্থ পরিপালনের পক্ষে অনিবার্য। তিনি বলেছেন, ‘আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ-বঙ্গদেশ আল বা আলিবহুল, যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ‘আল’ সে দেশই বাঙ্গালা বা বাংলাদেশ। এ আলগুলোই আবুল ফজলের সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তার ব্যাখ্যা পড়লে এ কথাই মনে হয়।’[২১] মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ অঞ্চল ‘বাঙ্গালা’ নামে অভিহিত হয়েছে। ‘বাঙ্গালাহ’ই তাদের ভাষায় হয়েছে ‘বেঙ্গালা’ বা ‘বেঙ্গল’। আকবর-পূর্ব যুগেও ‘বেঙ্গালা’র উল্লেখ পাওয়া যায় মার্কোপোলোর লেখনীতে। সুতরাং ‘বেঙ্গালা’ বা ‘বাঙ্গালা’ নাম মোগলপূর্ব যুগেই খ্যাতিলাভ করেছিল অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত। মোগল যুগ থেকেই এর বহুল প্রচার এবং ইউরোপীয়দের মাধ্যমেই এ নাম রূপ নিয়েছে ‘বেঙ্গালা’, ‘বেঙ্গলা’ বা ‘বেঙ্গল’ এ।[২২] মূলত মোগলপূর্ব যুগে ‘বাঙ্গালাহ’ সমস্ত ভূখণ্ডের নাম সূচনা করত কি না এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় যে, বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বাংলাদেশ বিজয়ের সময় ‘বাঙ্গালা’ নামে একক কোন দেশ ছিল না। ঐতিহাসিক মিনহাজ-ই-সিরাজ মুসলিমদের বাংলা বিজয়ের ইতিহাস রচনার সময় ‘বাঙ্গালা’ নামের উল্লেখ করেননি; বরং বরেন্দ্র, রাঢ় এবং বঙ্গ নামে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলকে চিহ্নিত করেন।

মিনহাজের বর্ণনায় বাংলা সম্বন্ধে তার ভৌগোলিক জ্ঞানের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লখনৌতি ও বঙ্গকে পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাকে বুঝিয়েছেন। তিনি বঙ্গের সাথে সমতট (সকনত)-এর উল্লেখও করেছেন।[২৩] মিনহাজের পরবর্তী ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারুনি সর্বপ্রথম ‘বাঙ্গালা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু সমগ্র দেশ নয়, এর অংশ বিশেষের উল্লেখ প্রসঙ্গে। ‘ইকলিম লখনৌতি’ বা ‘দিয়ার লখনৌতি’র পাশাপাশি ‘ইকলিম বাঙ্গালা বা ‘দিয়ার বাঙ্গালা’র উল্লেখ করেছেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব বাংলাকেই নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী ঐতিহাসিক শামস-ই-সিরাজ আফিফ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে ‘শাহ-ই-বাঙ্গালা’ ‘শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান’ বা ‘সুলতান-ই-বাঙ্গালা’ রূপে আখ্যা দিয়েছেন। সুলতান ইলিয়াস শাহ সমস্ত ‘বাংলাদেশে’ একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি বাংলার তিনটা শাসন কেন্দ্রই– লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও-এর উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলায় স্বাধীন সুলতানির প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করেন এবং স্বাধীনতা প্রায় দু'শো বছর ধরে অক্ষুন্ন ছিল। ইলিয়াস শাহ-ই মুসলিম সুলতানদের মধ্যে প্রকৃত অর্থেই প্রথম ‘শাহ-ই-বাঙ্গালা’ বা ‘সুলতান-ই-বাঙ্গালা’।[২৪]

---

১৯. Colonel H.S. Jarrett revised by Sir Jadunath Sarkar, *Ain-i-Akbari of Abul Fazal-i-Allami*, vol. II, ibid, p. 120

২০. শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*(কলিকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০১২), খ.১, পৃ. ১

২১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫

২৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল*(ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ২

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩, ১৯৮-২২৮

সুতরাং একথা বলা যায় যে, আফিফ 'বাঙ্গালা' বলতে সারা বাংলাদেশকে অর্থাৎ আবুল ফজলের 'বাঙ্গালা' বা ইউরোপীয়দের 'বেঙ্গালা' বা 'বেঙ্গল'কে বুঝিয়েছেন। ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই প্রথম 'বাঙ্গালা' তার ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ঐ সময়ে বঙ্গ বা বঙ্গাল দ্বারা বাংলার অংশবিশেষকে নির্দেশ করা হত। তাই 'বাঙ্গালা' নামের প্রচলন ইলিয়াস শাহের সময় থেকেই শুরু হয়েছে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।[২৫] সুকুমার সেন 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙ্গালা' বা 'বঙ্গালহ'র উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করেন। তিনি আরও বলেন, 'বাঙ্গালা' নামটা মুসলিম শাসনকালে সৃষ্ট এবং ফারসি 'বঙ্গালহ' থেকে পর্তুগীজ 'বেঙ্গালা' ও ইংরেজি 'বেঙ্গল' থেকে এসেছে বলে মত পোষণ করেন।[২৬] ইতিহাসের দৃষ্টিতে বর্তমানের বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গকে নিয়েই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা। এ ভূখণ্ডের একটা আঞ্চলিক সত্তা ছিল তাই ভূগোলবিদগণ বাংলাকে একটা ভৌগোলিক অঞ্চল (Region) বলে স্বীকার করেছেন।

বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচিতি : ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট মধ্যরাতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ রাষ্ট্রটা দু'টো অংশে বিভক্ত ছিল। যথা– পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। দুই পাকিস্তানের মধ্যকার দূরত্ব ছিল প্রায় ১৬০৯ কি.মি.। অবিভক্ত বঙ্গদেশের পূর্বদিকে তিন-চতুর্থাংশ এবং আসামের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পর নামকরণ হয় বাংলাদেশ।[২৭] বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী শহর ও চট্টগ্রাম হল বাণিজ্যিক রাজধানী।

বাংলাদেশের তিন দিকেই ভারত রাষ্ট্র, কেবল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। এর উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা, কুচবিহার, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য, পূর্বে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মায়ানমার (বার্মা), পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

বাংলাদেশের মোট সীমারেখা : ৫,১৩৮ কি.মি., মোট স্থলসীমা : ৪,৪২৭ কি.মি., জলসীমা : ৭১১ কি.মি. ও মোট সমুদ্রসীমা : ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি.। দেশের পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিমে ভারতের সাথে সীমান্ত ৪,১৫৬ কি.মি.[২৮] এবং দক্ষিণ-পূর্বদিকে মায়ানমারের (বার্মা) সাথে ২৭১ কি.মি.[২৯]। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৩২ কি.মি. (৪৫৫ মাইল)। আন্তর্জাতিক আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থান : অবস্থানগত দিক থেকে পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত। বাংলাদেশ ২০°৩৪ (২০ ডিগ্রি ৩৪ ইঞ্চি) উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮ (২৬ ডিগ্রি ৩৮ ইঞ্চি) উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এ দেশের বর্তমান সীমানা– উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, অরুণাচল ও আসাম রাজ্য; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্য, পূর্ব-দক্ষিণে মিয়ানমার (বার্মা); পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল। সমুদ্রতটে এটা অবস্থিত হওয়ায় এটার আয়তন পলিমাটি ও দ্বীপ তৈরি হওয়ার জন্য ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। আয়তন বাড়ার আরও একটা অন্যতম কারণ হল ভারত বিভক্তির সময় বাংলাদেশের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল দু'দেশের মধ্যদিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর মধ্য স্রোত বরাবর। কিছুদিন পূর্বে মায়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা বিষয়ক আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশের

---

২৫. Sir Jadunath Sarkar, *Commemoration Volume*(Hasiarpur : Punjab University Press, 1958), p. 56

২৬. সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা দেশের নামের পুরাতত্ত্ব*(কলিকাতা : ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ), সংখ্যা-৯, পৃ. ১৭-২০

২৭. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, আগষ্ট ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৩-৫, ৩১

২৮. হেলাল হামিদুর রহমান, *বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ১০-১১

২৯. প্রফেসর'স সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *নতুন বিশ্ব*(ঢাকা : প্রফেসর'স প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ৩

জয়ের ফলে বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় সমপরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীতে বা এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে বাংলাদেশ অবস্থিত। এটা প্রায় ২০°৩৪ উত্তর হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ফলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত।

আয়তন : আয়তনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯০তম। বাংলাদেশের মোট আয়তন প্রায় ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার (৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল)।[৩০] বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা প্রায় ২২ কি.মি. (১২ নটিক্যাল মাইল)[৩১] এবং দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চল (Economic zone) সমুদ্রের সীমারেখা হতে গভীর সমুদ্রের প্রায় ৩৭০.৪০ কি.মি. (২০০ নটিক্যাল মাইল) পর্যন্ত বিস্তৃত। সন্নিহিত এলাকা ১৮ নটিক্যাল মাইল। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজার; যার দৈর্ঘ্য ১৫৫ কি.মি.।[৩২]

জনসংখ্যা : জনসংখ্যার আকারের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম রাষ্ট্র। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ২০১১ সালের পঞ্চম আদমশুমারি অনুযায়ী প্রায় ১৫১.৭ মিলিয়ন ও। ২০১৬ সালের সাময়িক প্রাক্কলন অনুয়ায়ী ১৬০.৮ মিলিয়ন। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। ২০১৬ সালের সাময়িক প্রাক্কলন অনুযায়ী স্থূল জন্ম হার প্রতি হাজারে ১৮.৭ জন এবং মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫.১। শিশু মৃত্যু হার প্রতি হাজার জীবিত শিশুর মধ্যে ২৮ জন। নারী-পুরুষের অনুপাত ১০০ : ১০০.৩। প্রত্যাশিত গড় আয়ুকাল ৭১.৬ বছর। বর্তমানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১,০৯০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।[৩৩] পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৪.৪ জন। ২০১৭ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৬তম।

বাংলাদেশের জলবায়ু : বাংলাদেশ বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এখানে এত অধিক যে, সামগ্রিকভাবে এ জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। যদিও বছরকে ছয়টা ঋতুতে ভাগকরা হয়, তবে মাত্র তিনটা সুনির্দিষ্ট ঋতু লক্ষ্য করা যায়। শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। অন্য তিনটা ঋতু– শরৎ, হেমন্ত ও বসন্তকাল তেমন স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয় না। এদেশের জলবায়ু মৌসুমি বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর্দ্র গ্রীষ্মকাল, মৃদু শীতকাল, সারা বছর উচ্চ তাপমাত্রা ও প্রচুর বৃষ্টিপাত এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব এদেশের জলবায়ুর উপর এত অধিক যে সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এক একটা ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। একটা হতে আর একটা ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাত সম্পূর্ণরূপে পৃথক। এ বিভিন্ন ধরনের ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়। কিন্তু কোন সময়ই এটা অন্যান্য শীত প্রধান ও গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মত চরমভাবাপন্ন হয় না। বাংলাদেশকে ছয়টা জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়। যথা, (১) ক্রান্তীয় সামুদ্রিক জলবায়ু অঞ্চল; (২) ক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল; (৩) ক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল; (৪) ক্রান্তীয় প্রায় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল; (৫) উপক্রান্তীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু অঞ্চল ও (৬) উপক্রান্তীয় আদ্র জলবায়ু অঞ্চল।[৩৪]

৩০. Statistics & Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, *Statistical Year Book Bangladesh 2017*(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, May 2018), p. xxi

৩১. ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল বা ১.৮৫২ কি.মি.

৩২. ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, *ভূগোল*(ঢাকা : কাজল ব্রাদার্স লিঃ, ২০১১), পৃ. ৩২-৩৩

৩৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*(ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, জুন ২০১৮), পৃ. xvii

৩৪. হেলাল হামিদুর রহমান, *বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০২), পৃ. ৩২-৩৩

তাপমাত্রা : বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৪° সে. ও ২১° সে. (৯৩.২° ও ৭০.০° ফা.) এবং শীতকালীন সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° সে. ও ১১° সে. (৮৪.২° ও ৫১.৮° ফা.) অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের তাপমাত্রার পার্থক্য ৫°-১০° সে.। কিন্তু ১৯০৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারিতে শীতকালীন তাপমাত্রা দিনাজপুর ১.৬° সে. পরিলক্ষিত হয়। আজ পর্যন্ত এটা বাংলাদেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। সমুদ্রের প্রভাব এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের দরুণ বাংলাদেশে গ্রীষ্মের আধিক্য দেখা যায় না। এখানে গ্রীষ্মকালীন গড় উষ্ণতা ২৭° সে. হতে ৩২.২° সে. (৮০°–৯০° ফা.) এবং শীতকালীন গড় উষ্ণতা ১৩.২° সে. হতে ২১° সে. (৫৭°- ৭০° ফা.)।[৩৫]

বৃষ্টিপাত : বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত, রাজশাহি অঞ্চলের লালপুরে (১১৭.৫ সে.মি. বা ৪৭´´) এবং সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলের লালখান (৬৩৭.৫ সে.মি. বা ২২৫´´) পরিলক্ষিত হয়। এ দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের গড় ২০৩ সে.মি. (৮০´´)। এর পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্বদিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমঃশই বেশি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত উত্তর-পূর্বাংশে ৫০০ সে.মি., দক্ষিণ পূর্বাংশে ৩০০ সে.মি. এবং পশ্চিমাংশে ১২৫ সে.মি। বাংলাদেশের মোট ঋতু ছয়টা– (১) গ্রীষ্ম, (২) বর্ষা, (৩) শরৎ, (৪) হেমন্ত, (৫) শীত, ও (৬) বসন্ত। তবে বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত তিনটা ঋতুতে ভাগ করা যায়। যথা, (ক) শীতকাল (খ) গ্রীষ্মকাল ও (গ) বর্ষাকাল। একারণে বাংলাদেশকে মৌসুমি জলবায়ুর দেশও বলা হয়। মোটকথা শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রশাসনিক বিভাগ : বাংলাদেশে বর্তমানে ৮ টা প্রশাসনিক বিভাগ আছে। যথা :

(১) ঢাকা : ঢাকা বিভাগে ১৩টি জেলা রয়েছে।
(২) চট্টগ্রাম : চট্টগ্রাম বিভাগে ১১টি জেলা রয়েছে।
(৩) খুলনা : খুলনা বিভাগে ১০টি জেলা রয়েছে।
(৪) রাজশাহী : রাজশাহী বিভাগে ৮টি জেলা রয়েছে।
(৫) বরিশাল : বরিশাল বিভাগে ৬টি জেলা রয়েছে।
(৬) রংপুর : রংপুর বিভাগে ৮টি জেলা রয়েছে।
(৭) সিলেট : সিলেট বিভাগে ৪টি জেলা রয়েছে।
(৮) ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি জেলা রয়েছে।

বাংলাদেশের নদ-নদী : বাংলার ইতিহাস রচনা করেছে বাংলার ছোট বড় অসংখ্য নদ-নদী। এ নদ-নদীগুলোই বাংলার প্রাণ; এগুলোই বাংলাকে গড়েছে, যুগে যুগে বাংলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেছে এবং এখনও করছে। এ নদ-নদীগুলোই বাংলার আশীর্বাদ এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও কখনও বোধ হয় বাংলার অভিশাপ।'[৩৬] নীহাররঞ্জন রায়ের এ উক্তিতে বাংলার ভূপ্রকৃতিতে নদীর গুরুত্ব খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা ২৩০ টা। বাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগ নদীবাহিত পলিদ্বারা গঠিত এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব বাংলার কিছু অংশ ছাড়া বাংলার প্রায় সবটাই ভূতত্ত্বের আলোকে নবসৃষ্ট (new alluvium)। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্বদিকের সীমান্তবর্তী পর্বতমালা ছাড়া বাকি সবটাই সমতলভূমি এবং এ সমগ্র ভূভাগই নদীমালার ব-দ্বীপ বা 'ডেল্টা'।[৩৭] 'ওল্ডহাম' পশ্চিমে হুগলি নদী থেকে পূর্বে মেঘনা নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগকেই গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীমালার 'ডেল্টা' বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮] বাংলার ভূমিগঠনের ভূতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

---

৩৫. Statistics & Informatics Division, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, *Statistical Year Book Bangladesh 2017*(Dhaka : Bangladesh Bureau of Statistics, May 2018), p. xxii

৩৬. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

৩৭. Amitabha Bhattacharyya, *Historical Geography of Ancient and Early Mediaeval Bengal*, ibid, vol. II. pp. 16

৩৮. Board of Editors, *Journal of the Asiatic Society of Bangal*(Dacca : Asiatic Society of Bangladesh, 1870), p. 47

করে কোন অংশ মূলত 'ডেল্টা' সে বিষয়ে বাগচী[৩৯] আরও তথ্য পরিবেশন করেছেন। উত্তর-পূর্বে ও পূর্বে অবস্থিত সিলেট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পর্বতমালা 'টারশিয়ারি পাহাড়'। উত্তরে পদ্মা, পশ্চিমে ভাগীরথী, পূর্বে মেঘনা এবং দক্ষিণে বঙ্গেপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মূলত প্লাবন সমভূমি এবং গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র দ্বারা গঠিত ব-দ্বীপ বা 'ডেল্টা'।

তাই ভূ-প্রাকৃতিক গঠন বৈশিষ্ট্যের আলোকে বাংলার পাঁচটা ভাগ ধরা যায় : (১) উত্তর বাংলার পাললিক সমভূমি, (২) ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অন্তবর্তী ভূ-ভাগ, (৩) ভাগীরথী-মেঘনা অন্তবর্তী বদ্বীপ, (৪) চট্টগ্রামাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা এবং (৫) বর্ধমানাঞ্চলের অনুচ্চ পার্বত্য এলাকা। বাংলার ভূপ্রকৃতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নদীমালার। প্রধান নদীগুলোর স্রোতধারাই বাংলাকে মূলত চারটা বিভাগে বিভক্ত করেছে– উত্তর, পশ্চিম, মধ্য ও পূর্বভাগ। প্রত্যেকটা ভাগেরই যেমন রয়েছে নিজ নিজ ভৌগোলিক সত্তা, তেমনি রয়েছে ঐতিহাসিক সত্তা। অষ্টাদশ শতকে রেনেলের, সপ্তদশ শতকে ফানডেন ব্রোকের এবং ষোড়শ শতকের জাও দ্যা বারোসের নকশায় বাংলার নদীপথগুলোর গতিপথ অনেকটা স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে।[৪০] বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। জালের মত এ নদী পুরো বাংলাদেশকে ঘিরে রেখেছে। এর অল্প আয়তনের মধ্যে এত বেশি নদ-নদী পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না। অর্থাৎ এদেশের অন্যতম প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য হল এর নদ-নদী।[৪১] পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা, কর্ণফুলি প্রভৃতি বড় বড় নদী এবং এদের উপনদী ও শাখানদীর শাখা-প্রশাখা ভূখণ্ডের বুক চিরে শিরা-উপশিরার মত সাগর পানে বয়ে চলেছে। বাংলাদেশের নদীমালা এর গর্ব।

নদী এদেশের মানুষের জীবন ও জীবিকার নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। বলতে গেলে এ নদীই বাংলাকে গড়ে তুলেছে, বাঙালির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছে। এদেশ গোটা পূর্ব ভারতের নদীসমূহের সঙ্গমস্থল। উত্তর ভারত আর আসামের সমতলভূমি বেয়ে উপনদী-শাখানদীসমূহ নিয়ে নেমে এসেছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রসহ বিভিন্ন নদী। বর্ষার বিপুল জলরাশি সমগ্র উত্তর-ভারত আর আসামের পলিপ্রবাহ বুকে নিয়ে এ জাল বেয়ে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে প্রায় ৭০০ টা নদী-উপনদী সমন্বয়ে বিশ্বের অন্যতম নদীব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। দেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কিলোমিটার। ছোট ছোট পাহাড়ি ছড়া, আঁকাবাঁকা মৌসুমি খাড়ি, কর্দমপূর্ণ খালবিল, যথার্থ দৃষ্টিনন্দন নদ-নদী ও এদের উপনদী এবং শাখা নদী নিয়ে বাংলাদেশের বিশাল নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।[৪২] দেশের উত্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং আকার দুইই বৃদ্ধি পেয়েছে। ড. মুনতাসির মামুন নদীগুলোকে মোটামোটি পাঁচভাগে ভাগ করেছেন– (১) গঙ্গা বা পদ্মা এবং এর বদ্বীপ; (২) মেঘনা ও সুরমা প্রবাহ; (৩) ব্রহ্মপুত্রের শাখা-প্রশাখা; (৪) উত্তরবঙ্গের নদীসমূহ ও (৫) পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সংশ্লিষ্ট সমতলভূমি নদী। ফলে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার উপর নদ-নদীর প্রভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলো হল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, সুরমা এবং কর্ণফুলি ইত্যাদি।[৪৩]

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি : ভূ-প্রকৃতি বলতে মাটির গঠন বিন্যাসকে বুঝায়। পৃথিবীর উপরি পৃষ্ঠের নাম ভূপৃষ্ঠ। সাধারণত পৃথিবীর কোন দেশেরই ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। কোথাও উঁচু আবার কোথাও নিচু; আবার কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত সমভূমি; কোথাও সুউচ্চ পাহাড় বা বিস্তৃত পর্বতমালা কিংবা বিশালাকার মালভূমি। ভূপৃষ্ঠের এরূপ উঁচু-উঁচু অবস্থাকে ভূ-প্রকৃতি বলে। ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশ অনন্য। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ক্রমশ ঢালু। পূর্বে সামান্য

---

৩৯. K. Bagchi, *The Ganges Delta*(Calcutta : University of Calcutta, 1944), pp. 18-35

৪০. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*(ঢাকা : বর্ণায়ন, মার্চ ২০০২), পৃ. ১৬

৪১. প্রফেসর মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি:, আগষ্ট, ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৭-৮

৪২. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪), খ.৬, পৃ. ৩৭৯

৪৩. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

উচ্চভূমি ছাড়া সমগ্র দেশ বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে গেছে অসংখ্য নদ নদী। এত নদ-নদী বিধৌত ও উর্বর সমতল ভূমি পৃথিবীতে বিরল। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বাংলা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ বলে খ্যাত। এ বদ্বীপ অঞ্চলের বেশিরভাগ ভূমিই গড়ে উঠেছে গঙ্গা, ভাগীরথী, পদ্মা, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র বয়ে নেমে আসা পলি মাটি দ্বারা। শত-শত বছর ধরে জমে উঠা পলিমাটিতে এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন জনপদ। কখনও দু'কুল বেয়ে উপচে পড়েছে বর্ষার বিপুল জলরাশি, কখনও বা নদীপথ সরে গিয়ে জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে, ভেঙ্গে তছনছ হয়েছে বাংলার ভূ-ভাগ। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশই এসব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে বেশ কিছুটা প্রাচীন বা পুরাভূমিও বিদ্যমান। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বাংলাদেশকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ বা উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বের পর্বতমালা : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ অবস্থিত। দেশের মোট ভূখণ্ডের প্রায় ১২% এলাকা নিয়ে এটা বিস্তৃত। টারশিয়ারি যুগের শেষ দিকে গিরিজন আলোড়নের ফলে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এসব পাহাড় ভঙ্গিল এবং বেলে পাথর, শেল পাথর ও কাদা দিয়ে গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা : (ক) দক্ষিণ পূর্বের পার্বত্য অঞ্চলে ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বের পাহাড়সমূহ।[৪৪]

(২) প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ বা উচ্চ সমভূমি অঞ্চল : বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডের শতকরা প্রায় ৮ ভাগ এলাকা নিয়ে উচ্চ সমভূমি অঞ্চল গঠিত। আনুমানিক ২৫ হাজার বছর পূর্বের সময়কালকে প্লাইস্টোসিন যুগ বলা হয়। এ সময়ে মহাদেশীয় উঁচু ভূভাগের বরফ গলে পলি সঞ্চিত হয়ে এসব উঁচু সমভূমি গঠিত হয়েছিল। এগুলোর গড় উচ্চতা ১০ থেকে ১৮ মিটার। এগুলোকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) বরেন্দ্রভূমি; (খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়; এবং (গ) লালমাই পাহাড়।[৪৫]

(৩) বিস্তৃত পলিমাটির সমতলভূমি বা সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি : ভূ-তাত্ত্বিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন সৃষ্ট এ নিম্নসমভূমি অঞ্চল। দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ ভূমি এ অঞ্চলের আওতায় পড়ে। এর আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর গড় উচ্চতা ৯ মিটারের কম। এ অঞ্চল পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের অসংখ্য উপনদী ও শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বার্ষিক প্লাবনের ফলে বহুস্থানে অগভীর জলাভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো বিল ও হাওড় নামে পরিচিত। এ অঞ্চলের উপকূল ভাগ অত্যন্ত আঁকাবাকা, ফলে অসংখ্য ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর মধ্যে হাতিয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া ও মহেশখালী অন্যতম।[৪৬] সমভূমি অঞ্চলকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : যথা, (১) পশ্চিম বদ্বীপ সমভূমি যার মধ্যে কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের উত্তরাংশ অন্তর্ভুক্ত। (২) পূর্ব বদ্বীপ সমভূমি যার মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ ফরিদপুর এবং বরিশাল অন্তর্ভুক্ত। (৩) ব-দ্বীপ মোহনা বা সুন্দরবন ও দক্ষিণ পশ্চিম বরিশাল। বাংলাদেশের এ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর। ফলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলের ভূমিকা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। এদেশের ভূখণ্ড উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে অবস্থিত।

বাংলাদেশের মৃত্তিকা : ভূ-ত্বকের বহিরাবরণের সূক্ষ্ম পদার্থের শিথিল কোমল স্তরকে মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকা শিলা হতে উৎপন্ন হয়। খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি, বায়ু ইত্যাদির মিশ্রণে মৃত্তিকা গঠিত। ভূ-ত্বকের শিলাস্তরগুলো সূর্যতাপ, বৃষ্টিপাত, হিমবাহ, তুষার প্রভৃতির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সূক্ষ্ম শিলাকণায় পরিণত হয়। এ শিলাকণাই জৈবিক পদার্থের সাথে মিশ্রিত হয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।[৪৭]

---

৪৪. হেলাল হামিদুর রহমান, *বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান, *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*(ঢাকা : গ্রন্থ কুঠির, ২০১৪), পৃ. ৩১-৩২

৪৭. মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরী, *অর্থনৈতিক ও আঞ্চলিক ভূগোল*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৭), খ.২, পৃ. ৭-৮

বাংলাদেশের সমাজ ও জনগণের উপর এর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব : দেশ ও জনগণের উপরে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের প্রভাব অপরিসীম। মানুষের সংস্কৃতি পরিবেশের সৃষ্টি। ভূ-প্রকৃতি, অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড়-সাগর, জলবায়ু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভূখণ্ডের বিশেষ অবস্থানের জন্য জলবায়ুর তারতম্য ঘটে, জলবায়ুর তারতম্যের কারণে মানুষের খাদ্যাভ্যাস পোশাক-পরিচ্ছদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভৌগোলিক কারণে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি, তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ভিন্নতর হয়। ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, নদ-নদীর গতি পরিবর্তন মানুষের সভ্যতার পরিবর্তন ঘটায় বিপর্যস্ত করে; নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটাতেও সাহায্য করে।[৪৮] পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর মানসিকতা তৈরি হয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান এবং প্রাকৃতিক প্রভাবের ফলে।

বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আদ্র ও সমভাবাপন্ন। এটা দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত এবং ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। গঠনগত দিক থেকে বাংলাদেশ টারশিয়ারি ও প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চ ভূমি ও পাহাড় এবং নদী বিধৌত পলি মাটি দ্বারা গঠিত প্লাবন সমভূমির সমন্বয়ে গঠিত। এটা একটা নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে ছোট-বড় অসংখ্য নদী প্রবাহমান। বাংলাদেশ একটা ক্রান্তীয় অঞ্চল। বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলাদেশের জন জীবনে নদ-নদীর প্রভাব অত্যন্ত বেশি। বাংলাদেশের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উন্মুক্ত দ্বার। নৌ যোগাযোগের সুবিধার কারণে সু-প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশ ভূ-রাজনৈতিক দিক যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। ভূ-প্রাকৃতিক কারণেই বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

মূলত রাজনৈতিক সত্তার সঙ্কোচন ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জনপদগুলোর সীমাও সঙ্কুচিত বা বিস্তারিত হয়েছে। আর তাই সব জনপদের সীমা সব সময় এক থাকেনি; থাকা সম্ভবও নয়। আবার প্রাকৃতিক সীমা ও রাষ্ট্র সীমা এক হয় না। প্রাচীন যে আঞ্চলিক সত্তাগুলো আমরা লক্ষ্য করি তা মূলত প্রাকৃতিক ভাগে বিভক্ত ভূখন্ডকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। এ প্রাকৃতিক ভাগাভাগির প্রধান হাতিয়ার বাংলার নদীপ্রবাহ। মুসলিম শাসন প্রবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলায় স্থাপিত মুসলিম সাম্রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা সহজে দখল করে নেয় এবং পরবর্তীতে দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব বাংলায় সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করে। প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে মুসলিমগণের আগমনের পূর্বে তিনটা জনপদই বাংলার সমার্থক হয়ে উঠে– পুণ্ড্র, গৌড় ও বঙ্গ। এর মধ্যে অন্যান্য সত্তা যেন একে একে বিলিন হয়ে পড়েছিল। আবার এর মধ্যেও পুণ্ড্র যেন গৌড়ের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকেই বাংলার বাইরে বাংলা গৌড় বা বঙ্গ বলেই অভিহিত হয়েছে। মুসলিম শাসনকালের প্রাথমিক পর্যায়ে লখনৌতি এবং পরে সাতগাঁও ও সোনারগাঁওকে কেন্দ্র করে তিনটা রাজনৈতিক সত্তা গড়ে উঠে। ইলিয়াস শাহি শাসনে এ তিনটা সত্তা একিভূত হয় এবং 'বাংলা' নামের উৎপত্তি হয়। 'বঙ্গ' থেকেই বাংলার উদ্ভব। এ নামের বিকাশ ঘটেছিল মোগল যুগে 'সুবাহ-ই-বাঙ্গালাহ'র মাধ্যমে আর ইংরেজ শাসনকালে এ নাম 'বেঙ্গল' রূপ নিয়ে দেশে-বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।[৪৯]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা : বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম যদিও আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে ৯৪তম; ফলে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে নবম। মাত্র ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলেরও কম এ ক্ষুদ্রায়তনের দেশটার বর্তমান জনসংখ্যা ১৬০.৮ মিলিয়নের বেশি অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘনত্ব ১০৯০ জন।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের চলতি মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) পরিমাণ ছিল ১৯,৫৬১ বিলিয়ন কোটি টাকা যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি লাভ করে ২২,৩৮৪ বিলিয়ন কোটি টাকায় উন্নীত হয়। একই সঙ্গে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে জনগণের মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল

---

৪৮. এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*(ঢাকা : মজিদ পাবলিকেশন, ২০১৯), পৃ. ১৮-১৯
৪৯. আব্দুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১,৬০২ মার্কিন ডলার যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১,৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে মর্মে সরকারিভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে; টাকার অংকে যার পরিমাণ ১,৪২,৮৬২ টাকা। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের ঊর্ধসীমার হার ২৪.৩ শতাংশ ও নিম্নসীমার হার ১২.৯ শতাংশ।[৫০] এ উন্নয়নশীল দেশটা প্রায় দুই দশক যাবত ৫ থেকে ৭.৬৫ শতাংশ হারে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির অর্জনপূর্বক পরবর্তী একাদশ অর্থনীতিসমূহের তালিকায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে।

রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরের পরিবর্ধন বাংলাদেশের এ উন্নতির চালিকাশক্তিরূপে কাজ করছে। এর কেন্দ্রবিন্দুতে কাজ করছে একটা উচ্চাকাঙ্খী মধ্যবিত্ত শ্রেণির ত্বরিত বিকাশ এবং একটা সক্ষম ও সক্রিয় উদ্যোক্তা শ্রেণির আবির্ভাব। বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী তৈরি পোশাক শিল্প সারা বিশ্বে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। জনশক্তি রপ্তানীও দেশটার অন্যতম অর্থনৈতিক স্তম্ভ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। দেশের সরকার ও জনগণের অক্লান্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের ফলে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে।

২০২০ সালের দ্বিতীয়ার্ধে বিনিয়োগ, শিল্প উৎপাদন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে গতি ফিরে আসায় বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি বাড়বে বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) পূর্বাভাস প্রদান করে। আইএমএফ-এর সর্বশেষ প্রকাশিত ওয়ার্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০১৭-এ ২০১৭ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৬ সালের তুলনায় ০.৪ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৫ শতাংশে উন্নীত হয় এবং প্রবৃদ্ধির এ হার ২০১৮ সালে ৩.৬ শতাংশে দাঁড়াবে বলে আইএমএফ এক পূর্বাভাস দিয়েছিল।

উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা, বাণিজ্যিক ও আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহে আস্থা ফিরে আসা, এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হয়েছে। অন্যদিকে বিনিয়োগ পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি, চীনের অবকাঠামো ও আবাসন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি অবস্থা থেকে আংশিকভাবে হলেও বেরিয়ে আসা ইত্যাদি বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিশ্ব অর্থনীতিতে সম্ভাব্য কতিপয় ঝুঁকিসমূহের মধ্যে রয়েছে উন্নত অর্থনীতির কতিপয় দেশের অন্তর্মুখী সংরক্ষণ নীতি, যা বিশ্ববাণিজ্য এবং আন্তঃসীমান্ত বিনিয়োগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া, আর্থিক খাতের নিয়ন্ত্রণ পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যা সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করতে পারে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতি মুকাবিলা করে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে অবস্থান করছে তার বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো :

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা : বাংলাদেশের অর্থনীতি দৃঢ়তার সাথে বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ সংকট মুকাবিলা করে প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৭.৬৫ শতাংশে। পূর্ববর্তী অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭.২৮ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল ১৬১০ মার্কিন ডলার। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় ১৪২ মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়ে ১৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। মোট বিনিয়োগ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ০.৬২ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে জিডিপি'র ৩০.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। এ সময়ে রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা

৫০. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

নির্ধারণ করা হয় ২,৫৯,৪৫৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১১.৫৯ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) কর্তৃক কর রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ২,২৫,০০০ কোটি টাকা, এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭,৫০০ কোটি টাকা এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব ২৬,৯৫৩ কোটি টাকা। অর্থ বিভাগের Integrated Budgeting and Accounting System (iBAS^{++}) ডাটা বেইজ অনুযায়ী সাময়িক হিসাবে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আহরিত রাজস্বের মধ্যে কর রাজস্বের পরিমাণ ১,২৬,৮৩৪ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৫.৯১ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫,০৩০ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৯৫ শতাংশ কম। সার্বিকভাবে গত অর্থবছরের জুলাই ২০১৭-ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ১,৪১,৮৬৪ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার ৫৪.৬৮ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৩.৭১ শতাংশ বেশি।[৫১]

সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ব্যয় এর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় ৩,৭১,৪৯৫ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৬.৬০ শতাংশ। এর মধ্যে অনুন্নয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় যথাক্রমে ২,২৩,১৪৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৯.৯৭ শতাংশ এবং ১,৪৮,৩৮১ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.৬৩ শতাংশ। iBAS^{++} এর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ১,৪৬,২৪৫ কোটি টাকা, যার মধ্যে অনুন্নয়ন ব্যয় হয়েছে ১,১২,৪০০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় ৩৩,৮৪৫ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় অনুন্নয়ন ব্যয় ও এডিপি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৫৭ শতাংশ ও ১১.৩৭ শতাংশ।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুদ্রানীতি প্রণয়নে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে ঋণ যোগান অব্যাহত রাখতে মুদ্রা ও ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। গত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের শুরু থেকে মুদ্রাস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা বজায় থাকায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য অনুসৃত মুদ্রানীতি ঘোষণাপত্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৭.২ শতাংশ অর্জনের সহায়ক মুদ্রার যোগানের লক্ষ্যে মুদ্রা ও আর্থিক নীতি অনুসরণ করা হয়। জানুয়ারি-জুন ২০১৭ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতিতে চলমান অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত পরিস্থিতি এবং বার্ষিক মূল্যস্ফীতিকে ৫.৮ শতাংশের মধ্যে সীমিত রেখে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা ও ঋণ যোগানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। প্রণীত মুদ্রানীতিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর শেষে ব্যাপক মুদ্রার যোগান ১৫.৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাস শেষে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ১৩.৩৫ শতাংশ এবং ব্যক্তিখাতের ঋণ প্রবাহে প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মার্চ, ২০১৭সময়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশে। জুলাই ২০১৬-মার্চ ২০১৭ সময়ে গড় মূল্যস্ফীতির হার ৫.৩৫ শতাংশে, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ শতাংশের চেয়েও কম।

২০১৩ সাল থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদান ও আমানতের সুদের হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ১০.৯১ শতাংশ ছিল। ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৯.৭৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে তা আরো হ্রাস পেয়ে ৯.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শেষে ৬.১০ শতাংশ ছিল; যা ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে হ্রাস পেয়ে ৫.০৮ শতাংশে

---

৫১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xix

দাঁড়ায় এবং আমানতের ভারিত গড় সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ৫.১৮ শতাংশ হয়েছে। আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণের ভারিত গড় সুদ হার ক্রমাগতভাবে হ্রাসের ফলে ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান ফেব্রুয়ারি ২০১৭ শেষে ৪.৬৯ শতাংশে থেকে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শেষে ৪.৩৭ শতাংশ হয়েছে।[৫২]

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সময়ে দেশের মোট রপ্তানি আয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৪,৩৯৭.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৫.৯৪ শতাংশ এবং ১১.৫৬ শতাংশ। অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে কৃষিজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাটজাত পণ্যসহ আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, প্রকৌশলসামগ্রী, প্লাস্টিকসামগ্রী, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পেট্রোলিয়াম উপজাতসহ আরো কিছু খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৭১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৬.২ শতাংশ বেশি। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭,০০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রবাহের হারও বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৫১ শতাংশ। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের প্রথম দশ মাসে বাংলাদেশের ১২,০৮৮.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স দেশে এসেছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জুলাই ২০১৭ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে দেশের বাণিজ্য ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১১,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬,০৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্ণিত সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং অন্যান্য স্বল্পমেয়াদি ঋণ বৃদ্ধির ফলে মূলধন ও আর্থিক হিসাবে ৫,৯০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ৬,৩১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতির জন্য সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৯৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি দেখা যায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ২,৪৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্য ঋণাত্মক থাকায় বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৯ মে ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩১.৯২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা গত অর্থবছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩৩.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমদানির মাস হিসাবে বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে ৭.২ মাসের আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক টাকা ডলারের বিনিময় হারের ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বিগত ৩০ জুন ২০১৮ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৮০.২ যা মে ২০১৯ তারিখে ৮৩.১ টাকায় দাঁড়ায়।

সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গৃহীত কর্মসূচি বিবেচনায় এনে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৯-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কাঠামোতে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গড়ে ৭.৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি

৫২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xx

পেয়ে আগামী ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ৮.২ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।[৫৩] বিনিয়োগ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জিডিপির ৩১.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জিডিপির ৩৩.৫ শতাংশে দাঁড়াবে। বিনিয়োগের প্রবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপির ৩৫.৩ শতাংশে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মোট বিনিয়োগের ২৬.৩ শতাংশ আসবে বেসরকারিভাবে। অবশিষ্ট ৯ শতাংশ বিনিয়োগ আসবে সরকারিভাবে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির খাতভিত্তিক অবস্থা : নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতভিত্তিক অবস্থা তুলে ধরা হল :

(ক) কৃষিখাত : ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৪০৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকৃত উৎপাদন ছিল ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে আউশ ২৭.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৮.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়েছে। ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৯০.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গমের উৎপাদন ১২.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ২০,৪০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৪,৫২০.৪২ কোটি টাকা, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭১.১৮ শতাংশ। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গবাদিপশুর জন্য ১.০৪ কোটি ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.৫৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।[৫৪]

(খ) শিল্পখাত : বাংলাদেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'শিল্পনীতি ২০১৬' ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতি নারীর উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাসহ নারীদেরকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা এবং দারিদ্র্য বিমোচণে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে পুঁজিঘন শিল্পের পরিবর্তে শ্রমধন শিল্প স্থাপনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে শিল্পনীতিতে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণসহ কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে উৎসাহ প্রদানকল্পে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে শিল্পঋণ বিতরণ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ফলে শিল্পখাতের ঋণ বিতরণ ও আদায় ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবেশ বান্ধব পাট শিল্পের প্রসারের কিছু পণ্যে পাট জাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ ও বিধিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য ইপিজেডসমূহ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণসহ দেশে শিল্পখাত বিকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইপিজেডসমূহে বিনিয়োগ ও রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

(গ) রাষ্টায়ত্ত প্রতিষ্ঠান খাত : ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ৩০ এপ্রিল ২০১৮ পর্যন্ত ৪৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত অ-আর্থিক সংস্থার নিট মুনাফা ছিল ৯,২৯৫.৬২ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এ সকল সংস্থার নিট মুনাফা ছিল ৬,৬১৬.৬৮ কোটি টাকা। এ সময়ে মুনাফা

৫৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ২

৫৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxi

অর্জনকারী সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে সরকারি কোষাগারে ২,০০৩.৩৫ কোটি টাকা জমা করেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল বাবদ পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ২,০৩,১৭২.৮১ কোটি টাকা। ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৩০টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ৩১,১৪৬.৭২ কোটি টাকা, যার মধ্যে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ২১৫.১৯ কোটি টাকা। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট সম্পদের উপর পরিচালন রাজস্বের উপর নিট মুনাফার হার ৬.২১ শতাংশ এবং ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ৪.১৩ শতাংশে দাঁড়ায়।[৫৫]

(ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০৪৬ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। যার মধ্যে সর্বোচ্চ ১০,০৮৪ মেগাওয়াট উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছিল ৫৭,২৭৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার যা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়। বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ সিস্টেম লস ২০০৯-২০১০ অর্থবছরের ১৫.৭৩ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দাঁড়ায় ১১ শতাংশে। অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭১ শতাংশ পূরণ করছে। মোট আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৫.২২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ ১২.৫৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ১২.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। বর্তমানে দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ জ্বালানির দক্ষ ও সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

(ঙ) পরিবহণ ও যোগাযোগ খাত : আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক সেতু, কালভার্ট নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ইত্যাদিসহ কয়েকটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫৬] পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫৭] রূপকল্প-২০২১, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার

---

৫৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট-সংক্ষিপ্তসার*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ৯

৫৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৯), পৃ. ৭১৮-৭১৯

৫৭. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiii

ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(চ) মানবসম্পদ উন্নয়ন খাত : অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার আর্থ-সামাজিক খাতে বাজেটের প্রায় গড়ে ২৪ শতাংশ হারে ব্যয় করছে। ২০১৬ সালে প্রকাশিত হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৫ অনুযায়ী ২০১৫ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৯তম যা ২০১৪ সালে ছিল ১৪২তম।[৫৮] সরকার শিক্ষার সকল স্তরে ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ প্রণয়নসহ বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষিকার হার ১৯৯১ সালের ২১ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৬২.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করায় দেশের স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজনন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাত শিশু ও মাতৃমৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। অপুষ্টির হারও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতে আরও উন্নয়নের জন্য ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর কর্মসূচি সফল সমাপ্তির পর ২০১৭-২০২২ মেয়াদে 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত কর্মসূচি' শীর্ষক চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা এবং জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫৯]

(ছ) দারিদ্র্য বিমোচন খাত : সরকারি, বেসরকারি বহুবিধ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক ও কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯১ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ, ২০১৫ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২৩.৫ শতাংশে। ২০২০ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ১৮.৬ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের পরিধি ও বরাদ্দ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দের সঠিক বাস্তবায়নের জন্যে বাংলাদেশ সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতি অনুসরণ করছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণীত হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৪৫,২৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ক্ষুধা ও দারিদ্র্য সংশ্লিষ্ট প্রথম ও দ্বিতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কাজ শুরু করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সরকারের গৃহীত নানা কর্মসূচি বাস্তবায়নে পল্লী-সহায়ক ফাউন্ডেশন, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সরকরি-বেসরকারি ব্যাংক এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংক

---

৫৮. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiii

৫৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*(ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ৮-৯

ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৯,৫৯২.৩৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে এই ৬টি ব্যাংক ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৭,৪৮৮.৮৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বিভাগসহ আরও কিছু মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে ব্যয় বৃদ্ধি করা হচ্ছে।[৬০]

(জ) বেসরকারি খাত উন্নয়ন : উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সার্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নে সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে পৃথকভাবে গৃহীত প্রকল্প ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সরকার নানা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১,৭৪৫টি বেসরকারি প্রকল্পে মোট বিনিয়োগ প্রস্তাবনা ছিল ১৮,৫২,৬১৮ কোটি টাকা। অপরদিকে, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ১,১৩৪টি বেসরকারি প্রকল্পে এ প্রস্তাবনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭,৪৩,৪৫৯ কোটি টাকা। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার শিল্পের ক্রমবিকাশ শিল্প খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে এবং দেশে বিনিয়োগ সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল নাগরিককে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের আওতাভুক্ত করার লক্ষ্য পূরণেও বেসরকারি বিনিয়োগ কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩১,২১৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৪২.৬৮ শতাংশ উৎপাদিত হয়েছে বেসরকারি খাত থেকে। ২০১৭ পঞ্জিকা বর্ষে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে ২,১৫১.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরপর অষ্টম বারের মত মুডিস এবং এসএন্ডপি কর্তৃক স্থিতিশীল অর্থাৎ বিএ৩ এবং বিবি রেটিং অর্জন করেছে। ফিচ্ছ রেটিং-এ বাংলাদেশ পরপর দুইবার বিবি রেটিং পেয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে।[৬১] সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স পদ্ধতি প্রবর্তন করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পে তরুণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে আধুনিক ও উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।[৬২]

(ঝ) পরিবেশ উন্নয়ন খাত : জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মুকাবিলা ও অভিযোজন কর্মসূচি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে সরকার ২০০৯ সালে জলবায়ু বিষয়ক সকল কার্যক্রমকে সমন্বয়ের লক্ষ্যে Bangladesh Climate Change Strategic and Action Plan (BCCSAP) চূড়ান্ত করে। এ উদ্দেশ্যে সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে বরাদ্দ দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল গঠন করে এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত ফান্ডে ৩,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মুকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা প্রণয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১০ প্রবর্তন করাসহ দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তায় বাংলাদেশ ক্লাইমেট রিসাইলেন্স ফান্ড গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থ বিভাগ কর্তৃক Inclusive Budgeting and Financing for Climate Resilience শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি

---

৬০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১*(ঢাকা : অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ১৪

৬১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮*, প্রাগুক্ত, পৃ. xxiv

৬২. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ পরিবর্তনের রেখাচিত্র*(ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪), পৃ. ৩৯০-৩৯১

ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় ১৮.৫২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। জীববৈচিত্র প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার এক অমূল্য সম্পদ। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই দেশের মূল্যবান জীবসম্পদ সংরক্ষণে জাতীয় কর্মপরিকল্পণা-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং জাতীয় বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান কে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে।[৬৩]

মূলত চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থিত বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অধিবাসী সুদীর্ঘ অতীত থেকেই সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জীবন্ত উদাহরণ বাংলাদেশ তার এ ঐতিহ্য লালন করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবত। যদিও কোনো কোনো সময় এ বঙ্গ জননীর হীনমন্য কিছু কিছু অদূরদর্শী বাঙ্গালী সন্তান তার মায়ের লালন করা এই প্রাচীন ঐতিহ্যের মুখে কালিমা লেপন করার অপচেষ্টা চালাতেও পিছপা হয়নি। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার অপপ্রয়াস চালাতেও দেখা যায় কখনো কখনো। এসব রাষ্ট্রদ্রোহী ও দেশমাতৃকা বিরোধী কুকর্ম থেকে সুনাগরিক হিসেবে সকলের বিরত থাকা আবশ্যক।

৬৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ২-৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

সমাজবিজ্ঞানের সর্বব্যাপক এবং সার্বিক পরিবেষ্টনকারী শব্দটি হলো 'সমাজ'। এটি একটি সার্বজনীন এবং ক্রমপ্রবাহিত ধারণা বিশেষ। মানব সংগঠনের বিচার-বিশ্লেষণে সমাজ একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। সমাজতত্ত্ব সর্বাধিক আলোচিত বিষয় হলেও সমাজকে কেন্দ্র করে স্বতন্ত্র মতামত লক্ষ্য করা যায়। সমাজবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন অর্থে সমাজকে ব্যবহার করে থাকেন। কেউ বা সাংগঠনিক অর্থে, আবার কেউ তা কার্যনির্বাহী দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তবে একথাও ঠিক যে সমাজকে কোনো গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোনদিনও সম্ভব হয়নি। সমাজের ব্যাপকতা নিয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। তাছাড়া এর প্রাচীনতাও কম নয়। এছাড়া নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে যখন মানুষ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করে, তখন তাকে আমরা সমাজ বলি। সমাজ মূলত একটি স্থায়ী সংগঠন। সমাজ গঠনের মূলে রয়েছে সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতা। পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক না থাকলে সমাজ গঠিত হয় না। তাই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিকতাকে সমাজ বলা হয়। সমাজ বলতে আমরা সমজাতীয় উদ্দেশ্য অনুসরণ করার জন্য কতকগুলো স্থায়ী সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি। কিন্তু সমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সমাজতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। সঙ্গপ্রিয় মানুষ নানা প্রকার পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং এই সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশে নানা রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এই বৈচিত্র্য সমাজতত্ত্ববিদগণের সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক দর্শনে 'সমাজ' কথাটির প্রথম তাত্ত্বিক পর্যালোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটলের নীতিবিজ্ঞানে এটি প্রাথমিকভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৬৪] মানবীয় প্রয়োজন সিদ্ধির পূর্ণাঙ্গ মানব সম্প্রদায় হিসেবে গ্রিক দার্শনিকগণ 'পোলিস' (Polis) কথাটি ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে রোমান দার্শনিকগণ সমাজ সংক্রান্ত কিছু বুঝানোর উদ্দেশ্যে 'সিভিটাস' (Civitas) কথাটি প্রয়োগ করেন।[৬৫] এখানে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের দিকটি উল্লিখিত হয়। এভাবে কালের বিবর্তনের ফলে সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং প্রচলিত রাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা থেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। আর সমাজ একটি আদিম সংগঠন। সাহচার্যপ্রিয়তা, অস্তিত্ব রক্ষা, সাহায্য-সহযোগিতা, সামাজিকীকরণ প্রভৃতি নানাবিধ প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করে আসছে। অর্থাৎ সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যখন বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সংঘবদ্ধ হয় তখনই সমাজ জীবনের সূত্রপাত ঘটে। নিচে সমাজের পরিচয়, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ উপস্থাপিত হল।

সমাজের পরিচয়

সমাজের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে (সব-অট্+সঙ্) যা অনুভূত হয় তাহলো একত্রে বসবাস। পরস্পর সহযোগিতা ও সহানুভূতির সঙ্গে বসবাসকারী মনুষ্যগোষ্ঠী।[৬৬] সমাজ সৃষ্টির আবির্ভাবকাল থেকে শুরু করে মানুষের এই একত্রিত বসবাস প্রথা চলে আসছে।

---

৬৪. সরদার ফজলুল করিম, *এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্স*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৮), পৃ. [চৌদ্দ]
৬৫. George H. Sabine, *History of Political Theory*(London : Dryden Press, 1973), p. 89
৬৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক অভিধান*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪), পৃ. ১১২২

সমাজবদ্ধতার অনুকূলে যে দলবদ্ধতা গড়ে উঠে তার অন্যতম দিক হলো দৈনন্দিন জীবনধারায় একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা। এই গতিপ্রকৃতি অন্যান্য প্রাণীকূলের মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য এবং বৈষম্যের মধ্যে যে স্বেচ্ছা সম্পর্ক গড়ে উঠে তার ফলশ্রুতিতেই মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনে রূপান্তিরিত হয়। এটি একটি বিমূর্ত ধারণা। এর কোনো বাহ্যিক অবয়ব নেই। কেবলই তা অনুভূতিসাপেক্ষ। এর কোনো প্রত্যক্ষ গতি দেয়াও যায় না। অধ্যাপক গিডিংস (F.H. Gidings) প্রমূখ সমাজকে একটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

সমাজের ইংরেজি 'Society' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Socius' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ সঙ্গী 'Companionship'; বন্ধুত্ব 'Friendship', সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা; সমাজবদ্ধতা; সভ্য মানবগোষ্ঠীর রীতি-নীতি; যে প্রথায় মানুষ একত্রে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বাস করে; সমাজ।[৬৭] সাধারণত সমাজ হচ্ছে সমস্বার্থ ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় সংঘবদ্ধভাবে বসবাসরত জনসমাবেশ। যারা পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কে আবদ্ধ এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অবতীর্ণ হয়।

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক গ্রিন (A.W. Green) মনে করেন, 'সমাজ হলো এমন একটি বৃহত্তর গোষ্ঠী যেখানে ব্যক্তি সমষ্টি অবস্থান করে। তাই এই প্রেক্ষাপটে সমাজের সংজ্ঞা প্রদান এক কথায় সম্ভব নয়।'[৬৮]

সমাজের সংজ্ঞা প্রদানে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করেছেন।

অধ্যাপক গিডিংস (F.H. Giddings) বলেন, 'Society is a number of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness and therefore able to work toughter for common ends.' অর্থাৎ 'সমাজ হলো সমান মনোভাবাপন্ন এবং ঐক্যভিত্তিক কতকগুলো ব্যক্তি, যারা তাদের এই এক ও অভিন্ন মনোভাবের কথা জানে ও উপভোগ করে এবং সে কারণে সমজাতীয় লক্ষ্যের জন্য সমবেত হয়ে কাজ করতে সক্ষম হয়।' সমাজ সম্পর্কে সেই জন্যই গিডিংস বলেন, 'Consciousness of kind.' এরূপে এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক সমাজ প্রত্যয়ের ধারণা পোষণ করেন। তাদের মতে, সমাজ হচ্ছে, 'As a group of individuals living a coopertive life.' অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে একদল ব্যক্তি সমষ্টি যারা পারস্পরিক সহযোগিতায় জীবনযাপন করে।[৬৯]

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ম্যাকাইভার (R.M. MacIver) সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিভিন্ন উক্তি করেছেন। তার মতে, 'Society is the system of social relationship in and through which we live' অর্থাৎ 'সমাজ হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের এমন এক পূর্ণাঙ্গ রূপ যার মধ্যে ও মাধ্যমে আমরা বেঁচে থাকি।' তিনি আরও বলেন, সমাজ হলো মানুষের অবস্থা বা গুণবিশেষ। সমাজ হলো আমরা যেসব সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে জন্মগ্রহণ করি তাদের সুসংবদ্ধ রূপ। ম্যাকাইভার সামাজিক সম্পর্ক বিন্যাসকেও 'সমাজ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তার মতে, 'Society means co-operation.'[৭০] কিন্তু সমাজ শুধু সহযোগিতার লীলাভূমি

---

৬৭. Zillur Rahman Siddiqui, *Bangla Academy English-Bwngali Dictionary*(Dhaka : Bangla Academy, 2008), p. 744

৬৮. A.W. Green, *Sociology : An Analysis of Life in Modern Society*(London : McGraw-Hill, 1964), p. 15

৬৯. Franklin H. Giddings, *Principles of Sociology*(New York : The Macmillan Company, 1967), p. 6

৭০. R.M. MacIver, *Society*(New York : Farrar & Rinehart Inc., 1944), p. 47

নয়। এখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আচার-অনাচার লেগেই আছে। ম্যাকাইভার বলেছেন যে, সমাজে 'Diversity' তথা বিচিত্রতা রয়েছে। যদি এই বিচিত্রতা বা Diversity না থাকত এবং সকল সমাজে যদি শুধু Uniformity তথা সমরূপতা থাকত তাহলে সব সমাজ এক হয়ে যেত। তাহলে আর সমাজকে অধ্যায়ন করার প্রয়োজন হত না। সমাজে Diversity আছে বলেই সমাজ টিকে আছে।

অপরদিকে, কার্ল মার্কসের মতে, সহযোগিতা থাকলেই সমাজ হবে এমন কোনো কথা নেই। সহযোগিতা ছাড়াও সমাজ হতে পারে। যেমন– সামন্ত সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ, সেখানে সহযোগিতার জায়গায় রয়েছে দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বের ফলেই সমাজ সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই ব্যক্তি ও সমাজের বিকাশ ঘটেছে। অতএব দেখা যায় যে, সামাজিক সম্পর্ক দুই ধরনের।[৭১] যথা : সহযোগিতার সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক।

সমাজ শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রাণীদের মাঝেও সমাজ দেখা যায়। যেমন– পিঁপড়ার দল, মৌমাছির ঝাঁক, ভেড়ার পাল ইত্যাদি। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেন, 'Where there is life there is society.' অর্থাৎ যেখানে প্রাণ আছে, সেখানেই সমাজ আছে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমাজ প্রত্যয়টি মূলত মানব সম্পর্ককে বুঝাতেই ব্যবহৃত হয়, তবে রাষ্ট্রে সাধারণত এটা সরকারের শাসন এলাকাধীন বৈশিষ্ট্যকেও বুঝায়। এ প্রসঙ্গে Franz Oppenheimer বলেন, 'I mean by it [the state] that summation of privileges and dominating positions which are brought into being by extra-economic power. I mean by society, the totality of concepts of all purely natural relations asn institutions between man and man.'[৭২]

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে R.T. Schaefer সমাজের একটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'Society is a fairly large number of people who live in the same territory, are relatively independent of people outside their area, and participate in a common culture.'[৭৩] অর্থাৎ সমাজ হচ্ছে এমন একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী যারা একই এলাকায় বসবাস করে, যারা তাদের এলাকার বাইরের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর থেকে আপেক্ষিক অর্থে স্বাধীন এবং যারা একটি সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে।

সমাজের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক জিসবার্ট (P. Gisbert) বলেন, 'Society is in general consists in the complicated network of social relationship by which every human being in interconnected with his fellowmen.' অর্থাৎ 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল বন্ধন, যেখানে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কিত।' তিনি আরও বলেন, 'সমাজ হচ্ছে একটি মানসিক প্রপঞ্চ। অর্থাৎ ভাবের আদান-প্রদান হলেই মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠে।' তিনি একটি উদাহরণ দিয়েছেন, 'দুই ব্যক্তি এক বাগানের মধ্যে পায়চারি করছেন। সেই বাগানের এক জায়গায় তারা একই জাতের ফুল পর্যবেক্ষণ করছেন। যদিও তারা পাশাপাশি অবস্থান করছেন কিন্তু তাদের এই সম্পর্ক ঠিক নয়? কেননা তারা একে অন্যের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করেন নি। কিন্তু যখনই তারা একে অপরের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করে, তখন তা সামাজিক সম্পর্ক হিসেবে বিবেচিত হয়।[৭৪]

৭১. Karl Marx, *Das Kapital*(Berlin : Gradners Books, 1967), v.1, p. 56
৭২. Franz Oppenheimer, *The State*(New York : Vanguard Press, 1919), p. 16
৭৩. R.T. Schaefer, *Sociology*(London : McGraw-Hill, 2005), p. 58
৭৪. P. Gisbert, *Foundamental of Sociology*(New Delhi : Orient Longrman, 2010), p. 65

সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) বলেন, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সংগঠিত বা অসংগঠিত, সচেতন বা অচেতন, সহযোগিতামূলক বা বৈরীতামূলক সমস্ত সম্পর্কই হলো সমাজ।'[৭৫]

অধ্যাপক সি. এইচ. কুলি (C.H. Cooley) তার দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করেন, 'সমাজ হলো একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, যেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অবস্থান করে।'[৭৬]

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার এবং পেজ (R.M. MacIver and C.H. Page) মনে করেন, 'সমাজ হলো পারস্পরিক সম্পর্কের এমন ঢেউ, যা সদা পরিবর্তনশীল। তাই সমাজকে কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়।' তারা আরও বলেছেন, 'সমাজ হচ্ছে মানুষের আচার-আচরণ ও কার্যপ্রণালি কর্তৃক এবং পারস্পরিক সাহায্য, বিভিন্ন সংঘ ও বিভাগ, মানব আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং স্বাধীনতা– এসব কিছুর সমন্বয়ে গঠিত ব্যবস্থা।'

তবে ইবনে খালদুনের চিন্তাধারা মানবসভ্যতা সম্পর্কে মৌলিক রচনা তার মুকাদ্দিমার প্রথমেই তিনি সমাজ ও সভ্যতার সামগ্রিক রূপ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর আলোচনা স্থান পেয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া মানুষের চলে না। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘবদ্ধতার আবশ্যকতা বোধ করে। এমনিভাবে যৌথ জীবনযাত্রার আরম্ভ হয়। ইবনে খালদুন বলেন, তৎকালীন আরব ছিল গোত্রভিত্তিক। গোত্রকে কেন্দ্র করেই সমাজ ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হত। তার মতে, মানুষের পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজের সৃষ্টি হয়। সকল মানুষ শুধু যুক্তি ও ভাল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। লোক পশুসুলভ প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় এবং সমাজে নানা ধরনের অপকর্ম ও কুকর্ম করার প্রয়াস পায়। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার জন্য এসব দুষ্কৃতিকারীদের দমন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এ কারণে সামাজিক নীতিমালার সৃষ্টি হয়। ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমায় রয়েছে, নিজের পক্ষে শুধুমাত্র যদি একদিনের জীবনযাত্রার কথা ধরা হয় তাহলেই দেখা যায় যে, এ একদিনের জন্য গমের প্রয়োজন, তা ভাঙানোর প্রয়োজন, আটা মাখানোর প্রয়োজন ও রুটি প্রস্তুতের প্রয়োজন। তার অর্থ একদিনের এসব প্রয়োজন মিটানোর জন্য পাচক, ছুতার, কামার, কুমার, কারিগরসহ অন্যান্য পেশার লোকের কাজের প্রয়োজন। একজন লোকের পক্ষে এসব প্রয়োজন এককভাবে মিটানো সম্ভব নয়। সকলে যদি সম্মিলিতভাবে কাজ করে তবে প্রয়োজনের চেয়ে তারা অনেক বেশি কাজ করতে সক্ষম হবে। এ প্রয়োজনীয়তার সূত্র ধরেই সমাজের সৃষ্টি।[৭৭]

সুতরাং সমাজ হলো কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ বা পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি, যারা নিজস্ব প্রথা, রীতিনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং এসবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের মিলবন্ধনের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্পর্ক সমাজ সৃষ্টির মূল কথা। অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সচেতন মানবগোষ্ঠীই হল সমাজ। বস্তুত সামাজিক সম্পর্কে যে মানবীয় প্রবণতা তা সহজাত বলে দাবি করে। সমাজবিজ্ঞানীরা 'সমাজ' শব্দটি যে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে সাধারণত সমাজ সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাওয়া যায়–

(১) সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপ আছে।
(২) সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

---

৭৫. Morris Ginsberg, *Introduction to Sociology*(Kerala : University of Calicut, 2014), p. 11
৭৬. C.H. Cooley, *Essentials of Sociology*(New York : Pearson, 1920), p. 51
৭৭. ইবনে খালদুন, অনূ. গোলাম সামদানী কোরায়শী, *আল-মুকাদ্দিমা*(ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০১৭), খ.১, পৃ. ১২৫-১২৬

(৩) বহুলোকের সংঘবদ্ধভাবে বসবাস।
(৪) একই সংস্কৃতির লোকদের নিয়ে সমাজ গঠিত।
(৫) দ্বন্দ্ব ও সহযোগিতা দুটিই সমাজে বিদ্যমান।
(৬) সমাজ একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বা সমষ্টি ধারাবাহিক অবস্থানে সক্ষম হয়।
(৭) সমাজ সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
(৮) সমাজ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে।
(৯) সমাজ একটি সার্বজনীন এবং সর্বব্যাপী সংগঠন।
(১০) একটি স্থায়ী জনসমষ্টি, যেখানে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই।
(১১) একটি জটিল প্রক্রিয়াভিত্তিক মানবিক সংগঠন।
(১২) মানুষের বিচিত্র সামাজিক সম্পর্কের জটিল অবস্থা।

দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের সংজ্ঞাগুলোকে বিচার করা যেতে পারে। যথা : (১) সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ থেকে ও (২) মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে। যখন সমাজ অর্থ A group of sentient being বুঝায় তখন সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণের উপর জোর দেয়া হয়। আবার যখন সমাজ বলতে মনের অবস্থা বা গুণ বিশেষ বুঝায়, তখন মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের উপর জোর দেয়া হয়। এক কথায়, সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একদল জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

মোটকথা, সমাজ হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠীর একক, যাদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান আছে, পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজনাদি মিটিয়ে থাকে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা পরস্পরিক সহযোগিতায় বা সম্পর্কে আবদ্ধ। সমাজ ছাড়া মানুষ বসবাস করতে পারে না। সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করা মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম। যে শিশু জন্মের পর মানুষের সমাজ থেকে দূরে থাকে অর্থাৎ তাদের যদি মানবেতর প্রাণীর মধ্যে বসবাস করতে দেয়া হয় তাহলে তাদের আচরণ ওদের মত হওয়াই স্বাভাবিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভারতের কমলা ও আমলা নামে দুই মানবিক নেকড়ে শিশুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের আচার-ব্যবহার নাকি একেবারে বন্য নেকড়ে শিশুর মত। তারা কথা বলতে পারে না এমনকি তাদের মানবিক অনুভূতিও ছিল না। তারা চার বাহুতে ভর করে হাঁটত এবং কাঁচা গোশত খেত। সবদিক দিয়ে তারা বন্য জীবজন্তুর মত হয়ে গিয়েছিল। উপরিউক্ত মানবিক নেকড়ে শিশুদ্বয়ের কথা J.A.L. Sing এবং R.M. Zingg এর লেখা 'Wolf Children & Feral Man' নামক বইয়ে দেখতে পাওয়া যায়।[৭৮]

'Anna Isabelle' নামে দুই মানব শিশুকে আমেরিকায় মানবসমাজ থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। কিংসলি ডেভিড 'American Journal of Sociology' এর এক নিবন্ধে বলেছেন যে, এই শিশু দুটি মানুষের মত কথা বলতে, হাঁটতে, খেতে ও নির্দেশ মেনে চলতে পারত না। এরা মানসিক দিক দিয়ে অস্বাভাবিক শিশুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাহলে এটা বুঝা যাচ্ছে যে, মানুষের সংস্পর্শে মানুষ না থাকলে ও দলবদ্ধ জীবনযাপন না করলে সে স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বড় হতে পারে না।[৭৯] তাই অ্যারিস্টটল মানুষকে সমাজবদ্ধ জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, এমন মানুষ যদি পাওয়া যায়, যে কোনো দুর্ভাগ্যের কারণে নয়; বরং স্বভাবগতভাবে সমাজহীন, তার বাস করার জন্য কোনো সমাজ নেই, তাহলে সে মানুষকে হয় অধমের অধম, নয়ত উত্তমের উত্তম, অমানুষ কিংবা অতিমানুষ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৮০]

---

৭৮. J.A.L. Singh Robert M. Zingg, *Wolf Children & Feral Man*(New York : Harper, 1942), p. 54
৭৯. Board of Editors, *American Journal of Sociology*(Chicago : The University of Chicago Press, 1940), v.45. No. 4, pp. 554-565
৮০. এ্যারিস্টটল, অনূ. সরদার ফজলুল করিম, *পলিটিকস*(ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৮), পৃ. ৩৭-৩৮

উপরিউক্ত সংজ্ঞাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের একটি ধারণা পাওয়া যায়। মানুষ বেঁচে থাকার এবং জীবনকে আরও উন্নত করার জন্য সে সর্বদা প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তাই মানুষ কতকগুলো নিয়মনীতি ও আদর্শ মেনে চলে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে সহযোগিতাপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক, যার অন্য নাম হচ্ছে সমাজ। সুতরাং ব্যাপক অর্থে, সমাজ বলতে যে কোনো সামাজিক সম্পর্ককে বুঝায়। ক্ষুদ্রতর অর্থে, সমাজ হল একটি অল্পবিস্তর স্থায়ী সংগঠন যার মাধ্যমে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বিকশিত হয়।

সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মানব সমাজ হলো সমাজ বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই মানব সমাজ আকস্মিকভাবে কোনো একদিন সৃষ্টি হয়নি। সুদীর্ঘ কালের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে গড়ে উঠেছে আজকের এই সমাজ ব্যবস্থা। মানব সমাজের ক্রমবিকাশের এই ধারাটি হলো বিরতিহীন। এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক সমাজবিজ্ঞানী সামাজিক বিবর্তনের ধারণাটির সাহায্য নিয়েছেন। সমাজ বিজ্ঞানীরা সামাজিক বিবর্তনের কথা বলেন বিভিন্ন সামাজিক অবস্থা এবং সামাজিক ব্যবস্থাদি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে।

সমাজ একটি শাশ্বত সার্বজনীন মানব সংগঠন। অতি আদিমকালে মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে যূথবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে সমাজের বীজ রোপণ করে, যা বিকাশ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ মহীরুহে পরিণত হয়। সমাজের এ বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে অসংখ্য প্রকরণ বা শ্রেণিবিভাজন পরিলক্ষিত হয়। মানুষ তার আদিম ও বন্য স্তরে শুধু 'Hunting and gathering' সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ জীবন প্রণালী গড়ে তুলেছিল। এ ব্যবস্থাকে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর বলা যেতে পারে। এ স্তর থেকেই হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে সমাজ অগ্রসর হয়েছে পূর্ণাঙ্গতার দিকে। কখনও ধীর গতির বিবর্তন আবার কখনও ব্যাপক উচ্ছ্বাসপূর্ণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশ সাধিত হয়েছে। সমাজ হচ্ছে মানুষের এমন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা পরস্পরের সম্পর্ক, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা ও পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। সমাজকে ঘিরেই মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ যাবতীয় কার্যাবলি সম্পন্ন হয় এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটে। কিন্তু নদীর প্রবাহমান স্রোতের মতই সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। মানুষের কাজ এবং চাহিদাও সমাজকে পরিবর্তিত ও বিকশিত হতে সাহায্য করে। এ ধারাবাহিকতায় সমাজের বিভিন্ন প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, সমাজের এই প্রকরণের সাথে অর্থ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ কোন সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন ছিল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজবিজ্ঞানী R.T. Schaefer সমাজের প্রকরণকে একটি সারণির সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। নিম্নে তার সমাজের প্রকরণের সারণিটি তুলে ধরা হলো[৮১] :

সামাজিক বিবর্তণের স্তরসমূহ		
সমাজ-এর প্রকরণ	প্রথম আত্মপ্রকাশ	বৈশিষ্ট্যসমূহ
শিকার ও সংগ্রহ সমাজ	মানব জীবনের সূত্রপাত কাল	যাযাবর সমাজ; তারা তৈরি খাদ্যশস্যের উপর নির্ভরশীল ছিল।
উদ্যানচাষ সমাজ	প্রায় ১০০০০-১২০০০ বছর পূর্বে	যাযাবর জীবনের কিছুটা স্থায়িত্ব; তারা কৃষির বিকাশ ও সীমিত প্রযুক্তির ব্যবহার করত।
কৃষি সমাজ	প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে	এ সমাজ ছিল বৃহত্তর আকারের, অধিকতর স্থায়ী আবাসন, প্রযুক্তির উন্নতি, কৃষিকাজের অধিকতর মনোনিবেশ এবং শ্রম বিশেষায়ন।

৮১. R.T. Schaefer, *Sociology*(London : McGraw-Hill, 2005), p. 117

সামাজিক বিবর্তণের স্তরসমূহ		
সমাজ-এর প্রকরণ	প্রথম আত্মপ্রকাশ	বৈশিষ্ট্যসমূহ
শিল্প সমাজ	১৭৬০-১৮৫০ খ্রিঃ	এ সমাজে প্রযুক্তিগত শক্তির উপর নির্ভরশীলতা, জ্বালানি ও শক্তির নতুন উৎস, কেন্দ্রীয় কর্মক্ষেত্র, অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা, আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা।
শিল্পোত্তর সমাজ	১৯৬০ খ্রিঃ	চাকুরির উপর নির্ভরশীলতা, বিশেষত তথ্য-প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াকরণ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ।
উত্তর আধুনিক সমাজ	১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের পর	অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি; জনসাধারণের জন্য ভোগ্যপণ্য ও সংবাদ মাধ্যম; বিভিন্ন সংস্কৃতির একাঙ্গীকরণ।

সমাজের উল্লিখিত ছয়টি প্রকরণ নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সামাজিক বিবর্তনের ভিত্তিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত এ সমাজগুলোর ধারাবাহিক আলোচনার মধ্য দিয়েই সমাজের অতীত-বর্তমান সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করা সম্ভব। তবে বিভিন্ন সমাজ ও নৃবিজ্ঞানী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতেও সমাজের বিভিন্ন প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন– কার্ল মার্কস সমাজের পাঁচটি প্রকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা : (১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ; (২) দাস সমাজ; (৩) সামন্তবাদী সমাজ; (৪) পুঁজিবাদী সমাজ ও (৫) সাম্যবাদী সমাজ। কার্ল মার্কসের সমাজ বিভাজনকে নিম্নরূপভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যথা : (১) এশীয় সমাজব্যবস্থা; (২) প্রাচীন সমাজব্যবস্থা; (৩) সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা ও (৪) বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা।[৮২]

ইংরেজ সমাজ ও নৃবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার একজন বিবর্তনবাদী সমাজকে নিম্নোক্ত চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : (১) সরল সমাজ; (২) জটিল সমাজ; (৩) দ্বৈত জটিল সমাজ ও (৪) ত্রয়ী জটিল সমাজ।[৮৩]

এমিল ডুরখেইম সমাজকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা : (১) সরল বা যূথবদ্ধ সমাজ; (২) সরল বহুমুখী সম্পর্কভিত্তিক সমাজ; (৩) সরল জটিল বহুমুখী সম্পর্কভিত্তিক সমাজ ও দ্বৈত জটিল বহুমুখী সম্পর্কভিত্তিক সমাজ।[৮৪]

হার্বার্ট স্পেনসার সামগ্রিকভাবেই ডারউইনের বিবর্তনের ধারণার সাহায্য গ্রহণ করেছেন এবং সমাজ জীবনের বিশ্লেষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। স্পেনসার মানব সমাজের ক্রমবিকাশের একটি ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি বিবর্তনের তত্ত্বের মাধ্যমেই সচেষ্ট হয়েছেন। স্পেনসারের Principles of Sociology শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনার পরিচয় পাওয়া যায়। স্পেনসারের অভিমত অনুসারে জীবজগত ও মানব সমাজ উভয়েরই ক্রমবিকাশ বা ক্রমবর্ধমানের ধারা হলো অভিন্ন ধরনের অর্থাৎ ক্রমবিবর্তনের সাধারণ নীতি সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও কার্যকর হয়। ক্রমবিবর্তনের এই সাধারণ নীতিটিতে ক্ষুদ্রাকার থেকে বৃহদাকার, সরল অবস্থা থেকে জটিল অবস্থায়, অবিভক্ততা থেকে বিভক্ততায়, অসংলগ্নতা থেকে সংলগ্নতায়, অনির্দিষ্টতা থেকে নির্দিষ্টতায়, সমসত্ততা থেকে অসমসত্ততায় উপনীত হওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে স্পেনসার তার প্রণীত গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'Thus in all respects is fulfilled the formula of

৮২. ড. মোঃ আহসান হাবিব, *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*(ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, ২০১২), পৃ. ৫০
৮৩. Herbert Spencer, *The Man Versus the State*(London : Williams and Norgate, 1884), p. 75
৮৪. Émile Durkheim, *The Rules of Sociological Methods* (NewYork : Free Press, 1982), p. 92

evolution. There is progress towards greater size coherence, multiformity and definiteness.' স্পেনসারের মত অনুসারে যে তত্ত্ব জীব জগতের ক্ষেত্রে অভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয় সেই তত্ত্ব মানব সমাজের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ জীব জগতের সঙ্গে মানব সমাজের কাঠামোগত গুঢ় সাদৃশ্য বিদ্যমান।

হার্বার্ট স্পেনসারের অভিমত অনুসারে বিবর্তনের নিয়ম জীবজগত, জড়জগত এবং মানব সমাজ সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়। অর্থাৎ বিবর্তন হলো এক সর্বজাগতিক নিয়ম। এদিক থেকে স্পেনসার তিন ধরনের বিবর্তনের কথা বলেছেন। এই তিন ধরনের বিবর্তন হল– (ক) জৈব বিবর্তন, (খ) অজৈব বিবর্তন এবং (গ) অতি জৈব বিবর্তন। জৈব বিবর্তন বলতে জীব জগতের বিবর্তনকে বুঝায়। অজৈব বিবর্তন বলতে জড়জগতের বিবর্তন এবং সামাজিক বিবর্তনকে বলা হয় অতি জৈব বিবর্তন। সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশকে সামাজিক বিবর্তন বলা হয়। সামাজিক বিবর্তনের ধারণা দিতে গিয়ে বলা যায় যে, বিবর্তন এক ধরনের পরিবর্তন যা ক্রমান্বয়ে ঘটে থাকে। তাহলে সামাজিক বিবর্তন বলতে বুঝা যায় ক্রমান্বয়ে সমাজের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাই সামাজিক বিবর্তন।[৮৫]

প্রস্তর যুগ ও এর সমাজ ব্যবস্থা : সমাজ বিবর্তনের ধারায় মানুষ বন্যদশা ও বর্বর দশা অতিক্রম করে সভ্য সমাজে পদার্পণ করেছে। মানুষ যখন পর্যন্ত লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি তখন পর্যন্ত তাদের ভাগ্যের দুয়ার খোলেনি। লিখন পদ্ধতি মানুষের আয়ত্তে এসেছিল খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৫০০০ বছর পূর্বে। এ সময় থেকেই মানুষের সভ্যতার যুগ চিহ্নিত হয়েছে। লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের পূর্বেও মানব গোষ্ঠী সমাজ পরিবর্তনের জন্য এবং কাঙ্খিত লক্ষ্যে উপনীত হতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। এ প্রচেষ্টার ফলেই মানুষ সভ্যতার যুগকে আবিষ্কার করেছে। লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনের পূর্বের সময়কে প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৮৬] এর পরে এসেছে প্রস্তর যুগ। বন্য দশা অতিক্রান্তের শেষ পর্বে এসে মানুষের প্রথম অগ্রগতির কালকে প্রস্তর যুগ বলা হয়। এর কারণ এ সময় মানুষের শ্রম ও জীবন ধারণের মুখ্য হাতিয়ার ছিল পাথরের তৈরি। ভূ-পৃষ্ঠের আবির্ভাবের পর হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীকুলকে অতিক্রম করে জীবজগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ারের উৎকর্ষকে কতকগুলো ভাবে বিভাজন করে দেখিয়েছেন, কোন সময়ের মানুষ কি অবস্থায় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, মানব সমাজের ইতিহাসের উপকরণ খুঁজে পাওয়া যায় তাদের তৈরি হাতিয়ারের মধ্য দিয়ে। কোনো এক বিশেষ যুগের মানুষ কি কি হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে তা থেকে সে যুগের মানুষের চিন্তাধারা, ধ্যান-ধারণা, সমাজের গড়ন, জীবন যাপনের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অনেক কিছু জানা সম্ভব। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মানুষের হাতিয়ার ব্যবহারের উপর নির্ভর করেই এই যুগের নামকরণ করেছেন প্রস্তর যুগ। এ সেই যুগ যেখানে মানুষ পাথরের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করত।

প্রস্তর যুগকে তিন ভাগে বিভাজন কর হয়। যথা : (ক) পুরোপলীয় যুগ বা প্রত্নপ্রস্তর যুগ, (খ) মধ্যপলীয় বা মধ্য প্রস্তর যুগ এবং (গ) নবোপলীয় বা নব্য প্রস্তর যুগ। সামগ্রিকভাবে প্রস্তর যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।[৮৭]

পুরোপলীয় যুগের সমাজ ব্যবস্থা : পুরোপলীয় যুগ বা Paelaeolithic-কে প্রাচীন প্রস্তর যুগ বলা হয়ে থাকে। Palaious শব্দের অর্থ পুরো বা পুরাতন আর Lithas শব্দের অর্থ উপল বা প্রস্তর। তাই Paelaeolithic শব্দের অর্থ দাঁড়ায় পুরাতন পাথর। এটি ছিল প্রস্তর যুগের

৮৫. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*(ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৫), পৃ. ২৪

৮৬. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*(Boston : Boston University African Studies Center, 1974), v. 7, No.1, pp. 134-136

৮৭. সম্পাদনা বোর্ড, *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*(ঢাকা : অনু প্রকাশনী, ২০১২), পৃ. ১৪৮

প্রাথমিক পর্যায়। এ সময় অন্যান্য সহজ দ্রব্যাদির পাশাপাশি মানুষ ব্যাপক হারে অমার্জিত স্থূল এবং অমসৃণ পাথুরে অস্ত্র ব্যবহার করত বলে যুগটির এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। পুরোপলীয় যুগ ছিল প্রস্তর যুগের দীর্ঘস্থায়ী কাল। আফ্রিকায় প্রায় ১০ লক্ষ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ থেকে ১৫ লক্ষ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কাল পুরোপলীয় যুগ হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাসবিদগণ এ যুগের আরও যথেষ্ট নিদর্শন না পাওয়ায় যুগের সময় কালকে আরও কম করে হিসাব করেছেন। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এ যুগের সময়কাল ছিল ৫০ হাজার বছর থেকে ১৫ হাজার বছরের মধ্যে।[৮৮] এ সময়ে জনজীবনের বিকাশ ছিল অত্যন্ত মন্থর। যার ফলে সে যুগে উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত হয়নি। তবে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এ পুরোপলীয় যুগেই মানব সভ্যতার ভিত রচিত হয়েছিল।

পুরোপলীয় যুগের বস্তুগত সমাজ-সংস্কৃতিও ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে পুরোপলীয় যুগের বস্তুগত সমাজ-সংস্কৃতি তুলে ধরা হল :

পুরোপলীয় যুগের খাদ্য : কিভাবে খাদ্য উৎপাদন করতে হয় সে প্রক্রিয়া সম্পর্কে পুরোপলীয় যুগের মানুষের জ্ঞান ছিল না। খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করার জন্য এ সময়ে মানুষ খুবই তৎপর ছিল। মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য লতাগুল্ম, ফলমূল, পাখির ডিম ছিল অন্যতম সামগ্রী। প্রাথমিক পর্যায়ে পুরোপলীয় যুগের মানুষেরা ছোট ছোট পশু শিকার করত। এখান থেকে যে সকল পশুর দেহাবশেষ পাওয়া যায় তাতে জানা যায় এগুলো গিরিগিটি, ব্যাঙ, ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি ছিল। ধীরে ধীরে আরেকটু বড় পশু মানুষের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলোর মধ্যে শূকর, ভেড়া, গরু, জিরাফ ইত্যাদি। পিথেক্যানথ্রপাস নরগোষ্ঠী ব্যাপকহারে হরিণ শিকার করত।[৮৯] এ্যাচুলীয় ও ম্যাগদালেনীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত আদি মানবদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন প্রকার হরিণের সন্নিবেশ ঘটেছিল। হরিণ ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষি আবিষ্কারের পূর্বের মানুষের মূল খাবার।[৯০]

কেনিয়ার এ্যাচুলিয়ান শিকারিরা হরিণের পাশাপাশি শূকর, জেব্রা ও বেবুনের গোশত আহার করত। জলহস্তী এবং কচ্ছপও তাদের খাবার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল। চিনের হোয়াংহো নদীর তীরে মধ্যপুরোপলীয় যুগের মানুষেরা তাদের প্রধান খাবার হিসেবে উট পাখির ডিম আহার করত। প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগের ইউরোপীয় শিকারী মানুষেরা সবচেয়ে বেশি বিচিত্র ধরনের খাবার গ্রহণ করত। গ্রীষ্ম প্রধান এই অঞ্চলে গরু, ঘোড়া, শূকর, বাইসন, বন্যছাগল, লাল হরিণ তাদের চতুর্দিকে বিচরণ করত এবং সে সময়ে এগুলোর প্রাচুর্যও বেশি ছিল। শীত প্রধান তুন্দ্রা অঞ্চলে পাওয়া যেত বল্গা হরিণ ও ম্যামথ। শিকারীরা এ অঞ্চলে পশুর পাশাপাশি উট এবং বন্য ঘোড়ার গোশত আহার করত। উত্তর আমেরিকার শিকারী মানুষ নেকড়ে কুকুর ও খরগোশ শিকার করত। ঝিনুক, শামুকও তাদের খাবার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। বড় বড় পশু শিকার করতে গিয়ে নিরাপত্তার জন্য মানুষকে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য স্বাভাবিকভাবেই মানুষ যাযাবর জীবন যাপন করত। এ সময়ে তারা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল ছিল।[৯১] খাবার উৎপাদন না করতে পারায় মানুষের জীবন ছিল সংগ্রামমুখর। জীবন ধারণের প্রয়োজনে পুরোপলীয় মানুষ যৌথভাবে শিকার করত ও খাদ্য গ্রহণ করত বলে এ যুগকে আদিম সাম্যবাদী যুগ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

---

৮৮. Clive Bell, *Civilization and Old Friends*(Chicago : University of Chicago, 1973), p. 107

৮৯. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

৯০. James E Swain, *A History of World Civilization*(London : McGraw-Hill Book, 1947), p. 297

৯১. T.W. Wall Bank and M.A. Taylor, *Civilization : Past and Present*(New York : Harpercollins College, 1995), p. 227

পুরোপলীয় যুগের আশ্রয়স্থল : আশ্রয় হল মানুষের মৌলিক চাহিদা। এ আশ্রয়ের খোঁজে মানুষ যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। আশ্রয়ের প্রয়োজনে সৃষ্টির প্রথম থেকেই পাখি এবং কিছু জন্তু-জানোয়ার বাসা বানিয়েছে অথবা গুহাবাসী হয়েছে। তবে এরা তাদের আশ্রয় নির্মাণ বা ব্যবহারে কোন বৈচিত্র্য আনতে পারেনি। কিন্তু মানুষ যখন গৃহ নির্মাণ করতে শিখল তখন এর মধ্যে বৈচিত্র্য আসল। প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তারা বাসস্থান নির্মাণ করতে লাগল। বাসস্থান নির্মিত হল মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে। তারা বাড়ি বানাতে ব্যবহার করল বিভিন্ন প্রকারের কাঁচামাল। গাছের পাতা, ডাল, পশুর চামড়া, তিমি ও ম্যামথের হাড়, কাঠ, মাটি, তৃণ, বরফ প্রভৃতি ছিল এসব কাঁচামালের অন্তর্ভুক্ত। ক্ল্যানের অধিবাসীরা পাহাড়ের ঢালে বা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় বাড়ি বানাত।[৯২] অনেক সময় একই ছাদের নিচে অনেক প্রকোষ্ঠ করা হত। সেখানে ক্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন পরিবার বসবাস করত। পুরোপলীয় যুগের মানুষের বসতির অনেক স্মৃতি চিহ্ন তৃণ অঞ্চল, নদী ও সাগর তীর এবং বেলা ভূমিতে দেখা গিয়েছে। পশু শিকারের জন্য এ যুগের মানুষকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়াতে হত বলে তাদের বাসগৃহে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ছিল।

বরফযুগে ঠান্ডা প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষকে সাধারণ ঘরবাড়ি বানানোর চেয়ে বেশি উষ্ণতা ও নিরাপত্তা প্রদানকারী আশ্রস্থল খুঁজতে হয়েছে। তাই এ সময়ে মানুষকে পাহাড়ের গুহায়, পাহাড়ের ঝুলন্ত পাথরের ছায়ায় অথবা মাটির গর্তে বসবাস করতে দেখা যায়। তবে এটা ভাবার কারণ নেই যে মানুষের ক্রমবিকাশের শুরুতেই তারা পাহাড়ের গুহায় বা পাথরের আচ্ছাদনে আশ্রয় খুঁজেছিল। মানুষের প্রাচীনতম অবস্থান ছিল আফ্রিকায়, সেখানে এ জাতীয় প্রকৃতিক সুবিধা না থাকায় খোলা আকাশের নিচেই তাদের রাত্রিযাপন করতে হত। প্লেইস্টোসিন যুগে অস্ট্রালোপিথেকাস নরগোষ্ঠীর দেহাবশেষের কিছু নমুনা পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গেছে।[৯৩] তবে এ গোষ্ঠীর সকলেই গুহাবাসী হতে পারেনি। তাদের কেউ কেউ তখনও খোলা আকাশের নিচেই বসবাস করতে বাধ্য ছিল।

আফ্রিকায় এ্যাচুলীয় সমাজের শেষদিকেই শুধুমাত্র ব্যাপকভাবে আশ্রয় খোঁজা বা বানানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়। এ যুগের পূর্বে আফ্রিকার আদি মানবদের স্থায়ীভাবে গুহাবাসী হওয়ার প্রমাণ নেই। কারণ তাদের আগুন ব্যবহারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গুহার অন্যতম দাবিদার হিংস্র জীব-জন্তুদের আগুনের ভয় দেখিয়ে তাড়ানোর প্রথা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে শেষ পুরোপলীয় ও মধ্য পুরোপলীয় যুগে আশ্রয় হিসেবে আদি মানব গুহাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করত।[৯৪] দ্বিতীয় বরফযুগে পিকিং-এর নিকট ঝাউ-কাউ-তিয়েন গুহায়, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি এলাকার গুহায় পিথেক্যাথ্রপাস নরগোষ্ঠীর বসবাসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। শেষ আন্তঃবরফযুগে এ বসবাসের পরিমাণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায়। শেষ পুরোপলীয় যুগে ইউরোপে বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে গুহাবাসী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শেষ বরফযুগের নিয়ানডারথাল মানুষদের প্রধান আশ্রয় ছিল গুহা। কৃষি আবিষ্কারের পর নিউমেক্সিকোর সান্দিয়া এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গুহাবাসী মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে।[৯৫] দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের ডরডোগান এলাকায় চুনাপাথরের আচ্ছাদন পুরোপলীয় মানুষেরা বাসস্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে। এভাবে পুরোপলীয় যুগের

---

৯২. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 135

৯৩. Clive Bell, *Civilization and Old Friends*, ibid, p. 154

৯৪. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*(ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৪

৯৫. Joseph Reither, *World History at a Glance*, ibid, p. 190

মানুষ ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থল ছেড়ে এক সময়ে পশুর চামড়ায় নির্মিত তাঁবুতে বা লতাপাতার আচ্ছাদিত আশ্রয়ে বসবাস করতে থাকে এবং ক্রমে এগিয়ে যায় নবপোলীয় যুগের উন্নয়নের দিকে।

পুরোপলীয় যুগের অস্ত্রশস্ত্র : পুরোপলীয় মানুষ জীবন রক্ষার প্রয়োজনে শিকারকে সহজ করার জন্য হাতিয়ার উদ্ভাবন করে। নিজ মেধা কাজে লাগাতে গিয়ে এভাবে মানুষ তাদের সমাজ-সংস্কৃতির উদ্বোধন ঘটায়। পাথরের হাতিয়ারই ছিল এ যুগের প্রধান হাতিয়ার। অবশ্য গাছের ডালপালাও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হত। হাতিয়ার ছিল শ্রমকে কাজে লাগানোর মাধ্যম। সুতরাং মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে এ সকল পাথুরে অস্ত্রের ভূমিকা ছিল অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আদি প্রাইমেটদের কেউ হয়ত একটি বৃশ্চিক মারার জন্য তারা চারপাশে ছড়িয়ে থাকা একখণ্ড পাথর হাতে তুলে নিয়েছিল। পাথরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের প্রক্রিয়া এভাবেই শুরু হয়েছিল।[৯৬] পুরোপলীয় যুগের প্রথম পর্যায়কে এ হিসেবে মানুষের হাতিয়ার ব্যবহারের পর্যায় বলা যায়। পরবর্তীকালে হোমিনিড গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজন মত পাথরের আকৃতি পরিবর্তন করে হাতিয়ারের বিভিন্ন রূপ দিতে থাকে। মানুষ এ সময় হাতিয়ার নির্মাতায় পরিণত হয়। তবে নির্দিষ্ট প্রয়োজনে বিশেষ আকার ও ধরনের অস্ত্র বানানোর পরিণত মেধা শুরু থেকেই অস্ত্র নির্মাতাদের আয়ত্তে আসেনি। এজন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। আদি হাতিয়ার নির্মাতা মানবগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিল চিনের ঝাউ-কাউ-তিয়েন পাহাড়ী এলাকার পিথেক্যানথ্রপাস গোষ্ঠী।[৯৭] এ নির্মাতা গোষ্ঠীর পরবর্তী বংশধরদের অবস্থান পূর্ব এশিয়ায় লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে পুরোপলীয় মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে যেমন ছিদ্র করা, গর্ত করা, কাটা ছুড়ে মারা প্রভৃতির জন্য পাথরকে নির্দিষ্ট আকার দেয়ার চেষ্টা করে। এ্যাচুলীয় সমাজের কিছু হস্ত কুঠারের নমুনা এর প্রমাণ। কুঠারের প্রান্তদেশ ধারালো করা হয়েছিল পাথরকে প্রয়োজন মত ভেঙ্গে। প্রাপ্ত কুঠারসমূহের ধরন, বিভিন্ন আকার ও ওজন হাতিয়ার নির্মাতাদের দক্ষতার প্রতিনিধিত্ব করছে।

পুরোপলীয় যুগের পাথুরে অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূচনা কাল থেকে পুরোপলীয় যুগের শেষ সময় পর্যন্ত হাতিয়ারের আকৃতি ক্রমান্বয়ে বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রকার হয়ে এসেছে। প্রাথমিক পুরোপলীয় যুগের হাতিয়ারগুলো ছিল কর্তক, হস্ত কুঠার, শাবল, ছুরি, চাকতি ইত্যাদি। সবগুলোর আকৃতিই সুনির্দিষ্ট হত না। কোনটি ছিল গোলাকার, কোনটি ডিম্বাকার, আবার কোনটি চতুষ্কোণ। উপরের ও নিচের দিকে পাথর ভেঙ্গে তা ধারালো করা হত। সাধারণত এই হাতিয়ার বানানো হত নুড়ি বা চকমকে পাথর দিয়ে। একইভাবে পাথরকে বিভিন্নভাবে ভেঙ্গে উল্লিখিত হাতিয়ারগুলো বানানো হত। মধ্য পুরোপলীয় যুগে এসে হাতিয়ার আরও কার্যকরী রূপ লাভ করে। এ যুগে আরও নতুন কিছু হাতিয়ার যুক্ত হয়। যেমন পশু চামড়া ছাড়ানোর জন্য তৈরি হয় স্ক্র্যাপার, নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত বা ছিদ্র করার জন্য পয়েন্ট এবং গোশত কাটার জন্য ব্লেড ইত্যাদি।[৯৮] শেষ পুরোপলীয় যুগে এসে এই অস্ত্রগুলোই আরও উন্নত হয়। সেই সাথে হাড় বা চামড়া ছিদ্র করার জন্য তৈরি হয় ছেদক। দূর থেকে অস্ত্র ছুড়ে পশু শিকারের জন্য তৈরি হয় তীরের ফলা। শেষ পুরোপলীয় যুগের উদ্ভাবনে সূচ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এ যুগেই পাথরের পাশাপাশি হাড়, হাতির দাঁত, পশুর শিং প্রভৃতি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রাথমিক ও মধ্য পুরোপলীয় যুগে যে সমস্ত পাথুরে হাতিয়ার পাওয়া যায় তা তৈরি করা হয় ব্যাসল্ট, গ্রানাইট, কোয়ার্টজাইট প্রভৃতি রুক্ষ পাথর দিয়ে। কিন্তু শেষ পুরোপলীয় যুগে এসব ক্ষেত্রে মসৃণ পাথর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

---

৯৬. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 307

৯৭. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৯৮. T.W. Wall Bank and M.A. Taylor, *Civilization : Past and Present*, ibid, p. 266

প্রস্তর যুগের সামাজিক জীবন : পুরোপলীয় যুগের আদি মানব খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ জীবন গড়ে তোলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবন ধারণের জন্য ম্যামথ, বাইসন, বল্গা হরিণ প্রভৃতি বড় পশু শিকারের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। এই বাস্তব প্রয়োজনেই মানুষকে দলবদ্ধ হতে হয়েছে। প্রাইমেটদের পরিবারের ধরন কিরূপ ছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ডারউইনের অনুসারীদের মতে এদের পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রধান ছিল পরিবারের সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ। ছেলে বড় হলে পরিবার থেকে বের হয়ে গিয়ে নতুন দল গড়ে তুলত। আধুনিক গবেষকদের মতে, আদি মানব সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এ সমাজে নেতৃত্বের ভার ছিল মেয়েদের হাতে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয়, শেষ পুরোপলীয় যুগের পূর্বেই মানব সমাজের সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ গঠনে যে সংঘবদ্ধ জীবনের প্রয়োজন হয় তার লক্ষণ পাওয়া যায় পিথাক্যানথ্রপাস গোষ্ঠীর দেহাবশেষ থেকে। ঝাউ-কাউ-তিয়েন পাহাড়ের গুহায় পুরুষ, স্ত্রী ও শিশুর দেহাবশেষ একই সাথে পাওয়া গিয়েছে। তাতে মনে হয় তারা এক সাথে বসবাস করত।[৯৯] দৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের জন্য অস্ট্রোলোপি থেকাসদের চেয়ে এরা অনেক সফলভাবে শিকার করতে পারত। এসব মানবগোষ্ঠী যে ভাল শিকারি ছিল তার প্রমাণ মিলে তাদের বাসস্থানের আশে পাশে থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে হরিণের হাড়, শিং ইত্যাদি প্রাপ্তির ফলে। তবে অস্ট্রোলোপি থেকাসদেরও সংঘবদ্ধ পারিবারিক জীবন ছিল। পুরোপলীয় মানুষ সম্পর্কে নতুন তথ্য পাওয়া যায় ঝাউ-কাউ-তিয়েন এলাকায়।[১০০]

স্বগোত্রীয়দের মাংস ভক্ষণ করা ছিল এদের সামাজিক রীতি। এদের অবস্থানে বেশ কিছু ভাঙ্গা মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছে। এতে খুলি ভেঙ্গে মগজ বের করা হয়েছিল এমনটিই ধারণা করা হয়। নিজ গোত্রের মাংস ভক্ষণ করার তিনটি কারণ দর্শানো হত। প্রথমত ধর্মীয় কোন চেতনায় এদের উৎসর্গ করা হত। দ্বিতীয়ত কোন স্বেচ্ছাচারী চিন্তার ফল হিসেবে হত্যা করা হত। তৃতীয়ত খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হত। তারা কখনও কখনও মৃতদেরকেও ভক্ষণ করত বলে অনুমান করা হয়। কখনও বৃদ্ধদের হত্যা করা হত এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে ও তাদের পরশ নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে তাদের মাংস ভক্ষণ করত। পিকিং-এর কাছে প্রাপ্ত দেহাবশেষ থেকে নরগোষ্ঠী কর্তৃক মানুষের মাংস ভক্ষণ করার প্রমাণ ভিন্ন সামাজিক ধারণার কথা প্রকাশ করে। এখানে যাদের হত্যা বা ভক্ষণ করা হয়েছে তারা নিজেদের গোত্র বা বংশোদ্ভূত নয়। অন্য কোন গোষ্ঠীর লোকদের হত্যা করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা বিদ্যমান ছিল। কেনিয়ার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চল অরগেসাইলিতে এ্যাচুলীয় সংস্কৃতির ধারক মানুষদের মধ্যে হস্ত কুঠার ও অন্যান্য পাথুরে অস্ত্রের ব্যবহারের প্রচলন দেখা গিয়েছে।[১০১] ধারণা করা হয়, অস্ত্র তৈরির দক্ষতা এখানে সবচেয়ে বেশি অর্জিত হয়েছিল এবং যার কারণে একটি কারিগরি শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল।

শেষ পুরোপলীয় যুগে অপেক্ষাকৃত উন্নত হাতিয়ার ব্যবহার করে নিয়ানডারথাল মানবগোষ্ঠী। তারা অনেক বড় বড় পশু শিকার করত। যেমন– ম্যামথ ও জলহস্তী। এদের সামাজিক সংগঠনটা ছিল খুবই দৃঢ়। এ সময় মানুষ বাস্তব প্রয়োজনে দলবদ্ধ হতে গিয়ে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংগঠনগুলো গড়ে তুলেছিল পরবর্তীকালে তা ক্ল্যান নামে অভিহিত হত। এ সংঘবদ্ধতা মানুষকে ধীরে ধীরে গোত্র চিন্তার দিকে ধাবিত করে। তারা তখন ব্যক্তি চিন্তার চেয়ে গোত্র

---

৯৯. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 188
১০০. সম্পাদনা বোর্ড, *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১০১. Clive Bell, *Civilization and Old Friends*, ibid, p. 175

চিন্তার প্রতি মনোনিবেশ করতে শুরু করে। আর তাইতো তারা আত্মরক্ষা ও পশু শিকারের মত কাজে দলবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ হয়। এতে রক্ষা পাওয়াও সহজ হয়। এই যুগকে আদিম সাম্যবাদী সমাজ বলে আখ্যা দেয়া হয়। সাম্যবাদী সমাজ বলে গোত্রের সকলে এক সাথে কাজ করত এবং এর ফলও তারা একত্রে ভোগ করত। রক্তসম্পর্কযুক্ত নিকট আত্মীয়দের নিয়ে ক্ল্যান গঠন করা হত।[১০২]

ক্ল্যান পরিচালনার জন্য একজন দলপতি নিযুক্ত করা হত। এই ক্ল্যানবদ্ধ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জন্মাতে থাকে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ তাদের কৌতুহলী করে তোলে। শিকারি জীবনকে সফল করার জন্য এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তারা অদৃশ্য কোন শক্তির আনুকূল্য প্রত্যাশা করতে থাকে। পুরোপলীয় এ আদিম ধর্ম বিশ্বাসকে টোটেম বলা হত। প্রতিটি ক্ল্যান পৃথক পৃথক প্রাণীকে তাদের পূর্ব-পুরুষ মনে করত। যেমন– ক্যাঙ্গারু, সাপ, বাজপাখি ইত্যাদি। পুরোপলীয় মানুষের এই ধর্মীয় বিশ্বাস টোটেম পালনের জন্য বেশ কিছু বিধিনিষেধ ছিল। এগুলোকে ট্যাবু বলা হত। যেমন– যে ক্ল্যানের পূর্বপুরুষ ছিল ক্যাঙ্গারু, তাদের ট্যাবু ছিল তারা কখনও ক্যাঙ্গারু হত্যা করতে পারবে না। ট্যাবু আদি মানুষদের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। বিভিন্ন ক্ল্যানের সমন্বয়ে পরবর্তীকালে বড় সামাজিক 'ট্রাইব' গড়ে উঠেছিল।

মধ্যোপলীয় যুগের সমাজ-সংস্কৃতি : চতুর্থ বরফযুগের সমাপ্তির পর পৃথিবীর বুকে একটা ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এ সময়ে বড় বড় পাথরের আস্তরণসমূহ গলে যায়। যার ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতায় পরিবর্তন আসে। ইউরোপের তৃণভূমি বা তুন্দ্রা অঞ্চল গভীর বনাঞ্চলে রূপান্তরিত হয়। নিকট প্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার প্রান্তরগুলো মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়। এখানে মাঝে মধ্যে কিছু কিছু মরুদ্যান গড়ে উঠে।[১০৩] ব্যাপকভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তিত আবহাওয়াতে টিকে থাকতে না পেরে পুরোপলীয় যুগের ম্যামথ ও অন্যান্য পশু শিকারি মানুষের বংশধরেরা অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। বরফ যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মানুষ নতুনভাবে পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে বসবাস করতে শুরু করে। এ প্রেক্ষিতেই এখানে গড়ে উঠে একটি নতুন জীবন প্রণালী। এখানে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল তাকেই বলা হয় মধ্যোপলীয় সমাজ।

পুরোপলীয় ও নবোপলীয় যুগের অন্তর্বর্তীকালে মধ্যোপলীয় যুগের অবস্থান। সাগর উপকূলে বসবাস করত মধ্যোপলীয় যুগের মানুষের একটি শাখা। তারা ক্ষুধা নিবারণ করতে মাছ শিকার করত। আহারের জন্য শামুক সংগ্রহ করত। তাই পুরোপলীয় যুগে যেখানে শিকারের প্রয়োজনে যাযাবর জীবন বেছে নিয়েছিল, সেখানে মধ্যোপলীয় যুগের মানুষের জীবন ছিল আধা যাযাবর ও আধা স্থায়ী। আর মূল ভূমিতে এ যুগের অন্য শাখার মানুষেরা বাস করত। তারা পুরোপলীয় মানুষের মত শিকারি জীবনে অভ্যস্ত ছিল। তাদের অবস্থান ছিল বনাঞ্চলের নিকটে। বাস্তব প্রয়োজনে এ যুগের মানুষেরা অস্ত্র ব্যবহার করত। পাথরের কুঠারের সাহায্যে কাঠ কেটে বিভিন্ন অস্ত্রের হাতল বানাত। শিকারের জন্য তীর-ধনুক বানাত। তারা বরফের উপর চলার জন্য স্কি বা স্লেজগাড়ি ব্যবহার করার পদ্ধতি জানত। পানিতে চলার জন্য নৌকা বানাত যা গাছের গুড়ি খোদাই করে তৈরি করা হত। বরফের উপর স্লেজ গাড়ি টানার জন্য কুকুর ব্যবহার করা হত। এভাবে মধ্যোপলীয় যুগে পশুকে প্রথম গৃহপালিত করা হয়। পরে নবোপলীয় যুগেও এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। যদিও মধ্যোপলীয় যুগের মানুষ

---

১০২. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১০৩. Joseph Reither, *World History at a Glance*, ibid, p. 238

পুরোপলীয় যুগের মানুষের মত খাদ্য উৎপাদন করতে জানত না, তথাপি এদিক থেকে তাদের উন্নয়ন বেশ লক্ষণীয়। ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার মানুষেরা এ যুগে পশু শিকারের পাশাপাশি প্রাকৃতিকভাবে কিছু লতাপাতা খাদ্য হিসেবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল। খাদ্য সংগ্রহকারী মানুষের নবোপলীয় যুগে খাদ্য উৎপাদনকারী মানুষে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা হিসেবে পুরোপলীয় ও মধ্যোপলীয় উভয় যুগের মানুষ ছিল পশু ও মৎস শিকারি। অন্যদিকে নবোপলীয় যুগের মানুষ ছিল কৃষক ও পশু পালক। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই পুরো ব্যাপারটিই ইতিহাসে মানুষের প্রথম অর্থনৈতিক বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

মধ্যোপলীয় যুগের মানুষ সমুদ্র ছাড়াও লেক ও নদীতে মিঠা পানির মাছ শিকার করত। তাদের শিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল শূকর ও লাল হরিণের মত মাঝারি আকৃতির পশু। তারা ফাঁদ পেতে বীবর, নেউলে, শৃগাল, বন বিড়াল এ সমস্ত ছোট পশু শিকার করত।[১০৪] তাদের খাদ্য তালিকায় জলচর পাখিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই মধ্যোপলীয় যুগের মানুষের হাতিয়ার ব্যবহারে কিছুটা পরিবর্তন আসে। এ সময় প্রধান অস্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল তীর ও ধনুক।[১০৫] তবে তীর-ধনুকের ব্যবহার উত্তর ইউরোপে সবচেয়ে বেশি হয়েছিল বলে মনে করা হয়। সমগ্র ইউরোপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর তীক্ষ্ম করে বিশেষ করে বড়শি সদৃশ অস্ত্র ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। পাথর তীক্ষ্ম করে হার্পুনের ফলা তৈরি করা হত এবং পাথরের পাশাপাশি হরিণের শিং ও পশুর হাড় দিয়েও এগুলো তৈরি করা হত। এ সময়ে মাছ শিকার প্রচুর গুরুত্ব পেয়েছিল বলে অনেক বড়শি, চাই, টানাজাল, নৌকা ও বৈঠার সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যোপলীয় যুগে মানুষ তাদের অস্ত্রের হাতল হিসেবে কাঠের ব্যবহারও করত।[১০৬]

নবোপলীয় যুগের সমাজ-সংস্কৃতি : নবোপলীয় যুগের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Neolithic age, আবার Neo শব্দের অর্থ নব বা নতুন ও lithic শব্দের অর্থ উপল বা পাথর। তাহলে Neolithic age শব্দের অর্থ দাঁড়ায় নতুন পাথরের যুগ। পাথরের যুগের এ পর্যায়ে হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধনের সাথে সাথে মানুষের জীবন প্রণালীরও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে সকল উন্নয়ন ঘটেছিল সেগুলো নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

কৃষি : মানব সভ্যতার উল্লেখযোগ্য যেসব দিক রয়েছে তা আবিষ্কৃত হয় নবোপলীয় যুগে। কৃষির আবিষ্কার ছিল সভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন। জীবন ধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহকারী মানব সমাজ খাদ্য উৎপাদনকারী সমাজে রূপান্তরিত হল। একই স্থানে স্থিরভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় তারা যাযাবর বৃত্তি পরিত্যাগ করেছিল। খাদ্য সামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকায় তাদের চিন্তাভাবনাও প্রসারিত হতে থাকে। তখন থেকেই তারা সৃজনশীল অনেক কর্মকান্ডের সাথেই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল। তখন কৃষি কাজের উৎপত্তি হয় নারীদের দ্বারা। কেননা ফল আহারের পর যে সকল বীজ থাকত তা নারীরাই মাটিতে পুঁতে রাখত। এভাবে এ সকল বীজ থেকে গাছ এবং গাছ থেকে অনুরূপ ফল পাওয়ার সুযোগ পেল। পরবর্তীতে এ প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে কৃষির উদ্ভব হয়েছিল। বিশেষজ্ঞদের অভিমত অনুসারে বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত জারমো ও হাসুনা নামক পার্বত্য ভূমিতে প্রথম নবোপলীয় মানুষ প্রায় ৮০০০ থেকে ৬০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৃষিকাজের পদ্ধতি উদ্ভাবন

---

১০৪. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১০৫. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 311

১০৬. T.W. Wall Bank and M.A. Taylor, *Civilization : Past and Present*, ibid, p. 385

করেছিল। একই সময়ে জর্ডানের জেরিকোতেও কৃষিকাজ শুরু হয়েছিল। এখানে ঝর্ণার পানি প্রবাহের আনুকূল্যে প্রাকৃতিকভাবে শস্য উৎপাদন করা হত। এভাবে কিছু কিছু মরুদ্যান গড়ে উঠেছিল। নিম্নভূমির চেয়ে উচ্চভূমিতে বৃষ্টিপাত বেশি হওয়ায় কৃষির সূচনাকালে সেখানে গম ও ভুট্টার চাষ হত। কৃষি উদ্ভাবনের পর পরই নবোপলীয় যুগের মানুষ পুরোপুরিভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হতে পারেনি। এ জন্য কৃষির সাথে সাথে তারা শিকারের কাজও সমানভাবে চালিয়ে গেছে। এ প্রেক্ষিতেই এ যুগের মানুষ কৃষি ও শিকারের সুবিধার জন্য তাদের বসতি স্থাপন করেছে পানির উৎস ও বনের ধারে। সম্ভবত নবোপলীয় যুগেই দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় কৃষি কাজের জন্য পানি সেচের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

স্থায়ী নিবাস প্রস্তুত : কৃষি আবিষ্কারের পর নবোপলীয় মানুষের মধ্যে বন্য পশুর ভীতি অনেকাংশেই হ্রাস পায়। তারা এ যুগের শেষ পর্যায়ে বাড়িঘর তৈরিতে মনোনিবেশ করে। তাই এ সময়ে গুহার গুরুত্ব কমে আসে। মানুষ তাদের আবাদি জমির আশেপাশেই ঘাস, লতাপাতা, গাছ, কাঠ ইত্যাদি দিয়ে ঘর নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করে। এ সমস্ত ছোট ছোট ঘরই পরবর্তীতে গ্রামে রূপান্তরিত হয়। বিশেষজ্ঞগণের ধারণা মতে, প্রায় ৮০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্থায়ী বাসের জন্য মানুষ গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। কৃষি কাজের মাধ্যমেই তারা গ্রাম্য ব্যবস্থা গড়ে তোলে। নবোপলীয় যুগের শেষ প্রান্তে মানুষ আরও উন্নতি লাভ করে নগর গড়তে শুরু করে। দক্ষিণ আনাতোলিয়ার মালভূমিতে এ সকল গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। এ সময়ে ইউরোপে তৈরি হয় কাঠের বাড়ি। সুইজারল্যান্ডের লেকবাসী মানুষেরা লেকের পানিতে গাছ বা বাঁশ পুঁতে তার উপর মাচা করে ঘর তৈরি করত। কৃষি কাজে মনোনিবেশ করেই মানুষ স্থায়ীভাবে বাসস্থান নির্মাণ করার প্রয়োজন বোধ করেছিল। যার ফলশ্রুতিতে তারা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছিল।

পশুপালন ব্যবস্থার উন্নয়ন : নবোপলীয় যুগের আরও একটি অবদান ছিল পশুপালন পদ্ধতির উন্নয়ন। সে যুগের মানুষ পর্যাপ্ত শিকার সংগ্রহ করতে পারলে তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পশু হত্যা না করে পরবর্তী সময়ে তা ব্যবহারের জন্য সঞ্চয় করে রাখত। এ সকল পশুই ধীরে ধীরে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরিত হত। মানুষ প্রত্যক্ষভাবে এসব পশুর দুধ দেয়া, ডিম পাড়া এবং বাচ্চা প্রসব করা অবলোকন করে। এখান থেকেই মানুষের মনে পশু হত্যা না করে পশু পালন করার সুবুদ্ধি আসে। অন্যদিকে কৃষি আবিষ্কারের ফলে অনেক তৃণভোজী জন্তু শস্যক্ষেত্রের আকর্ষণে লোকালয়ের কাছে চলে আসত। এ সমস্ত পশু ধরে তাকে গৃহপালিত করা তাদের জন্য বেশ সহজসাধ্য কাজ ছিল। এ ছাড়াও কৃষিজ পণ্য পরিবহণ, ভূমিকর্ষণ, লাঙল টানা প্রভৃতির জন্যও জীবজন্তুকে গৃহপালিত করে তোলার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। সভ্য যুগের সূচনায় নবোপলীয় যুগের মানুষেরা পশুকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করত এবং তাদেরকে পোষ মানিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের শুভসূচনা করেছিল।[১০৭]

অস্ত্রশস্ত্রের উন্নয়ন : পাথরের যুগের শুরুতেও হাতিয়ার নির্মাণ ও ব্যবহারের প্রতি মানুষের দক্ষতার পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। নবোপলীয় যুগে এসে মানুষ তাদের হাতিয়ারকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে। এ সময়ে তারা পাথরের অস্ত্রগুলো ঘষে-মেজে, ভেঙ্গে বিভিন্ন আকৃতি দান করত।[১০৮] নবোপলীয় যুগের অস্ত্রগুলো বেশি তীক্ষ্ণ এবং বেশ মসৃণ ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা হাতিয়ারের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। শুধু পাথর নয়, তখন তারা উন্নত হাতিয়ারের জন্য কাঠ, হাড় ও তামার ব্যবহার সংযোজন করে।

---

১০৭. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*(ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১৫
১০৮. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

আগুনের ব্যবহার : মানুষ আগুন সম্পর্কে ধারণা লাভ করে পুরোপলীয় যুগে। কখনও কখনও মানুষ আগুন সংগ্রহ করে তা কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু নবোপলীয় যুগের মানুষ নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ করে আগুনকে ব্যবহার করার বিশেষ কৌশল শিখেছিল। মানুষ অস্ত্র তৈরি করতে গিয়ে পাথর ভাঙ্গার মধ্য দিয়েই আগুনের খোঁজ পেয়েছিল। তারা পাথরে পাথর ঠুকে বা কাঠে কাঠ ঘর্ষণ দিয়ে কৃত্রিমভাবে আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি শিখে। আগুন ব্যবহার শেখার পূর্বে তারা কাঁচা গোশত ভক্ষণ করত। কিন্তু আগুন ব্যবহার করতে শিখে তারা গোশত আগুনে ঝলসে খাওয়ার প্রক্রিয়া শিখে নেয়।[১০৯] এর ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি হতে থাকে। তার মাটির পাত্রকে আগুনে পুড়িয়ে টেকসই পাত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। শীত নিবারণের জন্য আগুনের ব্যবহার ছাড়াও বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আগুন অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে।

চাকার আবিষ্কার : সভ্যতার অগ্রগতিতে চাকার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নবোপলীয় যুগে চাকার আবিষ্কার মানুষের জীবনে পরিবর্তন এনে দেয়। চাকা সম্পর্কে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিচে উল্লিখিত হল : (১) কুমারের চাকা আবিষ্কারের ফলে মৃৎশিল্পের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। চাকার সাহায্যে প্রয়োজনীয় মাটির পাত্র তৈরি সম্ভবপর হয়। মানুষের জীবনমান আরও এক ধাপ এগিয়ে যায়। (২) চাকা আবিষ্কারের ফলে বস্ত্র শিল্পের বিকাশ ঘটে।[১১০] গাছের বাকল বা পশুর চামড়ার পরিবর্তে মানুষ বস্ত্র পরিধান করতে শিখে। (৩) চাকার সাহায্যে গাড়ি নির্মাণ শুরু হয়। প্রথম দিকে বরফের উপর কুকুরের স্লেজ গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে চাকার আবিষ্কার হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।

সামাজিক জীবন প্রবাহ : পুরোপলীয় মানুষ প্রথম ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল জীবন সংগ্রামের প্রয়োজনে এবং তা নবোপলীয় পর্যায়ে আরও আবশ্যিক হিসাবে পরিদৃষ্ট হয়। এ কারণেই মানুষ আরও সমাজবদ্ধ হয়। এতে করে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুরোপলীয় মানুষ সংঘবদ্ধতার মাধ্যমে প্রথমে ক্ল্যান এবং পরে ট্রাইব গঠন করেছিল। নবোপলীয় যুগে এসে তারা খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে অনেকটা অবসর বের করে আনতে সক্ষম হয়। মানুষের চিন্তা-চেতরার বিকাশ অবকাশের মাধ্যমেই ঘটে থাকে। আর ধীরে ধীরে মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘঠতে থাকে। ট্রাইব সংগঠন আরও বৃদ্ধি পেয়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়। এতে সমাজে পেশাভিত্তিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটতে থাকে।[১১১] নবোপলীয় যুগে বিভিন্ন মানবিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভব ঘটতে থাকে। এর ফলে সভ্যতার উন্নয়ন মানুষের জন্য সহজ হয়ে যায়। পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর প্রাচীনতম সংগঠন। পরিবার একটি বিস্তৃত প্রত্যয়। সমাজ বিজ্ঞানীগণ পরিবারকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারেনি। সাধারণভাবে মনে করা হয় মাতা-পিতা, ভাই-বোন নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। তাদের চিন্তা ও বিশ্বাসের কাঠামো থাকে এক ও অভিন্ন। তারা নিজেদের মধ্যে শ্রমবিভাজন করে নেয়। একইভাবে তারা সম্পদের অংশীদারিত্ব ভোগ করে। এক বিবাহ ও বহু বিবাহ উভয় বিবাহ প্রথাই নবোপলীয় যুগে প্রচলিত ছিল। বর্তমান প্রেক্ষিতে সামাজিক বিধি ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হত কিনা তা জানার উপায় নেই। পারিবারিক বন্ধন এই ধাঁচেই গড়ে উঠেছিল। স্থান ভেদে বহু বিবাহ প্রথার ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কোথাও এক স্ত্রীর বহু স্বামী ছিল আবার কোথাও এক স্বামীর বহু স্ত্রী ছিল।

---

১০৯. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 312

১১০. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

১১১. T.W. Wall Bank and M.A. Taylor, *Civilization : Past and Present*, ibid, p. 386

খাদ্য সংগ্রহকারী পুরোপলীয় মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খাদ্য উৎপাদনকারী নবোপলীয় মানুষের জীবনব্যবস্থা ভিন্নতর ছিল। তারা কৃষি ও পশু পালনের প্রয়োজনে স্থায়ী জীবন গড়ে তোলে। তারা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করে। এ সময় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিময় প্রথারও উদ্ভাবন ঘটে। ক্রমে একই সমাজে শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। নারী ও পুরুষের মাঝেও শ্রমবিভাজন দেখা দেয়। নবোপলীয় পুরুষেরা হাতিয়ার বানাত, পশু পালন করত, শিকার করত এবং ঘরবাড়ি তৈরিতে বিশেষ অবদান রাখত। অপরদিকে নারীরা ফসল ফলাতে, ঝুড়ি বানাতে, বস্ত্র বয়ন করতে ও মৃৎপাত্র তৈরিতে শ্রম নিয়োগ করত।[১১২] এ ছাড়া তারা সন্তান প্রতিপালনেও ভূমিকা রাখত। প্রত্যেক নবোপলীয় গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় ফসল উৎপন্ন করত ও নিজেদের ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করত। ফলে বাইরের কোন গ্রামে তাদের যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। এক কথায় বাইরের জগত থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ছিল। এ কারণেই নবোপলীয় গ্রামগুলোতে একটি বিচ্ছিন্ন ও নিজস্ব সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়।

ভাষার অগ্রগতি : নবোপলীয় যুগে মানুষ পরস্পর পরস্পরের কাছে আসার সুযোগ পায়। এ কারণে ব্যবহারিক জীবনে তাদের বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই এ যুগে ভাষা একটি নির্দিষ্টরূপ লাভ করে।

ব্রোঞ্জের আবিষ্কার : নবোপলীয় যুগের শেষ প্রান্তে এসে তামার আবিষ্কার হয়। তামা ছিল সভ্যতার প্রস্তুতি পর্বে উদ্ভাবিত একটি মূল্যবান ধাতব পদার্থ। এ সময় খনি থেকে সরাসরি তামার আকরিক সংগ্রহ করা হত। এ যুগের মানুষ তামার হাতিয়ার তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। পাথরের অস্ত্রের পাশাপাশি তামার অস্ত্র ব্যবহার করা হত বলে এ সময়টিকে তাম্র-প্রস্তর যুগও বলা হয়। তামা আবিষ্কার এবং তামা থেকে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত এ যুগকে সভ্যতার দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল।

এগুলো ছাড়াও সমাজের অসংখ্য শ্রেণিবিভাজন বা প্রকরণ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প অর্থনীতির ভিত্তিতে আদিম, শিল্প-পূর্ব, শিল্প সমাজ এবং ক্রান্তিকালীন সমাজের উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষির ভিত্তিতে আদিম, কৃষি এবং আধুনিক সমাজের কথা বলা হয়েছে। আবার সামগ্রিক বিচারে সমাজকে ঐতিহ্যবাহী বা লোক সমাজ এবং আধুনিক সমাজ– এ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তুত সমাজের প্রকরণ নির্দিষ্ট কোন ছকে বাঁধা নেই। বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে বিভাজিত করেছেন। যেমন–

(ক) আদিম সমাজ : আদিম কথাটি একটি জটিল প্রত্যয়। ব্যবহারগত দিক থেকে এ প্রত্যয়টিকে আদিম শব্দ দ্বারা ব্যবহার করতে অনেক নৃবিজ্ঞানীই ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। মানুষ যখন তার কথাবার্তাকে লিখনীর সাহায্যে ব্যক্ত করতে শিখেছিল তখনই উদ্ভব হয়েছিল সভ্যতার। তবে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে সভ্য যুগের পূর্বে একটা ব্যাপক সময় ধরে পৃথিবীতে মানুষ বসবাস করে আসছিল।[১১৩] এ সময়ের মানুষকে অসভ্য; কিংবা এ সমাজকে অসভ্য সমাজ বলে পরিচয় দেয়া যায় না। সমাজের ঐ অবস্থাতেও প্রথা, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থাকে বুঝাতে নৃবিজ্ঞানীগণ মূল্যবোধমুক্ত একটি যথোপযুক্ত প্রত্যয় খুঁজে পেতে অনেক চেষ্টা করেছেন। ফলে কয়েকটি শব্দ বের করা সম্ভব হয়েছে বটে; কিন্তু তার কোনটাই প্রকৃত অর্থবোধক বলে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন

১১২. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 139
১১৩. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*(ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৫), পৃ. ১১

না। নির্বাচিত শব্দসমূহের মধ্যে– আদিম, অমার্জিত, অসভ্য, বন্য, বর্বর ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই শব্দগুলোর মধ্যে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব লুকিয়ে আছে বলে ধারণা করা হয়। অনেকে অবশ্য 'প্রাক-অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সমাজ' প্রত্যয়টি ব্যবহার করতে চেয়েছেন।[১১৪] কিন্তু তাও নৃবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট মনে করেন না। কারণ এখানেও আদিবাসীদের অক্ষর জ্ঞানহীন বলে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞান না থাকলেই যে মানুষ জ্ঞান সম্পন্ন হবে না এমন কথার কোন যৌক্তিকতা নেই।

সমাজচিন্তাবিদগণ বিভিন্নভাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন– সমাজবিজ্ঞানী মারডক-এর মতে, আদিবাসী বলতে বুঝায় এমন এক সামাজিক গোষ্ঠীকে যার মধ্যে বিভিন্ন উপজাতি, যাযাবর দল ও নানা উপগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রয়েছে। আদিবাসীরা সাধারণত নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় বসবাস করে এবং এদের ভাষা ও সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। তাছাড়াও বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর আলাদা আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান।[১১৫]

যাহোক, যারা আদিবাসী হিসেবে পরিচিত সেসব জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের একটি সাধারন নাম থাকে। তারা একই অঞ্চলে বাস করে।একই পূর্বপুরুষের বংশধর হিসেবে তারা নিজেদের মনে করে বা দাবি করে। তারা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই ধরনের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে এবং তারা অভিন্ন সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি ও রীতিনীতি অনুসরণ করে। প্রকৃতপক্ষে আদিম বলতে বুঝায় যে সমাজের লিখিত কোন ভাষা ছিল না, স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, পাহাড়-পর্বতের গুহায় তারা পশুর ন্যায় জীবন যাপন করত। উৎপাদনের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল আদিম সমাজ। আদিম মানুষ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে জীবন যাপন করত। এ যুগের মানুষের প্রধান কাজ ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। কেননা তাদের নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করতে হত। তাদেরকে বন্য পশু-পাখি ও জীবজন্তু শিকারের সন্ধানে অথবা বনে-জঙ্গলে ঘুরে ফিরে ফলমূল, শাক-সবজি জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ করতে হত। আবার কখনও নদ-নদী, খাল-বিল থেকে মাছ শিকার করতে হত। তাদের বসবাসের কোন স্থায়িত্ব ছিল না। মানুষ দরবদ্ধভাবে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং সেই সাথে সকলে মিলে সে খাদ্য আহার করত। নৃবিজ্ঞানী মিনুমাসানির মতে তাদের জীবন ছিল হয় ভুঁড়িভোজ না হয় উপবাস। আদিম সমাজকে ভালভাবে জানতে হলে তার বৈশিষ্ট্যসমূহ জানা আবশ্যক। আদিম সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা :

১. **অভিন্ন ভাষা ও লিখিত ভাষার অভাব :** আদিম সমাজে কোন লিখিত ভাষা ছিল না। এদের সামাজিক ব্যবস্থার কোন কিছুই লিখিত আকারে পাওয়া যায় না। শ্লোক, পৌরাণিক উপাখ্যান, সৃষ্টি রহস্য, বিশ্বাস, আচার বিধি ও ইতিহাস মুখ থেকে মুখান্তরে ছড়িয়ে ছিল। কোন কোন স্থানে অক্ষর থাকলেও তা দিয়ে ভাষার প্রচলন সম্ভব হয়নি। পৃথিবীর অন্যান্য নিরক্ষর সমাজের ন্যায় বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলেও এরূপ সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল; যাদের তেমন কোন লিখিত ভাষা ছিল না। তবে প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যরা একই ভাষায় কথা বলত। রমেশ থাপার কর্তৃক সম্পাদিত 'Tribe, Caste and Religion' শীর্ষক গ্রন্থে আঁদ্রে বেঁতেলি তার 'The Definition of Tribe' শীর্ষক রচনায় বলেছেন, 'a tribe as a society has a linguistic boundary.'[১১৬]

---

১১৪. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১১৫. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১১৬. Romesh Thapar, *Tribe, Caste and Religion*(London : Macmillan, 1983), 85

২. **অর্থনৈতিক ব্যবস্থা :** আদিবাসীদের উৎপাদন কৌশল ছিল খুবই অনুন্নত। এরা পশু ও মৎস্য শিকার এবং পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। দা, কোদাল ইত্যাদি ব্যবহার করে এই আদিবাসীরা সামান্য কিছু শস্য উৎপাদন করত। এ সমাজে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণা খুব একটা প্রবল নয়। সাধারণত মেয়েরা রান্নাবান্না ও ঘরের কাজ করত এবং পুরুষেরা বাইরে থেকে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা নিত। অনেক সময় মেয়েরা মাঠের কাজে পুরুষদেরকে সাহায্য করত। তাদের কাজকর্মের মধ্যে দ্রব্য বিনিময় প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন তাদের স্বীকৃত প্রথা অনুযায়ী নির্ধারিত হত।[১১৭] তাদের অবস্থা অনেকটা 'দিনে আনে দিনে খায়' ধরনের ছিল। তারা উদ্বৃত্ত কিছু সঞ্চয় করে রাখতে পারত না।

৩. **অভিন্ন অঞ্চল :** আদিবাসীরা সাধারণত একই অঞ্চলে বসবাস করে।

৪. **সামাজিক ব্যবস্থাপনা :** আদিম সমাজে অবাধ যৌন মিলন ছিল না। তবে যৌন মিলনের বিধি-নিষেধের শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-বিবাহ যৌনমিলন, বহু স্ত্রী ও বহু স্বামী গ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গোত্রের বাইরেই আদিবাসীদের মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠী বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এ সমাজে মেয়েদের নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। তবে সেখানে পুরুষদের নেতৃত্বও অনুপস্থিত ছিল না। আদিম সমাজে পিতৃ প্রধান ও মাতৃ প্রধান উভয় প্রকার পরিবারেরই অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রথা ছিল। তবে এর উপর সামাজিক বিধি-নিষেধ ছিল। পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহ অনুষ্ঠানাদির মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।[১১৮]

৫. **রক্তের সম্পর্ক বা আত্মীয়তার বন্ধন :** আদিবাসী গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক বা দৃঢ় আত্মীয়তার বন্ধন বিদ্যমান ছিল এবং তাদের মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় প্রকৃতির ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকত।

৬. **ধর্মের গুরুত্ব :** আদিবাসী জীবনে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম, আদিবাসীরা একই পূর্ব-পুরুষের পূজা করত। তবে তাদের সমাজের ধর্ম উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের ধর্ম ছিল বিভিন্ন ধরনের। আত্মা, প্রেতাত্মা, অতি প্রাকৃত শক্তি এবং অতিমানবে বিশ্বাস হল এ ধর্মের মূলমন্ত্র। পূর্ব পুরুষ, প্রকৃতি পূজা, বিশেষ বস্তুতে ভক্তি, নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষ্টানিকতা হচ্ছে ধর্মীয় জীবনের অংশ। গোত্র কখনও বা কোন বিশেষ প্রাণী বা গাছপালার নামে পরিচিত হত এবং সেই প্রাণী বা গাছকে ঘিরে টোটেম উৎসব পালন করা হত।[১১৯] এই প্রাণী ও গাছপালা টোটেম বলে এদের কোনরূপ ক্ষতি করা যেত না। এছাড়া আদিম অধিবাসীরা বহু ঈশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদের ধারণা পোষণ করত। ধর্মীয় বিধি-নিষেধ ছিল সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপাদান। ট্যাবু প্রত্যয়টি এই নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত বিষয়। অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং তার উপাসনা করতে হলে তারা অনেক সতর্কতা অবলম্বন করত। তাই এ ব্যাপারে অনেক বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়। এ সমাজে ধর্মের উৎপত্তির পূর্বে ও পরে যাদুবিদ্যার প্রচলনও লক্ষণীয়। প্রকৃতির খেয়াল খুশির কাছে আত্মনিবেদন পূজা ও অর্ঘ্যদান হলো ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ। অপরপক্ষে অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বিশেস কৌশলে বশীভূত করা ও তা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে

---

১১৭. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

১১৮. টম বটোমোর, *সমাজবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৮

১১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৭

কাজ আদায় করে নেয়ার প্রচেষ্টাই হলো যাদুবিদ্যা। আদিম অধিবাসীদের জীবনে যাদুবিদ্যা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।[১২০]

৭. **রাজনৈতিক সংগঠন :** আবার প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠনও থাকত। তবে আদিম আধুনিক সমাজের ন্যায় রাষ্ট্রীয় সংগঠন জন্ম নিতে পারেনি। এখানে গোষ্ঠীই প্রধান। উপজাতি প্রধান বয়স্কদের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি একাধারে নেতা, ধর্মযাজক, শ্যামন ও যাদুকর। উপজাতীয় নেতার মধ্যে 'মনা' শক্তি নিহিত রয়েছে বলে সেই নেতৃত্ব দিবে এটাই উপজাতীয়দের বিশ্বাস।[১২১] উপজাতি কোন যুদ্ধে পরাজিত হলে উপজাতীয়রা মনে করত যে তাদের নেতার মধ্যে 'মনা' শক্তি আর নেই। অতএব নেতৃত্ব অর্জনে 'মনা' শক্তির অধিকারী হওয়াটা একটা বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত ছিল। উপজাতীয়দের বিশ্বাস নেতারা প্রায়ই বংশ পরম্পরায় এ শক্তির অধিকারী হত। তবে আদিম সমাজে রাজনৈতিক সংগঠন একেবারে ছিল না এটা বলা চলে না। নিম্নমানের হলেও এক ধরনের রাজনৈতিক সংগঠন এ সমাজে ছিল বলে লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণত আজটেকের উপজাতীয় পরিষদের কথা বলা যায়। এই পরিষদ সাধারণত বিশজন গোষ্ঠী প্রধান নিয়ে গঠিত ছিল। তাদের প্রত্যেককে 'বক্তা' বলা হত। এ পরিষদ যুদ্ধ, শান্তি, বিচারকার্য ইত্যাদি পরিচালনা করত। আদিম অধিবাসীদের মধ্যে রাজতন্ত্রের ধারণাই প্রবল ছিল। তবে এ রাজতন্ত্র ছিল উদারপন্থী।

৮. **চিত্রকলা :** আদিম অধিবাসীদের চিত্রকলা ছিল বিচিত্রময়। তাদের কিছু কিছু চিত্র এমনভাবে আঁকা যে তা খুবই জটিল ও অনেকটা বিমূর্ত বলা যায়। এতে স্বাভাবিক ও প্রাত্যহিক জীবনের যেমন প্রতিফলন ঘটেছে; ঠিক তদ্রুপ মানসিক ধ্যান-ধারণার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। বুশম্যানদের চিত্র অঙ্কনেও তা লক্ষ্যনীয়। এসব চিত্রকলায় তাদের শিকারী জীবন ফুটে উঠেছে। এতে তীর, ধনুক ও শিকারী প্রাণীর ছবি আঁকা হয়।[১২২] ধর্মীয় এবং যাদুবিদ্যার বিশ্বাসকেও চিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়। এর সাহায্যে লেখার কাজও চালিয়ে নেয়া হয়। কোন বিশেষ বস্তু বা বিষয়কে বুঝাতে তারা বিশেষ কোন প্রতীক ব্যবহার করত।

৯. **পোশাক ও গহনাপত্র :** আদিম সমাজের মানুষেরা সৌন্দর্যপ্রিয় ছিল। তারা শীত নিবারণের জন্যই যে পোশাক পরিধান করত তা নয়, সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবেও পোশাক ও গহনাপত্র ব্যবহার করত। পোশাকের মধ্যেই তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রকাশ পেত। তাছাড়া ধর্মীয় উৎসব ও যাদুবিদ্যার জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যেত। প্রকৃতি ও প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষা, সাজসজ্জা, ব্যক্তিগত রুচির পরিচয় দান, সামাজিক আনুষ্ঠানিকতা পালন এবং সামাজিক পদমর্যাদা প্রদর্শন ইত্যাদি ছিল পোশাক ও গহনা ব্যবহারের উদ্দেশ্য।

১০. **সামাজিক শ্রেণি ও পদমর্যাদা :** বর্তমান সমাজে যেভাবে শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে ঠিক সেভাবে আদিম সমাজে শ্রেণিবিন্যাস ছিল না। হোবেলের মতে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ অর্থনীতিভিত্তিক সমাজের দুই-তৃতীয়াংশ শ্রেণিহীন ছিল। আদিম সমাজে স্ত্রী-

১২০. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫
১২১. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
১২২. এ.এফ. ইমান আলি, *সমাজতত্ত্ব*(রাজশাহী : সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯৩), পৃ. ১৭৭-১৮০

পুরুষ ভেদ, বয়স ও ব্যক্তির কর্মনিপুনতার উপর সামাজিক মর্যাদা নির্ভর করে। জন্ম ও বংশগত পরিচয়কেও বড় করে দেখা হত।[১২৩]

১১. **আইন ও সামাজিক বিধি-বিধান :** আদিম সমাজে আচরণ বিধি এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণে প্রথা ও ঐতিহ্যের মূল্য অপরিসীম। সমাজের রাজনৈতিক সংগঠন থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই অপরাধ বলতে কি বুঝায় তা প্রায় জানা ছিল না। এ সমাজে ব্যক্তিগত পর্যায়ের পারস্পরিক শত্রুতা সহ্য করা হত না। সামাজিক বিধি-নিষেধ বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রকার ছিল। আদিম সমাজে কোনো লিখিত চুক্তি আইন ছিল না বলেই প্রথা ও আচরণ বিধি দ্বারা কাজ বা ঘটনার মূল্যায়ন করা হত।[১২৪]

১২. **প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার :** আদিম সমাজে কিছু অদ্ভুত বিশ্বাস লক্ষ্য করা যেত। যেমন– বাংলাদেশের মুরং উপজাতিদের কেউ মারা গেলে একটি কুকুর মেরে ফেলা হত। তাদের বিশ্বাস পার্থিব জীবনে কুকুরটি যেমন তাকে সাহায্য করেছে, মৃত্যুর পরও কুকুরটি তেমনি তাকে সাহায্য করবে। কোন কাজের শুভাশুভ পরিণতি কি হবে তা দেখতে তারা দু'টি কড়ি হাতের মুঠোয় নিয়ে ঝাঁকি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিত। একটির পিঠ ও অন্যটির বুক যদি এক সঙ্গে পড়ত তবে তারা বুঝত ফল শুভ। আর উভয় কড়ির বুক বা পিঠ এক সঙ্গে পড়লে ফল অশুভ হবে বলে মনে করা হত।[১২৫]

১৩. **অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :** আদিম সমাজে নানাভাবে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হত। যেমন কুকীদের মধ্যে মৃতদেহকে কয়েকদিন পর্যন্ত বাড়িতে রেখে দিয়ে পরে তা সমাহিত করা হত। কবর দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত গ্রামবাসী মৃত ব্যক্তির বাড়ির সকলের জন্য খাবার সরবরাহ করত। কোন যোদ্ধার মৃত্যু হলে তার কপালে বর্ণনা দিয়ে একটি ক্ষত চিহ্ন এঁকে দেয়া হত। তাদের বিশ্বাস পরজগতে উক্ত চিহ্ন তাকে যোদ্ধা বলে পরিচিত করবে এবং সেখানে সে যথাযথ সম্মান পাবে। কোন কোন সমাজে মৃত ব্যক্তির কবরে তার ব্যবহৃত তীর, ধনুক, হাতিয়ার ইত্যাদি রেখে দিয়ে তাকে মাটি দেয়া হত।[১২৬] তার শিকারকৃত সকল প্রাণীর মাথার হাড়গুলোও কবরে রাখা হত। গারোরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে একটি পাঁঠা বলি দেয়। পাঁঠার আত্মা মৃত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে এটা ছিল তাদের বিশ্বাস। শবদাহ শেষে ছাই ও হাড় কুড়িয়ে মাটির পাত্রে ভরে কিছুদিন ঘরে রেখে পরে আনুষ্ঠানিকভাবে তা মাটিতে পুঁতে ফেলা হত।

আদিম সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে তার সকল পর্যায়গুলো উপস্থাপন করা হলো। এ সকল বৈশিষ্ট্যধারী সমাজকেই আদিম সমাজ হিসেবে গণ্য করা হয়। সমাজ বিবর্তনের প্রথম পর্যায়েই আদিম সমাজ হিসেবে ধরা হয়। এ সমাজের অবস্থা ছিল বড়ই নাজুক। খাদ্য সংগ্রহের মধ্যেই ছিল তাদের জীবন সীমাবদ্ধ। বিচিত্র ছিল তাদের জীবন। চারপাশের অবস্থার সাথে সংগ্রাম করেই তাদেরকে টিকে থাকতে হয়েছে।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজ : আদিম সমাজের প্রারম্ভেই লক্ষ্য করা যায় শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজ। এ সমাজের ভিত গড়ে উঠেছিল বিশেষ করে শিকার এবং খাদ্য সংগ্রহের

---

১২৩. এ.এফ. ইমান আলি, *সমাজতত্ত্ব*, পৃ. প্রাগুক্ত, ৭৬-৭৭
১২৪. আবদুল হালিম, *পৃথিবীর ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪
১২৫. সম্পাদনা পরিষদ, *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১২৬. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

উপর। অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেগুলোকে জীবন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করার মত তখন তাদের জ্ঞান ছিল না।[১২৭] প্রকৃতির উপর নির্ভর করেই তারা জীবন ধারণ করত। এ সমাজের মানুষও ছিল অপেক্ষাকৃত কম এবং তাদের চাহিদাও ছিল কম। সে কারণেই তারা অধিক উৎপাদন ও সঞ্চয়ের প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে অজ্ঞতাই তাদের জীবন উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় ছিল। জীবনের অস্তিত্বের প্রাতমিক পর্যায়ে পৃথিবী নামক গ্রহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে যে সকল সমাজের অবস্থান ছিল তা ছিল শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজ। এ সমাজে ত্রিশ থেকে চল্লিশের অধিক লোক বাস করত না। শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারীদের জীবিকার অবলম্বন ছিল পশু শিকার, মৎস্য শিকার এবং বনের উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত অন্যান্য খাদ্য। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সংস্কৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন– আফ্রিকার শুষ্ক অঞ্চল, ব্রাজিলের জঙ্গল এবং নিউগিনিতে।[১২৮] পশ্চিমা সংস্কৃতির আগ্রাসনে অধিকাংশ শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে। আবার অনেকাংশে আধুনিক সংস্কৃতির সাথে মিশে গেছে। তবে অনেক দিন যাবত শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। বর্তমান পৃথিবীর ০.০০১ শতাংশ লোক এখনও শিকার ও সংগ্রহ সমাজের অনুসারী।

বৃহত্তর সমাজ বিশেষ করে আধুনিক সমাজ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ সমাজের সামান্যই অসমতা পরিলক্ষিত হয়। শিকারের জন্য হাতিয়ার নির্মাণের বস্তুগত সামগ্রী, মাটি খনন ও ঘরবাড়ি নির্মাণ যন্ত্রপাতি, জাল ও রান্নাবান্নার বাসনপত্রের ব্যবস্থা ছিল খুবই সীমিত। বস্তুগত অধিকারের ভিত্তিতে সমাজের সদস্যদের খুব কমই পার্থক্য ছিল। ধনী ও গরিব বলে কোন পার্থক্য ছিল না। বয়স এবং লিঙ্গ ভেদে মানুষের অবস্থানের পার্থক্য ছিল সীমিত। পুরুষের কাজ ছিল শিকার করা আর নারীদের কাজ ছিল বন-জঙ্গল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা। তাছাড়াও নারীরা রান্নার কাজ ও শিশুদের দেখাশুনার কাজে ন্যস্ত ছিল। নারী ও পুরুষদের মধ্যে শ্রম বিভাজন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষেরা জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করত, এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দিত। সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ, বৃদ্ধ এবং দক্ষ ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কাজে তাদের মতামত উপস্থাপন করত।[১২৯] কিন্তু সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে সম্পদের দিক থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সমাজে ক্ষমতার ভেদাভেদ খুব কমই ছিল। শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রহ সমাজে অংশ গ্রহণমূলকভাবে তাদের কাজ পরিচালিত হত। প্রয়োজন এবং অভাব-অনটনের সময় সকল বয়স্ক ব্যক্তি একত্রিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দেখা যায়।

শিকারীরা এবং খাদ্য সংগ্রহকারীরা কখনও অনিয়মিতভাবে চলাফেরা করত না। অধিকাংশ দলের ভ্রমণ করার জন্য নির্দিষ্ট এলাকা থাকত এবং তাকে ঘিরেই বছর বছর তারা স্থানান্তর গমন করে। অনেক শিকারী এবং খাদ্য সংগ্রহকারীর স্থায়ী সদস্য পদ ছিল না। লোকেরা এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে তাদের পরিসীমার মধ্যে চলাফেরা করতে পারত। শিকার ও সংগ্রহসমাজের শতশত উদাহরণ দেয়া যায়, তন্মধ্য থেকে একটি জাতির কথা উল্লেখ করা হল– এ জাতির নাম মুবুতি পিগমি। এ সকল জাতি আফ্রিকার জায়ারে এলাকায় বাস করত। মুবুতিদের বাসস্থান ছিল গভীর জঙ্গলে, যেখানে বহিরাগতরা প্রবেশ করতে পারত না। তারা নিজেদের জঙ্গলে বাস করাই মঙ্গল মনে করত এবং আনন্দের সাথে এখানে

১২৭. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 145
১২৮. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১২৯. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 141

বিচরণ করত। সেখানে ছিল পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা, খাদ্যের উপযোগী উদ্ভিদ এবং শিকার করার জন্য প্রচুর প্রাণী। মুবুতিদের বাড়িঘর স্থায়ীভাবে বাস করার উপযোগী ছিল না। তাদের ঘরগুলো ছিল ডালপালার কাঠামোর উপর গাছের পাতার ছাউনি। তারা একই জায়গায় একইভাবে বসবাস করতে পারত না। যখন তারা বাড়িঘর ত্যাগ করে চলে যেত তখন মনে হত পরিত্যাক্ত আবাসভূমি। মুবুতিরা চার অথবা পাঁচটি পরিবার মিলে একটি বন্ধনী তৈরি করত। বন্ধনীর সদস্যদের স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বিবেচিত করা হত।[১৩০] তবে কোন ব্যক্তি বা দলকে অন্য বন্ধনীতে যোগদানের জন্য নিষেধ করা যেত না। কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই কোন বন্ধনী পরিচালনা করত না। কেননা এদের মধ্যে কেউ প্রধান বলে গণ্য হত না। বয়স্ক ব্যক্তিদের একটা দায়িত্ব ছিল পরিবেশ শান্ত রাখা, কলহ এবং ঝগড়া না করা। কেননা পিগমিদের বিশ্বাস ছিল এগুলো করলে বন তাদের জন্য অভিশাপ দিবে। যদি কোন দ্বন্দ্ব জটিল আকার ধারণ করে তবে এক বন্ধনী ত্যাগ করে অন্য বন্ধনীতে যোগ দিত।

শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ যুগের মানুষের প্রযুক্তি বা কলাকৌশল সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে এ সমাজের মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন ছিল খাদ্য সংগ্রহ করা। খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা ধনুক, বর্শা ও প্রস্তর প্রভৃতি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করত। আর মূলত এ সকল আসবাবপত্র এবং হাতিয়ার ছিল তাদের ব্যক্তিগত অধিকারে। তবে সংগৃহীত ফলমূল, সবজি বা শিকার লব্ধ পশুপাখি, মাছ ইত্যাদিতে ব্যক্তিগত মালিকানা তেমন ছিল না।[১৩১] তাদের রীতি ছিল দলবদ্ধভাবে প্রকৃতির দেয়া খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করা। তারা যা সংগ্রহ করত বা শিকার করত তা সকলে মিলে এক সাথে গ্রহণ করত। খাদ্য সংগ্রহের যুগে কোন সময় খাবার না জুটলে তারা এক সঙ্গে অনাহারে থাকত। প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এ অসহায় মানুষেরা দিনের পর দিন অনাহারে দিন যাপন করত। তখন পর্যন্ত কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখার অবস্থা তাদের ছিল না। কখনও আহার আবার কখনও অনাহার, এ ছিল তাদের জীবনের একটি অধ্যায়। তাই তাদের জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে সামাজিক নৃবিজ্ঞানী বলেছেন– 'তাদের জীবনটা ছিল ভুড়িভোজনে আনন্দমুখর কিংবা উপবাসে জর্জরিত।'[১৩২]

অতএব দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় মানুষের কোনো বাসস্থান ছিল না। বনজঙ্গল, পাহাড়ের গুহায় বাস করে এবং বনের পশু-পাখি শিকার করে কাঁচা গোশত ভক্ষণ করত এবং গাছের ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি ছিল তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উপাদান। এ অবস্থায় মানুষ পশুর ন্যায় জীবন যাপন করত। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ ছিল অসহায়। তাই সে সময় তারা মানবেতর জীবনের চেয়ে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। মানুষ যখন শিকারী হয়েছে তখনই সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়েছে। নতুন নতুন হাতিয়ার ও কৌশল আবিষ্কারের ফলে আদিম মানুষের জীবনে যথেষ্ট পরিবর্তন আসে। ক্রমান্বয়ে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রত্যেকটি গোষ্ঠী গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে এক একটি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে শিকার করত। আদিম শিকারীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভিত্তি ছিল সমতা।

আদিম শ্রেণিহীন সমাজের আর্থিক অবস্থা থেকে মানুষের প্রথম সংস্কৃতির উদয় হল ভাষার প্রচলন, শিল্পকলার উৎপত্তি, ম্যাজিক, ধর্মের সূচনা, লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার এগুলো হল সে সংস্কৃতির প্রধান চিহ্ন। এ সবের মাঝেই সেকালের আর্থিক জীবনের ছাপ রয়েছে। শিকারের

---

১৩০. Clive Bell, *Civilization and Old Friends*, ibid, p. 187

১৩১. Joseph Reither, *World History at a Glance*, ibid, p. 244

১৩২. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

সাথে হাত-পায়ের সাহায্যে সংকেত, জন্তুদের ভয় দেখানো বা ভুলানোর জন্য গলার আওয়াজ, হাতিয়ার তৈরি করার কৌশল পরস্পরকে শিখানো এসব ব্যাপারে ভাষার প্রচলন শুরু হয়। মানুষের বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে ভাষাও ক্রমশ উন্নতি লাভ করে। হাতিয়ারের সুন্দর গড়নের মধ্যে মনে হয় শিল্পের জন্ম, গুহাচিত্র অঙ্কনের সময় মানুষ শিকারের ধ্যানে মগ্ন থাকত। প্রকৃতির শক্তির সামনে অসহায় মানুষ অলৌকিক শক্তির সাহায্য চায়। শিকারের সুবিধার জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি শক্তির আরাধনা আরম্ভ করে। মানব জীবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ মানুষকে তার সংস্কৃতির নিজস্ব গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ রেখেছে।[১৩৩] কিন্তু মানুষের জীবিকা অন্বেষণ ও খাদ্য আহরণের প্রচেষ্টায় দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত করতে হয়েছে। বর্তমান সভ্য জগতের অন্তরালে এখনও যে খাদ্য আহার্য অবস্থায় জনজীবনের নিজস্ব পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়ে আছে তা বস্তুত পরিবেশগত কারণে।

উদ্যান সমাজ : উদ্যান সমাজের অস্তিত্ব প্রথমত লক্ষ্য করা যায় প্রায় ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মধ্য প্রাচ্যে। পরবর্তীতে ইহা বিস্তার লাভ করে চীন ও ইউরোপে। এ সমাজ এখনও টিকে আছে আফ্রিকার উপসাহরানে। সাধারণভাবে উদ্যান সমাজ বলতে সে সমাজকে বুঝায় যে সমাজে ধাতু নির্মিত হাতিয়ার বা লাঙ্গল ছাড়া উদ্ভিদ ও বাগানের চাষ করা হত। আরও অগ্রসর হয়ে উদ্যান সমাজে ধাতু নির্মিত অস্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। কিন্তু তখনও মাটি চাষের জন্য লাঙ্গলের ব্যবহার শুরু হয়নি। শিকার ও সংগ্রহ সমাজের মত উদ্যান সমাজও জীবিকা নির্বাহের উপায়। মানুষ নির্ভর করত লম্বা হাতলযুক্ত কোদাল এবং হস্ত শক্তির উপর তা প্রকৃতই উৎপাদনমুখী কৃষির জন্য যথেষ্ট ছিল না। সাধারণ উদ্যান সমাজের রাজনৈতিক কাঠামো দু'টি স্তরের অধিক কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল না।[১৩৪] কিন্তু আরও অগ্রসরমান সমাজে ক্ষমতা কাঠামো চার-এর অধিক স্তরে বিভক্ত ছিল। তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল খুবই কেন্দ্রীভূত। কিন্তু তারা খুব জটিল আত্মীয়তার সম্পর্কের অধকারী ছিল। অনেক সময় তারা তাদের বিবাহের রীতির ফলে বহুগোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

পশুপালন সমাজ : প্রায় বিশ হাজার বছর পূর্বে শিকারী এবং সংগ্রহকারী গোষ্ঠী তাদের গৃহপালিত পশুকে পোষ মানাতে শিখে এবং কৃষি কাজে ব্যবহার করে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে। শিকারী জীবনের কোন কোন সময়ে শিকারীদের হাতে কতক পশু জীবন্ত ধরা পড়ত। তখন আবশ্যকীয় খাদ্যের যোগান থাকলে ঐ পশুগুলোকে বেঁধে রাখত। যেদিন শিকার জুটত না সেদিন প্রয়োজনবোধে ধৃত পশুগুলোকে বধ করে তার গোশত ভক্ষণ করত। খাদ্যের অভাব না হলে ঐরূপ পশুগুলোকে লালনপালনের মাধ্যমে পোষ মানানো হত।[১৩৫] আবার অনেক ক্ষেত্রে পশুগুলোও মানুষের আস্তানার আশেপাশে থেকে যেত শিকারীদের দেয়া খাবারের আশায়। এভাবে বনের পশু মানুষের পোষ মেনেছে এবং ব্যবহারের উপযোগী হয়েছে। গড়ে উঠেছে পশুপালন সমাজ।

অনেক পশুপালন সমাজ এখনও আধুনিক পৃথিবীতে বিরাজ করছে। প্রধানত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় এ ধরনের সমাজ পরিদৃষ্ট হয়। সাধারণত পশুপালন সমাজ গড়ে উঠে সেই সব এলাকায় যেখানে পশুকে খাওয়ানোর জন্য প্রচুর ঘাস পাওয়া যেত; মরুভূমি অথবা পাহাড়ের পাদদেশে। মানুষ দেখল যে, দু'চারটি পশু এরূপ মওজুদ রাখতে পারলে তাদের আর খাদ্যের অনিশ্চয়তা থাকে না, তখন ঐ জাতীয় পশুদের আর সহজে বধ না করে

---

১৩৩. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 313
১৩৪. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৩৫. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 314

প্রতিপালন করতে লাগল। তাতে দেখা গেল যে, সে সময়ে এরা বাচ্চা প্রসব করার ফলে পালের পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। উপরন্তু এদের দুগ্ধও ব্যবহার করা চলে। অবস্থা যখন এরূপ হল, তখন দলের সকলেই বের না হয়ে কেউ কেউ পালিত পশুর তত্ত্বাবধানে রাখালরূপে থাকতে লাগল। এভাবে পশুপালনের সূত্রপাত ঘটে। যে সকল পশুকে পোষ মানানো হত তাদের মধ্যে ছিল গরু, ভেড়া, ছাগল, উট এবং ঘোড়া অন্যতম। নৃবিজ্ঞানীদের মতে প্রথম পালিত পশু ছিল বুনো ভেড়া ও বুনো ষাঁড়। জানা যায়, ফায়ুম বাসীরা গরু, ভেড়া ও শূকর পালন করত।[১৩৬] অনেক নৃবিজ্ঞানীর ধারণা, ফায়ুমবাসীরাই পৃথিবীর প্রথম পশুপালক। কুকুর মানুষের পোষ মেনেছিল পশু-পাখির হাড় ও তাজা রক্তের লোভে। কুকুর মানুষের আস্তানার কাছে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করত। শিকারীরা এদের কিঞ্চিত সহানুভুতি দেখানোর ফলে এরা শিকারীদের অনুগত ও সহচররূপে গণ্য হয়েছিল।

পশুপালন যুগে মানুষ পশুপালনের মাধ্যমে নিজের খাদ্যের একটা ব্যবস্থা আয়ত্ব করে নেয়ার পর পশুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। ভেড়া ও গবাদি পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে, প্রতি বছর এদের দুধ ও গোশত খাওয়ার পরও এদের সংখ্যা বাড়ে ছাড়া কমে না। এ ছাড়া পশুর চামড়া ও পশম দ্বারা বস্ত্র ও তাবু তৈরি হল। কিন্তু পশুর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পেতে থাকল, তখন তাদের সমস্যা হলো শত শত পশুর খাদ্য যোগানের।[১৩৭] কিন্তু স্থায়ী আস্তানায় থেকে শত শত পশুর খাদ্য যোগানো ছিল অসম্ভব। কাজেই তারা তৃণভূমির সন্ধানে পশুপাল নিয়ে এক আস্তানা ত্যাগ করে অন্য আস্তানায় চলে যেতে বাধ্য হয়। সেখানকার তৃণাদি নিঃশেষ হলে আবার অন্যত্র তৃণভূমির খোঁজে বের হত। সেকালের পশু পালনরত ভ্রাম্যমান আদিম মানব গোষ্ঠীই পরবর্তীতে যাযাবর জাতি হিসেবে পশুচারণ সমাজের ভিত গঠন করে। শিকার ও সংগ্রহ যুগের মানুষের মত এ যুগের মানুষ বস্তুতান্ত্রিক সম্পদের প্রতি তেমন আকৃষ্ট ছিল না। কেননা তাদের প্রধান চিন্তা ছিল তাদের গৃহপালিত পশুদের খাদ্য যোগান দেয়া।[১৩৮] কেননা পশুদের জন্য সব সময়ই খাদ্য সরবরাহ করা লাগত। পশুপালন সমাজ শিকার ও সংগ্রহ সমাজ থেকে অনেক বড় ছিল। অনেক পশুপালন সমাজের লোক সংখ্যা ছিল আড়াই লক্ষ বা ততোধিক।

পশুপালন সমাজের মানুষেরা একটা ব্যাপক এলাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াত। অনেক সময় এক দল অন্য দলের সাথে মিশে যেত। মাঝে মধ্যে তারা ব্যবসায় মনোনিবেশ করত। পশুপালন সমাজ ছিল শান্তিপ্রিয়। তারা শুধু চিন্তা করত তাদের খাদ্যের। তাছাড়া তারা তাদের সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি এবং অনুষ্ঠানাদি যথাযথ মেনে চলত। এদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিল যুদ্ধপ্রিয়। তারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে তৃণভূমি দখল করে নিত। শিকার ও সংগ্রহ সমাজের মানুষের চেয়ে পশুপালন সমাজের মানুষের মধ্যে সম্পদ ও ক্ষমতার ক্ষেত্রে বেশ পার্থক্য ছিল। দলনেতা এবং যুদ্ধনেতার হাতে পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত ক্ষমতা থাকত। পশুচারণ সমাজ সম্পর্কে একটি উৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন ই.ই. ইভানস প্রিচার্ড (১৯৪০)। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ সুদানের নুয়ের নামক একটি গোত্রের উপর অধ্যয়ন করেন। নুয়ের জাতির উত্থান হয় গরু পালনের মাধ্যমে। তাছাড়া তারা কিছু কিছু শস্যও উৎপাদন করত। এই লোকেরা গ্রামে বসবাস করত। আর গ্রামগুলো পাঁচ থেকে বিশ মাইল দূরে দূরে অবস্থিত ছিল। ১৯৩০ সালে ইভানস প্রিচার্ড তার গবেষণা কর্ম পরিচালনা করেন। তিনি বলেন, সে

১৩৬. T.W. Wall Bank and M.A. Taylor, *Civilization : Past and Present*, ibid, p. 387
১৩৭. Edward McNall Burns & Philip Lee Ralph, *World Civilizations*, ibid, p. 142
১৩৮. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

সময়ে নুয়েরদের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দুই লক্ষ জন। তারা সকলে একই ভাষায় কথা বলত এবং একই রীতিনীতি মান্য করত। তাদের কোন কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সংগঠন বা কোন প্রকারের সরকার ব্যবস্থা ছিল না। নুয়েরেরা বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ছিল, যারা সময় সময় একই সঙ্গে কাজ করত; কিন্তু অধিকাংশরাই পৃথকভাবে বাস করত। প্রত্যেক উপজাতির জন্য নিজস্ব এলাকা থাকত, পানি সরবরাহের সুবিধার্থে এ সকল এলাকা ভাগ করা হত। নুয়েরদের জন্য একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিশ্চিত করা ছিল না। তাই যতদূর সম্ভব তারা তাদের পশুদেরকে ঘাস খাওয়াতে পারত। বছরের শুষ্ক মৌসুমে তারা পানির নিকটস্থ তাদের তাবু গাড়ত। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তারা তাদের গরু-বাছুরের সাথেই কাটাত। বিভিন্নভাবে তাদের সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। তারা তাদের প্রতিবেশি যাদে গরু-বাছুর থাকত না তাদেরকে ঘৃনার চোখে দেখত।[১৩৯] যাদের জীবনের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে যেমন– জন্ম, বয়স প্রাপ্ত হওয়া, বিবাহ এবং মৃত্যুতে তাদের গরু সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান পালন করত। অনেক সময় যে গাভী প্রিয় এবং দুধ দেয়, তার নামানুসারে ষাঁড়দের ও নারীদের নামকরণ করা হত।

কৃষি সমাজ : কৃষিকে কেন্দ্র করে মানবসমাজে যে অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় কৃষি সমাজ। কৃষি সমাজের মূলকথা হল কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি।[১৪০] মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষিকার্য ও কৃষি সভ্যতার সূচনা হয়েছে খাদ্য আহরণ ও পশুপালন যুগের পরবর্তী পর্যায়ে। কৃষি সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে। এ সময় নতুন এক অর্থনৈতিক কাঠামো বিকশিত হয়। সমকালীন অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হয়ে পড়ে। এই অর্থনীতির সুবাদে নির্দিষ্ট অঞ্চলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।[১৪১] নির্দিষ্ট অঞ্চলে মানুষ স্থায়ীভাবে বসবাসসূত্রে এই সময় জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে। এই সময় নতুন নতুন গ্রাম ও জনপদ গড়ে উঠতে থাকে। ফলে মানবসমাজে নতুন ধরনের সামাজিক সংগঠন গড়ে উঠে এবং সমাজের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ও অভাব অনুভুত হয়।

একটি উপমা হিসাবে এখানে নিউগিনির গুরুরুম্বা উপজাতির কথা তুলে ধরা যায়। সেখানে প্রত্যেক গ্রামে অনেকগুলো করে বাগান ছিল। বেড়ার সাহায্যে একে অপরের জমিকে পৃথক করে রাখা হত। প্রত্যেকটি পরিবার তাদের নিজ ভূমি খণ্ড নিজ নিজ বেড়ার সাহায্যে পৃথক করে রাখত। সকল প্রকারের বয়স্ক এবং শিশুরা ভূমি খণ্ডের পরিচর্যার কাজে জড়িত থাকত। যদিও পুরুষ ও নারীদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন প্রকারের ফল এবং শাক-সবজি সংগ্রহের কাজ করা। প্রত্যেক পরিবারে একাধিক ভূমিতে বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের চাষ হত। এমনিভাবে সারা বছরের খাদ্য সংগ্রহ করা হত।[১৪২] সম্প্রদায়ের সম্মান রক্ষার জন্য গুরুরুম্বা সংস্কৃতির লোকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারের মধ্যে উপহার আদান-প্রদান করত। যে সব লোকের বাগান ছিল তারা প্রতিদিন বাগান থেকে আবশ্যকীয় খাদ্য সরবরাহ করত এবং তারা অন্যান্য যে সব ভূমিতে চাষাবাদ করত তাতে উৎপাদন করত 'প্রেস্টিজ ক্রোপস'। আর এই 'প্রেস্টিজ ক্রোপস' সাধারণ প্রয়োজনের জন্য ব্যবহার করা হত। গুরুরুম্বা জনগোষ্ঠী শূকর ছানা পালন করত, শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য নয়; সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার্থে পুরস্কার দেয়ার জন্য। প্রায় প্রতি বছর একটা বিরাট আকারের শূকর হত্যা করা হত এবং রান্না করে উপহার হিসেবে বিলি করা হত। পশুচারণ গোষ্ঠীর মত গুরুরুম্বা গোষ্ঠীতেও

---

১৩৯. Clive Bell, *Civilization and Old Friends*, ibid, p. 188
১৪০. Joseph Reither, *World History at a Glance*, ibid, p. 246
১৪১. আলহাজ্ব মোঃ আসাদুজ্জামান, *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
১৪২. James E Swain, *A History of World Civilization*, ibid, p. 314

শিকার ও সংগ্রহ সমাজ থেকে মানুষের মধ্যে অনেক অসমতা বিরাজ করত। গোত্র প্রধান এবং উপজাতীয় নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। বস্তুগত ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হত।[১৪৩]

সনাতন সমাজ : সমাজবিজ্ঞানে সনাতন সমাজ বলতে এমন একটি সমাজকে বুঝায় যা ভবিষ্যতের চেয়ে অতীতের সাথে সম্পৃক্ত বেশি, যেখানে কৃষ্টি ও প্রথার ভূমিকা অন্যান্য সকল প্রপঞ্চের চেয়ে বেশি। সনাতন বলতে সাধারণত এমন সকল সমাজ ও সমাজের উপাদানকে বুঝায় যেগুলো ক্ষুদ্র পরিধির হয়ে থাকে যার উৎস হচ্ছে আদি ও সনাতন সাংস্কৃতিক চর্চা।[১৪৪]

এ সকল সমাজে ব্যবসা ও পরিবারের মতে বেশি পার্থক্য চিহ্নিত করা যায় না, এখানে শ্রমের বিতরণ হয় প্রধানত বয়স, লিঙ্গ ও মর্যাদাভেদে।[১৪৫]

(ক) সনাতন বনাম আধুনিক : সনাতন সমাজগুলোর বৈশিষ্ট্য বরাবরই আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের বিপরীত। ডুরখেইম ও পিয়ের বর্দোর সম্প্রদায় বনাম সমাজ অথবা যান্ত্রিক বনাম জৈবিক ঐক্যের মতবাদগুলোতে এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।[১৪৬] পক্ষান্তরে ক্লদ, লেভিড স্ট্রস মনে করেন যে, সনাতন সমাজ হচ্ছে এমন কিছু শীতল সমাজ যেখানে বৈধতার সামাজিক ধারণা চিহ্নিত করতে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হয়েছে।[১৪৭]

তবে যাই হোক না কেন বর্তমানের সামাজিক বিবর্তনের আলোকে সনাতন ও আধুনিক শিল্পোন্নত সমাজের মধ্যে যে পার্থক্যগুলো করা হচ্ছে সেগুলো খুবই সাদামাটা প্রকৃতির। এখানে যে মেরুকরণগুলো উল্লেখযোগ্য সেগুলো হচ্ছে জীবিকা বনাম প্রবৃদ্ধি, মুখোমুখি বনাম নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বনাম প্রাতিষ্ঠানিক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, সামষ্টিক মালিকানা বনাম ব্যক্তিগত মারিকানা। এ যাবত যে গবেষণাগুলো করা হয়েছে তাতে সনাতন সমাজের সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের উপর জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া অনেকেই এটিকে আধুনিকতার বিকল্প হিসেবেও দেখছেন।[১৪৮]

(খ) আচার্যপর্ব : সনাতন সমাজগুলো কঠোরভাবে বিভিন্ন আচারপর্ব যজ্ঞের মাধ্যমে নিজের সামষ্টিক স্মৃতিগুলো জীবিত রাখার চেষ্টা করে। এখানকার সমাজপতিরা সবসময় সাম্প্রদায়িক চর্চাগুলো বিরাজমান রাখার জন্য সক্রিয় ও সচেতন থাকে।[১৪৯] ব্যবহারিক মতবাদ অনুযায়ী বলা যায় আচার পর্বের চর্চাও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিলেও চলমান অবস্থা থেকে কোন সনাতন সমাজ এখনও বিচ্যুত হয়নি।

(গ) বৈচিত্র : ফ্রাডরিক জেমিসন লক্ষ্য করেন যে, বিংশ শতাব্দীর আধুনিকায়ন বর্তমানে দুই ধরনের সনাতন সমাজের উপস্থিতি দেখে আসছে। একটি হচ্ছে গোত্রীয়, যেমন– আফ্রিকা অপরটি হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির যেমন– চীন ও ভারত। তবে এটিও লক্ষ্য রাখা দরকার যে, ইতিপূর্বে এর চেয়েও অনেক বেশি বৈচিত্র্য সনাতন সমাজগুলোতে বিরাজ করছিল। মানব অস্তিত্ত্বের ক্ষেত্রে প্রথমে শিকার সংগ্রহকেন্দ্রিক গোত্র আকারে প্রথমবারের মত সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ধরনের যাযাবর প্রকৃতির সমাজের অস্তিত্ব এখনও

---

১৪৩. সম্পাদনা বোর্ড, *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

১৪৪. S. Langlois, Traditions : Social, In : Beil J. Smelser and Paul B. Baltes, Editor(s)-in-Chief, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*(Oxford : Pergamon, 2001), pp. 15829-15833

১৪৫. S. Langlois, Traditions : Social, In : Beil J. Smelser and Paul B. Baltes, Editor(s)-in-Chief, *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, ibid, pp. 15829-15833

১৪৬. Michael James Grenfell, *Pierre Bourdieu : Agent Provocateur*(Ulster : Continuum, 2005), pp. 44

১৪৭. Claude Levi-Strauss, *The Savage Mind*(Chicago : The University of Chicago Press, 1966), pp. 233-236

১৪৮. John R. Half, *Sociology on Culture*(London : Routledge, 2003), pp. 71-74

১৪৯. Ulrich Beck, *Reflexive Modernisation*(California : Stanford University Press,), pp. 63-65

অস্ট্রেলিয়াতে দেখতে পাওয়া যায়।[১৫০] তাছাড়া বিভিন্ন দেয়াল কর্ম, গান, পৌরানিক কাহিনী এবং আচারপর্বেও এগুলোর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।[১৫১] এ সকল বিষয়ের মধ্যে যে জিনিসটি জোরালোভাবে লক্ষ্য করা যায় সেটি হচ্ছে পূর্বপুরুষ ও তাদের প্রথার সাথে বিরাজমান সম্পর্ক যা ভবিষ্যতেও বজায় থাকবে বলে জোরালো অনুমান করা যায়।[১৫২]

প্রায় ১০ হাজার বছর আগে যখন মানব সমাজে কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তখনই কৃষি সমাজ গড়ে উঠে। এতে করে পৃথিবীতে দুই ধরনের সমাজ দেখতে পাওয়া যায়, একটি হচ্ছে বেদুইন কিংবা যাযাবর সমাজ অপরটি হচ্ছে কৃষি সমাজ। তবে পূর্ব পুরুষদের আচারপর্ব এবং সনাতন পদ্ধতির সাথে কৃষি সমাজের সম্পৃক্ততা ছিল যাযাবর সমাজের তুলনায় অনেক বেশি।[১৫৩] কৃষি সমাজে এখনও বৃহত্তর পরিধির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এমনকি গ্রিক সমাজেও শক্তিশালী আত্মীয়তার বন্ধন, নির্ধারিত পদমর্যাদা এবং সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রত্যাশার জোরালো উপস্থিতি ছিল। এগুলোর প্রতিফলন তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ও উৎসবে দেখতে পাওয়া যায়। এম. আই. ফিনলে এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘Still recreated for their audiences the unbroken web of all life, stretehing back over generations of men to the god.’[১৫৪] অর্থাৎ, ‘জীবনের অবিচ্ছেদ্য বুননে আমরা সনাতন পদ্ধতির প্রতিফলন দেখতে পাই। এই পদ্ধতিগুলো অনেক পূর্বপুরুষদের ধারা ও ঈশ্বরের সাথে সম্পৃক্ত।’[১৫৫]

বর্তমানে সনাতন সমাজগুলোতে আরও বৃহত্তর পরিধিতে সামাজিক ও গণজীবনে ভারসাম্য এসেছে বলে মনে করা হয়।[১৫৬] মধ্যযুগীয় ইউরোপেও স্বাধীন কৃষি সমাজের অস্তিত্ব ছিল যা বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অনেকটাই স্থানীয়। এখানে আইনের পরিবর্তে কৃষ্টি ও প্রথার আধিপত্য ছিল তাই সংস্কৃতি ততটা গতিশীল ছিল না। এই সমাজে প্রাচীন কর্তৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল অসীম। অভিজ্ঞতা, প্রচলিত ব্যবহার এবং আইনের পরিবর্তে প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার কেন্দ্রবিন্দু।[১৫৭]

(ঘ) আলোকিত যুগ এবং সনাতন পরবর্তী পরিস্থিতি : ইউরোপে যখন আলোকিত যুগের আবির্ভাব ঘটে তখন প্রথমেই সনাতন সমাজের ধ্যান-ধারণাকে পাল্টে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রচেষ্টা থেকেই বিভিন্ন ধরনের বিপরীতমুখী প্রপঞ্চের আবির্ভাব হয় যেমন– গ্রামীণ, পাদসোপান সম্পন্ন, প্রথাগত, পদমর্যাদাগত। এর বিপরীতে ছিল নাগরিক, সাম্যবাদী, প্রগতিবাদী, ঠিকাদারি। আধুনিকতা ও আধুনিকতাবাদ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জর মাধ্যমে সহজেই সনাতন সমাজের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

তবুও জেমিসন উত্তর আধুনিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, উত্তর আধুনিকতা হচ্ছে বিশ্বায়ন যা সনাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলোকে মিটিয়ে দিয়ে একমুখী অস্থায়ী প্রকৃতির সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এখন আর অতীত ও আধুনিকতার সহাবস্থান নিয়ে চিন্তা না করলেই চলে।[১৫৮]

(ঙ) ইন্টারনেট : গবেষকগণ লক্ষ্য করেছেন যে, বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম ইন্টারনেট নতুন করে সনাতন সংস্কৃতিগুলোকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছে।[১৫৯] তবে

---

১৫০. Michael Hardt, *The Jameson Reader*(Oxford : Blackwell Publishers, 2005), p. 319
১৫১. David Attenborough, *Life on Earth*(Nodia : Harper Collins Publishers, 1992), p. 304
১৫২. Emile Durkheim, *The Elimentary Forms of the Religious Life*(Oxford : Oxford University Press, 1971), pp. 276-280
১৫৩. Max Weber, *The Sociology of Religion*(New York : Beacon Press, 1971), p. 81
১৫৪. M.I. Finley, *The World of Odysseus*(New York : NYRB Classics, 1967), pp. 89, 133-134
১৫৫. J.H. Plumb, *The Death of the Past*(London : Palgrave MacMillan, 1969), pp. 24-25
১৫৬. J.Boardman, *The Oxford History of the Classical World*(Oxford : Oxford University Press, 1991), p. 232
১৫৭. J.H. Hexter, *On Historians*(Harvard : Harvard University Press, 1979), pp. 269-271
১৫৮. Michael Hardt, *The Jameson Reader*, ibid, pp. 240-244

সনাতন পদ্ধতির সাথে উত্তর আধুনিক পদ্ধতির গরমিল হচ্ছে এটাই যে, এখানে অংশগ্রহণটা হয়ে উঠেছে স্বেচ্ছাসেবামূলক। এখানে বিষয়টা ছিল অনেকটাই আরোপিত। যা নির্দিষ্ট স্থান, সামাজিক শ্রেণি বিন্যাস ও ভূমিকা প্রত্যাশার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[১৬০]

ক্রান্তিকালীন সমাজ : ক্রান্তিকালীন সমাজের ধারণা বলতে সাধারণত ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যৎ বাস্তবতা সম্বন্ধে আগাম চিন্তাধারাকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে যদি তেল ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কথা একসাথে মনে করা হলে হয়ত বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি পরিপ্রেক্ষিত নিয়েই চিন্তাভাবনা করতে হবে। এরপর এই ক্রান্তিকালকে সচল করার উদ্যোগ নিতে হবে। অনুমান করা হচ্ছে ভবিষ্যতে নিম্নোক্ত পরিবর্তনগুলো আবশ্যক হয়ে উঠবে :

- যে আবহাওয়ার উপর মানুষ শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্ভরশীল ছিল সেই স্থিতিশীল আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে যা মানুষের অনুমানের বাইরে চলে যেতে পারে।
- জ্বালানির বিতরণ বিশেষ করে তেল ও গ্যাসের সরবরাহে ব্যাপক পরিবর্তন আসতে পারে। এখন মানুষ পৃথিবীর জ্বালানি মজুদের দ্বিতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে।
- বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। জিনিসপত্রের প্রচুর ও সস্তায় উৎপাদন। জীবাশ্মভিত্তিক জ্বালানির ব্যাপক প্রয়োগ।
- যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছু আবশ্যক পরিবর্তন যা বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে।
- খাদ্য সরবরাহে ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি পানি সরবরাহ, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অন্যান্য বিষয়সমূহের পরিবর্তন।

ক্রান্তিকালীন আন্দোলনের ঘোষণা হচ্ছে এটাই যে, বর্তমানে মানুষ তেলের উপর যতটা নির্ভরশীল তা কমাতে হবে। এটা সম্ভব যদি মানুষ সচেতনতার সাথে জিনিসপত্র সেভাবেই উদ্ভাবন করে। ক্রান্তিকালীন আন্দোলনের মাধ্যমে ক্রান্তিকালীন সমাজ চায় স্বল্প জ্বালানি শক্তির উপর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জ্বালানির ভোগের মাত্রা কমিয়ে দিতে। মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস ও অর্থনৈতিক ধারায় পরিবর্তন আনতে হবে। তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে দিতে হবে। এই সকল আবহাওয়ার সাথে নিজেদের অবস্থানকে ভারসাম্যপূর্ণ করা যাতে কোন নেতিবাচক পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে না হয়। যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম ক্রান্তি শহর গড়ে তোলা হয়। এ ধারণাটি নেয়া হয় রব হকিন্স-এর বই ও ব্লগ থেকে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ১০০টি প্রাতিষ্ঠানিক ক্রান্তি উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও অন্যান্য দেশে নিজস্ব আদি অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছে।

শিল্পসমাজ বা আধুনিক সমাজ : মানবসমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল শিল্পবিপ্লব। শিল্পবিপ্লবই সমাজব্যবস্থার এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব মন্তব্য করেছেন, 'A very important factor in the history society has been the Industrial Revolution which has brought about far-reaching consequences in the structure of societies.'[১৬১] শিল্প-বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পর আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মূলধনের মালিক শ্রেণি এই পরিবর্তিত ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে সংগঠন-উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করে। মূলধন মালিকেরা সমকালীন বাজারের উপর সমীক্ষা সম্পাদনের পর প্রয়োজন অনুযায়ী কলকারখানা গড়ে তুলল। মূলধনের মালিক শ্রেণি বাজার

---

১৫৯. Kate Fox, *Watching the English*(UK : Hodder & Stoughton Ltd, 2004), p. 14

১৬০. Peter Worsley, *The New Modern Sociology Readings*(New York : Penguin Books, 1991), p. 317

১৬১. Vidya Bhushan & D.R.Sachdeva, *An Introduction to Sociology*(New Delhi : SAGE Publications, 2012), p. 751

থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং মজুরির বিনিময়ে শিল্প-শ্রমিক নিয়োগের প্রথা প্রচলন করল। স্বাধীন কারিগররাই শিল্প-শ্রমিক হিসেবে মূলধন-মালিকদের কলকারখানায় যোগ দিল। এই অবস্থায় কারিগররা নিছক শ্রমিকে পরিণত হল। যাবতীয় উৎপাদন-উপাদানের মালিকানা কেন্দ্রভূত হল মূলধন-মালিকদের হাতে। কলকারখানা, হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, উৎপাদিত দ্রব্য প্রভৃতি কোন কিছুরই মালিকানা আর কারিগরদের হাতে থাকল না। এভাবে উৎপাদনের সমগ্র ধারা থেকে কারিগররা বা শ্রমিক শ্রেণি ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। একটি শিল্প সমাজের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে মার্কিন শিল্প সমাজের কথা বলা যায়।

সমাজ বিবর্তনের চরম পর্যায় বা শেষ ধাপ হচ্ছে শিল্প সমাজ, যাকে আধুনিক সমাজও বলা হয়ে থাকে। শিল্প সমাজ মানব জীবনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রেটব্রিটেনে শিল্প সমাজের সৃষ্টি হয়। আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে অগ্রসরমান শিল্প সমাজ উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং পূর্ব-এশিয়া যার অন্তর্গত রয়েছে জাপান, তাইওয়ান, হংকং এবং দক্ষিণ কোরিয়া। তাছাড়াও অন্যান্য আরও দেশ যার মধ্যে রয়েছে ভারত, মেক্সিকো, ব্রাজিল এবং আফ্রিকার কতকগুলো দেশ। এসব দেশগুলোতেও যথেষ্টভাবে শিল্পায়ন হয়েছে। উদ্যান সমাজ থেকে শুরু করে কৃষি সমাজ পর্যন্ত প্রযুক্তি এবং বিভিন্ন শক্তির প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। যার উন্নয়নের ফলশ্রুতিই হচ্ছে শিল্প সমাজ। শিল্প উৎপাদনের পিছনে কাজ করেছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মানুষ এবং প্রাণীর ব্যবহৃত শক্তির পরিবর্তন ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল কয়লা পুড়িয়ে বাষ্পীয় শক্তি, বিদ্যুৎ এবং পরবর্তীতে আণবিক শক্তি যা ব্যবহৃত হচ্ছে কল-কারখানায় আর তারই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে অধিক উৎপাদন। মানুষ পূর্বে যা হাতে করত বা অন্য প্রাণীর সাহায্য নিয়ে জীবন যাপনের উপযোগী উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করেছিল, সেগুলো এখন প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে, আমেরিকায় ও পরে অন্যত্র উৎপাদন ব্যবস্থায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল এর ফলে সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি এ আমূল পরিবর্তনকে শিল্প বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেন। ১৭৬৯ সালে জেমস ওয়াট বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কার করেন। বাষ্পীয় শক্তি আবিষ্কারের পর যন্ত্র যুগের দ্রুত বিকাশ হতে থাকে। এতে যেমন বৃদ্ধি পায় বিধি শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, তেমনি বৃদ্ধি পায় আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ। শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে বণিক শ্রেণি সমাজে একটি বিশেস স্থান অধিকার করে বসল। ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো পুঁজিপতিদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে লাগল। বৃহৎ শিল্পের মালিকানা লাভের সাথে সাথে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ তাদের অধিকারে চলে যায়। সমাজে আসল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যান্ত্রিক উৎপাদন এবং এখানেই শ্রমশিল্প বিপ্লবের সৃষ্টি হয়।[১৬২]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্পায়নের অগ্রযাত্রার ফলে যে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তা ছিল পূর্ববর্তী সমাজ থেকে অনেকাংশে উন্নত। কর্মব্যস্ত মানুষের চাপ প্রতিহত করার জন্য তাদেরকে অধিকাংশ পৌর কেন্দ্রে একত্রিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অধিকাংশ শিল্প সমাজে উচ্চতর পর্যায়ে সরকারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। সরকারকে সাহায্য করল আমলারা এবং সামরিক বাহিনী। শিল্পায়নের ফলে পরিবারগুলোতে নেমে আসলো অন্ধকার। শিল্পায়নের ফলশ্রুতিতে পরিবার তার অনেক কাজকে হারিয়ে ফেলল। কেননা হস্তশক্তি এখন পরিবর্তিত হল যন্ত্রশক্তিতে। আর বেকার হল হস্তশিল্পীরা। সামাজিকী করণের প্রক্রিয়া শুরু হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে। শিল্প যুগে সমাজ ব্যবস্থার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। সামন্তযুগে যারা শোষিত শ্রেণির লোক ছিল তারাই আজ যোগ দিল কলে-কারখানায়। মজুরির বিনিময়ে তারা কাজ করতে শুরু করল। পশ্চিম

---

১৬২. ড. মোঃ আহসান হাবিব, *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ, ৫৬

ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য বা অর্থনৈতিক লেনদেন মূলক কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার নীতি গৃহীত হয়। প্রত্যেকেই যার যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করতে থাকে। ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা রূপান্তরিত হয় বৃহদাকার শিল্প কারখানায়। ভূমিতে যান্ত্রিক চাষের ফলে উৎপাদন অনেক গুণ বেড়ে যায়। সম্পত্তির হস্তান্তর ও লগ্নি বৃদ্ধি পায়। সমাজ অধিকতর গতিশীল হয়, সাথে সাথে শ্রেণি বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।[১৬৩]

শিল্পসমাজকে আবার তিনটি স্তরে বিভাজন করা যায়। যথা– (১) ধনতান্ত্রিক সমাজ, (২) সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও (৩) সাম্যবাদী সমাজ। ধনতান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক বিকাশের আবার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা– (ক) বাণিজ্যিক ধনতন্ত্র, (খ) শিল্প নির্ভর ধনতন্ত্র ও (গ) পুঁজিতন্ত্র। বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রের সমাজে দেশ-বিদেশের ভিতর বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনতন্ত্র সমাজের বিকাশ হয়। বাণিজ্যের মাধ্যমে যে পুঁজি সঞ্চয় হয় তা ব্যবহৃত হয় শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে। পুঁজি বিনিয়োগের ফলে গড়ে উঠে বড় বড় শিল্প কারখানা। ধনতান্ত্রিক যুগের শেষ পর্যায়ে পুঁজিপতিরা উৎপাদন যন্ত্রের উন্নয়নে তেমন উৎসাহ দেখায়নি। কলকারখানার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপক শ্রেণি বা টেকনোক্রেটরা করত। অন্যদিকে এ পর্যায়ে পুঁজিপতিরা নগদ অর্থ লগ্নি ও অর্থ নিয়ন্ত্রণ করেই মুনাফা অর্জন করতে থাকে।

শিল্প সমাজেই সর্বপ্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। জাতীয় রাষ্ট্র হল রাজনৈতিক লোকসমাজ যাদের সীমানা চিরায়ত রাষ্ট্রসমূহের মত অস্পষ্ট নয়। অপরদিকে, জাতীয় রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের বহু দিকে সরকারের ব্যাপক ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের উপর রাষ্ট্র প্রণীত আইন বলবৎযোগ্য। বর্তমান বিশ্বে অন্যান্য জাতীয় সমাজের ন্যায় ব্রিটেনকেও একটি জাতীয় রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।[১৬৪]

শিল্পোত্তর সমাজ : বর্তমানের এ আধুনিক ও শিল্প সমাজ থেকে শিল্পোত্তর সমাজকে পৃথক করা কষ্টকর। তবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক উত্থান-পতনে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আরও স্পষ্ট করে বললে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ কিছু মৌলিক এবং বৈশিষ্টগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এ পরিবর্তনের আলোকেই শিল্প সমাজ থেকেই শিল্পোত্তর সমাজকে পৃথক করা হয়েছে। শিল্পোত্তর সমাজকে উত্তর আধুনিক সমাজও বলা হয়। যদিও শিল্প বিপ্লব রাজতন্ত্রকে উপড়ে ফেলতে পারেনি, তবুও এর দ্বারা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, যার ফলে রাজনৈতিক বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, যা ছিল বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এ বিপ্লব ছিল মানুষের কর্মক্ষমতাকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের কাছে হস্তান্তর করা। এটা পরিবর্তন সাধন করেছিল সামাজিক সংগঠনসমূহের কর্মের স্থানকে। মানুষ গৃহের কর্ম ত্যাগ করে কর্মের মূল কেন্দ্রবিন্দু কল-কারখানার দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

শিল্প বিপ্লবের ফলে একটা নতুন সমাজ কাঠামোর উদ্ভব হয়। শিল্প সমাজ বলতে সে সমাজকে বুঝায় যা যান্ত্রিক পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদিত পণ্য ও তার ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল ছিল। শিল্প সমাজ বয়ে আনলো নতুন আবিষ্কার যা পরিচালনা করল কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনকে এবং যার মাধ্যম ছিল বাষ্পীয় শক্তি। অনেক সমাজই অপরিবর্তনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল যেখানে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হয়ে শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তত দিন, যত দিন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা পরিবার এর মত আদর্শ উৎপাদন ব্যবস্থা না দিতে পারে। উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমেই উন্নতি লাভ করতে থাকে। শিল্পায়নের প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ফলশ্রুতি

---

১৬৩. সম্পাদনা বোর্ড, *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১৬৪. প্রাগুক্ত।

ছিল। পরিবার এবং সম্প্রদায়গুলো একটি স্বনির্ভর একক হিসেবে কাজ করতে পারেনি। ব্যক্তি, গ্রাম ও এলাকাসমূহ তাদের দ্রব্যাদি শিল্প সমাজের পরবর্তী সমাজ ও আধুনিক সমাজের পরবর্তী সমাজ। প্রথমত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারার উন্নয়ন হয়েছিল ১৯৬০ সালে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পায়িত সমাজ পর্যায়ক্রমে অধিক উন্নত প্রযুক্তির অধিকারী হয়ে গেল। লেনস্কি এবং অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীরা সমাজ কাঠামোর তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে বললেন, সমাজের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হচ্ছে শিল্পায়ন। যে সকল জাতি প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়ন সাধন করল, তাদেরকেই বলা হয় শিল্পায়নের পরের সমাজ। সমাজ বিজ্ঞানী ডানিয়েল বেল সর্বপ্রথম Post-industrial society প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, "Post industrial society as a society whose economic system is engaged in the processign and control of information."[১৬৫] অর্থাৎ ‘শিল্প সমাজের পরবর্তী সমাজ বলতে সেই সমাজকে বুঝায় যার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।[১৬৬]

আধুনিকোত্তর সমাজ : অতি সাম্প্রতিক কালে সমাজ বিজ্ঞানীগণ শিল্পোত্তর সমাজের পরও একটি আদর্শ ধরনের আধুনিকোত্তর সমাজের কথা ব্যক্ত করেছেন। ব্রানিগান-এর মতে, "A Post modern society is a technologically sophisticated society that is pre occupied with consumer goods and media images." অর্থাৎ আধুনিকোত্তর সমাজ বলতে প্রযুক্তভাবে সার্বিক সমৃদ্ধ সমাজকে বুঝায় যা পূর্বেই দখল করে রাখে ক্রেতার দ্রব্যাদি এবং প্রচারের জন্য ব্যাপকভাবে মওজুদ থাকে এবং যার সুনাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আর অধিক পরিমাণে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়। আধুনিকোত্তর সমাজ সম্পর্কিত তত্ত্বটি সকল জাতির সাংস্কৃতিক ধারার মধ্যে বিশ্বজনীনভাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরা জ্যামাইকার সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছে এবং খাদ্য হিসেবে সুশি এবং অন্যান্য জাপানি খাবার গ্রহণ করছে। আধুনিকোত্তর সমাজ তত্ত্বের উপর এজন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় যে, পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণনায় সংস্কৃতির ধরন ও সামাজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিকোত্তর সমাজ তত্ত্ব এক নতুন সংযোজন হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায় মানব সমাজের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারায় নানাবিধ ধরন রয়েছে। প্রাক-আধুনিক সমাজেরও বিভিন্ন বিভাজন রয়েছে। এগুলো হলো শিল্পসমাজের পূর্ববর্তী সমাজসমূহ। শিকারি ও সংগ্রাহক সমাজগুলোতে মানুষেরা চাষবাস করত না বা পশুপালন করত না। তারা পশু শিকার বা ফলমূল সংগ্রহ করে জীবনযাপন করত। পশুপালক সমাজে গৃহপালিত পশুপালন করে তাদের জীবনযাত্রা অতিবাহিত হত। কৃষি সমাজে সুনির্দিষ্ট জমিতে চাষ করে মানুষ বেঁচে থাকে। বৃহৎ ও অধিক উন্নত কৃষি সমাজ চিরায়ত রাষ্ট্র তথা সভ্যতা গড়ে তোলে। এছাড়া আধুনিক সমাজ ও সনাতন সমাজের মধ্যে বিস্তার ব্যবধান রয়েছে। কেননা আধুনিক সমাজের সকল কর্মকাণ্ডই শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত অথবা বৃহত্তর পরিধির উপনিবেশবাদী সমাজের উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। অপরদিকে সনাতন সমাজের সামাজিক উপাদান মূলত ক্ষুদ্র পরিধির, যার উৎস হচ্ছে আদি ও অধিকাংশই প্রাচীন সাংস্কৃতিক চর্চাকেন্দ্রিক।

---

১৬৫. Daniel Bell, *The Coming of Post-Industrial Society*(New York : Harper, 1974), p. 5
১৬৬. Michael Harrington, *The Other America*(New York : Scribner, 1997), p. 245

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর

মানুষ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট সামাজিক নির্দেশনার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় কতকগুলো সুযোগ সুবিধার আশ্রয়ে। কিন্তু মানব জীবনের কিছু কিছু অদৃশ্য, অযাচিত সুদূর প্রসারী সাধনা সাধারণভাবে ঘটে থাকে যেগুলো পূর্ব থেকে অনুমান করা সহজসাধ্য নয়, আর সেগুলো মুকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণও সহজ নয়। সমাজের সর্বজনীন একক উপাদান পরিবারে ব্যক্তি মাত্রই জন্মগ্রহণ এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ ক্ষেত্রে সমাজ তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নির্দেশনা প্রদান করে যাতে তার বৃদ্ধি ও বিকাশ সুষ্ঠু হতে পারে। কিন্তু কতিপয় মানবীয় দুর্ঘটনা, অযাচিত পরিস্থিতি যেমন– বেকারত্ব, শ্রম দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, বৈধব্য, বার্ধক্য, পরিবারের মুখ্য উপার্জনকারী সদস্যের মৃত্যু সংশ্লিষ্টদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলে; যেগুলো মুকাবেলা ব্যক্তির একার পক্ষে অনেক সময়ই সম্ভব হয় না। উদ্ভুত এ সমস্ত পরিস্থিতিসমূহ সমাজের পূর্বেও ছিল, এখনও তা বিদ্যমান। সর্বোপরি অবস্থার প্রভাব পূর্বে তেমন একটা গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করা হত না; যেমনটি বর্তমানে করা হয়ে থাকে। বিগত সময়ে মানুষ উক্ত দুর্ঘটনাসমূহ থেকে নিজেদের রক্ষার্থে নানাবিধ রক্ষা ব্যবস্থা খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে।

আদিকালের সামাজিক ব্যবস্থা ছিল সাদামাঠা, সহজ-সরল, দৈব-দুর্ঘটনার প্রকৃতিও ছিল সাদামাঠা। মানব জীবনের তখনকার উদ্ভুত ছোট-খাটো দৈব-দুর্ঘটনা বদান্যতা ও দানশীলতা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিকতার দৃষ্টিকোণ নির্ভর সামাজিক ব্যবস্থার আওতায় সমাধান করা সম্ভব ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিনির্ভর গতিশীল শিল্প সমাজে সামাজিক সমস্যাগুলোর বহুমুখিতা ও জটিলতার কারণে স্বেচ্ছা মনোভাব ও মানবিকতাবোধ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা এ সমস্যাসমূহ মুকাবেলা করা খুবই দুরুহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া শিল্প বিপ্লবোত্তর পৃথিবীতে দ্রুত শিল্পায়ন ও নগরায়নসহ প্রকৌশলগত উৎকর্ষতায় যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারে রূপান্তর, শ্রম ও শিক্ষা দুর্ঘটনা, বেকারত্বসমূহ জীবন সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, একাকী বা বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনসহ বিভিন্ন কারণে সমাজের নিরাপত্তার প্রশ্নটি বর্তমানে ব্যাপক পরিধিতে রাজনৈতিক সমাজের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা : মানবিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উৎপত্তির সাথে সমাজের উৎপত্তি, উন্নয়ন ও ক্রমবিবর্তন সম্পর্কযুক্ত; কারণ নিরাপত্তার প্রশ্নেই এসেছে সামাজিক যূথবদ্ধতা। 'সামাজিক নিরাপত্তা' ইস্যুটি জটিল গতিশীল আধুনিক যুগে খুবই সর্বাত্মক একটি প্রপঞ্চ। এ প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয় ১৯৩৫ সালে আমেরিকার 'United States Laislation to the Social Security 1935' এ। সামাজিক নিরাপত্তা হলো আধুনিক জীবনের যে কোন দুর্ঘটনা থেকে সমাজ কর্তৃক সুরক্ষা কার্যক্রম। এটি একটি সমন্বিত ও সুসংগঠিত ব্যবস্থা যা ব্যক্তি বা সমাজকে বিভিন্ন অবস্থা থেকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে এবং এ দ্বারা ব্যক্তি ও দলকে এমনভাবে সাহায্য করা হয় যাতে তারা সন্তোষজনক জীবন মান অর্জন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা হল সমাজ কর্তৃক প্রদেয় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা যা সমাজের সদস্যদেরকে বিশেষ মুহূর্তে যখন তারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য বা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। প্রকৃতপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট, সর্বজনীন এমন কোন সংজ্ঞা নেই যা সর্বজন গৃহীত। বরং 'সামাজিক নিরাপত্তা' ধারণা এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশের প্রথা, বিদ্যমান সামাজিক আইন ও দর্শন অনুযায়ী পার্থক্য বিদ্যমান।[১৬৭]

---

১৬৭. Board of Editors, *Social Science Review*(Dhaka : University of Dhaka, 2010), vol. xv, No. 2, pp. 297-298

সমাজকল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা 'সামাজিক নিরাপত্তা'। মানব জীবনে এমন কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটতে পারে, যা মানুষের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে মুকাবেলা করা অসম্ভব। এসব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে কিছু প্রতিরক্ষামূরক ব্যবস্থা নেয়া হয়, যা সামাজিক নিরাপত্তা নামে অভিহিত। সাধারণত সামাজিক নিরাপত্তা বলতে এমন এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক অর্থনৈতিক কর্মসূচি বুঝায়, যা আধুনিক সমাজে প্রাকৃতিক বা অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা এবং বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়। যেমন– দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, পঙ্গুত্ব প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণহীন পরিস্থিতি। সামাজিক নিরাপত্তার প্রবক্তা লর্ড উইলিয়াম বিভারিজ বলেন, 'বেকারত্ব, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, বার্ধক্য, চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ, উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুবরণ অথবা জন্ম ও বিয়ের সময় অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে কোন পরিবারে আয়ের পথ বন্ধ হওয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে আয়ের নিশ্চয়তা প্রদানকারী কর্মসূচিই সামাজিক নিরাপত্তা।'

সমাজবিজ্ঞানী মরিস স্ট্যাক-এর মতে, 'আধুনিক জীবনের অসুস্থতা, বেকারত্ব, বার্ধক্যজনিত নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা ও বিকলঙ্গতার বিরুদ্ধে যখন কোন ব্যক্তি নিজ ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার দ্বারা নিজেকে ও পরিবারকে রক্ষা করতে ব্যর্থ ও অপারগ হয়, তখন সমাজ কর্তৃক যেসব প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি গৃহীত হয়, তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা নামে অভিহিত করা হয়।' "By social security, we understood a program of protection provided by society against those contingencies of life- sickness, unemplyment, old-age, dependency, industrial accidents and invalidism against which the individual cannot be excepted to protect himself and his family by his own ability or foresight."[১৬৮]

সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে সমাজের অসুবিধাগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণির সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। যার সমর্থনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামাজিক আইনগত সহায়তা প্রয়োজন হয়। মূলত দ্রুত পরিবর্তনশীল, শিল্পায়িত ও উন্নত প্রযুক্তির জটিল সমাজ ব্যবস্থায় অসুস্থতা, বেকারত্ব, দরিদ্রতা, উপার্জন অক্ষমতা, বার্ধক্য, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, পেশাগত দুর্ঘটনা এবং অন্যান্য বিপদাপদের কারণে অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত আর্থিক বা অন্যান্য ভাবে সহায়তাভিত্তিক কার্যক্রমকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Charls I. Schottland বলেছেন, 'সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে আইনি সহায়তাপুষ্ট এক ধরনের প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচি যা অসুস্থতা, বেকারত্ব, উপার্জকারীর মৃত্যু, বার্ধক্য কিংবা অক্ষমতাজনিত নির্ভরশীলতা এবং দুর্ঘটনার কারণে যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় তখন তার বা তাদের খরচ নির্বাহমূলক ব্যবস্থা।'[১৬৯]

সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Maurice Stack বলেছেন, 'সামাজিক নিরাপত্তা আধুনিক জীবনের ঐ সমস্ত আকস্মিক ঘটনা যেমন– অসুস্থতা, শিল্পদুর্ঘটনা, বেকারত্ব, বার্ধক্যকালীন নির্ভরতা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমাজ কর্তৃক গৃহীত এক রক্ষামূলক কর্মসূচি; যে অবস্থায় একজন ব্যক্তি তার নিজের সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে নিজের ও তার পরিবারকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় না।'[১৭০]

সামজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় William Beveridge বলেছেন, 'বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দুর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়সে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ, পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু বা জন্ম, মৃত্যু ও বিয়ের সময়

---

১৬৮. Walter A. Friendlander, *Introducation to Social Welfare*(New York : Prentice-Hall, 1955), p. 5

১৬৯. "By social security, we understood a program of protection provided by social legislation against sickness, unemployment, death of wagearner, old age or disability dependency and accident-contingencies against wich the individual cannot be expected to protect himself." see. Walter A. Friendlander, *Introducation to Social Welfare*, ibid, p. 1

১৭০. Walter A. Friedlander, *Introduction to Social Welfare*, ibid, p. 5

অতিরিক্ত ও অস্বাভাবিক ব্যয়ের কারণে যখন কোনো পরিবারের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায় তখন যে কর্মসূচির মাধ্যমে আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় তাকেই সামাজিক নিরাপত্তা বলে।' তিনি আরও বলেন, 'সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে দরিদ্রতা, অজ্ঞতা, অসুস্থতা, মলিনতা এবং অলসতা নামক পাঁচটি দৈত্যের বিরুদ্ধে গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা।'[১৭১]

অন্যদিকে 'সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে Rovert L. Barker সম্পাদিত The Social Work Dictionary গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সামাজিক নিরাপত্তা' হল– সমাজের বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের আয় সহায়তা দেয়ার এক বিধান, যাদের আয় আইনগতভাবে সংজ্ঞায়িত দুর্ঘটনা বা বিপদ, যেমন– বৃদ্ধ, অসুস্থ, তরুণ অথবা বেকার হওয়ার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে।'[১৭২]

১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে বলা হয়েছে যে, 'বৃহৎ অর্থে সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে সে ব্যবস্থা যাতে অসুস্থতা, বেকারত্ব, বৃদ্ধাবস্থা কিংবা কারো মৃত্যুজনিত কারণে যখন মানুষ সন্তোষজনক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয় তখন তা উপশম বা নিবৃত্তকরণের লক্ষ্যে গৃহীত এক ধরনের সরকারি সহায়তা।'[১৭৩]

সামাজিক নিরাপত্তা মূলত মানুষের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কালীন সময়ে দেয়া হয়। সমাজের মানুষ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণে আজীবনই অবদান রাখে। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের এ কল্যাণে অবদান রাখতে গিয়ে অনেক সময়ই তারা বিভিন্ন ধরনের আকস্মিক বিপদের সম্মুখীন হয় যা তাদের অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। রাষ্ট্র বা সমাজ তাই এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব হিসেবে এসব বিপদগ্রস্ত নাগরিকদেরকে তাদের অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। Encyclopedia of Social Work in India (1967)-তে প্রদত্ত সামাজিক নিরাপত্তা হল, বিভিন্ন আকস্মিক কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্দশায় ব্যক্তিকে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং রাষ্ট্রের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান বজায় রাখার নিশ্চয়তা দেয়।[১৭৪]

সার্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, আর্থ-সামজিক, রাজনৈতিক কিংবা দুর্যোগজনিত কারণে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যখন আর্থ-সামাজিক ও স্বাস্থ্যগত (শারীরিক ও মানসিক) নিরাপত্তাহীনতায় আক্রান্ত হয় বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষ আইনি সহায়তায় যে নিপত্তামূলক বা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে ব্যবস্থাকে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বলে। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে এমন এক কর্মসূচি, যা মানুষকে দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক অবস্থা ও বিপর্যয় বা দূর্যোগকালে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা হয়। যেমন– সামাজিক বীমা।

সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর

আধুনিক সমাজে সমস্যার জটিলতা ও বহুমুখীতার কারণে সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রবক্তা লর্ড উইলিয়াম বিভারিজের মতে, 'ব্যক্তি যখন কর্মক্ষম থাকে, তখন তাকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া, আর যখন কাজ করতে অক্ষম হয় তখন তাকে আয়ের ব্যবস্থা করে দেয়াই সামাজিক নিরাপত্তার মূল কথা।' সামাজিক নিরাপত্তা সম্ভবত মানব ইতিহাসের মতই প্রাচীন। কেননা, সামাজিক নিরাপত্তার তাৎপর্য এবং এর পরিধি বিভিন্ন দেশ ভেদে বিদ্যমান সামাজিক আইন, ঐতিহ্য এবং ধারার প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তার অর্থ এবং এর পরিধির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কতিপয় দেশে সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে শুধু আয়ের নিশ্চতয়াকে গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে অন্য দেশে সামাজিক নিরাপত্তা হিসেবে বিস্তৃত নিরাপত্তা খাতকে সামাজিক নিরাপত্তা স্তরের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এজন্য যে, সামাজিক নিরাপত্তার প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিকের

---

১৭১. ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব*(ঢাকা : নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০৩), পৃ. ৩৬
১৭২. Robert L. Barker, *The Social Work Dictionary*(Washington DC : NASW Press), pp. 355-356
১৭৩. K. D. Gangrade, *Social Legislation in India*(New Delhi : Concept Publishing Co., 1978), p. 220
১৭৪. Board of Editors, *Encyclopedia of Social Work in India*(New Dhlhi : New Royal Book Co., 1963), vol. 2, p. 112

অনুপস্থিতি রয়েছে। তদুপরি, সামাজিক নিরাপত্তার সর্বজনীন তিনটি স্তর রয়েছে। যথা : (১) সামাজিক বীমা (Social Insurance), (২) সামাজিক সাহায্য (Social Assistance) ও (৩) সামাজিক সেবা (Social Service)।[১৭৫]

(১) সামাজিক বীমা (Social Insurance) : সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি শুরু হয় সামাজিক বীমার মাধ্যমে। জার্মান সরকারের চ্যান্সেলর (Otto von Bismarck) ১৮৮৩-১৮৮৪ সালে সর্বপ্রথম ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক বীমা হাতে নেন। সামাজিক বীমা প্রবর্তন করা হয় তিনটি ভাগে। ১৮৮৩ সালে অসুস্থতা বীমা (Sickness Insurance), ১৮৮৪ সালে কর্মচারী আঘাতপ্রাপ্ত বীমা (Employment Injury Insurance), এবং ১৮৮৯ সালের অক্ষমতা ও বার্ধক্য বীমা (Disability & Old-age Insurance)। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) এর মতে, "Social Insurance ... is a scheme of providing benefits for persons of small earnings granted as of right in amounts that combine and contribuite efforts of the insured with subsidies from the employer and the state." 'সামাজিক বীমা ব্যবস্থা সকল আয়-উপার্জনকারীর জন্য বাধ্যতামূলক যার অর্থ কর্মকর্তা-কর্মচারী, দক্ষ-অদক্ষ এবং যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সামাজিক বীমা হলো এমন এক প্রকার যন্ত্র যা কোন ব্যক্তিকে দায়িত্ব দায়িত্ব ও দুর্দশাগত অবস্থা থেকে রক্ষা করে এবং উক্ত ব্যবস্থা ব্যক্তিদেরকে জরুরি অবস্থায় সহায়তা প্রদান করে।' ফ্রিডল্যান্ডারের মতে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হিসেবে সামাজিক বীমার লক্ষ্য হল শিল্পায়িত গতিশীল সমাজে বীমাকৃত শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের প্রকৃতিক দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করা যেমন– বেকারত্ব, বৃদ্ধ বয়সের নির্ভরশীলতা, শিল্প দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, পঙ্গুত্ব, পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু।[১৭৬]

কর্মরত শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য সামাজিক বীমা এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা স্তর। দেশের প্রচলিত আইন ও কর্মরত প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ নিজে ও তাদের পরিবার এটি প্রাপ্ত হয়। Saxene ও Saxena বলেন, 'সামাজিক বীমা এমন এক পদ্ধতি, যা ব্যক্তিকে দারিদ্র্য ও দুর্দশায় নিক্ষিপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে এবং জরুরি সময়ে সহায়তা করে।' যে সব বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে সামাজিক বীমা কর্মসূচি প্রচলিত তা হচ্ছে– বেকারত্ব, বার্ধক্য, শিল্প দুর্ঘটনা, অসুস্থতা, অক্ষমতা, উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু, সন্তান প্রসব প্রভৃতি। চাকুরিজীবী, চাকুরিদাতা ও সরকারের সহযোগিতায় এ উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিল থেকে সাহায্য প্রদান করা হয়। এটি চাকুরিজীবীর আইনগত অধিকার এবং এর হারও নির্দিষ্ট। সামাজিক বীমা বিভিন্ন ধরনের। যেমন–

(১) চাকুরিজীবীর বাধ্যতামূলক চাঁদা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় বীমাসমূহ। যথা : (ক) ভবিষ্যৎ তহবিল (PF), (খ) কল্যাণ তহবিল (BF), যৌথ বীমা (GI) ইত্যাদি।

(২) চাকুরির ফলে প্রাপ্যসমূহ। যথা : (ক) অবসর ভাতা (Pension), (খ) নাগরিক অধিকার তথা বেকার ভাতা, (গ) মাতৃত্ব সুবিধা (Maternity Benefit) ছুটি, ভাতা প্রভৃতি, (গ) দুর্ঘটনা ভাতা (Accident Allowance), (ঘ) পারিবারিক ভাতা (Family Allowance), (ঙ) বিনোদন ভাতা (Recreation Allowance), (চ) উৎসব ভাতা (Festivale Bonus), (ছ) প্রণোদনা ভাতা (Incentive Bonus) ইত্যাদি।

সামাজিক বীমা চাকুরিজীবীরা অধিকার হিসেবে নির্দিষ্ট হারে ভোগ করেন। এতে আর্থিক ও ঝুঁকির নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

---

১৭৫. Board of Editors, *Encyclopedia of Social Work in India*, ibid, vol. 2, p. 114
১৭৬. ibid

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সামাজিক বীমার বৈশিষ্ট্যগুলো হল–

- সাধারণত সামাজিক বীমায় আর্থিক দিকটি দু'দিক থেকে আসে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বার্থে সরকার সমভাবে অবদান রাখে এবং পরিপূরক অবদান সাধারণ রাজস্ব থেকে ভর্তুকি আকারে।
- এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ কতিপয় শর্ত ছাড়া বাধ্যতামূলক।
- শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারের অর্থ একটি বিশেষ তহবিলে সঞ্চিত হয় যা থেকে সুবিধা প্রদেয়।
- উদ্ধৃত অবদান এবং সুবিধা প্রায় তার আয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
- কর্মচারী আঘাতপ্রাপ্ত বীমা বা Employment Injury Insurance স্কিম সাধারণত কর্মচারীরাই অর্থায়ন করে থাকে। তবে এই সঙ্গে সরকারের সাধারণ রাজস্ব থেকে পুরো সহায়তা করার সম্ভাবনা থাকে।

(২) সামাজিক সাহায্য (Social Assistance) : সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত এ ধরনের সাহায্য ব্যবস্থা যেখানে সরকার তার রাজস্ব আয় বা নিজস্ব তহবিল থেকেও এ ধরনের কাজে অর্থায়ন করে থাকে। Walter A. Friedlander এর মতে, "It may be provided by payments based upon economic and social needs of the applicants which are determined by a means test, or they may be granted as a flat rate allowance legally fixed with yard to recognize average needs of families of a specific size."[১৭৭] সামাজিক সাহায্যের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

- সামাজিক সাহায্য কর্মসূচির সম্পূর্ণ অর্থায়ন বা ব্যয় নির্বাহ করে থাকে রাষ্ট্র এবং সরকারের স্থানীয় ইউনিট।
- সুবিধা প্রদান করা হয় নির্ধারিত বিভিন্ন চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে।
- সামাজিক সাহায্যে সহায়তা প্রক্রিয়া অস্থায়ী প্রকৃতির।
- এ ধরনের সহায়তা পেতে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ জরুরি নয়।
- যারা মূল বীমা স্কিমের আওতাভুক্ত না ও যাদের বীমা সুবিধা তাদের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল তাদের জন্য সামাজিক সাহায্য গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) সামাজিক বীমাকে নিরাপত্তা জাল হিসেবে অভিহিত করেছে; সামাজিক সাহায্যের মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেসব ব্যক্তিদের নিজেদেরকে সহায়তা করার জন্য অন্য কোন উপায় নেই তাদেরকে নূন্যতম অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য প্রদান করা। এসব বীমা নিম্ন আয়ভুক্ত শ্রেণি ও অভাবীদের জন্য গৃহীত হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে চিকিৎসা সহায়তা বাবদ অনুদান, পারিবারিক অনুদান, শিশু সন্তানদের জন্য অনুদান এবং টেস্ট রিলিফ প্রোগ্রাম এগুলো হলো সামাজিক সাহায্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেগুলো তীব্র দরিদ্র হতে কাউন্টার ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক বেশ কিছু প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা। অতীতে রাষ্ট্র প্রধানতঃ পুলিশি ভূমিকায় অবতীর্ণ হত; কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রের ভূমিকার ব্যাপক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রের কল্যাণধর্মী ভূমিকার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে আধুনিক সামাজিক নিরাপত্তা ধারণার জন্ম। পেশাগত অসুখ, কর্মস্থলে আহত, বেকারত্ব ইত্যাদি শিল্প সভ্যতার ফসল। একজন শিল্প শ্রমিকের আয়ের পথ হারানো এবং চাকুরির সম্ভাব্য ক্ষতি– এসব প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা তাই জীবনের এসব ঝুঁকি দূর করতে সচেষ্ট হয়। জীবন চলার পথে চাহিদা, অসুখ, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, মলিনতা ও অলসতা– এই পাঁচটি ঝুঁকি সচরাচর মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

---

১৭৭. Board of Editors, *Encyclopedia of Social Work in India*, ibid, vol. 2, p. 115

বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র মানেই কল্যাণ রাষ্ট্র এবং এই আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র প্রত্যেক নাগরিক ও তার পরিবারের জন্য ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে Cole C.D.H. তার Beveridge Explained বইতে লিখেছেন, "The idea that the state shall make itself responsible for ensuring a minimum standard of material welfare to all citizens on a basis wide enough to cover all the contingencies of life"[১৭৮] জীবনের নানাবিধ দুর্ঘটনা, দৈব অবস্থা মানুষের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য যেমন প্রতিকূল তেমনি এগুলো আবার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এসব ঝুঁকিপূর্ণ ঘটনা বা বিপদাপদগুলো আকস্মিক এবং অনেক ক্ষেত্রে আবার অনিবার্য। ফলে জটিল ও আকস্মিক এ অবস্থাগুলো স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজেদের আয় ও চেষ্টা দিয়ে মুকাবিলা করতে পারে না। এমনকি তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাহায্য নিয়েও এ সঙ্কটজনক অবস্থা থেকে কার্যকরভাবে মুক্ত হতে পারে না। এই ঝুঁকিপূর্ণ ও সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মানুষকে অর্থনৈতিক দূরাবস্থায় নিপতিত করে, যা মানুষের শারীরিক এমনকি নৈতিক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকদেরকে সঙ্কটকালীন সময়ে বিপদ থেকে রক্ষা করে।

Thompson এর ভাষ্যমতে, "Social Security has been defined as the protection given by society to its members or various categories of them, Through a series of public measures from the economic distress that other wise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment, injury unemployment; invalidity, old age and death; for providing medical care to these groups in the population and also for subsidising families containding a numbers of children." [১৭৯] সামাজিক সাহায্য মূলত বেশকিছু প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির সমষ্টি যা সমাজ বা রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে বর্তমান ও ভবিষ্যত বিপদাপদ যা তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে বা করতে পারে তা থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত হয়। সামাজিক সাহায্যের সাধারণ লক্ষ্য হলো সামাজিকভাবে সমাজের নাগরিকদেরকে রক্ষা করা। সামাজিক সাহায্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকার। সর্বোপরি সামাজিক সাহায্য কর্মসূচি শুধু বিপদাপদ, দৈব-দুর্ঘটনার হ্রাসের লক্ষ্যে প্রণীত হয় না; বরং সমাজের কর্মজীবী শ্রেণির জন্য একটি পর্যাপ্ত মজুরি, ন্যূনতম মানের গৃহ-সংস্থান, যথোপযুক্ত কাজের সময় এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থাদি হাতে নেয়া এর লক্ষ্য। এ জন্য কল্যাণ রাষ্ট্রের ধারণাটি জনপ্রিয়তার কারণ হলো সামাজিক সাহায্য ব্যবস্থাকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[১৮০] সামাজিক সাহায্যকে দু'ভাবে দেখানো যায়। যেমন–

১. সাধারণ সাহায্য : পর্যাপ্ত জীবন মানের বা জীবন নির্বাহের অধিকারী নয় এমন জনগণের জন্য সরকারিভাবে সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা হলো সাধারণ সাহায্য। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির ঐ অবস্থার কারণে নির্বিচারে সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মোঃ আলি আকবর বলেন, "General Assistance for all those who are without sufficient means of subsistance regardless of the reason for that condition."[১৮১]

২. বিশেষ সাহায্য : সুনির্দিষ্ট শ্রেণিভুক্ত অভাবী জনগণের জন্য বিশেষ সাহায্য ব্যবস্থা এটি। বিশেষ করে বার্ধক্যে অভাবগ্রস্ত, অক্ষম, প্রতিবন্ধী এবং যে সব পরিবারের উপার্জনকারীর মৃত্যুতে পরিবার অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত জীবনযাপন করছে তাদের জন্য বিশেষ সাহায্যের

---

১৭৮. এম.এ.এস. তালুকদার, *শ্রম ও শিল্প আইন*(ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৭), পৃ. ২৯৬

১৭৯. Board of Editors, *Social Science Review*, ibid, vol. xv, No. 2, p. 294

১৮০. ড. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সমাজকর্মের প্রাসঙ্গিক প্রত্যয় প্রক্রিয়া ও তত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

১৮১. Board of Editors, *Social Science Review*, ibid, vol. xv, No. 2, p. 186

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে মোঃ আলি আকবর বলেন, "Special Assistance for all categories of needy person, the needy aged, invalid, handicapped or families suffering on account of the death of the bread winner."[১৮২]

মূলত সামাজিক সাহায্য সামাজিক নিরাপত্তার এমন এক অংশ, যাতে সাহায্যগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক বীমার বহির্ভূত সে সব শ্রেণির লোকজন যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, আকস্মিক দুর্ঘটনা, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে ন্যূনতম জীবনমান বজায় রাখতে সক্ষম হয়। এটি একটি প্রাচীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। সামাজিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কোনো আইনগত অধিকার কারো নেই। তাছাড়া, সাহায্যগ্রহীতারও কোনো অবদান থাকে না। তবুও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা হয়ে থাকে। সামাজিক সাহায্যের সাধারণ কর্মসূচিতে জনগণের একাংশের ন্যূনতম মৌল মানবিক প্রয়োজন পূরণ করা হয়। যেমন– নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, রেশন প্রভৃতির ব্যবস্থা। এছাড়া বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে দুস্থ, অসহায়, দরিদ্র লোকদের সাহায্য করা হয়। যেমন– প্রতিবন্ধী, প্রবীণ,অনাথ, বিধবা, বাস্তুহারা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ প্রভৃতি।

(৩) সামাজিক সেবা (Social Service) : সামাজিক বীমা ও সামাজিক সাহায্যের তুলনায় সামাজিক সেবার পরিধি ব্যাপক। বলা হয়ে থাকে সামাজিক সেবা হলো সামাজিক নিরাপত্তার মৌলিক কর্মসূচি যা মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই প্রচলিত ছিল। সামাজিক সেবা ব্যক্তি এবং দেশকে একটি সন্তোষজনক অবস্থার মধ্যে মান অর্জনে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। সমাজসেবার বৈশিষ্ট্য হলো এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যই সংঘটিত। সমাজসেবার আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাগুলো হলো জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিশুকল্যাণ, শ্রমিক কল্যাণ, নারী ও পরিবার কল্যাণ, অপরাধ সংশোধন, গৃহ-সংস্থান এবং প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। অন্য কথায় সামাজিক সেবা বলতে বুঝায়, "The programes that are not included in social insurance or social assistance but necessary for the well being of society is called social services."[১৮৩]

মূলত সামাজিক বীমা, সামাজিক সেবা ও সামাজিক সাহায্য এ তিনটি বিষয়ের সামষ্টিক রূপ হলো সামাজিক নিরাপত্তা। যে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী যত মজবুত সে দেশ তত উন্নত; সে দেশের নাগরিক তত সুখী, নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী।

---

১৮২. Board of Editors, *Social Science Review*, ibid, vol. xv, No. 2, p. 186
১৮৩. ibid

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা

১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের পৃথক কোন একক ভৌগোলিক ও জাতিগত ঐক্য হিসেবে পরিচিতি ছিল না। এ অঞ্চলকে ধারাবাহিক ভারত সাম্রাজ্যের একটা অংশ হিসেবে ধরা হত এবং ব্রিটিশ সময় থেকে বাংলাদেশকে সমগ্র বেঙ্গল-এর পূর্ব অংশ হিসেবে গঠন করা হয়, যা প্রভাবিত হত ব্রিটিশ শাসক ও হিন্দু সমাজপতি, বণিক এবং জমিদার দ্বারা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বর্তমান বাংলাদেশের নেতৃত্ব অমুসলিম কর্তৃত্ব থেকে পাকিস্তানের পশ্চিমা অবাঙ্গালী মুসলিম অভিজাত শ্রেণির অধিকারে আসে। অতপর বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরই একটা নতুন জাতি ও নতুন সামাজিক কাঠামো হিসেবে জন্ম হয়।

বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস : ১৯৪৭ সালের ব্রিটিশ ভারত বিভাজন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ব বাংলার শতকরা ৮০ ভাগ বড় গ্রাম অঞ্চলগুলোতে, শহুরে ভূসম্পত্তি, সরকারি চাকুরিতে, অর্থ, বাণিজ্য ও জীবিকায় হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা কাঠামোতে আমুল পরিবর্তন আসে। হিন্দু রাজনৈতিক ও অভিজাত পরিবারেরা তাদের অর্থনৈতিক কাঠামো গুটিয়ে কলকাতার মধ্যে সীমিত করে নেয়। পরবর্তীতে হিন্দু কুলীনদের এ শূন্যস্থান দ্রুত মুসলিমদের হাতে চলে আসে এবং পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও সরকার-প্রধানের দায়িত্ব প্রথমবারের মত মুসলিম দখলে আসে। এটা অতি দ্রুত সুযোগ তৈরি করে, বিশেষভাবে সরকারি চাকুরি ও বিভিন্ন জীবিকায়, যদিও খুব দ্রুত এটা পশ্চিম পাকিস্তান ভিত্তিক অভিজাত পরিবারের– যে পরিবারের সদস্যদের প্রতি সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পরপরই পাকিস্তানের খালি করে দেয়া স্থানসমূহ কিছু সুযোগসন্ধানী অসৎ অভিজাত শ্রেণির অধিকারে চলে যায়। সামান্য কিছু অবাঙ্গালী মুসলিম সদস্য যারা 'বণিক সমাজ' নামে পরিচিত তারা ব্যতীত সকল ছোট-বড় সব ধরনের বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বাঙ্গালী মুসলিমদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭২ সালের অবাঙ্গালীদের জাতীয়করণের ফলে সকল বৃহৎ কারখানাগুলোর উপরও দেশীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দ্রুততর হয়।[১৮৪] মধ্যবিত্ত শ্রেণির অপ্রত্যাশিত উত্থান এবং সামরিক ও বেসামরিক আমলাতান্ত্রিকতার বিস্তার শহুরে এবং গ্রামীণ উভয়খাতের ভারসাম্য বিপর্যস্ত করে তোলে। দ্রুত অগ্রসরমাণ রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির অথবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের স্থানে প্রবেশের প্রধান পূর্বশর্ত হয়ে উঠে দলীয়করণ, রাজনৈতিক পরিচিতি অথবা যুগান্তকারী কাগুজে ব্যবস্থা। মধ্যবিত্তের কর্মদক্ষতার খুব সামান্যই এতে প্রতিফলন ঘটে। নব্য অভিজাত শ্রেণি তাদের রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রামের দিকে সম্পদ কুক্ষিগত করতে থাকে। গ্রামের রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি ফসলের এবং গ্রামভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত ভাগ্যের উপর সুবিধা নিতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে গ্রামের প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল কৃষককে যারা স্থানীয়ভাবে জোয়ার্দার নামে পরিচিত তাদের প্রতিস্থাপিত করে এক নতুন ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠে।[১৮৫]

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এক দীর্ঘ উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। সত্তরের দশকে অর্থাৎ বাংলাদেশের পথ চলার শুরুর দিকে প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দুর্যোগে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে নিরাপত্তা কর্মসূচি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব ঘুচাতে এবং জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। আওয়ামী লীগ সরকার দেশের নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে দেখে আসছে। সরকারের দুই মেয়াদকালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য আর্থিক

---

১৮৪. Bangladesh Country Study Guide, *Strategic Information and Developments*(Dhaka : International Business Publication), vol. i, pp. 82-109

১৮৫. ibid

বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে এগুলোর ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে মোট ব্যয় ছিল ১১ হাজার ৪৬৭ কোটি টাকা, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এসে সরকার এ খাতের জন্য ৫৪ হাজার ২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে, যা বাজেটের ১৩.৫৪ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৪৪ শতাংশ। গত দশ বছরে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কর্মসূচি এবং বেড়েছে সুফলভোগীর সংখ্যা। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনের লড়াইয়ে পাওয়া গেছে সাফল্য। সরকার সমাজের দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে শুরু করে খাদ্য নিরাপত্তা এবং কর্মসৃজন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা করেছে। বিগত দশ বছরে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেশের মূলধারার উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ রূপে দৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফলভোগী : ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৬৭,০০,০০০ জন মানুষ নিরাপত্তা কর্মসূচির সুফল পেয়েছে। পিছিয়ে পড়া মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষকে মৌলিক সেবা, প্রণোদনা এবং নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। এটি আর কেবলমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বয়স্ক, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারী, প্রতিবন্ধী, দুস্থ ও দরিদ্র অন্তঃসত্ত্বা নারী, চা বাগানের শ্রমিক, হিজড়া, দলিত ও ভবঘুরে সম্প্রদায় এবং মুক্তিযোদ্ধারা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সহায়তা পাচ্ছে।[১৮৬] সরকার প্রতি বছরই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি বাড়িয়ে চলেছে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৫৭ লাখ ৬৭ হাজার। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে অতিরিক্ত ১০ লাখ মানুষকে এই কর্মসূচির আওতায় আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে। সরকারের মোট ২৩টি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বর্তমানে ১৪৫টি কর্মসূচি পরিচালনা করছে।[১৮৭]

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি : বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে প্রদত্ত হলো :

(১) মাতৃত্ব সুবিধা : বিভিন্ন সময়ে প্রণীত মাতৃত্ব কল্যাণ আইনের আওতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত মহিলাদেরকে মাতৃত্ব সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– মাতৃত্ব কল্যাণ আইন, ১৯৩৯ এবং মাতৃত্ব কল্যাণ (চা-বাগান) আইন, ১৯৫০। আইনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিম্নোক্ত মাতৃত্ব সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে :

(ক) গর্ভকালীন সময়ে সন্তান জন্মদানের পূর্বে ও পরে ৬ সপ্তাহ করে ১২ সপ্তাহ বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা (সম্প্রতি এই ছুটি ৬ মাস করা হয়েছে)।

(খ) মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নগদ অর্থ প্রদান।

(গ) কর্মকালীন সময়ে দিনে দুই বার শিশুকে দেখাশুনার সুবিধা।

(২) চিকিৎসা সুবিধা : চিকিৎসা সুবিধার আওতায় সকল সরকারি কর্মচারিকে চিকিৎসার জন্য প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেয়া হয়। চিকিৎসার জন্য অর্থ দেয়ার পাশাপাশি অসুস্থ হলে বাড়িতে গিয়ে রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থাও রয়েছে। এছাড়াও রোগ নির্ণয়ের জন্য প্যাথলজিক্যাল ব্যবস্থা এবং ঔষধপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

(৩) শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ : কল-কারখানা, বন্দর, রেলওয়ে, খনি প্রভৃতি স্থানে কর্মরত শ্রমিকের জন্য ১৯২৩ সালের শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্মকালীন সময়ে কোনো শ্রমিক যদি দুর্ঘটনার শিকার হয় তবে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়ার প্রকৃতি অনুসারে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। বর্তমানে কোনো শ্রমিকের মৃত্যু হলে তার পরিবারকে এককালীন ২১ হাজার টাকা এবং স্থায়ীভাবে পঙ্গু হলে ৩০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান ছিল। তবে বর্তমানে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৮ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহত হয়ে স্থায়ীভাবে অঙ্গহানি হলে ২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[১৮৮]

---

১৮৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*(ঢাকা : পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৫), পৃ. ১৭-১৮

১৮৭. সম্পাদনা বোর্ড, *বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা*(ঢাকা : সিআরআই, ২০১৮), পৃ. ৫

১৮৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

(৪) সামাজিক বীমা : বাংলাদেশে সামাজিক বীমার আওতায় যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তাহলো :

(ক) প্রভিডেন্ট ফান্ড : The Provident Fund Act, 1925-এর আওতায় বাংলাদেশে সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর বিধান করা হয়েছে। সাধারণত প্রতি মাসে সরকারি সরকারি চাকুরিজীবীদের মূল বেতনের ৬% থেকে ১২% তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় রাখা হয় এবং চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর এই সঞ্চয়ের লভ্যাংশসহ ফেরত দেয়া হয়। এছাড়া, আর্থিক বিপর্যয়ের সময়ও এই ফান্ড থেকে অগ্রিম টাকা উত্তোলন করা যায়।

(খ) অবসর ভাতা : সরকারি কর্মচারিরা চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর অবশিষ্ট জীবন নির্দিষ্ট হারে পেনশন পেয়ে থাকেন। পেনশন বা অবসর ভাতা মূল বেতনের ৮০ শতাংশ হারে দেয়া হয়। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ প্রভিডেন্ট ফান্ডের সাথে এককালীন দেয়া হয় এবং বাকি ৪০ শতাংশ প্রতি মাসে দেয়া হয়। পেনশন ব্যবস্থাপনা, পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া ও পেনশনের আওতার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু সংস্কার সাধন করেছে। অবসরকালে সরকারি কর্মচারিদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন আয় প্রবাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান শতভাগ নগদায়ন প্রথা রহিত করা হয়েছে। একইভাবে এ আয়কে মূল্যস্ফীতির প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য পেনশনের ক্ষেত্রেও ইনক্রিমেন্ট প্রদানের প্রথা চালু করা হয়েছে। শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারিদের মৃত্যুর পর তাদের বিধবা স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন এবং বিপত্নীক স্বামীকে সর্বাধিক ১৫ বছর মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও বছরে ২টি উৎসব ভাতা প্রদানের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে।[১৮৯]

(গ) গোষ্ঠী বীমা : ১৯৬৯ সালের গোষ্ঠী বীমা আইনের আলোকে বাংলাদেশের সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিরা গোষ্ঠী বীমার সুবিধা ভোগ করেন। এক্ষেত্রে কর্মচারিদেরকে তাদের বেতন অনুসারে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে হয় এবং তাদের উত্তরাধিকারীগণ তাদের বীমাকৃত টাকা পেয়ে থাকে। এছাড়া চাকুরিকালীন সময়ে কেউ মারা গেলে তার পরিবারকে এই গোষ্ঠী বীমার আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়।

(ঘ) গ্রাচ্যুয়িটি : যে সকল কর্মচারি তাদের চাকুরির মেয়াদ দশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ঐ চাকুরি ছেড়ে যায় তারা পেনশন-এর পরিবর্তে গ্রাচ্যুয়িটি সুবিধা ভোগ করে। এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে তার চাকুরির সময়কাল হিসাব করে প্রতি বছরের জন্য এক মাসের মূল বেতনের সমান অর্থ প্রদান করা হয়। তিন বছর বা ততোধিককাল কিন্তু পাঁচ বছরের কম সময় চাকুরি করলে তিন মাসের মূল বেতনের সমান গ্রাচ্যুয়িটি সুবিধা প্রদান করা হয়।

(ঙ) বেনেভোলেন্ট ফান্ড : এক্ষেত্রেও সরকারি কর্মচারিদের মাসিক বেতনের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতি মাসে জমা রাখা হয় এবং চাকুরি শেষে তা পেনশনের সাথে দেয়া হয়। বেনেভোলেন্ট ফান্ড তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের জন্য বাধ্যতামূলক; কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়।

(৫) সামাজিক সাহায্য : সামাজিক সাহায্য মূলত দুঃস্থ মানবতার সেবায় সরকার কর্তৃক গৃহীত এক সেবামূলক কার্যক্রম। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রকৃতিক দুর্যোগ বা অকস্মাৎ সৃষ্ট কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সরকারিভাবে ত্রাণ ও পুনর্বাসন আকারে সামাজিক সাহায্য প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অন্যান্য দুর্যোগকালীন সময়ে দুঃস্থ ও আক্রান্ত জনগণের মাঝে নগদ অর্থ সাহায্যসহ খাদ্য ও বস্ত্র সাহায্য দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপকরণ, কৃষিবীজ, সার, গৃহনির্মাণ সামগ্রী প্রভৃতি প্রদান করা হয়; আর এসবই সামাজিক সাহায্যের আওতাভুক্ত।

(৬) সামাজিক সেবা : বাংলাদেশে সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠিত সেবা কর্মসূচি রয়েছে; সেগুলি দেশের সার্বিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। প্রধান প্রধান সামাজিক সেবামূলক কার্যক্রম হচ্ছে– শহর সমাজসেবা কর্মসূচি, গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি, প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস,

---

১৮৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম, সরকারি শিশু সদন বা পরিবার, ছোটমনি নিবাস, দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্র, ভবঘুরেদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন, কিশোর-কিশোরীদের সংশোধনমূলক কার্যক্রম প্রভৃতি।

সার্বিকভাবে এটা হলো বাংলাদেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। তবে এই কর্মসূচিগুলো ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে চালুকৃত আরও কিছু কর্মসূচি রয়েছে যাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কর্মসূচিগুলো হলো– বয়স্ক ভাতা ও বিধবা ভাতা।

(ক) বয়স্ক ভাতা : ১৯৯৮ সাল থেকে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৬১টি থানার ইউনিয়নসমূহের প্রতি ওয়ার্ডে ১০ জন সর্বাপেক্ষা বয়োজৌষ্ঠ ও দরিদ্র ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়। এই ১০ জনের মধ্যে অন্তত ৫ জন হবে মহিলা। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে এই কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল ২৬০.৩৭ কোটি টাকা। বর্তমানে এ ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে ৩৫ লক্ষ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।[১৯০]

(খ) বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলদের জন্য ভাতা : ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছর থেকে এ কর্মসূচি চালু হয়। এই কর্মসূচির আওতায় প্রত্যেক ওয়ার্ডের ১০ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাকে মাসিক ১০০ টাকা করে প্রদান করা হত। ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে দেশের ৪৪৭৯টি ইউনিয়নের মোট ৪,০৩,১১০ জন বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের মাঝে মোট ৪,০৩,১১,০০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। ২০০০-২০০১ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ ছিল ২৫ কোটি টাকা। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে এই টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করে ১২৫ টাকা এবং ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে ১৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে এই কর্মসূচির আওতায় মাসিক ভাতার পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করে ১৬৫ টাকায় এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা আরো ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৬ লক্ষে উন্নীত করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জনপ্রতি ৫০০ টাকা হারে ১২.৬৫ লক্ষ জন বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হয়।[১৯১]

(৭) মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা : এ কার্যক্রমটি সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। পরবর্তীতে কার্যক্রমটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয় এ খাতে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে জন প্রতি মাসিক ৫০০ টাকা হিসাবে মোট ৫০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করে ৬০ হাজারে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে ১২,০০০ টাকা হারে প্রতিজনকে এ সম্মানী প্রদান করা হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কারণে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে ১০ লক্ষ মানুষ

ক্রমিক	কর্মসূচি	নতুন সুবিধাভোগীর সংখ্যা
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৫ লক্ষ
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতাদের জন্য ভাতা	১ লক্ষ ৩৫ হাজার
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১ লক্ষ ৭৫ হাজার
৪	মাতৃত্বকালীন ভাতা	১ লক্ষ
৫	দুগ্ধদানকারী মা	৫০ হাজার
৬	ভিজিডি	৪০ হাজার
৭	চা শ্রমিক	১০ হাজার

আগামী অর্থবছরে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় নিয়ে আসতে যাচ্ছে সরকার। তারপরও, বাইরে থাকবে শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি দরিদ্র মানুষ। অথচ, এ খাতের

১৯০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯*(ঢাকা : অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ১২৪
১৯১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

বরাদ্দের চার ভাগের এক ভাগই ব্যয় হয় সচ্ছল সরকারি চাকুরেদের পেনশনে। এ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন অর্থনীতির গবেষকরা। অর্থনীতির মূল স্রোতের বাইরে থাকা দরিদ্র মানুষদের জন্যই সরকারের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি।[১৯২]

বিআইডিএস'র জ্যেষ্ঠ গবেষক ড. নাজনীন আহমেদ জানান, এক্ষেত্রে আসলে একদম ছোট পদে চাকুরি করতেন সেই ব্যক্তি যেমন আছেন তেমনি সর্বোচ্চ পদে যিনি চাকুরি করছেন। যেমন সচিব বা সিনিয়র সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তারাও আছেন। তাদের সকলেরই অবসর ভাতা কিন্তু এই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচি থেকেই প্রদান করা হচ্ছে বলেও জানান ড. নাজনীন আহমেদ।

দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন ৪ কোটিরও বেশি। চলতি অর্থবছরে ১১৮টি কর্মসূচির আওতায় আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন ৭৫ লক্ষ মানুষ। এখনও সোয়া ৩ কোটিরও বেশি মানুষ রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার বাইরে। আগামী অর্থবছরে নতুন ১০ লক্ষ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা করছে সরকার। বাড়ছে বয়স্ক, বিধবা, অসচ্ছল, প্রতিবন্ধী, প্রসূতী মা ও ভিজিডির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের হিসাব মতে, যদি ১০ ভাগ বাড়ে তাহলে ৬ লক্ষ বাড়ার কথা। ২০২১ সালের আগেই এই রকম সহায়তা পাওয়ার জন্য যারা আছেন তাদের কাছে সহায়তা পৌঁছে যাবে বলেও জানানো হয়েছে। ২০১৫ সালে করা সরকারি হিসাব মতে, সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্য হার কমেছে ৮ শতাংশ।[১৯৩]

জাতীয় সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯ ও বাজেট ২০১৯-২০-এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহ

(ক.১) : নগদ প্রদানসহ বিভিন্ন ভাতা ও অন্যান্য কার্যক্রম

(ক.১.১) সামাজিক নিরাপত্তা :

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
১	বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম	৪০.০০	৪৪.০০	২৪০০.০০	২৬৪০.০০
২	বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের জন্য ভাতা	১৪.০০	১৭.০০	৮৪০.০০	১০২০.০০
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা	১০.০০	১৫.৪৫	৮৪০.০০	১৩৯০.৫০
৪	ক্যানসার, কিডনি ও লিভার সিরোসিস এবং অন্যান্য রোগীদের আর্থিক সহায়তা	০.১৫	০.৩০	৭৫.০০	১৫০.০০
৫	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	০.৪০	০.৫০	২০.০০	২৫.০০
৬	সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকি ভাতা	০.২১	০.২১	৫৪.৬৬	৬৩.৬৩
৭	বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন মঞ্জুরি	০.৮৮	১.০০	১০৫.০০	১২০.০০
৮	দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	৭.০০	৭.৭০	৬৯৪.০২	৭৬৩.২৭
৯	কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	২.৫০	২.৭৫	২৪৮.৮৮	২৭৩.১১
১০	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা	২.০০	২.০০	২৯৯৬.১৫	৩৩৮৫.০৫
১১	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা	০.১৫	০.১৫	৪১৫.০৫	৪৮০.১৫
১২	শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন	০.৩০	০.৩০	৩৩.৫০	৫১.০০
১৩	বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী (পরিধেয় বস্ত্র, কম্বল, বিস্কুট, ঢেউটিন ইত্যাদি)	১৩.০৯	১৪.৭৩	২২০.৮৪	২৪২.৯৫
১৪	দুর্যোগ অনুদান (থোক)	০.০০	০.০০	২১০.০০	৩৬৯.৬৪
১৫	অবাঙালি পুনর্বাসন	০.১৫	০.১৫	১০.০০	১০.০০
১৬	বিবিধ ত্রাণ কার্য (বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য)	০.০০	০.০০	৮১.০০	৮১.০০

১৯২. http://www.mof.gov.bd/en/index.php?option=com_content&view, visited on 10.07.2019
১৯৩. https://mof.portal.gov.bd/site/page/, visited on 15.07.2019

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
১৭	সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অবসর ও পারিবারিক অবসর ভাতা	৬.৩০	৬.৩০	২২৪৪৯.৪৬	২৩০১০.০০
	উপমোট: লক্ষজন ও কোটি টাকা (ক.১.১)	**৯৭.১৩**	**১১২.৫৩**	**৩১৬৯৩.৫৬**	**৩৪০৭৫.৩০**
(ক.১.২) সামাজিক ক্ষমতায়ন					
১	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি	০.৯০	১০০.০০	৮০.৩৭	৯৫.৬৪
২	প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি	০.৩৫	০.৩৫	২৫.০০	২৮.০০
	উপমোট: লক্ষজন ও কোটি টাকা (ক.১.২)	**১.২৫**	**১০০.৩৫**	**১০৫.৩৭**	**১২৩.৬৪**
	মোট লক্ষজন ও কোটি ক.১ (ক.১.১+ক.১.২)	**৯৮.৩৮**	**২১২.৮৮**	**৩১৭৯৮.৯৩**	**৩৪১৯৮.৯৪**
(ক.২.১) নগদ হস্তান্তর (বিশেষ) কর্মসূচি					
১	গৃহ নির্মাণ সহায়তা	২.৯৬	২.৯৬	২৫.০০	২৫.০০
২	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান	০.৬৯	০.৮১	১৭.৫০	২০.৫০
৩	চর, হাওড় ও পশ্চাদপদ এলাকার উন্নয়নে বিশেষ সাহায্য	০.৯০	০.২৩	২০০.০০	৫০.০০
৪	কৃষি পুনর্বাসন	০.০০	০.০০	১২০.০০	১২০.০০
	উপমোট: লক্ষজন ও কোটি টাকা (ক.২.১)	**৪.৫৫**	**৩.৯৯**	**৩৬২.৫০**	**২১৫.৫০**
	মোট লক্ষজন ও কোটি টাকা (ক)	**১০২.৯৩**	**২১৬.৮৭**	**৩২১৬১.৪৩**	**৩৪৪১৪.৪৪**
(খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি : সামাজিক সুরক্ষা					
১	ওএমএস	৭০.০৬	৮৯.৩৯	৭৪৪.২১	৯৪৯.৫২
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(৪.৫০)	(৫.৪০)
২	ভিজিডি	১৩৯.৮১	১৪২.৪৭	১৬৫৬.৪৫	১৬৯৮.৯১
		(জন মাস)	(জন মাস)	(৩.৬৭)	(৩.৭৪)
৩	ভিজিএফ	৭০.৭১	৮৩.৪১	১৮৯২.১৬	১৯৫৬.৯১
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(৪.৩৭)	(৪.৫০)
৪	জিআর (খাদ্য)	৫৬.৮২	৫৬.৮২	৫৪১.৭৪	৫৪৩.৫৯
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(১.২৫)	(১.২৫)
৫	খাদ্য সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)	৮.৪২	৮.৫৫	৩০৬.৭৬	৩১১.৫৭
		(জন মাস)	(জন মাস)	(০.৮০)	(০.৮০)
৬	কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)	১০.৭৫	১৭.১৪	৯৬৪.৬৮	১২০৪.০৮
		(জন মাস)	(জন মাস)	(২.৫৯)	(৩.২৭)
৭	কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা)	১৫.১৮	১৫.৮১	৭২০.০০	৭৫০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(০.০০)
৮	টিআর (নগদ)	১৯.০৬	২০.৯৮	১৩৯০.০০	১৫৩০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(০.০০)
৯	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান	৮.২৭	৮.২৭	১৬৫০.০০	১৬৫০.০০
		(জন মাস)	(জন মাস)	(০.০০)	(০.০০)
১০	খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি	০.৫০	০.৫০	৬৩৮.০০	২৬২৪.০০
		(লক্ষ জন)	(লক্ষ জন)	(৭.৪৮)	(৭.৪৮)
১১	খাদ্য ভর্তুকি	০.০০	০.০০	১২৫০.১১	১৩১০.১৭
	(খ) মোট (লক্ষ জন/কোটি টাকা)	**১৯৮.০৯**	**২৩০.১২**	**৫০৬৬.২২**	**৭৩৮৪.১৯**
	(খ) মোট (জনমাস/কোটি টাকা)	**২০১.৪৯**	**২১৩.২২**	**৬৬৮৭.৮৯**	**৭১৪৪.৫৬**
	(খ) মোট (কোটি টাকা)	**-**	**-**	**১১৭৫৪.১১**	**১৪৫২৮.৭৫**
(গ.১) ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি : সামাজিক ক্ষমতায়ন					
১	মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষুদ্রঋণ	০.২৮	০.৩৪	৫.০০	৬.০০
২	পিকেএসএফ-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি	৭৯.৩৭	২৬৮.৫৬	২৩২.০০	৭৮৫.০০
৩	সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম	০.২১	০.২৯	৪১.০০	৫৮.০০

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
৪	সোস্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন	০.০০	০.০০	৪০০.০০	২৩৫.০০
	উপমোট : লক্ষজন ও কোটি টাকা (গ.১)	**৭৯.৮৬**	**২৬৯.১৮**	**৬৭৮.০০**	**১০৮৪.০০**
(গ.২) বিবিধ তহবিল : সামাজিক ক্ষমতায়ন					
১	দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন তহবিল	০.৩০	০.৩৩	১.৫০	১.৬৫
২	নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট	০.০০	০.০০	২৫.৫০	২৭.৫০
৩	শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট	০.০০	০.০০	১১.৫০	১৫.০০
৪	জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ	০.৬৮	০.৭৯	৬০.০০	৭০.০০
৫	জয়িতা ফাউন্ডেশন	০.১০	০.১০	২.৪০	৩.৩০
৬	নারী উন্নয়ন ও উদ্যোক্তার জন্য বিশেষ সহায়তা তহবিল	-	-	১০৬.৬৫	১২৫.০০
৭	নির্যাতিতা দুঃস্থ মহিলা ও শিশুকল্যাণ তহবিল	-	-	৫০.০০	৫০.০০
৮	দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র কৃষক ও পোলট্রি খামারিদের সহায়তা তহবিল	১.০০	১.০০	১০০.০০	১০০.০০
৯	দক্ষতা উন্নয়ন ও ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তহবিল	০.১৭	০.১৭	৪০০.০০	৪০০.০০
	উপমোট : লক্ষজন ও কোটি টাকা (গ.২)	**২.২৫**	**২.৩৯**	**৭৫৭.২৫**	**৭৯২.৪৫**
(গ.৩) বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম : সামাজিক সুরক্ষা					
১	প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র	৩.৭৬	৩.৭৬	৬২.৯৩	৬৫.০০
২	বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	০.৬২	০.৮১	৫০.০৩	৬৭.১০
৩	ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	০.০৬	০.০৮	৩.০০	৪.০০
৪	হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	০.০৬	০.০৬	১১.৪০	৫.৫৬
৫	জীবিকায়নের জন্য মহিলাদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	০.০০	০.০০	৬.৮০	৬.৮০
৬	শিশু বিকাশ কেন্দ্র	০.০৩	০.০৩	৫.৮০	৬.৩০
৭	পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম	০.০২	০.০২	৩.৭০	৪.০০
৮	পরিবেশ পরিবর্তন তহবিল	৪.৫০	৪.৫০	৩০০.০০	৩০০.০০
৯	ন্যাশনাল সার্ভিস	১.৪৯	১.৫২	৬৬৯.৬০	৬৮১.৯১
১০	পেনশন বীমা স্কিম	০.০২	০.০২	১২.০০	১২.০০
১১	বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য থোক বরাদ্দ	০.০৮	০.৪০	২৯৯.০০	১৪৬৩.০০
	উপমোট : লক্ষ জনমাস ও কোটি টাকা (গ.৩)	**১০.৬৪**	**১১.২০**	**১৪২৪.২৬**	**২৬১৫.৬৭**
	মোট (গ) : লক্ষ জনমাস ও কোটি টাকা	**৯২.৭৫**	**২৮২.৭৮**	**২৮৫৯.৫১**	**৪৪৯২.১২**
	মোট নিরাপত্তা : লক্ষজন ও কোটি টাকা (ক.১.১ +খ)	**২৯৫.২২**	**৩৪২.৬৬**	**৩৬৭৫৯.৭৮**	**৪১৪৫৯.৪৯**
	মোট নিরাপত্তা : লক্ষ জনমাস (খ+গ.৩)	**২১২.১৩**	**২২৪.৪২**	**৮১১২.১৫**	**৯৭৬০.২৩**
	মোট ক্ষমতায়ন : লক্ষ জনমাস (ক.১.২ + ক.২.১ + গ.১ + গ.২) সর্বমোট কোটি টাকা (ক+খ+গ)	**৮৭.৯১**	**৩৭৫.৯২**	**১৯০৩.১২**	**২২১৫.৫৯**
	সর্বমোট : কোটি টাকা (ক+খ+গ)	**-**	**-**	**৪৬৭৭৫.০৫**	**৫৩৪৩৫.৩১**
	মোট পরিচালন বাজেট	**-**	**-**	**২৬৬,৭২৮**	**৩১০,২৬২**
	পরিচালন বাজেটের শতাংশ	**-**	**-**	**১৭.৫৪%**	**১৭.২২%**
(ঘ) উন্নয়ন খাতের কার্যক্রমসমূহ : সামাজিক ক্ষমতায়ন					
(ঘ.১) চলমান উন্নয়ন প্রকল্প					
১	বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)	০.১৭	০.২১	৪০.০০	৫০.০০
২	আশ্রয়ন-২ ও ৩ প্রকল্প	১২.৮৪	১০.৬৫	১১০১.২৭	৪৫০.০১

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
৩	প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রী উপবৃত্তি	১৩০.০০	১৪৩.৯৫	১৫৫০.০০	৭২২.৩৬
৪	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম ও দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কার্যক্রম	১৯.৩০	২৫.০০	৫১৮.১০	৪৭৪.৫৯
৫	রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন	৫.৫৭	৫.৬০	২২৭.৭০	১৫৬.২৬
৬	সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসিপ)	২৫.৩১	০.০০	৮১০.০০	৮৫০.০০
৭	সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এস.ই.এস.পি)	১০.০০	০.০০	২৬০.০০	১০৪.৮৬
৮	উচ্চ মাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রদান	৬.৭৮	০.০০	১৭৪.০০	২.৮৮
৯	শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন	০.০০	০.০০	৬.৯৫	১০৭.৯০
১০	* ম্যাটারনাল, নিউনেটাল, চাইল্ড এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ	৬৫৬.৩২	৬৯৭.৯৫	৭৮১.৯৭	৯২৮.৬৯
১১	* এসেনসিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি ও কমিউনিটি বেইজড হেলথ কেয়ার	১৩৪০.০০	১৩৮৩.১৬	৯৮৯.২৩	৯৮৭.৫৩
১২	* ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিসেস	৬৬১.৯৮	৯০০.০০	৮৯.০০	৯৬.০০
১৩	* ম্যাটারনাল, চাইল্ড, রিপ্রোডাকটিভ এন্ড এডোলেসসেন্ট হেলথ	৬৫৪.০২	৭৪৬.০৯	২০৬.০০	২৩৫.০০
১৪	* ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারি	৩৭.৭১	৩৪.৬১	৩৩৯.৪৫	২৮৬.০৮
১৫	* ফ্যামিলি প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারি	৩০৬.৫৭	৩৩০.৯৬	২৮৭.১৫	৩১০.০০
১৬	* টি.বি. লেপ্রোসি, কমিউনিকেবল এন্ড নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৪৪২.১৫	৩০২৯.২৫	৪০৯.৪১	৭৫২.৮৩
১৭	সরকারি শিশু পরিবার ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ	০.১২	০.০০	৪১.৯৫	০.০০
১৮	শিশুর বিকাশে প্রারম্ভিক শিক্ষা (৩য় পর্যায়)	০.৫০	০.৫০	১০.৫০	১৯.৬৩
১৯	নর্দান এরিয়ার্স রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিসিয়েটিভ	০.০২	০.০০	২০.৯০	০.০০
২০	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	০.০০	০.০০	২০৮১.৭১	৪১২৫.৫৩
২১	অগ্রাধিকারমূলক গ্রামীণ পানি সরবরাহ	-	-	৩৭২.০০	৫০২.১৭
২২	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন	০.১৬	১.৮৫	৭৫.০০	৮৬৭.৭৩
২৩	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট	০.৩৪	০.২৭	১৯০.০০	১৫৫.৫০
২৪	শিশু সুরক্ষা ও শিশু কল্যাণ	০.০০	০.০০	৯৪.৩৯	১৮৯.৩৯
২৫	এগ্রিকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট	০.৬৯	০.৮৫	৩৩.১০	৪০.৮৫
২৬	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ	০.৩৮	০.৫৮	৪৫.৫০	৭০.০০
২৭	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর	৪.৫৬	০.০০	১৭.০০	০.০০
২৮	বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (৩য় পর্যায়)	০.২৫	২.৫৯	১৫.০০	১৫৫.১২
২৯	বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	০.০০	০.০০	২০.০৫	১৮২.৭০
৩০	বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন	০.০০	০.০০	৮০.০০	২০০.০০
৩১	একটি বাড়ি একটি খামার	৯.০০	৯.০০	১১৫০.৭৯	১১৪৩.৫০
৩২	হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প	০.০০	০.০০	৩২৪.০০	৫৫২.২৩
৩৩	বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা	০.০০	০.০০	২৭৫৬.৭৫	৯৬১.৯৯
৩৪	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট	০.২৪	১০.১৮	২৭.২৭	২২৭.০০
৩৫	গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলাইটেশন) প্রজেক্ট	১.১৯	১.২৮	১৫২.৪৬	১৬৪.৫৬

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
৩৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প পার্বত্য চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়)	৪.৮৯	৫.২৭	৬৫.০০	৭০.০০
৩৭	তথ্য আপা : ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন	০.০০	০.০০	৮৮.৫৬	১৩০.০০
৩৮	বাংলাদেশ অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন	০.০০	০.০০	৬.৯৬	৬০.০০
৩৯	স্কিলস ফর ইমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম	২.১৩	২.৩৪	৩৯৪.০০	৪৩৩.২০
৪০	জেনারেশন ব্রেক থ্রু	০.০৫	০.১০	১.৪০	৩.০০
৪১	বিলুপ্ত ছিটমহলবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন	০.০০	০.০০	৪.১৩	৪.০১
৪২	ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট (যত্ন)	১.১৪	১০.৮১	৮১.৯৬	৭৭৮.১০
৪৩	বাংলাদেশ স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড প্রডাক্টিভিটি	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০
৪৪	বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	০.৩৪	০.৩৪	২১০.০০	২১০.০০
৪৫	গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ‘পল্লী জনপদ’ নির্মাণ	০.০১	০.০১	২৫.৪০	২৫.৪০
৪৬	উত্তরাঞ্চলের অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি	০.০৭	০.০৬	২৩.২৮	১৮.৭৪
৪৭	পোভার্টি রিডাকশন থ্রু ইনক্লুসিভ এন্ড সাসটেইনেবল মার্কেটস (প্রিজম)	০.০৪	০.০৪	৪৯.৪৫	৪৯.৪৫
৪৮	সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রাম	০.০০	০.০০	৮.৯২	৩.৩৫
৪৯	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর সোস্যাল প্রোটেকশন	০.০০	০.০০	১৯.৩০	১৭.০৮
৫০	স্কিলস এন্ড ইমপ্লয়মেন্ট প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ	০.০০	০.০০	৩৯.২৪	৩৭১.৫৪
৫১	উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প	০.০০	০.০০	২৭.০০	৪৩.০০
৫২	সাপোর্ট টু আরবান হেলথ এন্ড নিউট্রিশন টু দি আরবান বাংলাদেশ	০.৭৮	১.১৩	৩৮.৯৫	৫৬.৩৬
৫৩	স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহেন্সমেন্ট	০.০০	০.০০	৪৫৬.০০	০.০০
৫৪	নগরভিত্তিক প্রান্তিক মহিলা উন্নয়ন	০.৫৩	০.৫৩	১৯.৭৫	২০.৬৪
৫৫	২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন	০.০৬	০.০৬	১২.৭২	১১.৭৪
৫৬	উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ	০.৩০	০.৩০	৯২.৯৬	৯০.৭২
৫৭	নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম (৪র্থ পর্ব)	০.০০	০.০০	২১.০০	২৭.৩৮
৫৮	আমাদের বাড়ি : সমন্বিত প্রবীন শিশু নিবাস	০.০০	০.০০	১০.০৮	০.০০
৫৯	স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য উন্নত জীবন ব্যবস্থা	০.০০	০.০০	২৩.৬০	৪২.২০
৬০	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ (সিআরপি, মানিকগঞ্জ)	০.০০	০.০০	৩.০৬	১.০০
	ঘ.১ মোট চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি	**৫৩৩৬.৫০**	**৭৩৫৫.৫২**	**১৭০৩৬.৩২**	**১৮৫৩৯.৮০**
	বি.দ্র. : * চিহ্নে প্রদর্শিত কভারেজ সেবা গ্রহণের সংখ্যা।				
	(ঘ.২) নতুন উন্নয়ন প্রকল্প				
১	আরবান পাবলিক এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেন্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম	০.০০	০.০০	১১১.৬৭	১০৩.৮০
২	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প : (ডিএনসিসি ও ডিডিএম)	০.০০	০.০০	৪১২.৮১	৬২৭.০৫
৩	বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা এবং বিবিধ প্রশিক্ষণ কার্যাবলীর মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	০.০০	০.০০	৩.০১	২.৩৭

ক্রমিক নং	কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্পের নাম	কভারেজ (লক্ষ জন/জনমাস)		সংশোধিত বাজেট/বাজেট (কোটি টাকায়)	
		সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০	সংশোধিত বাজেট ২০১৮-১৯	বাজেট ২০১৯-২০
৪	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমনি নিবাস নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ	০.০০	০.০০	১.৮০	২০.০০
৫	ক্যাশ ট্রান্সফার মর্ডানাইজেশন	০.০০	০.০০	২.৮২	৩১.৩২
৬	অটিস্টিক শিশু ও মহিলাদের জন্য পাইলট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ	০.০০	০.০৪	২.৮৫	২.৮৫
৭	২১টি জেলার সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান	০.০০	০.০০	৩৩.৩৩	১৯.৭০
৮	জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ এবং টাওয়ার নির্মাণ	০.০০	০.০০	৯.১৭	৫১.৭৭
৯	প্রোমোটিং নিউট্রিশন সেনসেটিভ সোশ্যাল সিকিউরিটি এবং পলিসি সাপোর্ট প্রোগ্রামস	০.০০	০.০০	১৫.৩৮	৬.৩২
১০	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানা	০.০০	০.০০	০.০০	৭.০০
১১	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০	৪১৯.৬৪
১২	সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইডিপি)	০.০০	৪৪.৫২	০.০০	১০০০.০০
১৩	প্রতি জেলা/উপজেলায় অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণ	০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০
	উপমোট : লক্ষজন ও কোটি টাকা (ঘ.২)	**-**	**৪৪.৫৬**	**৫৯২.৮৪**	**২৩৯১.৮২**
	মোট : লক্ষজন ও কোটি টাকা (ঘ)	**৫৩৩৬.৫০**	**৭৪০০.০৮**	**১৭৬২৯.১৬**	**২০৯৩১.৬২**
	মোট : (সামাজিক নিরাপত্তা : কোটি টাকা)	**-**	**-**	**৪৪৮৭১.৯৩**	**৫১২১৯.৭২**
	সামাজিক নিরাপত্তা (বাজেটের %)	**-**	**-**	**১০.১৪**	**৯.৭৯**
	সামাজিক নিরাপত্তা (জিডিপির %)	**-**	**-**	**১.৭৭**	**১.৭৭**
	মোট (সামাজিক ক্ষমতায়ন : কোটি টাকা)	**-**	**-**	**১৯,৫৩২.২৮**	**২৩,১৪৭.৯১**
	সামাজিক ক্ষমতায়ন (বাজেটের %)	**-**	**-**	**৪.৪১**	**৪.৪২**
	সামাজিক ক্ষমতায়ন (জিডিপির %)	**-**	**-**	**০.৭৭**	**০.৮০**
	সর্বমোট উপকারভোগী (লক্ষ জন)	**৫৭১৯.৬৩**	**৮১১৮.৬৫**	**-**	**-**
	সর্বমোট (জনমাস)	**২১২.১৩**	**২২৪.৪২**	**-**	**-**
	সর্বমোট কর্মসংস্থান (বার্ষিক লক্ষ জন)	**১৭.৬৮**	**১৮.৭০**	**-**	**-**
	সর্বমোট কোটি টাকা (সামাজিক নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়ন)	**-**	**-**	**৬৪,৪০৪**	**৭৪,৩৬৭**
			মোট বাজেট	৪৪২,৫৪১	৫২৩,১৯০
			বাজেটের শতাংশ	**১৪.৫৫%**	**১৪.২১%**
			জিডিপি	২,৫৩৬,১৭৭	২,৮৮৫,৮৭২
			জিডিপির শতাংশ	**২.৫৪%**	**২.৫৮%**

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার উল্লেখযোগ্য সাফল্য : বাংলাদেশে ত্রাণ ও খাদ্য সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ মুকাবিলার উদ্দেশ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের সূচনা হলেও ক্রমেই এর সাথে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক অধিকার, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মসৃজন, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মুকাবিলা, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন এবং উন্নয়নের মত বিষয়গুলোকে যুক্ত করা হয়। বিগত দশকে বহুমাত্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলে অনেক ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য এসেছে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষার সুযোগ, জীবনমান উন্নয়ন এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি।[১৯৪]

১৯৪. http://www.mof.gov.bd/en/index.php?option=com_content&view, visited on 10.07.2019

বিগত এক দশকে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র্যের হার কমেছে। এই প্রবণতাকে বাংলাদেশের একটি বড় অর্জন হিসেবে মনে করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও নেতৃবৃন্দ। দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে সরকারের পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের তথ্য মতে দেশে দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে যা ২০০৯ সালের দিকে ছিল ৩১.৫ শতাংশ। একই সময়ে বাংলাদেশে অতিদরিদ্র পরিস্থিতির বেশ উন্নতি হয়েছে। দেশে অতিদরিদ্রের সংখ্যা কমেছে; সাত বছরের ব্যবধানে প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ অতি দরিদ্রসীমার উপরে উঠতে সক্ষম হয়। বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ হিসাবে অতিদরিদ্রের হার দেশের মোট জনসংখ্যার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে; যা ২০০৯ সারের দিকে ছিল ১৭.৬ শতাংশ।

বর্তমান সরকারের টানা তিন মেয়াদে পরিচালিত বিভিন্ন উপবৃত্তি কর্মসূচি বিশেষ করে মেয়েদের জন্য সকল শিক্ষাস্তরে বৃত্তি সহায়তার পরিমাণ ও পরিধি সম্প্রসারিত হওয়ার সুফল জাতি পেয়েছে। চলমান স্কুল ফিডিং কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য পড়াশুনা চালিয়ে নেয়া এবং পুষ্টিহীনতা রোধে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। প্রাথমিক স্তরে শিশু ভর্তির হার ২০০০ সালের দিকে ৮০ শতাংশ ছিল; যেটি ২০১৫ সালে প্রায় শতভাগে উন্নীত হয়। এ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার বেড়ে ৮০ শতাংশে পৌঁছায়। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধানে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭৮ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশে উন্নিত হয়। কয়েক বছরের মধ্যে শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণ বহুলাংশে বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে সমতা অর্জিত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৯.৪ শতাংশে উন্নিত হয়েছে এবং মোট শিক্ষার্থীর ৫৩ শতাংশ মেয়ে, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে যা ছিল মাত্র ৩৫ শতাংশ।

প্রান্তিক থেকে সকল পর্যায়ের জনগোষ্ঠীর মানুষকে মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য অনেকগুলো উদ্যোগ চালু রয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য সেবা বিশেষ করে গর্ভকালীন সেবা, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রীর সহায়তা, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার ফলে নরবজাতক মৃত্যুর ঘটনা অনেক কমে এসেছে। আরও একচি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পাওয়া। মাতৃমৃত্যু হার ২০০৫ সালের দিকে ছিল প্রতি লাখে ৩১৯ জন, যা ২০১৫ সালে মাত্র ১৭৬ জনে নেমে আসে। বিগত আট বছরে পাঁচ বছরের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ৬৪ থেকে ৩৪-এ নেমে এসেছে। সরকারের টিকাদান কার্যক্রম বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়িত হওয়ার ফলে দেশের ৯৯ শতাংশ শিশুকে টিকা দেয়া সম্ভব হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো হলো–[১৯৫]

- বর্তমানে দরিদ্রের হার ২৪.৩ শতাংশ যা ২০১০ সালে ৩১.৫ শতাংশ ছিল। আর অতিদরিদ্রের হার ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে, ২০০৯-২০১০ সালে এ হার ছিল ১৮ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে শিশু ভর্তির হার ২০০০ সালে ছিল ৮০ শতাংশ, যেটি ২০১৫ সালে শতভাগ।
- দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৭৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৯.৪ শতাংশ।
- প্রাথমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ৯৯.৪ শতাংশে উন্নীত।
- মাতৃমৃত্যু হার ২০০৫ সালে ছিল প্রতি লাখে ৩১৯ জন, যা ২০১৫ সালে ১৭৬-এ নেমে আসে।
- ৫ বছরের কম বয়সের শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ৬৪ থেকে ৩৪-এ নেমে এসেছে।
- ১ বছরের নিচের ৯৯ শতাংশ শিশু টিকা লাভ করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা : বাংলাদেশে বর্তমানে জাতীয় বাজেটের অধীনে ১৫০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। সরকারের ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, মহিলা ও শিশু

১৯৫. https://mof.portal.gov.bd/site/page/, visited on 15.07.2019

বিষয়ক এবং সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বৃহৎ অনেকগুলো কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। ভিজিডি, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতির সুবিধাভোগী নির্বাচন এবং এগুলোর সুফল প্রান্তিক মানুষ পাচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসন যুক্ত আছে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব জাতীয়ভাবে স্বীকৃত। ইতোমধ্যে সরকার সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্য তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্কার কার্যক্রম তথা জি-টু-পি পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে।[১৯৬] এর আওতায় প্রত্যেক উপকারভোগী সরকারি কোষাগার থেকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে নিজ নিজ পছন্দের ব্যাংক হিসাব বা মোবাইল হিসাবে মাসের নির্দিষ্ট তারিখে ভাতা পাবেন। পাশাপাশি, জাতীয় পরিচয়পত্রের সাথে সংযোগ রেখে প্রত্যেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার প্রস্তুত করা হচ্ছে, যা উপকারভোগী নির্বাচনে দ্বৈততা পরিহারে সহায়তা করবে। একই সাথে নতুন ভাতার আবেদন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, অর্থবরাদ্দ, অর্থছাড় ইত্যাদি বিষয়ও এর মধ্যে যুক্ত করা হচ্ছে। ফলে সরকারি সম্পদ ও সেবায় সাধারণ জনগণের অধিকার ও সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। ইতোমধ্যে পাইলট ভিত্তিতে মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচির ৭টি উপজেলায় জি-টু-পি'র মাধ্যমে ভাতা বিতরণ পদ্ধতির সূচনা করা হয়েছে। দেশের ১১টি জেলায় জি-টু-পি পদ্ধতিতে বয়স্কভাতা, বিধবা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা বিতরণের প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আধুনিকায়নের সাহায্য করছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে নতুন একটি প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ভাতা প্রত্যাশীদের চিহ্নিত করতে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জাতীয় খানা তথ্যভাণ্ডারের সাথে অধিদপ্তরের তথ্য ব্যবস্থাপনার সংযোগ করা হবে। সেই সাথে সুফলভোগীদের আরো নিরাপদ ও সহজে ভাতা সরবরাহ করার জন্য এর সাথে অর্থ পরিশোধকারীদের যুক্ত করে দেয়া হবে। দেশে বিদ্যমান ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে এটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা সেবা হিসেবে বিকশিত হবে।

মানব উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা : বর্তমানে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানব উন্নয়নের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

(ক) শিক্ষা প্রণোদনা : বর্তমান সরকার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের ফলে মেয়েদের অংশগ্রহণ বহুলাংশে বৃদ্ধির পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে সমতা অর্জিত হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে অসময়ে ঝরে পড়া রোধ করে পড়াশুনা চালিয়ে নিতে উপবৃত্তি কার্যক্রমের পরিধি আগের তুলনায় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়। গ্রাজুয়েট বা সমপর্যায়ে পড়াশুনা করা মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করেছে সরকার।

বর্তমান সরকার মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। মোবাইল ব্যাংকিংয়ে উপবৃত্তি বিতরণ প্রকল্পের নাম 'মায়ের হাসি'। এ প্রকল্প থেকে মোবাইল একাউন্টের মাধ্যমে বছরে ১৬০০ কোটি টাকা উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এখন ৩৩ লাখ শিশু শিক্ষার্থীর মা তাদের একাউন্টে টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। দেশের দারিদ্র্য প্রবন এলাকাগুলোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল ফিডিং চালু আছে। এছাড়াও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' প্রজেক্টের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা এবং আর্থিক সহায়তা লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৫টি উপবৃত্তি প্রকল্প চলমান রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তি (২য় পর্যায়), সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর

১৯৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (সেসেপ), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাক্সেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প, স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে বিগত দুই বছর ৪৫ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি লাভ করেছে।[১৯৭]

সুবিধাবঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশুকিশোরদের শিক্ষা সহায়তা হিসেবে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৮০ হাজারে এবং বার্ষিক বরাদ্দ ৫৪ কোটি ৪৮ লাখ টাকায় উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে ৫০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

মোটকথা, প্রাথমিক স্তরে ১ কোটি ৩০ লাখ শিশু শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে ৪৫ লাখ শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে। ৮০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উপবৃত্তি পাচ্ছে।

(খ) উন্নত স্বাস্থ্য সেবা : বিগত দশকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সরকারের বেশ কিছু সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওরা একযোগে কাজ করায় দেশের স্বাস্থ্য খাতে সাফল্য এসেছে। বাংলাদেশের মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা বিশেষ করে গর্ভকালীন সেবা, প্রসবকালীন এবং প্রসব পরবর্তী সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার ফলে নবজাতক মৃত্যুর হার অনেক কমেছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস পাওয়া। সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে প্রসবকালীন মাতৃমৃত্যু হার প্রতি এক লাখে ৬৩ তে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। সারাদেশে ১৬,৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গ্রামীণ, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদেরকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে নারীবান্ধব হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও সারা দেশে ১৩ হাজার টি মাতৃ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য, সেবা ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদেরকে মাতৃত্বকালীন এবং পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার জন্য সরকার ২০১৫ সালে ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এর আওতায় একজন নারী ২ বার সন্তান ধারণকালীন সময়ে প্রতিবার ৪টি করে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ২০০ করে টাকা পান। এরপর সন্তান প্রসবের পর ২ বছর পর্যন্ত শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মাসে ৫০০ করে এবং পরবর্তী ৩ বছর প্রতি তিন মাসে ১০০০ করে টাকা পান। শিশুদের পুষ্টি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করার জন্য পান ৫০০ টাকা। 'ম্যাটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম' থেকে সন্তানসম্ভাবা নারীদের জন্য গর্ভকালীন সময়ে ৩ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নিরাপদ সন্তান প্রসব, প্রসব পরবর্তী ১টি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারছে এবং এর জন্য যাতায়াত ভাতা পাচ্ছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১.৫০ লক্ষ জন নারী এ স্কিম থেকে সেবা ও আর্থিক সহায়তা নিয়েছে। সরকার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষ মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করেছে। বর্তমানে ২.০০ লক্ষ জন দুগ্ধদানকারী কর্মজীবী নারী ভাতা পাচ্ছে। এ ধরনের ভাতা কার্যক্রমের আর্থিক বরাদ্দ, ভাতার পরিমাণ এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা প্রতিবছর বাড়ানো হচ্ছে।

দেশে টিকাদান কার্যক্রমের পরিসর কয়েকগুণ বাড়ানো হয়েছে। শুরুতে ৬ ধরনের প্রতিষেধক নিয়ে শুরু হয়, এখন ১১টি প্রতিষেধক দেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য বাংলাদেশ এখন পোলিওমুক্ত দেশ। বাংলাদেশের টিকাদান কর্মসূচি জাতিসংঘ কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। পরিবার-পরিকল্পনা তথা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সাফল্য লাভ করেছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণকারীর

১৯৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১*(ঢাকা : অর্থমন্ত্রণালয়, ২০১৮), পৃ. ৪৬-৪৭

হার ছিল শতকরা ১০ জন আর এখন তা শতকরা ৬১ জন। পরিবার-পরিকল্পনা খাতের জন্য ৪র্থ হেলথ সেক্টর প্রোগ্রামের অধীনে সরকার ২০১৭-২০২১ সালের জন্য ৪ হাজার ৯২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে।[১৯৮]

মোটকথা, গত ১০ বছরে ১৬,৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। ১ লাখ ৫০ হাজার নারী ম্যাটারনাল হেলথ ভাউচার স্কিম থেকে সহায়তা পাচ্ছে। ২ লাখ দুগ্ধদানকারী কর্মজীবী নারী ভাতা পাচ্ছে। ১১টি প্রতিষেধক নিয়ে টিকাদান কর্মসূচি চলমান। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৪৯২০ কোটি টাকা পরিবার-পরিকল্পনা খাতের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(গ) পুষ্টি সহায়তা : সরকার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মূলক বিভিন্ন সহায়তা বিভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষদের বিশেষভাবে শিশুদের জন্য পুষ্টি সহায়তার ব্যবস্থা করছে। দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সদর হাসপাতাল এবং মেডিকেল কলেজে 'সিভিয়ার একিউট ম্যালনিউট্রিশন' প্রতিরোধের জন্য বিশেষ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশে এখন ২০০ 'সিভিয়ার একিউট ম্যালনিউট্রিশন' ইউনিট কাজ করছে। পুষ্টিহীনতা দূরীকরণে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল বিতরণ প্রকল্পের সফলতা এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।

দারিদ্র্য বিমোচন : বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে আসছে। সরকার দারিদ্র্য ঝুঁকি মুকাবেলা ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

(ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসৃজন : বৃহৎ পরিসরে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এমন কর্মসূচি পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের অনেকগুলো উদাহরণ সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ। এ ধরনের প্রকল্পগুলোতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে লাখ লাখ মানুষ অভাবের সাথে লড়াই করে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহায়তা, প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক উদ্যোগ নিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়েছে মানুষ। 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচি হলো দেশের প্রথম দিককার সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির একটি। এ কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। স্থানীয় হাটবাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বর্তমানে দেশের সব জেলায় চলমান এ প্রকল্পের জন্য ৩৬৮৪ কোটি ৩৬ লাখ টাকা বরাদ্দ অনুমোদন করেছে সরকার। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়াও সরকার 'এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট (ইজিপিপি)' চলমান রেখেছে, যেটির মাধ্যমে কাজের মন্দা চলাকালে অভাবী জনগোষ্ঠীর জন্য বছরে দুই বার স্বল্পমেয়াদি কাজের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ মানুষ স্বল্পমেয়াদি কাজ করে উপকৃত হয়েছে।[১৯৯]

গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পরিচালিত হচ্ছে টেস্ট রিলিফ (টিআর) প্রকল্প। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ ও মন্দির মেরামত এবং উন্নয়ন কাজে দরিদ্র মানুষের শ্রম কাজে লাগিয়ে খাদ্যশস্য সরবরাহ এবং নগদ অর্থ দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা হয়। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে প্রায় ১৮ লাখ মানুষ টিআর প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভ করেছে্ এছাড়াও ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি। এ কর্মসূচিতে দুঃস্থ ও অসহায় কিন্তু শারীরিকভাবে সক্ষম নারীদের খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ১ কোটি ৩৭ লাখ মানুষ খাদ্য সহায়তা পেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি হল 'একটি বাড়ি একটি খামার'। ফান্ড মোবিলাইজেশন ও ফার্মিংয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা

---

১৯৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

(এসডিজি) অর্জনে সরকার এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রথম দফা মেয়াদের শুরুর দিকে ২০০৯ সালে এটি চালু হয়। বর্তমানে দেশের সবগুলো জেলার ৪৯০ উপজেলার ৪০ হাজার ৯৫০ টি ওয়ার্ডে এটি চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় ৭০ হাজার ১৪৭টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি থেকে দেশব্যাপী প্রায় ৩৩ লাখ ৭১ হাজার ৪৮৭টি হতদরিদ্র পরিবার সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এ প্রকল্পে ১ কোটি ৬৯ লাখেরও বেশি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

মোটকথা, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বৃহৎ ৪টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ১.৮৩ কোটি জন মানুষ বিভিন্ন মেয়াদে কাজ করে অর্থ ও খাদ্য সহায়তা পেয়েছে। ২০.০০ লক্ষ জন মানুষ কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় কাজের সুযোগ পেয়েছে। ৮.৩০ লক্ষ জন মানুষ এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্যা পুওরেস্ট (ইজিপিপি) কর্মসূচির আওতায় কাজের সুযোগ পেয়েছে। ১৮.০০ লক্ষ জন মানুষ টেস্ট রিলিফ (টিআর) প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভ করেছে। ১.৩৭ কোটি জন মানুষ ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) কর্মসূচি থেকে সহায়তা পেয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার কর্মসূচির আওতায় ১.৬৯ কোটি জন মানুষ উপকৃত হয়েছে।

(খ) ঝুঁকি সহায়তা : দেশের কিছু অঞ্চলে পরিবশেগত কারণে কিছুটা দুর্যোগ প্রবণ। এছাড়াও প্রতিবছর দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মুখে পড়ে। দুর্যোগ প্রবণ এলাকা যেমন চরাঞ্চল, হাওড়, পাহাড়ি দুর্গম এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠী বছরের বিশেষ কিছু সময় খাদ্য সংকটে আক্রান্ত হয়। এ ধরনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষদেরকে সহায়তার জন্য বেশ কয়েকটি বড় মাপের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

অতিদরিদ্রদের জন্য ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) কর্মসূচি দেশের সর্বপ্রথম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম যা ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষ মুকাবিলার জন্য চালু করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, প্লাবন ইত্যাদির ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন মানুষদের জন্য ভিজিএফ থেকে খাদ্য সহায়তা দেয়া হয়েছে। ভিজিএফ কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও নানা সময় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ২০ কেজি করে চাল দেয়া হয়। যেসব পরিবারের মালিকানায় কোনো জমি নেই বা কোনো সম্পদ নেই, নারী শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল, দিনমজুরির আয়ে চলে, স্কুলগামী শিশুকে আয়ের জন্য নামতে হয়, যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা বা তালাকপ্রাপ্তা, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা, অক্ষম ও প্রতিবন্ধী পরিবারের প্রধান এমন সব পরিবারকে ভিজিএফ কার্ড দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। গত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রায় ৬৮ লাখ মানুষ ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্য সহায়তা পেয়েছে।[২০০]

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবেলার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সালের দিকে গ্রাটুইসাস রিলিফ (জিআর) নামক কর্মসূচি শুরু করে। দুর্যোগের ফলে ক্ষতির শিকার পরিবারকে জিআর কর্মসূচি থেকে খাদ্য ও অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রায় ৫৮ লাখ মানুষ এ প্রকল্প থেকে সহায়তা লাভ করেছে।

গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১৯৯৭ সালে 'আশ্রয়ণ' নামে একটি প্রকল্প নেয়া হয়। সরকারের অর্থায়নে এ পর্যন্ত তিন ধাপে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ১ লাখ ৬০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এরপর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে এ প্রকল্পে মোট বরাদ্দ ছিল ১২১৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এছাড়াও সরকার উদ্ভাবিত গৃহায়ণ, আদর্শ গ্রাম, গুচ্ছ গ্রাম, ঘরে ফেরা প্রভৃতি কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নিয়মিত বাজারের চেয়ে কম দামে জাতীয় খাদ্য সরবরাহ কার্যক্রম চালু আছে। সরকার ওপেন মার্কেট সেলস (ওএমএস) কর্মসূচির আওতায় স্বল্প আয়ের মানুষদের ন্যায্যমূল্যে খাদ্য পণ্য যেমন চাল, আটা, তেল, ডাল, চিনি ইত্যাদি সরবরাহ করে। এসব পণ্য সারা দেশে নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্র, ডিলার ও খোলাবাজারে পাওয়া যায়। বাজারের তুলনায় কম দামে নিত্যপণ্য কিনতে পেরে দরিদ্র মানুষেরা

---

২০০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫১

বিশেষ করে কর্মহীন, শ্রমিক শ্রেণি এবং শহরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ঋণপকৃত হচ্ছে। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ ওএমএস কর্মসূচির ফলে উপকৃত হয়েছে।

মোটকথা, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় ৬৮.০০ লক্ষ জন মানুষ খাদ্য সহায়তা পেয়েছে। জিআর কর্মসূচির আওতায় ৫৭.০০ লক্ষ জন মানুষ সহায়তা লাভ করেছে। আশ্রয়ণ কর্মসূচির আওতায় ১.৬০ লক্ষ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ওএমএস কর্মসূচির আওতায় ২.২০ কোটি জন মানুষ উপকৃত হয়েছে।

(গ) শ্রমিক কল্যাণ : বর্তমান সরকার দেশের শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। শ্রমি কল্যাণ তহবিল নামে ২২০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিল থেকে শ্রমিকেরা সহায়তা পেতে শুরু করেছে। শ্রমিকদেরকে বীমার আওতায় নিয়ে আসার জন্য একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। দুই হাজার পাঁচ শত শ্রমিককে এরই মধ্যে বীমার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়াও গার্মেন্টস কারখানায় কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ৩টি দশ তলা ভবন নির্মাণ করছে সরকার।

সামাজিক সুরক্ষা ভাতা কর্মসূচি : বর্তমান সরকার ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পরে দেশে প্রথমবারের মত বেশ কিছু সামাজিক সুরক্ষা ভাতা চালু করে। সরকার এবারের টানা তিন মেয়াদে বয়স্ক, দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী, প্রতিবন্ধী, চা বাগানের শ্রমিক, জেলে, হিজড়া, দলিত ও ভবঘুরে ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা বছর বছর বৃদ্ধি করে যাচ্ছে। বিশেষভাবে ঝুঁকিতে থাকা নারী যেমন বয়স্ক, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা ও দুঃস্থ নারী, গর্ভবতী এবং কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মায়েদের জন্য মাসিক ভাতা কর্মসূচি চালু আছে। চলমান অর্থবছরে এসব ভাতা কর্মসূচির সুবিধাভোগীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। সরকার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা বাবদ ২১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। এ কর্মসূচি থেকে ৩৫ লাখ দরিদ্র মানুষ মাসিক ৫০০ টাকা করে পাচ্ছে। একই সময়ে ১২ লাখ ৬৫ হাজার বয়স্ক, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা ও দুঃস্থ নারীর জন্য ৭৫৯ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং ৬ লাখ নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়া হচ্ছে। একজন নারী মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা পায়। এছাড়াও ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৮ লাখ ২৫ হাজার প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য ৬৯৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ৬০০ টাকা করে ভাতা পেয়েছে।[২০১]

হিজড়া এবং বেদে সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে ৬০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হচ্ছে। চা শ্রমিকদের জন্য অনুদান ১০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ১৫ কোটি করা হয়েছে। জেলে সম্প্রদায়ের মানুষদের পেশাগত ঝুঁকি এবং কর্মহীন সময় বিবেচনায় নিয়ে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বিশেস কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে ১০ লাখ জেলে এ কর্মসূচি থেকে কার্ড পেয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকার সহায়তা পেতে শুরু করেছে। এছাড়াও দুর্গম পাহাড়ি এলাকা, চরাঞ্চল এবং দারিদ্র্যপীড়িত এলাকাগুলোতে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মোটকথা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৫ লাখ মানুষ বয়স্ক ভাতা পেয়েছে। ১২ লাখ ৬৫ হাজার দুঃস্থ নারী ভাতা পাচ্ছে। ৬ লাখ অতিদরিদ্র নারীদেরকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়া হয়েছে। ৮ লাখ ৩০ হাজার প্রতিবন্ধী মানুষ ভাতা পেয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে 'রূপকল্প ২০২১' অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সরকার উন্নয়ন ভাবনাকে বাস্তবে রূপান্তরের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে প্রণীত ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) গ্রহণ করে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়ন শেষে বর্তমানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ পরিকল্পনাগুলোর মূল লক্ষ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও আয়বৈষম্য দূরীকরণ এবং মধ্যম

---

২০১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ : বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া। সরকার দেশের আর্থসামাজিক বাস্তবতায় এসব লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে বিবেচনা করেছে। সরকারের তিন মেয়াদকালীন সময়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য আর্থিক বরাদ্দ কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ব্যাপক সম্প্রসারণ করা হয়েছে।[২০২]

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার একটি সমন্বিত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশের সমৃদ্ধ অতীত অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। এ কৌশলের লক্ষ্য হলো বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর পরিমার্জন ও সংশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোকে আরও নিখুঁত ও কার্যকর করে তোলা এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা। এই নতুন ব্যবস্থায় ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশের বাস্তবতায় কর্মসংস্থান নীতি ও সামাজিক বীমা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল একদিকে যেমন আয় বৈষম্য কমাতে সহায়তা করবে, তেমনি অন্যদিকে এটি মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখবে। সেই সাথে এ খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর এবং এ খাতে বিনিয়োগকে উৎপাদনমুখী করার উদ্যোগ রয়েছে। এই কৌশলপত্রের মাধ্যমে চলমান ১৪৫টি কমূসূচিকে এক ছাতার নিচে নিয়ে আসা হবে। এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার। বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ৩ কোটিরও বেশি নর-নারীকে। জীবনের বিভিন্ন পর্বে প্রয়োজন মিটানোর জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। আগামী পাঁচ বছরে এই কৌশল ও পরিকল্পনার ভিত্তিতে দেশে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হবে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা কর্মবিমুখ জাতি চাই না। সবাই মিলে কাজ করে এ দেশকে সমৃদ্ধ করতে হবে। প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, বিধবা ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষরা যাতে কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দুঃস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার সুরক্ষায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে এক সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।'

মোটকথা, বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে আসছে। সরকারের একাধারে তিন মেয়াদকালীন সময়ে সামাজিক কর্মসূচির আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং পরিধি ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়ার ফলে এসব কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস সহ শিক্ষা, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে কিছু কিছু অপচয়, অপব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের গুণগতমান রক্ষা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায়। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুশাসন ও উপযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে সরকার বদ্ধ পরিকর। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনা অনুসরণ করে সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তথ্য নিয়ে একটি সমন্বিত এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) শক্তিশালী করণের কাজ চলমান রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে ভূমিকা পালনকারী কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামীতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি অধিকতর কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে এটাই সকল নাগরিকের একান্ত প্রত্যাশা।

---

২০২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, পৃ. ১-৩

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও আইনসমূহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তায় আইন বিভাগ

আইন হলো শান্তি, শৃঙ্খলা ও সামাজিক নিরাপত্তার রক্ষাকবজ। মানুষ যখন গোত্রবদ্ধ হয়ে বাস করতে শুরু করে তখন গোত্রের সদস্যগণের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং গোত্রের সদস্যগণ কর্তৃক আহরিত জীবন ধারণের সামগ্রীর বিলি-বণ্টন করতে গিয়ে সর্বপ্রথম গোত্রীয় রীতিনীতি ও আইনের প্রতিষ্ঠা করে– সেই রীতিটি হচ্ছে গোত্রের সকল সদস্য যার যার সামর্থ অনুযায়ী খাদ্য সামগ্রী এবং জীবন ধারণের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করবে এবং গোত্রের সকল সদস্যই প্রাপ্যতা সাপেক্ষে যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলি ভোগ করবে।[১] বিয়ে এবং যৌন-জীবনে যুক্তিযুক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গোত্রীয় সভ্যতাতেই সৃষ্টি হয় বিয়ে এবং যৌন-জীবন সংক্রান্ত রীতি-নীতি ও প্রথার। পরবর্তীতে আন্তঃগোত্রীয় সংঘাত বা সমন্বয়ের হাজার বছরের নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়ায় বিশ্বে গড়ে উঠে রাষ্ট্র নামক এক সুদূরপ্রসারী প্রতিষ্ঠানের। রাষ্ট্রের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আইনের সৃষ্টি হলো রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে হাম্মুরাবির কোডের মাধ্যমে মানব সভ্যতায় সংযোজিত হয় ধর্মীয় রীতি-নীতি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আইনের। ইহুদি, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, হিন্দু, মুসলিম প্রভৃতি প্রায় সকল ধর্মই সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য অনেক রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়ন করে গেছে যা আজও বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে।

মধ্যযুগে রাজার আদেশই ছিল আইন। তিনিই আইন তৈরি করতেন। তিনি তার ঘোষিত আইন প্রয়োগ করতেন, আবার তিনিই আইন ভঙ্গকারীর বিচার করতেন। অর্থাৎ রাজা ছিলেন একাধারে আইন প্রণেতা, বিচারক এবং আইন প্রয়োগকারী।[২] কিন্তু শত শত বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ এবং আইন লংঘনকারীর শাস্তি বিধানের ক্ষমতা এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে ন্যস্ত হলে রাষ্ট্র পরিচালনায় দেখা দেয় স্বৈরতন্ত্র। একই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি কাজ অর্থাৎ আইন প্রণয়ন, আইনের প্রয়োগ এবং আইন লংঘনকারীর শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে সৃষ্ট অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের জন্য গৃহীত উদ্যোগ ও চিন্তা-চেতনা থেকে অ্যারিস্টটল-প্লেটোর ধারাবাহিকতায় রাষ্ট্র এবং রাজনীতি-বিজ্ঞানীরা 'ক্ষমতা-স্বতন্ত্রীকরণ নীতি' সংক্রান্ত মতবাদ প্রচার করেন।[৩]

সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের আরেক যুগান্তকারী উদ্ভাবন হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন। রাজতান্ত্রিক এবং সাম্রাজ্যবাদী যুগে সুসংবদ্ধভাবে লিখিত কোনো সংবিধানের অস্তিত্ব না থাকলেও রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে সকল রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেই এমন কতকগুলো প্রথা বা রীতি-নীতি ছিল যেগুলিকে সাধারণ প্রথা বা রীতি-নীতি থেকে আলাদা শ্রদ্ধা ও গুরুত্বের সাথে মেনে চলা হত এবং সেগুলিই ছিল একটি নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালনাকারী বিধি-বিধান যার

---

১. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন*, *বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*(ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮), পৃ. ২১

২. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৯

৩. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন*, *বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র ধরে কালের বিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন। মিশরের ফারাও সম্রাটদের স্থাপিত সাম্রাজ্যের আইন ও আইনগত প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তেমন কিছু জানা না গেলেও রোমান আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববাসী পরিজ্ঞাত। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বের প্রায় সকল আইন ব্যবস্থা কম-বেশি রোমান আইন ব্যবস্থার নিকট ঋণী। একইভাবে বাংলাদেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা ভারতের মুসলিম শাসক ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত বেয়ে রোমান আইনের অনেক নীতি গ্রহণ করে নিয়েছে 'Principles of natural justice' এর নামে।[৪] উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশরা এ অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনের আগে এ ভূখন্ড মুসলিম শাসকগণের শাসনাধীন ছিল। স্বভাবতই মুসলিমরা এ অঞ্চলে মুসলিম আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৮১ সনে ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে মুসলিম ফৌজদারি আইনই বলবৎ ছিল। মুসলিম রাজত্বের পূর্বে এ অঞ্চলে হিন্দু রাজত্ব এবং হিন্দু আইন ও বিচার ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। লক্ষণীয় বিষয় হলো হিন্দু ও মুসলিম আইন ছিল মূলত ধর্মগ্রন্থ নির্ভর ধর্মীয় আইন। আইনের বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সংরক্ষণের জন্য আইন বিভাগ কর্তৃক যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে উল্লেখ করা হলো :

(ক) **সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বিষয়ক আইনসমূহ :** সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রণীত আইনসমূহ[৫] নিম্নরূপ :

1. The Constitution of the People's Republic of Bangladesh
2. The Bangladesh (Adaptation of Insurance Act) Order, 1972 (PO No. 19 of 1972)
3. The Bangladesh Insurance (Emergency Provisions) Order, 1972 (PO No. 30 of 1972)
4. The East Pakistan Madrasah Education Ordinance (Repeal) Order, 1972 (PO No. 43 of 1972)
5. The Bangladesh Nationalized Enterprises and Statutory Corporation (Prohibition of Strikes and Unfair Labor Practices) Order, 1972 (PO No. 55 of 1972)
6. The Bangladesh Power Development Boards Order, 1972 (PO No. 59 of 1972)
7. The Bangladesh College of Physicians and Surgeons Order, 1972 (PO No. 63 of 1972) [Repealed]
8. The Census Order, 1972 (PO No. 70 of 1972)
9. The Government Educational and Training Institutions (Adaptation) Order, 1972 (PO No. 71 of 1972)
10. The Bangladesh (Budgetary Provisions) Order, 1972 (PO No. 74 of 1972)
11. The National Board of Revenue Order, 1972 (PO No. 76 of 1972)
12. The International Financial Organizations Order, 1972 (PO No. 86 of 1972)
13. The Bangladesh (Freedom Fighters) Welfare Trust Order, 1972 (PO No. 94 of 1972) [Repealed]
14. The Bangladesh Insurance (Nationalization) Order, 1972 (PO No. 95 of 1972)
15. The Bangladesh Scouts Order, 1972 (PO No. 111 of 1972)
16. The Bangladesh Parjatan Corporation Order, 1972 (PO No. 143 of 1972)
17. The Bangladesh Rifles Order, 1972 (PO No. 148 of 1972) [Repealed]

---

৪. মোঃ শফিকুর রহমান, *বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/, visited on 01.01.2019

Dhaka University Institutional Repository

18. The Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (PO No. 149 of 1972)
19. The Bangladesh Insurance Corporation (Dissolution) Order, 1972 (PO No. 161 of 1972)
20. The Insurance Corporations Act, 1973 (Act No. VI of 1973)
21. The Chittagong University Act, 1973 (Act No. XXXIII of 1973)
22. The Jahangirnagar University Act, 1973 (Act No. XXXIVof 1973)
23. The Asian Development Bank Order, 1973 (PO No. 3 of 1973)
24. The Bangladesh House Building Finance Corporation Order, 1973 (PO No. 7 of 1973)
25. The Bangladesh Passport Order, 1973 (PO No. 9 of 1973)
26. The University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (PO No. 10 of 1973)
27. The Dhaka University Order, 1973 (PO No. 11 of 1973)
28. The Bangladesh Laws (Repealing and Amending) Order, 1973 (PO No. 12 of 1973)
29. The Bangladesh Atomic Energy Commission Order, 1973 (PO No. 15 of 1973)
30. The Trade Marks (Invalidation and Summary Registration) Order, 1973 (PO No. 19 of 1973)
31. The Bangladesh Wild Life (Preservation) Order, 1973 (PO No. 23 of 1973) [Repealed]
32. The Bangladesh Red Crescent Society Order, 1973 (PO No. 26 of 1973)
33. The Bangladesh Krishi Bank Order, 1973 (PO No. 27 of 1973)
34. The Special Police Establishment (Repeal) Act, 1974 (Act No. II of 1974)
35. The Press Council Act, 1974 (Act No. XXV of 1974)
36. The Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974)
37. The National Sports Council Act, 1974 (Act No. LVII of 1974) [Repealed]
38. The Islamic Foundation Act, 1975 (Act No. XVII of 1975)
39. The Blind Relief (Donation of Eye) Act, 1975 (Act No. XXV of 1975)
40. The Islamic Development Bank Act, 1975 (Act No. XXVIII of 1975)
41. The Nationalized Banks (Transfer of Business) Act, 1975 (Act No. XXXIV of 1975)
42. The Jute Companies (Acquisition of Shares) Ordinance, 1975 (Act No. XXXVI of 1975)
43. The District Administration (Repeal) Ordinance, 1975 (Ordinance No. XLV of 1975)
44. The Jatiya Rakkhi Bahini (Absorption in the Army) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LII of 1975)
45. The Bangladesh Government Hats and Bazars (Management) (Repeal) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LIX of 1975)
46. The Registration (Extension of Limitation) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LX of 1975)
47. The Universities Laws Amendment Ordinance, 1975 (Ordinance No. LXII of 1975)
48. The Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Repeal) Ordinance, 1975 (Ordinance No. LXIII of 1975)
49. The Dhaka Metropolitan Police Ordinance, 1976 (Ordinance No. III of 1976)
50. The International Finance Corporation Ordinance, 1976 (Ordinance No. XII of 1976) [Repealed]
51. The Pharmacy Ordinance, 1976 (Ordinance No. XIII of 1976)
52. The Investment Corporation of Bangladesh Ordinance, 1976 (Ordinance No. XL of 1976) [Repealed]
53. The Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976)

Dhaka University Institutional Repository

54. The Railway Nirapatta Bahini Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLVII of 1976) [Repealed]
55. The Newspapers (Annulment of Declaration) (Repeal) Ordinance, 1976 (Ordinance No. L of 1976)
56. The Inland Shipping Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXII of 1976)
57. The Chittagong Hill Tracts Development Board Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXVII of 1976) [Repealed]
58. The Rajshahi Town Development Authority Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXVIII of 1976) [Repealed]
59. The Police Officers (Special Provisions) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXIV of 1976)
60. The Bangladesh Rifles (Special Provisions) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXV of 1976) [Repealed]
61. The Bangabandhu National Agriculture Award Fund Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXVII of 1976)
62. The Chittagong Division Development Board Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXXIX of 1976)
63. The Vested and Non-Resident Property (Administration) (Repeal) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XCII of 1976)
64. The Bangladesh Malaria Eradication Board (Repeal) Ordinance, 1977 (Ordinance No. X of 1977) [Repealed]
65. The Government of Bangladesh (Services Screening) (Repeal) Ordinance, 1977 (Ordinance No. XV of 1977)
66. The Paurashava Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXVI of 1977) [Repealed]
67. The Housing and Building Research Institute Ordinance, 1977 (Ordinance No. XLIX of 1977)
68. The Rural Electrification Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LI of 1977) [Repealed]
69. The Bangladesh Public Service Commission Ordinance, 1977 (Ordinance No. LVII of 1977)
70. The Prevention of Malaria (Special Provisions) Ordinance, 1978 (Ordinance No. IV of 1978) [Repealed]
71. The Madrasah Education Ordinance, 1978 (Ordinance No. IX of 1978)
72. The Defence Services Laws Amendment Ordinance, 1978 (Ordinance No. XVIII of 1978) [Repealed]
73. The Asian Reinsurance Corporation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XXVII of 1978) [Repealed]
74. The Political Parties Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLV of 1978)
75. The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978) [Repealed]
76. The Chittagong Metropolitan Police Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVIII of 1978)
77. The Law Reforms Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLIX of 1978)

Dhaka University Institutional Repository

78. The International Centre for Diarrheal Disease Research, Bangladesh, Ordinance, 1978 (Ordinance No. LI of 1978)
79. The Defence Services (Supreme Command) Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXIII of 1979) [Repealed]
80. The Armed Police Battalions Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXV of 1979)
81. The Food-grains Supply (Prevention of Prejudicial Activity) Ordinance, 1979 (Ordinance No. XXVI of 1979)
82. The University Laws Amendment Act, 1980 (Ordinance No. I of 1980)
83. The Banks and Financial Institutions Laws Amendment Act, 1980 (Act No. IX of 1980)
84. The Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 (Act No. XI of 1980)
85. The Medical and Dental Council Act, 1980 (Act No. XVI of 1980) [Repealed]
86. The Dowry Prohibition Act, 1980 (Act No. XXXV of 1980) [Repealed]
87. The Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (Act No. XXXVI of 1980)
৮৮. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮০ (১৯৮০ সালের ৩৭ নং আইন)
89. The Bangladesh Consumer Supplies Corporation (Repeal) Act, 1981 (Act No. III of 1981)
90. The Administrative Tribunals Act, 1981 (Act No. VII of 1981)
91. The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. III of 1982)
92. The Zakat Fund Ordinance, 1982 (Ordinance No. VI of 1982)
93. The Drugs (Control) Ordinance, 1982 (Ordinance No. VIII of 1982)
94. The Standards of Weights and Measures Ordinance, 1982 (Ordinance No. XII of 1982) [Repealed]
95. The Bangladesh Flag Vessels (Protection) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XIV of 1982)
96. The Emigration Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXIX of 1982) [Repealed]
97. The Bangladesh Veterinary Practitioners Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXX of 1982)
98. The Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) [Repealed]
99. The Public Employees Discipline (Punctual Attendance) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXIV of 1982)
100. The Chittagong City Corporation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXV of 1982) [Repealed]
101. The Haor Development Board (Dissolution) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXVII of 1982)
102. The Institute of Islamic Education and Research (Repeal) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XLIII of 1982)
103. The Bangladesh Rural Development Board Ordinance, 1982 (Ordinance No. LIII of 1982) [Repealed]
104. The Electoral Rolls Ordinance, 1982 (Ordinance No. LXI of 1982) [Repealed]
105. The Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XX of 1983)

Dhaka University Institutional Repository

106. The Bangladesh Railway Board (Repeal) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXIV of 1983)
107. The Bangladesh Irrigation Water Rate Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXI of 1983)
108. The Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983)
109. The Marine Fisheries Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXV of 1983)
110. The Dhaka City Corporation Ordinance, 1983 (Ordinance No. XL of 1983) [Repealed]
111. The Bangladesh Homoeopathic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLI of 1983)
112. The Local Government (Union Parishads) Ordinance, 1983 (Ordinance No. LI of 1983) [Repealed]
113. The National Curriculum and Text-Book Board Ordinance, 1983 (Ordinance No. LVII of 1983) [Repealed]
114. The Bangladesh Nursing Council Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXI of 1983)
115. The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXVIII of 1983) [Repealed]
116. The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXIX of 1983) [Repealed]
117. The Christian Religious Welfare Trust Ordinance, 1983 (Ordinance No. LXX of 1983) [Repealed]
118. The Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture Ordinance, 1984 (Ordinance No. II of 1984) [Repealed]
119. The Land Reforms Ordinance, 1984 (Ordinance No. X of 1984)
120. The Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984)
121. The Fisheries Research Institute Ordinance, 1984 (Ordinance No. XLV of 1984) [Repealed]
122. The Districts (Extension to the Chittagong Hill-tracts) Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXI of 1984)
123. The Khulna City Corporation Ordinance, 1984 (Ordinance No. LXXII of 1984) [Repealed]
১২৪. ভূমি খতিয়ান (পার্বত্য চট্টগ্রাম) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সালের ২ নং অধ্যাদেশ)
125. The Public Servants (Dismissal on Conviction) Ordinance, 1985 (Ordinance No. V of 1985)
126. The Government Primary School Teachers Welfare Trust Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXVI of 1985)
127. Bangladesh Bridge Authority Ordinance, 1985 (Ordinance No. XXXIV of 1985) [Repealed]
128. The Youth Welfare Fund Ordinance, 1985 (Ordinance No. XL of 1985) [Repealed]
129. The Khulna Metropolitan Police Ordinance, 1985 (Ordinance No. LII of 1985)
130. The Official Vehicles (Regulation of Use) Ordinance, 1986 (Ordinance No. VI of 1986) [Repealed]
131. The Drugs (Supplementary Provisions) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XIII of 1986)
132. The Police (Non-Gazetted Employees) Welfare Fund Ordinance, 1986 (Ordinance No. XXXIII of 1986)
133. The Special Security Force Ordinance, 1986 (Ordinance No. XLIII of 1986)

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ৫৮ নং অধ্যাদেশ)
135. The Bangladesh Academy for Rural Development Ordinance, 1986 (Ordinance No. LXIV of 1986) [Repealed]
১৩৬. বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ২ নং আইন)
১৩৭. শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ১৫ নং আইন)
১৩৮. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ৩৮ নং আইন) [রহিত]
১৩৯. ত্রাণ ও পুনর্বাসন সারচার্জ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ১ নং আইন)
১৪০. অস্থাবর সম্পত্তি হুকুমদখল আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সালের ২৬ নং আইন)
১৪১. ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ৮ নং আইন) [রহিত]
১৪২. আয়োডিন অভাবজনিত রোগ প্রতিরোধ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১০ নং আইন)
143. The Ordnance Factories Board (Repeal) Act, 1989, Act No. 13 of 1989
১৪৪. বাংলাদেশ ঋণ সালিসি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন)
১৪৫. পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৬ নং আইন)
১৪৬. রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ১৯ নং আইন)
১৪৭. খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২০ নং আইন)
১৪৮. বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২১ নং আইন)
১৪৯. ভূমি আপিল বোর্ড আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সালের ২৪ নং আইন)
১৫০. বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ১০ নং আইন)
১৫১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২০ নং আইন) [রহিত]
১৫২. খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ৫৪ নং আইন)
১৫৩. বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ৩ নং আইন)
১৫৪. ব্যাংক-কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ১৪ নং আইন)
১৫৫. The Local Government (Upazila Parishad and Upazila Administration Reorganisation) (Repeal) Act, 1992, Act No. 2 of 1992
১৫৬. পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ১২ নং আইন)
১৫৭. রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ২৩ নং আইন)
১৫৮. জাতীয় স্থানীয় ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ২৭ নং আইন)
১৫৯. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৪ নং আইন) [রহিত]
১৬০. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৭ নং আইন)
১৬১. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৮ নং আইন)
১৬২. খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৩৯ নং আইন)
১৬৩. আভ্যন্তরীণ নৌযান শ্রমিক (নিয়োগ-নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সালের ৫০ নং আইন)
১৬৪. বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ১৫ নং আইন)
১৬৫. পারমানবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ২১ নং আইন) [রহিত]
১৬৬. The Bangladesh Jute Corporation (Repeal) Act, 1993, Act No. 24 of 1993
১৬৭. আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ২৭ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

১৬৮. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন)
১৬৯. সন্ত্রাসমূলক অপরাধ দমন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ২১ নং আইন)
১৭০. কোস্ট গার্ড আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ২৬ নং আইন) [রহিত]
১৭১. বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১ নং আইন)
১৭২. আনসার বাহিনী আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ৩ নং আইন)
১৭৩. ব্যাটালিয়ন আনসার আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ৪ নং আইন)
১৭৪. গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ৫ নং আইন)
১৭৫. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ১৫ নং আইন)
১৭৬. আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সালের ২১ নং আইন)
১৭৭. পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সালের ৬ নং আইন)
১৭৮. আইন কমিশন আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সালের ১৯ নং আইন)
১৭৯. বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সালের ২০ নং আইন)
180. The Indemnity (Repeal) Act, 1996, Act No. 21 of 1996
১৮১. দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সালের ১০ নং আইন)
১৮২. বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সালের ১২ নং আইন)
১৮৩. বিমান-নিরাপত্তা বিরোধী অপরাধ দমন আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সালের ১৭ নং আইন)
১৮৪. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১ নং আইন)
১৮৫. কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ৭ নং আইন)
১৮৬. বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ৮ নং আইন)
১৮৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১২ নং আইন)
১৮৮. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১৬ নং আইন)
১৮৯. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ২৪ নং আইন)
১৯০. পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সালের ২৩ নং আইন)
১৯১. আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৬ নং আইন)
১৯২. পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ১১ নং আইন) [রহিত]
১৯৩. ব্যাংক আমানত বীমা আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ১৮ নং আইন)
১৯৪. জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ১৯ নং আইন)
১৯৫. জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ২৭ নং আইন)
১৯৬. মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৩৬ নং আইন)
১৯৭. বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৩৮ নং আইন)
১৯৮. সালিস আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১ নং আইন)
১৯৯. সিলেট সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১০ নং আইন) [রহিত]
২০০. বরিশাল সিটি কর্পোরেশন আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১১ নং আইন) [রহিত]
২০১. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১২ নং আইন) [রহিত]

Dhaka University Institutional Repository

২০২. অর্পিত সম্পত্তি আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১৬ নং আইন)
২০৩. ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১৯ নং আইন)
২০৪. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন)
২০৫. রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৪ নং আইন)
২০৬. হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৫ নং আইন)
২০৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৬ নং আইন)
২০৮. মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৭ নং আইন)
২০৯. পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৮ নং আইন)
২১০. রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৩৯ নং আইন)
২১১. নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪১ নং আইন)
২১২. বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪২ নং আইন)
২১৩. পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪৩ নং আইন)
২১৪. যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪৪ নং আইন)
২১৫. বরিশাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪৫ নং আইন)
২১৬. শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪৬ নং আইন)
২১৭. সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৪৭ নং আইন)
২১৮. পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৩ নং আইন)
২১৯. ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৫৬ নং আইন)
২২০. জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা (রহিতকরণ) আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ৬০ নং আইন)
২২১. জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৬ নং আইন)
২২২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৭ নং আইন) [রহিত]
২২৩. জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ৮ নং আইন)
২২৪. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১১ নং আইন)
২২৫. নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১২ নং আইন)
২২৬. পুলিশ স্টাফ কলেজ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ২৫ নং আইন)
২২৭. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ২৭ নং আইন)
২২৮. দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ২৮ নং আইন)
২২৯. যৌথ অভিযান দায়মুক্তি আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১ নং আইন)
২৩০. গ্রাম সরকার আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৬ নং আইন) [রহিত]
২৩১. অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৭ নং আইন)
২৩২. অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৮ নং আইন)
২৩৩. চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩১ নং আইন)
২৩৪. রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩২ নং আইন)
২৩৫. খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩৩ নং আইন)
২৩৬. ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৩৪ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

২৩৭. দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৫ নং আইন)
২৩৮. বিরোধ মীমাংসা (পৌর এলাকা) বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ১২ নং আইন)
২৩৯. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ২৯ নং আইন)
২৪০. ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ২ নং আইন)
২৪১. ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ১১ নং আইন)
২৪২. জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৫ (২০০৫ সালের ২৮ নং আইন)
২৪৩. বেসরকারি নিরাপত্তা সেবা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১১ নং আইন)
২৪৪. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৭ নং আইন)
২৪৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৮ নং আইন)
২৪৬. গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ১৯ নং আইন)
২৪৭. বাংলাদেশ এ্যাক্রোডিটেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ২৯ নং আইন)
২৪৮. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩২ নং আইন)
২৪৯. রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৩৭ নং আইন)
২৫০. এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪০ নং আইন)
২৫১. রংপুর কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪৫ নং আইন)
২৫২. বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪৬ নং আইন)
২৫৩. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪৭ নং আইন)
২৫৪. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৮ নং আইন)
২৫৫. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৬ নং আইন)
২৫৬. সিলেট মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৩ নং আইন)
২৫৭. বরিশাল মহানগরী পুলিশ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৪ নং আইন)
২৫৮. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৬ নং আইন)
২৫৯. গ্রাম সরকার (রহিতকরণ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৮ নং আইন)
২৬০. বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ২৯ নং আইন)
২৬১. বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৩০ নং আইন)
২৬২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৩ নং আইন)
২৬৩. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৮ নং আইন)
২৬৪. মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৫৯ নং আইন)
২৬৫. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৬০ নং আইন)
২৬৬. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৬১ নং আইন)
২৬৭. জাতির পিতার পরিবার-সদস্যগণের নিরাপত্তা আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ৬৩ নং আইন)
২৬৮. মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ২ নং আইন)
২৬৯. জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৩ নং আইন)
২৭০. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১২ নং আইন)
২৭১. বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৩ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

২৭২. মৎস্য হ্যাচারি আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ১৪ নং আইন)
২৭৩. ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ২৩ নং আইন)
২৭৪. চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ২৫ নং আইন)
২৭৫. বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৩৫ নং আইন)
২৭৬. বাংলাদেশ গ্যাস আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৪০ নং আইন)
২৭৭. বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৪৯ নং আইন)
২৭৮. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৩ নং আইন)
২৭৯. প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৫ নং আইন)
২৮০. পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৬ নং আইন)
২৮১. জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৭ নং আইন)
২৮২. স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬০ নং আইন)
২৮৩. বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬১ নং আইন)
২৮৪. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৬৩ নং আইন)
২৮৫. জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ৭ নং আইন)
২৮৬. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প (ভূমি অধিগ্রহণ) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১১ নং আইন)
২৮৭. ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৫ নং আইন)
২৮৮. পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ (২০১১ সালের ১৬ নং আইন)
২৮৯. দেওয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১ নং আইন)
২৯০. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩ নং আইন)
২৯১. অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪ নং আইন)
২৯২. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৫ নং আইন)
২৯৩. পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৯ নং আইন)
২৯৪. বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৪ নং আইন)
২৯৫. প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৫ নং আইন)
২৯৬. বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিষণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৮ নং আইন)
২৯৭. পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক (অবসর গ্রহণ) (বিশেষ বিদান) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ২৯ নং আইন)
২৯৮. বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩০ নং আইন)
২৯৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৩৪ নং আইন)
৩০০. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪০ নং আইন)
৩০১. টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ৪৮ নং আইন)
৩০২. আদালত অবমাননা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪ নং আইন)
৩০৩. ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫ নং আইন)
৩০৪. বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৪ নং আইন)
৩০৫. সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৮ নং আইন)
৩০৬. জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৯ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

৩০৭. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৩৭ নং আইন)
৩০৮. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৩৯ নং আইন)
৩০৯. নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন)
৩১০. মাল্টি-লেভেল মার্কেটিং কার্যক্রম (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৪ নং আইন)
৩১১. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৫ নং আইন)
৩১২. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৮ নং আইন)
৩১৩. পিতামাতার ভরণ-পোষণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৯ নং আইন)
৩১৪. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫০ নং আইন)
৩১৫. নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫২ নং আইন)
৩১৬. এশিয়ান রি-ইন্সুরেন্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫৫ নং আইন)
৩১৭. গ্রামীণ ব্যাংক আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫৬ নং আইন)
৩১৮. পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫৭ নং আইন)
৩১৯. ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৫৯ নং আইন)
৩২০. বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৬১ নং আইন)
৩২১. ভোজ্যতেলে ভিটামিন ‘এ’ সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৬৫ নং আইন)
৩২২. বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৬ নং আইন)
৩২৩. পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৭ নং আইন)
৩২৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ৮ নং আইন)
৩২৫. ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১০ নং আইন)
৩২৬. ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১২ নং আইন)
৩২৭. রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১৯ নং আইন)
৩২৮. মেট্রোরেল আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ১ নং আইন)
৩২৯. ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ৫ নং আইন)
৩৩০. সরকারি যানবাহন (ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ৬ নং আইন)
৩৩১. যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ৮ নং আইন)
৩৩২. খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ (২০১৫ সালের ১২ নং আইন)
৩৩৩. রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ২ নং আইন)
৩৩৪. উদ্বৃত্ত সরকারি কর্মচারি আত্তীকরণ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩ নং আইন)
৩৩৫. বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪ নং আইন)
৩৩৬. এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৫ নং আইন)
৩৩৭. কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৭ নং আইন)
৩৩৮. বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৯ নং আইন)
৩৩৯. প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ (সর্বাধিনায়কতা) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ১৬ নং আইন)
৩৪০. চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ১৭ নং আইন)
৩৪১. রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ১৮ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

৩৪২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩১ নং আইন)
৩৪৩. যুবকল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩৩ নং আইন)
৩৪৪. রেলওয়ে সম্পত্তি (অবৈধ দখল উদ্ধার) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩৫ নং আইন)
৩৪৫. বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৩ নং আইন)
৩৪৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৬ নং আইন)
৩৪৭. বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৭ নং আইন)
৩৪৮. বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন)
৩৪৯. বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৪৯ নং আইন)
৩৫০. ক্যাডেট কলেজ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১ নং আইন)
৩৫১. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৪ নং আইন)
৩৫২. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৯ নং আইন)
৩৫৩. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১০ নং আইন)
৩৫৪. বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১১ নং আইন)
৩৫৫. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১২ নং আইন)
৩৫৬. বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১৬ নং আইন)
৩৫৭. বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১৭ নং আইন)
৩৫৮. বেসামরিক বিমান চলাচল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ১৮ নং আইন)
৩৫৯. স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২১ নং আইন)
৩৬০. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ২৩ নং আইন)
৩৬১. বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২ নং আইন)
৩৬২. রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩ নং আইন)
৩৬৩. কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫ নং আইন)
৩৬৪. বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৭ নং আইন)
৩৬৫. বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৮ নং আইন)
৩৬৬. শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৯ নং আইন)
৩৬৭. ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১০ নং আইন)
৩৬৮. প্রতিরক্ষা-বাহিনীসমূহের প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৩ নং আইন)
৩৬৯. শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৪ নং আইন)
৩৭০. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৫ নং আইন)
৩৭১. বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৭ নং আইন)
৩৭২. খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৮ নং আইন)
৩৭৩. গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ১৯ নং আইন)
৩৭৪. রংপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২০ নং আইন)
৩৭৫. বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৪ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

376. Sugar (Road Development Cess) (Repealed) Act, 2018, Act No. 26 of 2018
৩৭৭. ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৭ নং আইন)
৩৭৮. আবহাওয়া আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৮ নং আইন)
৩৭৯. চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩১ নং আইন)
৩৮০. খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩২ নং আইন)
৩৮১. প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৩ নং আইন)
৩৮২. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৫ নং আইন)
৩৮৩. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৬ নং আইন)
৩৮৪. বস্ত্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৭ নং আইন)
৩৮৫. সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৮ নং আইন)
৩৮৬. জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪১ নং আইন)
৩৮৭. হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪২ নং আইন)
৩৮৮. কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৪ নং আইন)
৩৮৯. জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৫ নং আইন)
৩৯০. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন)
৩৯১. সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৭ নং আইন)
৩৯২. জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৪৯ নং আইন)
৩৯৩. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫১ নং আইন)
৩৯৪. কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫২ নং আইন)
৩৯৫. বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৩ নং আইন)
৩৯৬. হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৫ নং আইন)
৩৯৭. ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৬ নং আইন)
৩৯৮. সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭ নং আইন)
৩৯৯. মানসিক স্বাস্থ্য আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬০ নং আইন)
৪০০. সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন)
৪০১. জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬২ নং আইন)
৪০২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৩ নং আইন)
৪০৩. বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৪ নং আইন)
৪০৪. বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৫ নং আইন)
৪০৫. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৬ নং আইন)
৪০৬. বাংলাদেশ স্টান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউটশন আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৭ নং আইন)
৪০৭. বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬৯ নং আইন)
৪০৮. বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৭১ নং আইন)
৪০৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ৫ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

৪১০. উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ৬ নং আইন)

৪১১. বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ৭ নং আইন)

৪১২. বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ৮ নং আইন)

৪১৩. প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১২ নং আইন)

৪১৪. বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ১৩ নং আইন)

(খ) **নারী ও শিশুর নিরাপত্তা বিষয়ক আইনসমূহ :** নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রণীত আইনসমূহ[৬] নিম্নরূপ :

1. The Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974)
2. The Breast-Milk Substitutes (Regulation of Marketing) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXIII of 1984) [Repealed]
3. The Bangladesh Women's Rehabilitation and Welfare Foundation (Repeal) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVII of 1984)

৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ১৮ নং অধ্যাদেশ)

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সালের ৮ নং আইন)

৬. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৬ নং আইন)

৭. যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩৯ নং আইন)

৮. কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪৮ নং আইন)

9. The Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974) [Repealed]
10. The Primary Education Laws (Repeal) Act, 1974 (Act No. LV of 1974)
11. The Bangladesh Shishu Academy Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXXIV of 1976) [Repealed]
12. The Bangladesh Abandoned Children (Special Provisions) (Repeal) Ordinance, 1982 (Ordinance No. V of 1982)
13. The Primary Education (Repeal) Ordinance, 1983 (Ordinance No. XLV of 1983)

১৪. জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সালের ৯ নং আইন)

১৫. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১ নং আইন)

১৬. এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ২ নং আইন)

১৭. পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮ নং আইন)

১৮. প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করণ) আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৭ নং আইন)

১৯. শিশু-মাতৃ স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট আইন, ২০০২ (২০০২ সালের ১৬ নং আইন)

২০. শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ২৪ নং আইন)

২১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১৪ নং আইন)

২২. মাতৃদুগ্ধ বিকল্প, শিশু খাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও উহা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৩৫ নং আইন)

২৩. বাংলাদেশ শিশু একাডেমি আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৯ নং আইন)

---

৬. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/, visited on 10.04.2019

Dhaka University Institutional Repository

(গ) **শ্রমিকের নিরাপত্তা বিষয়ক আইনসমূহ :** শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রণীত আইনসমূহ[৭] নিম্নরূপ :

1. The Bangladesh (Taking Over of Control and Management of Industrial and Commercial Concerns) Order, 1972 (APO No. 1 of 1972)
2. The Bangladesh (Administration of Financial Institutions) Order, 1972 (APO No. 3 of 1972)
3. The Bangladesh Shipping Corporation Order, 1972 (PO No. 10 of 1972) [Repealed]
4. The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalization) Order, 1972 (PO No. 27 of 1972) [Repealed]
5. The Bangladesh Industrial Development Corporation Order, 1972 (PO No. 39 of 1972)
6. The Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972 (PO No. 68 of 1972)
7. The Bangladesh Shilpa Rin Sangstha Order, 1972 (PO No. 128 of 1972)
8. The Bangladesh Shilpa Bank Order, 1972 (PO No. 129 of 1972)
9. The Bangladesh Industrial Development Corporation (Dissolution) Order, 1972 (PO No. 140 of 1972)
10. The Public Servants (Retirement) Act, 1974 (Act No. XII of 1974)
11. The Essential Services Laws (Amendment) Act, 1974 (Act No. XXXVII of 1974)
12. The Services (Reorganization and Conditions) Act, 1975 (Act No. XXXII of 1975)
13. The Government of Bangladesh (Services) (Repeal) Ordinance, 1975 (Ordinance No. XLIV of 1975)
14. The Government Servants (Review of Penalties) Ordinance, 1975 (Ordinance No. XLVIII of 1975)
15. The Bangladesh Jute Corporation (Repeal) Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLIX of 1976)
16. The Public Servants (Marriage with Foreign Nationals) Ordinance, 1976 (Ordinance No. LVII of 1976) [Repealed]
17. The Tea Ordinance, 1977 (Ordinance No. XXXVIII of 1977) [Repealed]
18. The Regulation of Salary of Employees Laws Repeal Ordinance, 1977 (Ordinance No. XLII of 1977)
19. The Bangladesh Travel Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1977 (Ordinance No. XLVIII of 1977) [Repealed]
20. The Bangladesh Handloom Board Ordinance, 1977 (Ordinance No. LXIII of 1977) [Repealed]
21. The Government Servants (Review of Penalties) (Dissolution of Review Board) Ordinance, 1978 (Ordinance No. II of 1978)
22. The Government Servants (Special Provisions) Ordinance, 1979 (Ordinance No. XI of 1979)
23. The Bangladesh Hotels and Restaurants Ordinance, 1982 (Ordinance No. LII of 1982) [Repealed]
24. The Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Ordinance No. LV of 1983)
25. The Agricultural Labor (Minimum Wages) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XVII of 1984)
26. The Industrial Relations (Regulation) (Repeal) Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXII of 1984)

---

৭. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/, visited on 20.05.2019

Dhaka University Institutional Repository

২৭. বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সালের ৬২ নং অধ্যাদেশ) [রহিত]
২৮. বাংলাদেশ চা শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ১ নং আইন)
২৯. চা আইন, ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩৮ নং আইন)
৩০. বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ২৫ নং আইন) [রহিত]
৩১. বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ১ নং আইন)
৩২. ইপিজেড শ্রমিক সংঘ ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ২৩ নং আইন) [রহিত]
৩৩. ইপিজেড শ্রমিক কল্যাণ সমিতি ও শিল্প সম্পর্ক আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৪৩ নং আইন)
৩৪. পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরীর শর্তাবলী) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ২৮ নং আইন) [রহিত]
৩৫. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ২৫ নং আইন)
৩৬. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪২ নং আইন)
৩৭. ট্রেডমার্ক আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৯ নং আইন)
38. Public Servants (Retirement) (Amendment) Act, 2012, Act No. 2 of 2012
৩৯. বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সালের ১৫ নং আইন)
৪০. বাংলাদেশ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৫ নং আইন)
৪১. ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৩০ নং আইন)
৪২. পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকরীর শর্তাবলী) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫০ নং আইন)
৪৩. বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯ (২০১৯ সালের ২ নং আইন)
44. The Development of Industries (Control and Regulation) (Repeal) Act, 1990, Act No. 25 of 1990
৪৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সালের ২৮ নং আইন)

বাংলাদেশের আইন বিভাগ কর্তৃক সময়ের প্রয়োজনে সমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও জন-নিরাপত্তা নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে, তার একটি তালিকা উপরে উল্লিখিত হলো। একটি আইনের ব্যাপকতা অনেক। তাই দেখা যায় একটি আইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র একাধিক শ্রেণি, গোষ্ঠী ও পেশার মানুষ। প্রয়োগ ক্ষেত্রের আধিক্যের ভিত্তিতে উপরের শ্রেণি বিন্যাস করা হয়েছে। এ সকল আইনের আলোকে বাংলাদেশ সরকারের অন্য দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ– বিচার ও শাসন বিভাগ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তায় বিচার বিভাগ

সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা মানব সভ্যতা বিশেষত সামাজিক নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গণপরিষদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে এবং সংবিধানের ১৫৩ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে সংবিধান বলবৎ হয়। সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট[৮], দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অধস্তন আদালত[৯] ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল[১০] সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ গড়ে উঠেছে উর্ধ্বতন বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট), অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ) এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সমন্বয়ে। বাংলাদেশ সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। সরকারের অন্য দু'টি বিভাগ হলো আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ।

বাংলাদেশের বিচার বিভাগসমূহ

(ক) উর্ধ্বতন বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) : সংবিধানের ১ নং অনুচ্ছেদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ কোনো ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র না হওয়ায় অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে পৃথক সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা সংবিধান প্রণেতারা সমীচীন মনে করেননি। সেজন্য বাংলাদেশে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং উভয় বিভাগের বিচারপতিদের নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত। প্রধান বিচারপতি ও আপিল বিভাগে নিযুক্ত বিচারপতিগণ কেবল ঐ বিভাগে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ হাইকোর্ট বিভাগে আসন গ্রহণ করেন। সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ বিচারকার্য পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ করেন।[১১] প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।[১২] বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকায় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকলেও মহামান্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন নিয়ে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য স্থানে বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশনের ব্যবস্থা করতে পারেন।[১৩] সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর দ্বারা উপরোক্ত বিধান বাতিল করে হাইকোর্ট বিভাগের রাজধানীতে স্থায়ী আসনে বসা ব্যতীত বরিশাল, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোর, রংপুর ও সিলেটে আরো ছয়টি স্থায়ী বেঞ্চ গঠন করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিভাগ দু'টি হলো আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ।

(খ) বাংলাদেশের অধস্তন বিচার বিভাগসমূহ : সুপ্রিম কোর্ট ছাড়াও আইনের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে অন্যান্য অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। বিচার বিভাগের পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তাদের নিয়োগ করবেন রাষ্ট্রপতি। জেলা বিচারকের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সুপারিশক্রমে নিয়োগ দান করবেন

---

৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ১৯৯৮), পৃ. ৩৮-৪৬
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত সরকারি কর্মকমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শক্রমে তিনি নিয়োগ দান করবেন। কোনো ব্যক্তি জেলা বিচারকের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন যদি তিনি নিয়োগ লাভের সময় প্রজাতন্ত্রের কর্মে রত থাকেন এবং উক্ত কর্মে অন্যূন সাত বছরকাল বিচার বিভাগীয় পদে বহাল থাকেন অথবা অন্যূন দশ বছর কাল অ্যাডভোকেট হয়ে থাকেন। বিচার বিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে রত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি দান ও অন্যান্য বিষয়ে শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকে।[১৪] বাংলাদেশের অধস্তন বিচার বিভাগগুলো নিম্নরূপ :

দেওয়ানি বিচার বিভাগ : বর্তমানে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের অধীনস্থ নিম্নলিখিত পাঁচ শ্রেণির অধস্তন দেওয়ানি আদালতগুলো দেওয়ানি মামলার বিচার করে থাকেন।[১৫] যথা :

- জেলা জজ বা জেলা বিচারকের আদালত;
- অতিরিক্ত জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা বিচারকের আদালত;
- সাবেক সাবজজ বা উপবিচারকের বর্তমানে যুগ্ম জেলা জজ বা বিচারকের আদালত;
- জ্যেষ্ঠ সহকারি জজ বা জ্যেষ্ঠ সহকারি বিচারকের আদালত;
- সহকারি জজ বা সহকারি বিচারকের আদালত।

প্রতিটি জেলায় বিচার বিভাগের প্রধান হলেন জেলা জজ বা জেলা বিচারক। পার্বত্য জেলাগুলোতে যেখানে পৃথক কোনো দেওয়ানি আদালত ছিল না। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটরাই দেওয়ানি আদালতের দায়িত্ব পালন করতেন।[১৬] তবে সম্প্রতি সেখানে দেওয়ানি আদালত গঠিত হয়েছে এবং কাজ করছে। হাইকোর্ট বিভাগের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে জেলা জজের গোটা জেলার সকল দেওয়ানি আদালতের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। জেলা জজের প্রধানত আপিল মামলার বিচার করার ও মামলা পর্যালোচনা করার এখতিয়ার রয়েছে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার মৌলিক এখতিয়ারও রয়েছে। অতিরিক্ত জেলা জজের এখতিয়ার জেলা জজের এখতিয়ারের মতোই সমবিস্তৃত। তিনি জেলা জজ কর্তৃক তার উপর অর্পিত বিচারিক দায়িত্ব পালন করেন। সহকারি জজ ও অধস্তন জজের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি বা আদেশের বিরুদ্ধে আপিল জেলা জজদের আদালতে করতে হয়। অনুরূপভাবে জেলা জজ সহকারি জজদের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি, বা আদেশের বিরুদ্ধে আনীত আপিলগুলো যুগ্ম জেলা জজদের কাছে নিষ্পত্তির জন্য পাঠাতে পারেন। যুগ্ম জেলা জজদের দেওয়ানি বিষয়ক সীমাহীন মৌলিক এখতিয়ার রয়েছে।[১৭]

দেওয়ানি আদালতগুলো উত্তরাধিকার, বিবাহ বা জাতপাত কিংবা ধর্মীয় রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত যে কোনো প্রশ্নের নিষ্পত্তিকালে পক্ষগুলো যেখানে মুসলিম সেক্ষেত্রে মুসলিম আইন আর হিন্দু হলে হিন্দু আইন প্রয়োগ করে থাকে। তবে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোনো অধিনিয়মের (Enactment) দ্বারা এ জাতীয় আইনের পরিবর্তন বা বিলোপ ঘটে থাকলে সেসব ক্ষেত্রেই এর ব্যত্যয় ঘটে।

অর্থঋণ আদালত : সরকার অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ৮ নং আইন) এর বিধানাবলীর অধীনে প্রতি জেলায় একটি করে অর্থঋণ আদালত গঠন করেছেন এবং সুপ্রিম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে অধস্তন বিচারকদের এই আদালতের বিচারক পদে নিয়োগ দিয়েছেন।[১৮] ব্যাংক, বিনিয়োগ করপোরেশন, গৃহনির্মাণ

---

১৪. ড. এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ২০০৬), পৃ. ৮০৯
১৫. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*(ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২৪৯
১৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), খ.৭, পৃ. ৭৪
১৭. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপীল বিষয়ক আইন*(ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০১), পৃ. ১-৭
১৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ঋণদান সংস্থা, লিজিং কোম্পানি ইত্যাদির মতো অর্থ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান এবং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর বিধানাবলীর অধীনে গঠিত ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনাদায়ী ঋণ আদায়ের সকল মামলা অর্থঋণ আদালতে দায়ের করতে হয় এবং এ জাতীয় মামলাগুলো এককভাবে এই শ্রেণির আদালতে বিচারযোগ্য। অর্থঋণ আদালত একটি দেওয়ানি আদালত এবং দেওয়ানি আদালতের যাবতীয় ক্ষমতা এই আদালতের রয়েছে।[১৯]

অর্থনেতিক কর্মকাণ্ডের উন্নতি ও নিরাপত্তার একটি জাতি ও সমাজের উন্নতি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে। তাই বাংলাদেশে জাতীয়করণকৃত ও বেসরকারি ব্যাংকগুলো দেশের বিভিন্ন সেক্টরের উন্নয়নের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। তা ছাড়াও কিছু অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি, বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক খাতে অর্থ লগ্নী করে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে আসছে। এক ধরনের অসাধু লোক এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থলগ্নী করে প্রকৃত খাতে ব্যয় না করে উক্ত অর্থ আত্মসাতের চেষ্টা করে। দেশের এক শ্রেণির লোকদের মধ্যে এই প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে একদিকে যেমন দেশের উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রগতি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছিল, অন্যদিকে অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার পথে যাচ্ছিল।

পুর্বে প্রচলিত ১৯১৩ সালের সরকারি দাবি আইনের অধিক্ষেত্র সীমিত এবং ১৯৮৯ সালের অর্থঋণ অধ্যাদেশ অকার্যকর হওয়ায় এই পরিস্থিতি মুকাবেলা করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। এহেন পরিস্থিতি মুকাবেলা করার জন্য দেশের অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ও দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতি অব্যাহত রাখার মানসে ১৯৯০ সালে অর্থঋণ আদালত আইনের সৃষ্টি হয়। এই আইন ১৯৯০, ১৯৯২ ও ১৯৯৭ সালে সংশোধিত হয়। এরূপ সংশোধন করেও আইনটিকে সময়ের ও প্রয়োজনের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি। তাই ১৯৯০ সালের অর্থঋণ আদালত আইন সংশোধন করে ২০০৩ সালে এই অর্থঋণ আদালত আইন প্রণীত হয়েছে।

পারিবারিক আদালত : পারিবারিক বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে পারিবারিক আদালত। ১৯৬১ সালের মুসলিম ও পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ও পরবর্তীতে সংশোধিত পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর বিধানাবলী সাপেক্ষে কোনো পারিবারিক আদালতের পাঁচটি বিষয়াদির সকল অথবা যেকোনোটির সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে যেকোনো মামলা গ্রহণ, বিচার এবং নিষ্পত্তি করার একক এখতিয়ার রয়েছে। বিষয়গুলো হলো : (১) বিবাহবিচ্ছেদ, (২) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, (৩) দেনমোহর, (৪) ভরণপোষণ এবং (৫) সন্তান-সন্ততিগণের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।[২০]

দেউলিয়া আদালত : দেউলিয়া আইন, ১৯৯৭ এর অধীনে গঠিত হয়েছে দেউলিয়া আদালত। প্রতি জেলার জেলা আদালত সেই জেলার দেউলিয়া আদালত এবং জেলা জজ হলেন সেই আদালতের পরিচালনাকারী বিচারক। জেলার অভ্যন্তরে উদ্ভূত দেউলিয়া মামলাগুলোর বিচার ও নিষ্পত্তি করার কর্তৃত্ব তার হাতে ন্যস্ত এবং তিনি অতিরিক্ত জেলা জজকে এ জাতীয় যেকোনো মামলার বিচার ও নিষ্পত্তি করার কর্তৃত্ব অর্পণ করতে পারেন।[২১] সহকারি জজ, সিনিয়র সহকারি জজ এবং যুগ্ম জেলা জজদের ত্রিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ আদায়ের মামলা এবং কোনো বাড়ির ১২ মাসের ভাড়া উপরিউক্ত অংকের অর্থের সমপরিমাণ হলে সেই বাড়ির মালিক কর্তৃক মাসওয়ারি ভাড়াটিয়াকে উচ্ছেদের মামলা গ্রহণ ও বিচার করার জন্য স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের দায়িত্ব পালনের

---

১৯. হাসান মাহমুদ ও ইশতিয়াক আহমেদ, *অর্থঋণ আদালত আইন*, ২০০৩(ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৮), পৃ. ১৬-২৫

২০. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১), পৃ. ৬১-১০৭; পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সালের ১৮ নং আইন), ধারা ৫

২১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট কতিপয় আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের কাছে আপিল করা ছাড়া স্বল্প এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতের জারিকৃত ডিক্রি বা অধিকাংশ আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যায় না। তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ডিক্রি বা আপিলযোগ্য আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা পুনর্বিবেচনার আরজি পেশ করতে পারেন। সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজরা ভাড়া নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন এবং বকেয়া ভাড়া আদায়ের মামলা বা ভাড়া দেয়া জায়গা থেকে ভাড়াটিয়া উচ্ছেদের মামলা বাদে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়াদের মধ্যকার বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করে থাকেন। যেমন : বাড়ির মালিক বাড়িভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানালে ভাড়াটিয়া কর্তৃক প্রদত্ত বাড়িভাড়া জমা নেয়া, বাড়ির মেরামত কাজ করানোর ব্যবস্থা, মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ করা ইত্যাদি। সহকারি জজ ও সিনিয়র সহকারি জজদের নিয়ে পারিবারিক আদালতও গঠিত হয়ে থাকে যার কাজ হচ্ছে পারিবারিক বিরোধ থেকে উদ্ভূত মামলাগুলো গ্রহণ ও বিচার করা। যেমন : দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণ, সন্তানের হিফাজত ইত্যাদি।

ফৌজদারি আদালত : বর্তমানে বাংলাদেশে সুপ্রিম কোর্ট ও অন্য আইনের বিধান মতে গঠিত ট্রাইব্যুনাল বা আদালতগুলো ব্যতীত নিম্নে বর্ণিত পাঁচ প্রকার ফৌজদারি আদালত ফৌজদারি মামলার বিচার করেন।[২২] এগুলো হচ্ছে–

- সেশন বা দায়রা আদালত ও মেট্রোপলিটন সেশন বা মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত;
- মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত (মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের সমান ক্ষমতা পরিচালনা করেন।);
- প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত;
- দ্বিতীয় শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত ও
- তৃতীয় শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।

অন্যভাবে বলা যায়, ফৌজদারি আদালতগুলো হলো– দায়রা আদালত, বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত।[২৩]

মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। তারা সকলেই প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। পূর্বে বিভাগীয় কমিশনার তিন পার্বত্য জেলার দায়রা আদালতের দায়িত্ব পালন করতেন। কিন্তু ২০০৮ সাল থেকে পার্বত্য জেলাগুলোতে দায়রা আদালত গঠন করা হয়। ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন এলাকার জন্য মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৪] বিচারিক কার্যাবলী ছাড়াও অন্যান্য কার্য সম্পাদনের জন্য রয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ জেলাগুলোতে জেলা জজদের দায়রা জজ হিসেবে, অতিরিক্ত জেলা জজদের অতিরিক্ত দায়রা জজ হিসেবে এবং যুগ্ম জেলা জজদের যুগ্ম দায়রা জজ হিসেবে কাজ করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় জেলা জজ দায়রা

২২. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
২৩. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া, *দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপীল বিষয়ক আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯-১৯৬
২৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

জজের, অতিরিক্ত জজগণ অতিরিক্ত দায়রা জজের এবং যুগ্ম জেলা জজগণ যুগ্ম দায়রা জজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।[২৫]

মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে সাবেক জেলা জজদের মেট্রোপলিটন দায়রা জজ করে, সাবেক অতিরিক্ত জেলা জজদের মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত দায়রা জজ করে এবং সাবেক যুগ্ম জেলা জজদের মেট্রোপলিটন যুগ্ম দায়রা জজ করে মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত গঠন করা হয়েছে। যুগ্ম দায়রা জজগণ দায়রা জজদের অধস্তন এবং দায়রা জজগণ যুগ্ম দায়রা জজদের কর্মদায়িত্ব বণ্টনের নিয়মবিধি জারি করতে পারেন। অতিরিক্ত দায়রা জজগণ যদিও দায়রা জজদের মতো একই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন; তথাপি জেলার দায়রা জজ সেই জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ বা জজদের দায়িত্ব বণ্টন করে দিতে পারেন।

দায়রা আদালতগুলোর বিচারকগণ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এবং অধুনা বাতিলকৃত দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ এর স্থলে প্রবর্তিত দূর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর আওতাভুক্ত অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য ফৌজদারি আইন (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ১৯৫৮ এর অধীনে বিশেষ বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। দায়রা আদালতগুলোর বিচারকগণ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর বিধানাবলীর অধীন অপরাধসমূহের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কর্মরত দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা যুগ্ম দায়রা জজগণ আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে যেকোনো ধরনের সাজা বা দণ্ডাদেশ দিতে পারেন। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ এর বিধানাবলীর অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য বিশেষ আদালত হিসেবেও কাজ করে থাকেন।

দায়রা জজগণ জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ২০০০ এর আওতাধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য ঐ আইনের অধীনে জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান, সংশোধনী) আইন, ২০০২ বলে উক্ত আইনের অধিকাংশ বিধান বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত বিধানাবলীকে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ বলে ঈষৎ সংশোধিত আকারে পুনঃবিধিবদ্ধকরণ করা হয়েছে এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণির বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের দ্রুত বিচার আদালত হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসব অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচারের ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। হত্যা, ধর্ষণ, বেআইনি অস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য রাখার মতো অপরাধসমূহের দ্রুত বিচার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে ছয়টি জেলায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য অধস্তন ফৌজদারি আদালত কিংবা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালসমূহে বিচারাধীন এ জাতীয় কিছু কিছু মামলা স্থানান্তরিত করে প্রতি জেলায় এই ট্রাইব্যুনাল সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[২৬] এসব ট্রাইব্যুনাল, সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌসুলি ও পুলিশ অফিসারগণ সর্বোচ্চ ১২০ কর্মদিবসের মধ্যে এ জাতীয় মামলার বিচারকাজ সম্পন্ন করতে না পারার জন্য দায়ি থাকেন। যে কোনো ফৌজদারি অপরাধ কিংবা তার প্রস্তুতির ভিডিও ফিল্ম ও স্থির চিত্র অথবা এমন অপরাধের সঙ্গে সম্পর্কিত সংলাপ সম্পর্কিত টেপ রেকর্ড বা ডিস্ককে সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণের জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কিত বিশেষ বিধানকে এ জাতীয় মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে।

---

২৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১২ নং আইন)

২৬. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের বিচারের জন্য মানিলন্ডারিং আদালত হিসেবেও কাজ করেন। পরিবেশ রক্ষা আইন, ১৯৯৫ ও অন্যান্য পরিবেশগত আইন ও নিয়মবিধির অধীন বড় ধরনের পরিবেশগত অপরাধের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য অপরাধের বিচারের জন্য যুগ্ম জেলা জজদের (যারা আবার পদাধিকার বলে যুগ্ম দায়রা জজও বটে) নিয়ে পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশেষ বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের ছোটখাটো ধরনের পরিবেশগত অপরাধের বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ যা বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ দ্বারা সংশোধিত তার অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির ক্ষমতাধিকারী বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে এবং অ্যাসেসরদের সহায়তায় নৌ-আদালত গঠন করা হয়েছে।

মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের জেলাগুলোতে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করা হয়। ২০০৭ সালের নভেম্বর থেকে জেলাগুলোতে অতিরিক্ত জেলা জজগণ প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে, সিনিয়র সহকারি জজগণ প্রথম শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এবং সহকারি জজগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।[২৭] মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোর বাইরে প্রতি জেলায় প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির অন্যান্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছেন। সরকার কিংবা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় এলাকাগুলোর সীমানা নির্ধারণ করে দেন যার পরিসীমার মধ্যে এই ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের উপরে ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রতি জেলায় জেলা জজ দায়রা জজের দায়িত্ব, অতিরিক্ত জেলা জজ বা জজগণ অতিরিক্ত দায়রা জজের দায়িত্ব এবং যুগ্ম জেলা জজগণ যুগ্ম দায়রা জজের দায়িত্ব পালন করেন।

মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে সাবেক জেলা জজদের মেট্রোপলিটন দায়রা জজ করে, সাবেক অতিরিক্ত জেলা জজদের মেট্রোপলিটন অতিরিক্ত দায়রা জজ করে এবং সাবেক যুগ্ম জেলা জজদের মেট্রোপলিটন যুগ্ম দায়রা জজ করে মেট্রোপলিটন দায়রা আদালত গঠন করা হয়েছে। যুগ্ম দায়রা জজগণ দায়রা জজদের অধস্তন এবং দায়রা জজগণ যুগ্ম দায়রা জজদের কাজ ও দায়িত্ব বণ্টন করার নিয়মবিধি তৈরি করতে পারেন। অতিরিক্ত দায়রা জজগণ যদিও দায়রা জজদের মতো একই ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন; তারপরও জেলার দায়রা জজগণ ঐ জেলার অতিরিক্ত দায়রা জজ বা জজদের কর্মদায়িত্ব বণ্টন করতে পারেন। দায়রা আদালতগুলোর বিচারকগণ দূর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ ও দূর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ এর বিধানাবলীর অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য ফৌজদারি আইন (সংশোধনী) অ্যাক্ট, ১৯৫৮ অনুযায়ী বিশেষ জজ হিসেবেও কাজ করে থাকেন। দায়রা আদালতগুলোর বিচারকগণ বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর বিধানাবলীর অধীন অপরাধসমূহের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হিসেবে কর্মরত দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা সহকারি দায়রা জজগণ আইনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে যে কোনো সাজা প্রদান করতে পারেন। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (বিশেষ বিধান) আইন ২০০০-এর বিধানাবলীর অধীনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য বিশেষ আদালত হিসেবেও কাজ করেন। দায়রা জজগণ জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান)

২৭. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

Dhaka University Institutional Repository

আইন, ২০০২ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচারের জন্য ঐ আইন বলে জননিরাপত্তা ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান, সংশোধনী) আইন, ২০০২ বলে ঐ আইনের অধিকাংশ বিধান বাতিল করা হলেও উপযুক্ত মামলাগুলো তুলে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের হাতে ক্ষমতা সংরক্ষণ করে উক্ত আইনের অধীনে বিচারাধীন মামলাগুলো অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাতিলকৃত বিধানগুলোকে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ বলে ঈষৎ সংশোধিত আকারে নতুন করে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে এবং মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণির বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে দ্রুত বিচার আদালত হিসেবে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এসব অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ অ্যাসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য ট্রাইব্যুনাল হিসেবেও কাজ করেন। হত্যা, ধর্ষণ, বেআইনি অস্ত্র, বিস্ফোরক ও মাদকদ্রব্য রাখার অপরাধের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত বিচার সম্পন্ন করার জন্য দায়রা জজ পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিয়ে দ্রুত বিচার আদালত প্রাথমিকভাবে তৎকালীন ৬টি বিভাগে গঠন করা হয়েছিল এবং পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য অধস্তন ফৌজদারি আদালত কিংবা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন এ জাতীয় কিছু কিছু মামলা জেলাগুলোতে স্থানান্তর করে প্রত্যেক জেলায় দ্রুত বিচার আদালত সম্প্রসারিত করা হয়। এসব ট্রাইব্যুনাল, সংশ্লিষ্ট সরকারি কৌসুলি ও পুলিশ অফিসাররা সর্বোচ্চ সময় ১২০ কার্যদিবসের মধ্যে এ জাতীয় মামলার বিচার সম্পন্ন না হওয়ার জন্য দায়ি থাকবেন।[২৮] যে কোনো ফৌজদারি অপরাধ বা তার প্রস্তুতির ভিডিও দৃশ্য ও স্থিরচিত্র এবং এই অপরাধের সাথে সম্পর্কিত টেপরেকর্ড বা ডিস্ক সাক্ষ্য-প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ সম্পর্কিত বিশেষ বিধি এসব মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য করা হয়েছে। দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজগণ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ এর অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের বিচার করার জন্য মানিলন্ডারিং আদালত হিসেবেও কাজ করেন।

পরিবেশ রক্ষা আইন, ১৯৯৫ ও অন্যান্য পরিবেশ বিষয়ক আইন ও নিয়মবিধির অধীন বড় ধরনের পরিবেশগত অপরাধের বিচার করার জন্য যুগ্ম জেলা জজদের (যারা আবার পদাধিকার বলে যুগ্ম দায়রা জজও বটে) নিয়ে পরিবেশ আদালত গঠন করা হয়েছে এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ও বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটদের ছোটখাটো ধরনের পরিবেশগত অপরাধের বিচারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ খাদ্য (সংশোধনী) আইন, ২০০৫ এর দ্বারা সংশোধিত বিশুদ্ধ খাদ্য অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে বিশুদ্ধ খাদ্য আদালত গঠন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর অধীন অপরাধসমূহের বিচার করার জন্য প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ে ও অ্যাসেসরদের সহায়তায় নৌ-আদালত গঠন করা হয়েছে।

মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরের জেলাগুলোতে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ দেয়া হয়। জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনারগণ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যে কোনো ক্ষমতা থাকে। তবে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্দিষ্ট কতিপয় ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের অধস্তন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়াও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির অন্যান্য ম্যাজিস্ট্রেটগণও রয়েছেন। সরকার বা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট

---

২৮. আহমেদ আমি চৌধুরী, *পুলিশ আইন সহায়িকা*(ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৭), পৃ. ১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় এলাকাগুলোর সীমা নির্ধারণ করে থাকেন; যার পরিসীমার মধ্যে এই ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।[২৯]

প্রত্যেক থানায় সেই এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালনের জন্য অন্ততপক্ষে একজন বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দেয়া হয়। সিভিল সার্ভেন্ট কিংবা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নন দেশের এমন যে কোনো সম্ভ্রান্ত নাগরিকদেরও সরকার ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে পারেন। এমন ম্যাজিস্ট্রেটদের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট বলা হয়; যারা বেতনভুক্ত সিভিল সার্ভেন্ট ম্যাজিস্ট্রেটদের থেকে পৃথক ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এ ধরনের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়ার প্রথা রহিত করা হয়েছে।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল : সরকার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছে। জেলা জজ পদে ছিলেন বা আছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন সদস্য নিয়ে এ ধরনের প্রতিটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত। প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে (প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তি ছাড়া) কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংক ইত্যাদির মতো সুনির্দিষ্ট কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি পেনশনের অধিকারসহ তার চাকুরির শর্তাবলীর ব্যাপারে কিংবা এমন চাকুরিতে ব্যক্তি হিসেবে তার ক্ষেত্রে গৃহীত কোনো পদক্ষেপ সম্পর্কে আবেদন পেশ করলে তা শোনার ও নিষ্পত্তি করার একক এখতিয়ার প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রয়েছে।[৩০] প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যেতে পারে। এই আপিল ট্রাইব্যুনাল একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত। চেয়ারম্যান হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে আছেন বা ছিলেন কিংবা বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা তিনি প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে নিযুক্ত এমন একজন অফিসার পদে আছেন বা ছিলেন যার পদমর্যাদা সরকারের অতিরিক্ত সচিবের নিচে নয়। সরকার সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারককে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। একজন সদস্যকে অবসরপ্রাপ্ত বা চাকুরিরত জেলা জজদের মধ্য থেকে এবং অপরজনকে অবসরপ্রাপ্ত বা চাকুরিরত যুগ্ম সচিবদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা হয়। প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের কাছে ঐ বিভাগের অনুমতিক্রমে করা যায়।[৩১]

শ্রম আদালত : ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প শ্রমিকদের নিয়োগ সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালত গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রম আদালত একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্য নিয়ে গঠিত।[৩২] জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। সদস্যদের একজনকে মালিকদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং অপরজনকে শ্রমিকদের সাথে পরামর্শক্রমে নিযুক্ত করা হয়। শ্রম আদালত শিল্পবিরোধ, মালিক-শ্রমিক সমঝোতার বাস্তবায়ন বা লঙ্ঘন, মালিক ও শ্রমিকদের পরস্পরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং ছাঁটাই, লে-অফ, নিয়োগ বাতিল, চাকুরি থেকে বরখাস্ত, চাকুরিতে থাকাকালে পঙ্গুত্ববরণ হেতু ক্ষতিপূরণ ও বেতন পরিশোধ না করা সংক্রান্ত শ্রমিকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করে রায় দিয়ে থাকে। শ্রম সম্পর্কিত অন্যায্য কার্যকলাপ, সমঝোতা ভেঙ্গে যাওয়া বা তা বাস্তবায়ন না করা, বেআইনি ধর্মঘট বা লক আউট এবং শ্রম আদালতের আদেশ না মানা সম্পর্কিত অপরাধসমূহের বিচারও করে থাকে। শ্রম আদালতের রোয়েদাদে সংক্ষুব্ধ যে কোনো পক্ষ শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করতে পারে। হাইকোর্ট বিভাগের চাকুরিরত বা অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত

২৯. সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ধারা ২৮ ও ২৯
৩০. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ৭৪
৩১. কাজী এবাদুল হক, *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৩২. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬(ঢাকা : ইউনিভার্সেল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

একজন মাত্র সদস্য নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল গঠিত।[৩৩] শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালকে চাকুরিচ্যুত শ্রমিক বা শ্রমিকদের চাকুরিতে পুনর্বহালের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিলের নিষ্পত্তি আপিল পেশ করার ১৮০ দিনের মধ্যে করতে হয়। তবে শ্রম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যায় না। শ্রম আপিল আদালতের সিদ্ধান্তে কোনো পক্ষ সংক্ষুব্ধ হয়েছে মনে করলে তিনি ঐ মামলার আইনগত বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে মামলার নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখার জন্য রিট অব সার্টিওয়ারি ইস্যু করার ব্যাপারে হাইকোর্ট ডিভিশনে দরখাস্ত পেশ করতে পারেন। শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের কমিশনার হিসেবে শ্রম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ডিভিশনে আপিল করা যেতে পারে।

কোর্ট অব সেটেলমেন্ট : বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলিব্যবস্থা) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ১৬ নং আদেশ) জারি করেন এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞার আওতাভুক্ত সম্পত্তিসমূহের নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও বিলিব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের বিধান রাখেন।[৩৪] এ জাতীয় সম্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিরোধ দেখা দেয় এবং এসব বিরোধ চিরতরে দূর করার জন্য সরকার পরিত্যক্ত ভবন (সম্পূরক বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ এর অধীনে সকল পরিত্যক্ত ভবনের একটি তালিকা গেজেটে প্রকাশ করার এবং এসব সম্পত্তির উপর দাবিদাওয়া কোর্ট অব সেটেলমেন্ট নামে একটি ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করেন।[৩৫] কোর্ট অব সেটেলমেন্ট একজন চেয়ারম্যান ও দু'জন সদস্য নিয়ে সরকার কর্তৃক গঠিত। সুপ্রিমকোর্টের বিচার বা অতিরিক্ত বিচারক পদে আছেন বা ছিলেন কিংবা এই পদ ধারণ করার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। দুই সদস্যের একজনকে অতিরিক্ত জেলা জজের পদমর্যাদার নিচে নয় এমন অফিসার যারা আছেন বা ছিলেন তাদের মধ্য থেকে নিয়োগ দেয়া হয়। কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পরিত্যক্ত ভবনের তালিকা থেকে তার সম্পত্তি বাদ দেয়ার জন্য কোর্ট অব সেটেলমেন্টের কাছে আবেদন করলে কোর্ট সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর বক্তব্য শুনে এবং উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিচার-বিবেচনা করে আবেদনের নিষ্পত্তি করেন। কোর্ট অব সেটেলমেন্টের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যায় না। তবে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোর্ট অব সেটেলমেন্টের সিদ্ধান্তের আইনগত বৈধতা বা যথার্থতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য মামলার নথিপ্রত পরীক্ষা করে দেখার উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বিভাগের কাছে রিট অব সার্টিওয়ারি ইস্যুর আবেদন পেশ করতে পারেন।

সালিশি ট্রাইব্যুনাল ও সালিশি আপিল ট্রাইব্যুনাল : সরকার যে কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন জমি বা ভবন সরকারি উদ্দেশ্যে বা জনস্বার্থে হুকুমদখল বা অধিগ্রহণ করতে এবং ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের নিরূপিত মূল্য অনুযায়ী এমন জমি বা ভবনের মালিক ও দখলদারদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন। ক্ষতিপূরণ নিরূপণের আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যুগ্ম জেলা জজের পদমর্যাদার নিচে নয় এমন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সালিশকারীর কাছে আবেদন পেশ করতে পারে। সালিশকারীর দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সালিশি আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যেতে পারে। জেলা জজ পদে রয়েছেন বা ছিলেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে একজন সদস্য নিয়োগ করে এই সালিশি আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ণয় করে সালিশি ট্রাইব্যুনালের দেয়া সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সালিশি ট্রাইব্যুনারের সিদ্ধান্তের আইনগত বৈধতা বা যথার্থতা নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে মামলার নথিপত্র পরীক্ষার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের কাছে রিট অব সার্টিওয়ারি ইস্যুর

---

৩৩. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩৪. The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (President's Order No. 16 of 1972)

৩৫. The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance, 1985 (Ordinance No. LIV of 1985)

Dhaka University Institutional Repository

আবেদন পেশ করতে পারেন। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ সম্পর্কিত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করার জন্য সাধারণত জেলা আদালতের একজন যুগ্ম জেলা জজকে সালিশকারী হিসেবে এবং সেই জেলার জেলা জজকে সালিশি আপিল ট্রাইব্যুনাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল : নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল ও নির্বাচন আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন : স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ২৩ ধারার (১) উপ-ধারার এই আইনের অধীনে নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা, একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল এবং একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও একজন উপযুক্ত পদমর্যাদার নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করবে।[৩৬] (২) কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সদস্য বা সদস্যগণের নাম সরকারি গেজেটে প্রকাশের পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে নির্বাচনী দরখাস্ত দায়ের করতে পারবেন। (৩) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত ট্রাইব্যুনাল পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোনো দরখাস্ত, উহা দায়ের করার ১৮০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করবে। (৪) নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করতে পারবেন। (৫) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী গঠিত নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার ১২০ দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করবে। (৬) নির্বাচনী আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল : অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন ও এর গঠন : অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর ১৯ ধারার (১) উপ-ধারার এই আইনের অধীনে আপিল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা প্রত্যেক জেলার জন্য একটি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনাল এবং প্রয়োজনবোধে, এক বা একাধিক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপিল ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করতে পারে। (২) জেলা জজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে এবং উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অতিরিক্ত জেলাজজ সমন্বয়ে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। (৩) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনাল ধারা ১৮ এর অধীন দায়েরকৃত আপিল আবেদনসমূহের মধ্যে যে কোনো আপিল আবেদন নিষ্পত্তির জন্য অপির্তত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত আপিল ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করতে পারে।[৩৭]

ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনাল : ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট আপত্তি অফিসার বা সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসারের সমন্বয়ে। ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালার ৩০ নং বিধি ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত ‘ভূমি রেকর্ড ও নক্সা প্রস্তুত বিষয়ে সাধারণ নির্দেশাবলী’-এর আলোকে ভূমি জরিপ সংক্রান্ত আপত্তি শুনানির কাজ সম্পন্ন হয়। খসড়া রেকর্ড প্রকাশনা (ডিপি) চলাকালে গৃহীত আপত্তি মামলাসমূহ সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ মারফত জ্ঞাত করে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানি গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করা হয়। পক্ষগণ নিজ নিজ দাবি আপত্তি অফিসারের নিকট উপস্থাপন করতে পারেন। আপত্তি অফিসার পক্ষগণকে শুনানি দিয়ে রায় কেস নথিতে লিপিবদ্ধ করে তার সিদ্ধান্ত জানাবেন এবং খতিয়ান বা রেকর্ডে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে পারবেন।

---

৩৬. মোঃ মাছুম খান, *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০০৯), পৃ. ৭০২০

৩৭. মোঃ নজরুল ইসলাম, *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন*, ২০১৩(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৩), পৃ. ৮৯০২

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ভূমি জরিপ আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় সংশ্লিষ্ট আপিল অফিসার বা সহকারি সেটেলমেন্ট অফিসার অথবা চার্জ অফিসারের সমন্বয়ে। ১৯৫৫ সালের প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালার ৩১ নং বিধি ও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত 'ভূমি রেকর্ড ও নক্সা প্রস্তুত বিষয়ে সাধারণ নির্দেশাবলী'-এর আলোকে ভূমি জরিপ সংক্রান্ত আপিল শুনানির কাজ সম্পন্ন হয়। আপত্তির রায়ে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপিল দায়ের করতে পারেন। নির্ধারিত কোর্ট ফি এবং কার্টিজ পেপারসহ সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর আবেদন দাখিলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আপত্তি মামলার রায়ের নকল কপি গ্রহণ করতে হয়। নির্দিষ্ট ফরম পূরণের মাধ্যমে ঐ নকলসহ আপিল দায়ের করতে হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নোটিশ মারফত জ্ঞাত করে নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থানে শুনানি গ্রহণ করে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।[৩৮]

গ্রাম আদালত : ১৯৭৬ সালের গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ ও গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ দ্বারা গ্রামের খোটখাটো অপরাধ এবং অনধিক ৭৫ হাজার[৩৯] টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ধার্যকরণ সম্বলিত দেওয়ানি মামলা বিচার করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রত্যেক পক্ষের দুইজন প্রতিনিধি নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করে মামলা বিচার করার বিধান করা হয়েছে।[৪০] গ্রাম আদালত ফৌজদারি মামলায় আসামিকে কারাদণ্ড দিতে বা জরিমানা করতে পারেন না। তবে আসামি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ দিতে পারেন। গ্রাম আদালত দেওয়ানি মামলায় দাবিকৃত টাকা ডিক্রি দিতে, অস্থাবর মালামাল ফেরত দিতে বা সম্পত্তির দখল ফেরত দিতে আদেশ দিতে পারেন।[৪১] গ্রাম আদালত সর্বসম্মতভাবে বা পাঁচজনের মধ্যে চারজনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রায় দিলে তা পক্ষদের উপর বাধ্যকর হয়। যদি গ্রাম আদালত তিনজন ও দুইজনের সংখ্যা গরিষ্ঠতায় রায় দেন তবে যে কোনো পক্ষ ঐ রায়ের বিরুদ্ধে ত্রিশ দিনের মধ্যে ফৌজদারি মামলায় এলাকার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ও দেওয়ানি মামলায় এলাকার সহকারী বিচারকের নিকট আপিল দায়ের করতে পারেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী বিচারক ন্যায় বিচার হয়নি বলে সন্তুষ্ট হলে গ্রাম আদালতের তদ্রূপ রায় বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারেন বা মামলা পুনর্বিচার করার জন্য গ্রাম আদালতে পাঠাতে পারেন।[৪২] গ্রাম আদালতে মামলা বিচারে সাক্ষ্য আইন, দেওয়ানি কার্যবিধি ও ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান প্রযোজ্য নয়। তবে হলফ আইনের কতিপয় বিধান প্রযোজ্য। গ্রাম আদালতে মামলা বিচারের সময় কোনো পক্ষ উকিল নিযুক্ত করতে পারে না।[৪৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক 'গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬' সংশোধিত হয়ে 'গ্রাম আদালত আইন, ২০১৩' নামে সর্বশেষ আইন প্রণীত হয়েছে।[৪৪]

প্রকৃত পক্ষে সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বাংলাদেশে যে বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে সকল বিচারকগণ তাদের বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনত পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। ফলে দেখা যায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা ছিল যে বিচার বিভাগের দ্বারা সেখানে তা সব সময় সম্ভব হয় না। অথচ স্বাধীন বিচার বিভাগের দক্ষতা ও নিরপেক্ষতাই সরকারের শাসন ক্ষমতার দক্ষতা এবং যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

---

৩৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *প্রজাস্বত্ত্ব বিধিমালা–১৯৫৫ এর ৩০ ও ৩১ নং বিধি*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ১৯৮৫), পৃ. ৩২-৩৩

৩৯. ২০১৩ সনের ৩৬ নং আইন দ্বারা সংশোধিত। দ্র. এস.এ. হাসান, *গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা*(ঢাকা : বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০১৬), পৃ. ২০

৪০. মোঃ নূর-নবী, *গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (১৯ নং আইন)*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০০৬), পৃ. ১৯৫৭

৪১. মোঃ নূর-নবী, *গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (১৯ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫৮

৪২. মোঃ নূর-নবী, *গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (১৯ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫৮

৪৩. মোঃ নূর-নবী, *গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (১৯ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬০

৪৪. মোঃ নজরুল ইসলাম, *গ্রাম আদালত আইন, ২০১৩ (৩৬ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২১৭-৮২২৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তায় শাসন বিভাগ

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ পায় একটি স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড। এখানে তৈরি হয় একটি ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ। দেখা দেয় সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় শাসন বিভাগের অবদান অনস্বীকার্য। শাসন বিভাগের যে সব শাখা এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ভূমিকা রেখে আসছেন তার বিবরণ নিচে তুলে ধরা হলো :

বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী : বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর তিনটি সার্ভিস শাখা রয়েছে। যথা : (১) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, (২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী, (৩) বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। এর সদর দপ্তর হচ্ছে ঢাকা সেনানিবাস। এ বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছেন– (ক) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং (খ) বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত। বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আধা সামরিক বাহিনী দু'টি সাধারণ সময়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকে, তবে যুদ্ধকালীন সময়ে এই বাহিনীদ্বয় যথাক্রমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে।[৪৫]

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হলো প্রধান প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান যেখানে সামরিক আইন তৈরি ও বাস্তবায়ন করা হয়। সামরিক নীতিমালা এবং কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর একটি ছয় সদস্যবিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি রয়েছে। এ উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত তিন বাহিনীর প্রধান, সামরিক বাহিনী বিভাগের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবগণ। এছাড়া এনএসআই, ডিজিএফআই এবং বিজিবি এর সাধারণ পরিচালকগণ এই উপদেষ্টা পদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী গঠিত হয়। এ কারণে এই দিনটিকে সশস্ত্র বাহিনী দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিনে বঙ্গভবন, সামরিক বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস এবং দেশের প্রতিটি সামরিক প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মহান মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম : বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে বাংলার জনমানুষকে নিরাপত্তা প্রদানের জন্য জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর সেক্টরসমূহ হলো :

১ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। সেক্টরের এলাকা হলো চট্টগ্রাম জেলা, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী জেলার পূর্বাঞ্চল এলাকা এবং মুহুরী নদীর তীরবর্তী এলাকা।[৪৬] এ সেক্টরের প্রধান কার্যালয় ছিল হরিনাতে। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১০ মে ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমান; পরবর্তীতে তিনি সেক্টর-১১ তে স্থানান্তরিত হন। (২) ১০ মে ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর রফিকুল ইসলাম ১ নম্বর সেক্টরের দায়িত্ব পালন করেন। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডারগণ ছিলেন : (১) ঋষিমুখ : ক্যাপ্টেন শামসুল হুদা বাচ্চু; (২) শ্রীনগর : ক্যাপ্টেন অলি আহমদ, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ও

৪৫. http://www.mha.gov.bd/, visited on 11.02.2019

৪৬. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*(ঢাকা : দশদিশা প্রিন্টার্স, ২০০৬), খ.১, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান; (৩) মনুঘাট : ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান, ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান ও লেফটেন্যান্ট ফজলুর রহমান; (৪) তবলছড়ি : সুবেদার আলী হোসেন এবং (৫) দিমাগিরী : অজ্ঞাতনামা এক সুবেদার।

২ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। সেক্টরের এলাকা হলো বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার কিছু অংশ।[৪৭] এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর খালেদ মোশারফ। পরবর্তীতে স্থানান্তরিত। (২) ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর এ.টি.এম. হায়দার। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) গঙ্গাসাগর : ক্যাপ্টেন আইনউদ্দিন; (২) মন্দভাগ : ক্যাপ্টেন আবদুল গফফার হাওলাদার; (৩) সালদা নদী : মেজর আবদুস সালেক চৌধুরী; (৪) মতিননগর : লেফটেন্যান্ট দিদারুল আলম; (৫) নির্ভয়পুর : ক্যাপ্টেন আকবর হোসেন ও লেফটেন্যান্ট মাহবুবুর রহমান এবং (৬) রাজনগর : ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম, ক্যাপ্টেন শহীদুল ইসলাম এবং লেপটেন্যান্ট ইমাম-উজ-জামান)।

৩ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। এ সেক্টরের এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমা, বৃহত্তর সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, বৃহত্তর ঢাকা জেলার গাজীপুর মহকুমা, নরসিংদী মহকুমা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উত্তরাংশ, নারায়ণগঞ্জের একাংশ নিয়ে গঠিত।[৪৮] এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) ১০ এপ্রিল থেকে ২১ জুলাই ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ (২) ২৩ জুলাই ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এ.এন.এম. নুরুজ্জামান। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) আশ্রমবাড়ি/বাঘাইবাড়ী : ক্যাপ্টেন আজিজুর রহমান, ক্যাপ্টেন এজাজ আহমেদ চৌধুরী; (২) হাতকাটা : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান; (৩) সিমনা : ক্যাপ্টেন আবদুল মতিন; (৪) পঞ্চবটী : ক্যাপ্টেন এএসএম নাসিম; (৫) মনতলা/বিজয়নগর : ক্যাপ্টেন এম সুবিদ আলী ভূঁইয়া; (৬) কালাছড়া : লেফটেন্যান্ট মনসুরুল ইসলাম মজুমদার; (৭) কলকলিয়া/বামুটিয়া : লেফটেন্যান্ট গোলাম হেলাল মোর্শেদ।

৪ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। উত্তরে হবিগঞ্জ জেলা দক্ষিণে কানাইঘাট পুলিশ স্টেশনের মধ্যবর্তী ভারতের সাথে ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ডার এলাকা। মৌলভীবাজার মহকুমার সম্পূর্ণ অংশ, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ, বিয়ানীবাজারের একাংশ, গোলাপগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর, দেরাই, সাল্লা থানা এলাকা নিয়ে ৪ নং সেক্টর গঠিত হয়।[৪৯] প্রধান কার্যালয় ছিলো করিমগঞ্জে এবং পরবর্তীতে এটি মাসিমপুরে স্থানান্তর করা হয়। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত; (২) পরবর্তীতে ক্যাপ্টেন এ রব। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) জালালপুর : মাহবুবুর রব সাদী (গণবাহিনী); (২) বড়পুঞ্জী : ক্যাপ্টেন আবদুর রব; (৩) আমলাসিদ : লেফটেন্যান্ট জহিরুল হক খান; (৪) কুকিতল : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নুরুল কাদের ও ক্যাপ্টেন শরিফুল হক ডালিম; (৫) কৈলাস শহর : লেফটেন্যান্ট ওয়াকিউজ্জামান এবং (৬) কমলপুর : ক্যাপ্টেন খায়রুল আনাম।

৫ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। এই সেক্টরের সীমানা ছিলো দূর্গাপুর থেকে সিলেটের ঢাকি (তামাবিল) পর্যন্ত এবং সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলের সম্পূর্ণ বর্ডার।[৫০] ভারতের সিলং-এর ছিলো এই সেক্টরের প্রধান কার্যালয়। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : মেজর মীর শওকত আলী (৩০ জুলাই ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর

---

৪৭. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.২, পৃ. ৩৩

৪৮. প্রাগুক্ত, খ.৩, পৃ. ১৮-১৯

৪৯. প্রাগুক্ত, খ.৪, পৃ. ১৬

৫০. প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭১) এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) মুক্তাপুর : সুবেদার নাজির হোসেন। মুক্তিযোদ্ধা ফারুক ছিলেন সেকেন্ড-ইন-কমান্ড; (২) ডাউকি : সুবেদার বি আর চৌধুরী; (৩) শেলা : ক্যাপ্টেন হেলাল উদ্দিন; (৪) ভোলাগঞ্জ : লেফটেন্যান্ট তাহের উদ্দিন আখুঞ্জি; (৫) বালাট : সুবেদার গনি, ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন এবং (৬) বড়ছড়া : ক্যাপ্টেন মুসলেম উদ্দিন, ক্যাপ্টেন মাহফুজুর রহমান ভূঁইয়া।

৬ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। রংপুর এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল পাটগ্রামের কাছাকাছি বুগিমারিতে।[৫১] এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) ৩০ জুলাই ১৯৭১ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত উইং কমান্ডার মোহাম্মদ খাদেমুল বাশার। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) ভজনপুর : ক্যাপ্টেন নজরুল হক, স্কোয়াড্রন লীডার সদর উদ্দিন এবং ক্যাপ্টেন শাহরিয়ার; (২) পাটগ্রাম : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান; (৩) সাহেবগঞ্জ : ক্যাপ্টেন নওয়াজিশ উদ্দীন; (৪) মোগলহাট : ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন এবং (৫) চিলাহাটি : লেফটেন্যান্ট ইকবাল।

৭ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ। এ সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল তরঙ্গপুরে।[৫২] এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) মেজর নাজমুল হক (২-২০ আগস্ট ১৯৭১, দুর্ঘটনায় নিহত); (২) মেজর কাজী নুরুজ্জামান (২১ আগস্ট ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) এবং (৩) সুবেদার মেজর এ রব। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) মালঞ্চ : ইপিআর জেসিও সুবেদার মেজর মুজিব; (২) তপন : মেজর নাজমুল হক ছাড়াও নেতৃত্বে ছিলেন ইপিআর এর কমান্ডিং অফিসারগণ); (৩) মেহেদীপুর : সুবেদার ইলিয়াছ ও ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর; (৪) ভোলাহাট : লেফটেন্যান্ট রফিকুল ইসলাম; (৫) হামজাপুর : ক্যাপ্টেন ইদ্রিস আলী খান; (৬) আঙ্গিনাবাদ : এ সাব-সেক্টরে দুটি অপারেশনাল ক্যাম্প ছিল। বড়াহার ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন থাপাখাপা ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা মহসীন ক্যাম্প অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন। পরে আঙ্গিনাবাদ ক্যাম্প সুবেদার মোয়াজ্জেম হোসেন-এর কমান্ডে দেয়া হয়; কিন্তু মুখ্যত ভারতীয় ক্যাপ্টেন থাপাই-এর প্রশাসনিক দায়িত্ব চালাতেন। তিনি এ সাব-সেক্টরের অধীনস্থ বড়াহার ক্যাম্পের কমান্ডার ছিলেন; (৭) ঠোকরাবাড়ি : সুবেদার মোয়াজ্জেম; (৮) লালগোলা : ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী ও (৯) শেখপাড়া : ক্যাপ্টেন আবদুর রশিদ।

৮ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই সেক্টরের আওতায় যে সকল জেলাসমূহ ছিল সেগুলো হলো কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং পটুয়াখালী জেলা। মে মাসের শেষের দিকে সেক্টরসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয় এবং এই সময় সেক্টর-৮ এর অধীনে ছিল কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং ফরিদপুর জেলার উত্তর অংশ। এ সেক্টরের মূল নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র ছিল বেনাপোলে।[৫৩] এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) মেজর এম আবু ওসমান চৌধুরী (১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৭১) এবং (২) কর্নেল মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর (১৫ আগস্ট ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) বয়রা : ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা; (২) বানপুর : ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমান; (৩) লালবাজার : ক্যাপ্টেন এ আর আজম চৌধুরী; (৪) শিকারপুর : ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট জাহাঙ্গীর, ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম; (৫) হাকিমপুর : ক্যাপ্টেন শফিকউল্লা; (৬) ভোমরা : ক্যাপ্টেন

৫১. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.৬, পৃ. ১২
৫২. প্রাগুক্ত, খ.৭, পৃ. ১২
৫৩. প্রাগুক্ত, খ.৮, পৃ. ১৫-১৬

Dhaka University Institutional Repository

এটিএম সালাহউদ্দিন, ক্যাপ্টেন মাহবুব উদ্দিন এবং (৭) বেনাপোল : ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম ও ক্যাপ্টেন তৌফিক এলাহী চৌধুরী।

৯ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ৪ এপ্রিল ১৯৭১। বৃহত্তর বরিশাল, পটুয়াখালী জেলা এবং খুলনা অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) মেজর এম এ জলিল (জুলাই থেকে ডিসেম্বর ১৯৭১), (২) মেজর আবুল মঞ্জুর ও (৩) মেজর জয়নাল আবেদিন। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) টাকি : মেজর আবদুল জলিল মিয়া; (২) শমশেরনগর : ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সলিম উল্লাহ ও ক্যাপ্টেন মাহফুজ আলম বেগ এবং (৩) হিঙ্গলগঞ্জ : ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা।[৫৪]

১০ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ১৩ মে ১৯৭১। কোনো আঞ্চলিক সীমানা ছিল না। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকা, নদী ও সমুদ্র বন্দরসহ বাংলাদেশের সমগ্র জলপথ এ সেক্টরের এলাকা। নৌবাহিনীর কমান্ডো দ্বারা গঠিত। শত্রুপক্ষের নৌযান ধ্বংসের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পাঠানো হত। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর প্রধান কার্যালয় (৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। এ সেক্টরের কোনো সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।[৫৫]

১১ নম্বর সেক্টর প্রতিষ্ঠার তারিখ ১০ জুন ১৯৭১। ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল জেলা এবং রংপুর, গাইবান্ধা, উলিপুর, কমলাপুর চিলমারী এলাকার কিছু অংশ।[৫৬] ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সেক্টরের প্রধান কার্যালয় ছিল তপলাঢালাতে। পরবর্তীতে এটি মাহেন্দ্রগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়। এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন : (১) মেজর জিয়াউর রহমান (১৫ মে ১৯৭১ থেকে ১০ অক্টোবর ১৯৭১) সিলেটের সেক্টর ৪ এবং ৫ এ স্থানান্তরিত হন; (২) মেজর আবু তাহের (১০ অক্টোবর ১৯৭১ থেকে ২ নভেম্বর ১৯৭১) এবং (৩) স্কোয়াড্রেন লিডার এ হামিদুল্লাহ খান (২ নভেম্বর ১৯৭১ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১)। এ সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন : (১) মহেশখোলা : ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান; (২) মহেন্দ্রগঞ্জ : লেফটেন্যান্ট আব্দুল মান্নান; (৩) রংড়া : নাজমুল আহসান (এফ এফ); (৪) ঢালু : ডা. আবদুল্লাহ আল মাহমুদ; (৫) বাগমারা : মিত্রবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ইপিআর জেসিওরা কমান্ড করেছেন। পরে লেফটেন্যান্ট আসাদুজ্জামান অধিনায়ক নিযুক্ত হন; (৬) পুরাখাসিয়া : লেফটেন্যান্ট সামছুল আলম এবং (৭) মানকারচর : স্কোয়াড্রন লিডার এম হামিদুল্লাহ খান।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অবদান

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী : ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে 'সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে' এ শ্লোগান বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৃষ্টি। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। এ ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান করে থাকে। যে কোনো ধরনের বিপর্যয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলা ও জাতি গঠনে সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে।[৫৭]

সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ সেনাবহিনীর সেবামূলক কার্যক্রম : বাংলাদেশ সেনাবহিনী ঢাকা, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কয়েকটি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম অঞ্চলে রাস্তাঘাট নির্মাণ, কক্সবাজার মেরিন ড্রাইভ সড়ক মেরামত ও নির্মাণ, ঢাকাস্থ বনানী ফ্লাইওভার প্রকল্প, এয়ারপোর্ট-মিরপুর সেনানিবাসে সংযোগসড়ক প্রকল্প, হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্প এবং

---

৫৪. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : সেক্টরভিত্তিক ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, খ.৯, পৃ. ১৯

৫৫. প্রাগুক্ত, খ.১০, পৃ. ৩০-৩১

৫৬. প্রাগুক্ত, খ.১১, পৃ. ১৪

৫৭. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭(ঢাকা : নিকন এডভারটাইজিং ইন্টারন্যাশনাল, ২০১৮), পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

হযরত শাহজালাল রহ. আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ড্রেনেজ সিস্টেম উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা মহানগরীর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ইউটিলিটি সিফটিং প্রকল্প, ধানমন্ডি লেক সংলগ্ন এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প, ত্রিমুখ থেকে উজানপুর নদী খনন প্রকল্প, মেঘনা ও গোমতী সেতু মেরামত প্রকল্প, জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক প্রকল্প, মুন্সিগঞ্জ জেলার মুক্তারপুর-পঞ্চবটি সড়কের সংস্কার প্রকল্প এবং রায়ের বাজার জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও, ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ী ইন্টাসেকশন থেকে (ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংক সড়কসহ) মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাঙ্গা অংশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ ৪-লেন উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে রুট অ্যালাইমেন্টের মধ্যে বিদ্যমান ইউটিলিটি প্রতিস্থাপন ও অপসারণ প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।[৫৮]

জননিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম : সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সেনাবহিনী কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি অপারেশন নিম্নে প্রদত্ত হলো :

অপারেশন থান্ডারবোল্ট : বাংলদেশ সেনাবহিনীর প্যারা কমান্ডোর নেতৃত্বে রাজধানীর গুলশান-২ এর হলি আর্টিজান বেকারী নামক একটি রেস্টুরেন্টে জঙ্গিবিরোধী অভিযান ‘অপারেশন থান্ডারবোল্ট’ পরিচালনা করা হয়। সকাল ৭:৪০ টায় অপারেশন শুরু করে ১২:১৩ মিনিটের মধ্যে সকল সন্ত্রাসীকে নির্মূল করে টার্গেট এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে অপারেশনের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করে সকাল ৮:৩০ টায় অভিযানের সফল সমাপ্তি ঘটে। অভিযানের মাধ্যমে সেনাবহিনী ৩ জন বিদেশী (১ জন জাপানি ও ২ জন শ্রীলঙ্কান) নাগরিকসহ মোট ১৩ জনকে জীবিত উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। অভিযানে ৭ জন সন্ত্রাসীর মধ্যে ৬ জন সন্ত্রাসী নিহত হয় এবং ১ জন সন্দেহভাজন সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৫৯]

অপারেশন টোয়াইলাইট : গত ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখ সিলেটের দক্ষিণ সুরমার শিববাড়ি পাঠাপোড়া এলাকায় ‘আতিয়া মহল’ নামের পাঁচতলা বাড়ির নিচতলায় জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া যায়। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেনাবহিনীকে অভিযান পরিচালনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়। সে অনুসারে বাংলদেশ সেনাবহিনী ‘অপারেশন টোয়াইলাইট’ পরিচালনা করে। ১৭ পদাতিক ডিভিশন ও বিশেষায়িত কমান্ডো দল ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখে সকালে অভিযানটি শুরু করে। কমান্ডোরা তাদের জীবন বাজি রেখে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে অভিনব কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ২৫ মার্চ ২০১৭ তারিখ পুরুষ, মহিলা ও শিশুসহ মোট ৭৮ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করে। সম্রণকালের ইতিহাসে সন্ত্রাসী ঘটনায় আটকে পড়া এত বিপুল সংখ্যক জিম্মিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধারের ঘটনা নেই বললেই চলে। তিন দিনে একটানা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ২৭ মার্চ ২০১৭ তারিখ বিকালের মধ্যে সকল জঙ্গিদের নির্মূল করা হয়।[৬০]

বন্যা দুর্গতদের সহায়তা : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বন্যাকালীন সময়ে ‘এইড টু দি পাওয়ার’-এর আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে দেশের বিভিন্ন বিভাগের দুর্গত বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও ত্রাণবিতরণ কার্যক্রম তদারকি ও সহায়তা প্রদান করে।[৬১]

জাতীয় নিরাপত্তায় অপ্রচলিত হুমকি মুকাবিলা : জাতীয় নিরাপত্তায় অপ্রচলিত হুমকিসমূহ যেমন– সন্ত্রাসী হামলা কিংবা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে ঘটিত মানবিক বিপর্যয় ইত্যাদি মুকাবিলার জন্য

৫৮. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৬০. প্রাগুক্ত।
৬১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

সেনাবহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সহযোগিতায় সন্ত্রাসবিরোধী ও দুর্যোগ মুকাবিলা বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রকার প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যপ্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সেনাবহিনীকে দুর্যোগ মুকাবিলার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ভারি সরঞ্জামও প্রদান করা হয়েছে।[৬২]

বাংলাদেশ নৌবাহিনী : তদানীন্তন পাকিস্তান নৌবাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও সৈনিকগণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে ১৭ জন অফিসার, ৪১৭ জন নৌ সেনা এবং ২টি পেট্রোল ক্র্যাফট নিয়ে 'শান্তিতে সংগ্রামে সমুদ্রে দূর্জয়' শ্লোগান বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার রক্ষক। এ ছাড়া উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রাকৃতিক দূর্যোগ মুকাবিলা এবং নৌপথে বা সমুদ্রপথে মাদক পাচার রোধ ও চোরাচালান রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য প্রাথমিকভাবে সন্দ্বীপ এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ও হাতিয়া চ্যানেলের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত ভাসানচর নির্চাচন করা হয়। ইতোমধ্যে উক্ত এলাকার জরিপকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। এ জরিপ তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে চরের সুবিধাজনক স্থানে হেলিপ্যাড নির্মাণসহ অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে চরটিতে নৌবাহিনীর কন্টিনজেন্ট মোতায়েন রয়েছে।[৬৩]

বাংলাদেশ বিমান বাহিনী : মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কিছু সামরিক ও বেসামরিক বিমান নিয়ে 'বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত' শ্লোগান বুকে ধারণ করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী কার্যক্রম শুরু করে। আকাশপথে হামলা মুকাবিলা বিমান বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়সহ যে কোনো ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিমান বাহিনী হেলিকপ্টার সহায়তা প্রদান করে।[৬৪]

সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী : শান্তি শপথে বলীয়ান বাংলাদেশ পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা, নির্যাতিত মানুষের পাশে বন্ধুর মতো দাঁড়ানো এবং অপরাধীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে থাকে। যদিও বৃটিশ আমলে পুলিশ ছিল সাধারণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন। পুলিশের কর্মকাণ্ড ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনস্বার্থ বিরোধী।[৬৫] বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের প্রধান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। বাংলাদেশ পুলিশের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন 'পুলিশ মহাপরিদর্শক' (আইজিপি) বা ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী পুরুষ ও নারী উভয় নিয়ে গঠিত।

এক নজরে বাংলাদেশ পুলিশ :

- বাংলাদেশ পুলিশের নীতিমূলক শ্লোগান হচ্ছে : শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-প্রগতি। এ পর্যন্ত ২০টি জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ পুলিশ নিযুক্ত রয়েছে।[৬৬]
- বাংলাদেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার সারদায় অবস্থিত।
- কনস্টেবলদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে পিটিসি বা পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার বলে। বাংলাদেশে ৪টি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার আছে। যথা : (১) নেয়াখালী, (২) মহেড়া, টাঙ্গাইল, (৩) খুলনা ও (৪) রংপুর।
- পুলিশ বাহিনীর জন্য ২ স্তরের পুরস্কার রয়েছে। যথা : (১) বীরত্ব পুরস্কার ও (২) জিএস মার্ক। বীরত্ব পুরস্কার ৩টি। যথা : (১) বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল, (২) প্রেসিডেন্ট পুলিশ মেডেল ও (৩) আইজি

৬২. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১৬-২০১৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩
৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
৬৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*(ঢাকা : সমাবেশ, ২০০৬), পৃ. ১০০
৬৬. https://www.police.gov.bd/bn/at_a_glance_deployment_and_completed_un_missions, visited on 10.09.2019

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাজ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাষ্ট্র ও জনগণের সেবায় দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য বীরত্ব পুরস্কার দেয়া হয়। জিএস (GS Mark) হলো সার্ভিস বইতে প্রশংসাপূর্ণ মন্তব্য লিখন যা পুলিশ বা তদুর্ধ কর্মকর্তাগণ দিয়ে থাকেন।

- পুলিশ বাহিনীর জন্য ২ প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা আছে। যথা : (১) লঘু দণ্ড ও (২) গুরু দণ্ড।
- রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স-এর স্মৃতিসৌধটি **১৯৭১** সনের **২৫** মার্চ মধ্যরাতে পাক-বাহিনীর আক্রমণে নিহত পুলিশদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় **১৯৮৯** সালে।

পুলিশের বিভাগভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান : বাংলাদেশ পুলিশের বিভাগগুলো নিম্নরূপ :

সিআইডি : পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেসটিগেশন ডিপার্টমেন্ট সংক্ষেপে সিআইডি নামে পরিচিত। পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলের খুটিনাটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কথা বাদ দিলে বর্তমান সময়ের সিআইডি পুলিশের কর্তব্য ও ব্যবস্থাপনা প্রায় বৃটিশ যুগের প্রণীত **১৮৬১** সালের পুলিশ আইনের আলোকে পরিচালিত।[৬৭] ঢাকার মালিবাগে এর প্রধান কার্যালয়টি অবস্থিত। একজন এডিশনাল আইজি সিআইডি প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।[৬৮]

সিআইডির কার্যক্রম :

- তদন্তের স্বার্থে পুলিশ কর্মকর্তা এবং সংস্থাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা।
- অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর পলাতক অপরাধীর পরিচিতি সংগ্রহ, সনাক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকে সাহায্য করা।
- বিশেষ ধরনের অপরাধ ও পেশাদার অপরাধীর তথ্য সংগ্রহ করা। যাতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে অন্য তদন্ত কাজে সহায়তা করা যায়।
- অপরাধী ও অপরাধকে সনাক্তকরণের জন্য সিআইডির নয়টি বিভাগ আছে। যথা : (১) ফিঙ্গার প্রিন্ট ব্যুরো, (২) ফুট প্রিন্ট ব্যুরো, (৩) হ্যান্ড রাইটিং ব্যুরো, (৪) ব্যালেস্টিক ব্যুরো, (৫) মাইক্রো এ্যানালাইসিস ব্যুরো, (৬) কেমিকেল এ্যানালাইসিস ব্যুরো, (৭) জালনোট শাখা, (৮) ফটোগ্রাফিক ব্যুরো ও (৯) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো।[৬৯]

স্পেশাল উইপন্স এন্ড ট্যাকটিস (SWAT) : অনেক সময় সন্ত্রাসী ধরতে গিয়ে কিছু কিছু অভিযান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে যেখানে নিয়মিত অভিযানে অংশ নেয়া পুলিশ সদস্যদের পক্ষে অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা, জিম্মি উদ্ধার অভিযানে দক্ষ এবং আধুনিক অস্ত্রসস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর প্রয়োজন হয়। কারণ কিছু অপরাধী গোষ্ঠী উন্নত অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুলিশের মুকাবেলা করে। সাজোয়া যান, সাব মেশিনগান, স্লাইপার রাইফেল, নাইট ভিশন গগলস্ সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক সরঞ্জাম নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একটি এলিট ফোর্স গঠন করা হয়ে থাকে। **১৯৬৮** সালে লস এঞ্জেলস পুলিশ প্রথম সোয়াট গঠন করে। ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এবং কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে সোয়াট গঠন করা হয়।[৭০] বাংলাদেশ পুলিশেও ২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় সোয়াট গঠন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা প্রশিক্ষকগণ প্রথমে ঢাকায় ৪২ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তারপর তাদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিশেষায়িত দলটি গঠন করা হয়। এই বাহিনীর জন্য উন্নতমানের সাজ-সরঞ্জাম, স্লাইপার রাইফেল ও

৬৭. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৬৮. http://www.online-dhaka.com/619_746_2109_0-cid-dhaka.html, visited on 16.10.2019
৬৯. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৪৪
৭০. S. Dempsey John & S. Forst Linda, *An Introduction to Policing*(New York : Delmar Cengage Learning, 2011), p. 276

Dhaka University Institutional Repository

যানবাহনসহ সহায়ক অন্যান্য সব কিছুতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার সহায়তা দেয়। বিশেষায়িত মামলা তদন্ত, বোমা অপসারণ, জিম্মি উদ্ধার, বোমা বিস্ফোরণ মামলা তদন্ত ইত্যাদিতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের সোয়াত গঠন করা হয়েছে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) : পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ সংক্ষেপে এসবি নামে পরিচিত। ষাটের দশকে ছাত্র ও শ্রমিক সংগঠনের তৎপরতা বৃদ্ধিসহ আন্দোলন পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকার দেশের প্রতিটি জেলায় পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৩ সালে ঢাকার মালিবাগে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয়।[৭১] পরবর্তীতে এ সংস্থার উপর আরো কিছু নতুন দায়িত্ব অর্পিত হয়। এ সব দায়িত্বের মধ্যে রয়েছে– অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, ছাত্র তৎপরতা ও শ্রমিক তৎপরতা পর্যবেক্ষণ করা, রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের তৎপরতা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয় সরকারকে অবহিত করা। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ সংস্থাটি আরো সুগঠিত করা হয় এবং ভিআইপি বা রাষ্ট্রীয় অতিথিদের নিরাপত্তার জন্য এ সংস্থার সাথে যুক্ত করা হয় কিছু সংখ্যক প্রটেকশন ফোর্স। এ ফোর্স বাংলাদেশের প্রত্যেক মহানগর পুলিশ ফোর্সের সাথে যুক্ত রয়েছে।[৭২] বর্তমানে কেন্দ্রে একজন অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ স্পেশাল ব্রাঞ্চের প্রধানের দায়িত্ব পালন করছেন। তাকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন পুলিশ সুপার ও ডেপুটি পুলিশ সুপার, আর তার দাপ্তরিক স্টাফ রয়েছেন।[৭৩] রেঞ্জের অধীনস্থ প্রত্যেকটি জেলা সদরে একজন সাব-ইন্সপেক্টর, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, হেড কনস্টেবল ও ওয়াচার কনস্টেবল রয়েছেন। জেলা স্পেশাল ব্রাঞ্চের সামগ্রিক দায়িত্ব জেলা পুলিশ সুপারের উপর ন্যস্ত থাকে। তিনি সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল বিষয়ের সংবাদসমূহ কেন্দ্রীয় অফিসে প্রেরণ করেন।

স্পেশাল ব্রাঞ্চের কার্যাবলী :

- বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নেতাদের দেয়া বক্তৃতা রেকর্ড করা এবং আপত্তিকর বক্তব্য প্রদানকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া।
- রাজনৈতিক ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দৈনিক প্রতিবেদন (DR), সাপ্তাহিক গোপনীয় প্রতিবেদন (WCR) ইত্যাদি তেরি করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো।
- বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই করা এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করা।
- রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকারক কোনো কর্মকাণ্ড ও আইন-শৃঙ্খলা অবনতিকারক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ, যাচাই ও প্রয়োজনীয় প্রতিকার মূলক ব্যবস্থার জন্য দ্রুত যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
- সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রার্থীদের ভেরিফিকেশন।
- নিরাপত্তা পরীক্ষণ (Security Vetting)।
- দেশি, বিদেশি অতি গুরুত্বপূর্ণ (VVIP) এবং গুরুত্বপূর্ণ (VIP) ব্যক্তিবর্গের নিরাপত্তা দেয়া।
- কেপিআই ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহের জরিপ, পরিদর্শন এবং সেগুলোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।
- সীমান্তে উত্তেজনা বিষয় ও উপজাতীয়দের রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ ও গতিবিধির উপর গোয়েন্দা নজর রাখা।
- রাজবন্দিদের অন্তরীণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

---

৭১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

৭২. https://eshikhon.com/, visited on 15.09.2019

৭৩. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration*(Dhaka: Sumi Printing Press & Packing 2001), p. 20

Dhaka University Institutional Repository

- স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও জেলা স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া।
- সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করা।

র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) : র‌্যাব বাংলাদেশ পুলিশের একটি এলিট ফোর্স। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশ সংশোধন করে র‌্যাব গঠন করা হয়। বাংলাদেশ পুলিশ, সীমান্তরক্ষী বাহিনী, কোস্ট গার্ড, আনসার, সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী থেকে প্রেষণে লোক নিয়োগ করে র‌্যাব গঠন করা হয়। মূলত সন্ত্রাস দমনের উদ্দেশ্যে এটি গঠন করা হয়। এই এলিট ফোর্সটি বাংলাদেশ পুলিশের আইজির অধীনস্ত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন।[৭৪] বর্তমানে ঢাকার উত্তরায় এয়ারপোর্ট সংলগ্ন সিভিল এভিয়েশনের কার্গো এডমিন বিল্ডিং এ র‌্যাবের অস্থায়ী হেডকোয়ার্টার গঠন করা হয়েছে।[৭৫]

র‌্যাবের কর্মকাণ্ড : সন্ত্রাস দমন ও অপরাধীদের গ্রেফতার করা, অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, অবৈধ অস্ত্র-গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং এই ধরনের ক্ষতিকারক দ্রব্য উদ্ধার, যে কোনো সংঘটিত অপরাধ ও অপরাধীদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য প্রদান করা, সরকারি আদেশ অনুসারে যে কোনো অপরাধের তদন্ত করা, অন্যান্য যে কোনো সরকারি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা প্রভৃতি।

র‌্যাব-এর কাঠামো : সদর দপ্তরের অধীনে নয়টি শাখা কাজ করে।

(১) অপারেশন শাখা : (ক) পরিকল্পনা এবং সমন্বয়, (খ) ডগ স্কোয়াড ও (গ) বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট।
(২) গোয়েন্দা : (ক) তথ্য, (খ) গোয়েন্দা পর্যবেক্ষণ ও (গ) সন্ত্রাসীদের পারস্পরিক যোগাযোগের সময় তথ্য সংগ্রহ।
(৩) লিগ্যাল এবং মিডিয়া শাখা : (ক) লিগ্যাল সেল ও (খ) মিডিয়া সেল।
(৪) যোগাযোগ এবং এমআইএস উইং : (ক) অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও (খ) ডাটাবেস এবং তথ্য ব্যবস্থা।
(৫) তদন্ত এবং ফরেনসিক শাখা : (ক) ইনভেস্টিগেশন সেল ও (খ) ফরেনসিক সেল।
(৬) বিমান শাখা : (ক) আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ এবং ছবি সংগ্রহ, (খ) অনুসন্ধান এবং উদ্ধার, (গ) আকাশ টহল, (ঘ) সন্ত্রাসবিরোধী কার্যক্রম ও (ঙ) পরিবহন কার্যক্রম।
(৭) প্রশাসন এবং অর্থায়ন শাখা : (ক) প্রশাসনিক শাখা, (খ) শৃঙ্খলা শাখা ও (গ) পরিবহন শাখা।
(৮) প্রশিক্ষণ শাখা : (ক) প্রাথমিক প্রশিক্ষণ শাখা, (খ) সন্ত্রাসবিরোধী প্রশিক্ষণ শাখা, (গ) প্রাথমিক গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ কোর্স, (ঘ) প্রাথমিক গাড়ি চালনা এবং কম্পিউটার চালনা প্রশিক্ষণ।
(৯) আর এন্ড ডি শাখা : গবেষণা এবং উন্নয়ন শাখা।

সদর দপ্তরের অধীনে সারা দেশে মোট **১২**টি ব্যাটালিয়ন আছে। যার মধ্যে **৫**টিই ঢাকায়। **১** থেকে **৪** নম্বর ব্যাটালিয়ন এবং **১০** নম্বর ব্যাটালিয়নের অবস্থান ঢাকায়।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন : ১৯৭৬ সালে **৯** ব্যাটালিয়নের একটি রিজার্ভ বাহিনী গঠন করে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন নাম দেয়া হয়। এই ব্যাটালিয়নের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে একজন ডিআইজি আইজিপিকে সাহায্য করেন।[৭৬] নদী পথের জন্য একটি রিভার ব্যাটালিয়ন এবং কেবল নারী সদস্যদের নিয়ে একটি নারী ব্যাটালিয়নও আছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে **১১**টি ব্যাটালিয়ন রয়েছে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের। নদীপথ বা দুর্গম পার্বত্য

---

৭৪. http://www.rab.gov.bd, visited on 04.07.2019
৭৫. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৭৬. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলসহ সব জায়গাতেই পুলিশের এই ব্যাটালিয়নগুলো কাজ করছে। প্রতিটি ব্যাটালিয়নে ৫টি কোম্পানি থাকে। আর প্রতিটি কোম্পানি ৩টি প্লাটুনে বিভক্ত। প্রত্যেক ব্যাটালিয়নে সব মিলিয়ে ৬৪৭ জন পুলিশ সদস্য থাকেন।[৭৭] ১৯৭৯ সালের আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অধ্যাদেশের মাধ্যমে এ ব্যাটালিয়নকে যে সব দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা নিম্নরূপ :

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা।

(খ) বেআইনি অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক প্রভৃতি উদ্ধার।

(গ) সশস্ত্র অপরাধী চক্র গ্রেফতার।

(ঘ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় অন্যান্য ইউনিটকে সহায়তা প্রদান।

(ঙ) বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনো কাজ।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়ে আসছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা দেয়া, গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান যেমন নির্বাচন আয়োজন, ভিআইপি নিরাপত্তা দেয়া প্রভৃতি দায়িত্ব পালনে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন সুনাম কুড়িয়েছে। বিভিন্ন আন্তঃইউনিট ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়ও এই সাফল্য রয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালের জুন থেকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব নেবার পর থেকে সেখানকার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রী হয়রানি রোধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের বিভন্নি ইউনিট ও ইউনিট প্রধান :

ডগ স্কোয়াড : ১৯৯৮ সালের ২০ নভেম্বর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের পুলিশ বাহিনীর মতো বাংলাদেশ পুলিশেও ডগ স্কোয়াড যুক্ত হয়। ২৫টি কুকুরের মধ্যে ১২টি জার্মান সেফার্ড এবং ১৩টি ল্যাবরাডার জাতের কুকুর ইংল্যান্ডের চিলপট ইউকে লিঃ-এর কাছ থেকে সরবরাহ নেয়া হয়। বিদেশি দুইজন বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশি ডগ স্কোয়াডে অফিসারদেরকে কুকুর পরিচালনাসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এ ডগ স্কোয়াডের দায়িত্বে আছেন একজন পুলিশ কমিশনার, একজন সহকারি পুলিশ সুপার, একজন ইন্সপেক্টর, একজন সার্জেন্ট, তিনজন হাবিলদার, চারজন নায়েক ও ত্রিশজন কনস্টেবল।[৭৮] কুকুরের খাদ্য তৈরির জন্য দুইজন বাবুর্চি ও দুইজন ক্যানেল ক্লিনারও আছেন। মিরপুর ১৪ নং সেকশনে কুকুরগুলোর জন্য ক্যানেল ও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন স্থাপনা তৈরি করা হয়েছে।

রেলওয়ে পুলিশ : ব্রিটিশ শাসনামলে রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এর বিস্তৃতি ঘটানো হয়। বিস্তৃতির সাথে সাথে চুরি-ডাকাতিসহ বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি দেখা দেয়। এ জন্য প্রথমে আধাসামরিক বাহিনী গঠন করা হয় এবং পরে রেল পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পুরো রেলওয়ে পুলিশকে একটি রেঞ্জের আওতাভুক্ত করা হয়।[৭৯] বাংলাদেশ সৃষ্টির পর রেল পুলিশে মৌলিক কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। তবে এর সদর দপ্তর চট্টগ্রামে সরিয়ে নেয়া হয়। বর্তমানে রেল পুলিশের দু'টি জোন রয়েছে। চট্টগ্রাম জোন ও সৈয়দপুর জোন।[৮০] এ দুটি জেলায় দুজন পুলিশ সুপার পুলিশ প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।[৮১] রেল পুলিশের অধিক্ষেত্র হল রেললাইনের উভয় পার্শ্বে ১০ ফিট পর্যন্ত।[৮২] চট্টগ্রাম জোনে আটটি রেলওয়ে থানা, সতেরটি ফাঁড়ি ও চারটি

---

৭৭. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-593/section-18554.html, visited on 10.07.2019; The Armed Police Battalions Ordinance, 1979, Ordinance No. XXV of 1979

৭৮. https://www.thedailystar.net/news-detail-14850, visited on 14.08.2019

৭৯. মোঃ মতিয়ার রহমান, *পুলিশ প্রবিধানমালা বেঙ্গল*, ১৯৭৩(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ৩১৪-৩২০

৮০. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

৮১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-১৫৫

৮২. Dr. M. Enamul Huq, *Criminal Justice System Administration*, Ibid, p. 21

Dhaka University Institutional Repository

সার্কেল রয়েছে। সৈয়দপুর জোনে আটটি রেলওয়ে থানা, সতেরটি ফাঁড়ি এবং চারটি সার্কেল রয়েছে। একজন ডিআইজির নেতৃত্বে রেল পুলিশ পরিচালিত হচ্ছে।

চট্টগ্রাম জোন : (ক) চট্টগ্রাম রেলওয়ে থানায় (১) ষোলশহর, (২) ফৌজদার হাট, (৩) সীতাকুণ্ড, (খ) লাকসাম থানায় (৪) চৌমুহনী, (৫) ফেনী, (৬) কুমিল্লা, (৭) চাঁদপুর, (গ) আখাউড়া থানায় (৮) বি-বাড়িয়া, (ঘ) শ্রীমঙ্গল থানায় (৯) সায়েস্তাগঞ্জ, (ঙ) ভৈরব থানায় (১০) নরসিংদী, (চ) ময়মনসিংহ থানায় (১১) গফরগাঁও, (১২) গৌরীপুর, (১৩) মোহনগঞ্জ, (ছ) জামালপুর থানায় (১৪) দেওয়ানগঞ্জ, (১৫) শরিষাবাড়ী, (জ) ঢাকা রেলওয়ে থানায় (১৬) টঙ্গী ও (১৭) নারায়ণগঞ্জ রেল ফাঁড়ি রয়েছে।

সৈয়দপুর জোন : (ক) পার্বতীপুর রেলওয়ে থানায় (১) পার্বতীপুর, (২) হিলি, (৩) সৈয়দপুর, (খ) লালমনিরহাট থানায় (৪) রংপুর, (৫) কাউনিয়া, (গ) বোনারপাড়া থানায় (৬) তিস্তামুখ ঘাট, (৭) বগুড়া, (ঘ) সিরাজগঞ্জ থানায় (৮) সিরাজগঞ্জ, (ঙ) রাজবাড়ী থানায় (৯) গোয়ালন্দ, (চ) পোড়াদহ (১০) কুষ্টিয়া, (১১) চুয়াডাঙ্গা, (১২) দর্শনা, (ছ) খুলনা থানায় (১৩) খুলনা, (১৪) দৌলতপুর, (১৫) যশোর, (জ) রাজশাহী থানায় (১৬) আমনুড়া, (১৭) চাপাইনবাবগঞ্জ রেল ফাঁড়ি রয়েছে।

শিল্পাঞ্চল পুলিশ : বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের শিল্প কারখানার উন্নয়ন এবং বিস্তারের সাথে সাথে শিল্পাঞ্চলে নতুন ধরনের সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক অসন্তোষকে পুঁজি করে বিভিন্ন মহল শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। এর ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন রপ্তানিমুখী বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এমতাবস্থায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিশেষ পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ঢাকা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা আশুলিয়াতে ক্ষুদ্র অবয়বে গাজীপুর জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রাণাধীনে শিল্পাঞ্চল পুলিশ ২০০৯ এর জুন থেকে পরিচালিত হতো। ক্রমে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চলসহ সীতাকুণ্ডে জাহাজ কাটার এলাকাটিও শিল্পাঞ্চল ও পুলিশের দায়িত্বভুক্ত এলাকায় এনে শিল্পাঞ্চল-এর জন্য বৃহত্তর ও ক্ষমতাধর একটি সুশৃঙ্খল পুলিশ সংস্থা গড়ার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ৩১ অক্টোবর ২০১০ তারিখ থেকে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে শিল্পাঞ্চল পুলিশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।[৮৩] এতে একজন মহাপরিচালক ৫ জন পরিচালকসহ ১৮টি পদে সর্বমোট ১৫৮০ জন সদস্য নিয়োজিত আছেন। এই পুলিশ বাহিনী স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ উভয়ের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য চেষ্টা করে থাকে। মালিক পক্ষ যাতে যথাসময়ে শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দেয় সেদিকেও শিল্প পুলিশ লক্ষ্য রাখে।

সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন সেবা :

বাংলাদেশ পুলিশ, সিটিজেন চার্টার[৮৪] : বাংলাদেশ পুলিশ জনগণের সেবা প্রদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক শ্রেণি নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি থানায় সকল নাগরিকের সমান আইনগত অধিকার ও নিরাপত্তা লাভের সুযোগ রয়েছে। থানায় আগত সাহায্যপ্রার্থীদের আগে আসা ব্যক্তিকে আগে সেবা প্রদান করা হয়। থানায় সাহায্যপ্রার্থী সকল ব্যক্তিকে থানা পুলিশ সম্মান প্রদর্শন করে থাকে এবং সম্মানসূচক সম্বোধন করবে। থানায় জিডি করতে আসা ব্যক্তির আবেদনকৃত বিষয়ে ডিউটি অফিসার সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে এবং আবেদনের দ্বিতীয় কপিতে জিডি নম্বর, তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ তা আবেদনকারীকে প্রদান করতে হবে। বর্ণিত জিডি সংক্রান্ত বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করা

৮৩. https://bn.wikipedia.org/wiki/, visited on 15.06.2019
৮৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সিটিজেন চার্টার*(ঢাকা : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণায়ল, ২০০৭), পৃ. ৮-৯

Dhaka University Institutional Repository

হবে এবং গৃহীত ব্যবস্থা পুনরায় আবেদনকারীকে অবহিত করা হবে। থানায় মামলা করতে আসা ব্যক্তির মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক এজাহারভুক্ত করা হবে এবং আগত ব্যক্তিকে মামলা নম্বর, তারিখ ও ধারা এবং তদন্তকারী অফিসারের নাম ও পদবী অবহিত করতে হবে। তদন্তকারী অফিসার এজাহারকারীর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে তাকে তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করবে এবং তদন্ত সমাপ্ত হলে তাকে ফলাফল লিখিতভাবে জানিয়ে দিবে।[৮৫] থানায় মামলা করতে আসা কোনো ব্যক্তির মামলা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা থানার ডিউটি অফিসার এন্ট্রি করতে অপারগতা প্রকাশ করলে তখন উক্ত বিষয়টির উপর প্রতিকার চেয়ে নিম্নলিখিত নিয়মানুযায়ী আবেদন করতে হয় :

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকার সহকারি কমিশনার জোন বা জেলার সহকারি পুলিশ সুপার (সার্কেল) এর নিকট আবেদন করতে হবে।

(খ) তিনি যদি উক্ত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বা জেলা পুলিশ সুপারের নিকট আবেদন করবেন।

(গ) অতঃপর তিনিও যদি উক্ত ব্যক্তির বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কমিশনার বা ডিআইজির নিকট আবেদন করবেন।

(ঘ) তারা কেউ উক্ত বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা না করলে মহাপুলিশ পরিদর্শকের নিকট উক্ত বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করবেন।

আহত ভিকটিমকে থানা থেকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে এবং এ বিষয়ে থানা সকল মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করবে। শিশু-কিশোর অপরাধী সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আইন, ১৯৭৪ এর বিধান অনুসরণ করতে হবে এবং তারা যাতে কোনোভাবেই বয়স্ক অপরাধীর সংস্পর্শে না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে কিশোর হাজতখানার ব্যবস্থা করা হবে। মহিলা আসামি বা ভিকটিমকে যথাসম্ভব মহিলা পুলিশের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের কিছু সংখ্যক থানায় ওয়ানস্টপ ডেলিভারি সার্ভিস চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ওয়ানস্টপ ডেলিভারি সার্ভিস সেন্টার দেশের সকল থানায় প্রবর্তন করা হবে। আহত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভিকটিমকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য দেশের সকল থানায় পর্যায়ক্রমে ভিকটিম সাপোর্ট ইউনিট চালু করা হবে। পাসপোর্ট, ভেরিফিকেশন ও আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স ইত্যাদি বিষয়ে সকল অনুসন্ধান প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করে থানা থেকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে। থানা থেকে বর্ণিত আইনগত সহযোগিতা না পাওয়া গেলে বা কোনো পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বরাবরে অভিযোগ দাখিল করা যাবে।

পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট : বিদেশে যাওয়া বা বিদেশে চাকুরির ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট এর অর্থ হচ্ছে, যাকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স দেয়া হচ্ছে তিনি কোনো অপরাধী নন এবং তার বিরুদ্ধে থানায় কোনো অভিযোগও নেই। ঢাকার বাসিন্দাদের পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট প্রয়োজন হলে রমনায় অবস্থিত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে। সকল পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ইংরেজি ভাষায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যায়িত করে দেয়া হয়।[৮৬]

---

৮৫. http://www.online-dhaka.com/619_689_2260_0-bangladesh-police-citizen-charter-dhaka.html, visited on 14.07.2019

৮৬. www.bangladesh_police_clearance_certificate+online, visited on 05.05.2018

Dhaka University Institutional Repository

সিটিজেন হেল্প রিকোয়েস্ট : 'সিটিজেন হেল্প রিকোয়েস্ট' ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের একটি নতুন প্রকল্প। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পুরো এলাকাই 'সিটিজেন হেল্প রিকোয়েস্ট' প্রকল্পের আওতাভুক্ত।[৮৭] এ ছাড়া পুলিশ সদর দপ্তরের মাধ্যমে প্রবাসীগণ পুলিশের সাহায্য চাইতে পারেন। পুলিশ সদর দপ্তরের নারী নির্যাতন এবং মানবপাচার প্রতিরোধ সেল দু'টিকেও এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এই সেবা বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলাদেশ পুলিশের। পুলিশের তাৎক্ষণিক সাড়া প্রয়োজন নেই এমন ক্ষেত্রে মানুষ অনলাইনে জিডি করতে পারেন এবং পুলিশের সহায়তা চাইতে পারেন। পুলিশের ওয়েবসাইট বা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জনসাধারণ পুলিশের সাহায্য চাইতে পারেন। ইভ টিজিং সংক্রান্ত তথ্য, ছিনতাই বিষয়ক তথ্য, দলিল, সার্টিফিকেট, পরিচয়পত্র ইত্যাদি হারানো, চুরি বা ছিনতাই সংক্রান্ত তথ্য, নতুন বা পুরাতন নৈশপ্রহরী, দারোয়ান, গৃহপরিচারিকা, কেয়ারটেকার প্রভৃতি নিয়োগ (পলায়ন) সংক্রান্ত তথ্যাদি, নতুন বা পুরাতন ভাড়াটিয়া সম্পর্কিত তথ্য, প্রবাসীদের সমস্যা বা অভিযোগ, ভিকটিম সাপোর্ট ইত্যাদির তথ্য জানানো এবং পুলিশের সাহায্য চাওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে আলাদা আলাদা ফরম রয়েছে। এ জন্য ওয়েবসাইটে গিয়ে 'সিটিজেন হেল্প রিকোয়েস্ট'-এ ক্লিক করতে হয়। এছাড়া ফ্যাক্সের মাধ্যমেও প্রবাসীরা অভিযোগ জানাতে পারেন।

জিডি করতে সাহায্য করা : সাধারণ মানুষের কাছে জিডির গুরুত্ব ভিন্ন। কোনো থানায় মামলাযোগ্য নয় এমন ঘটনা ঘটলে মানুষ থানায় জিডি করে থাকেন। আবার কাউকে ভয়-ভীতি দেখানো হলে বা অন্য কোনো কারণে যদি তিনি নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন, কিংবা কোন ধরনের অপরাধের আশংকা করেন তাহলেও তিনি জিডি করতে পারেন। সরাসরি থানায় গিয়ে জিডি করার পাশাপাশি ঘরে বসে অনলাইনেও জিডি করার ব্যবস্থা রয়েছে। জিডি শব্দটি জেনারেল ডায়েরীর সংক্ষিপ্ত রূপ। প্রতিটি থানায় এবং ফাঁড়িতে একটি ডায়েরীতে ২৪ ঘন্টার খবর রেকর্ড করা হয়। প্রতিদিন সকাল আটটায় ডায়েরি খুলে পরের দিন সকাল আটটায় বন্ধ করা হয়। অর্থাৎ কার্যত এটি কখনই বন্ধ হয় না। এই ডায়েরিতে থানার বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন আসামি কোর্টে চালান দেয়া, এলাকার বিভিন্ন তথ্য, থানার উর্ধ্বতন কার্যক্রম যেমন কর্মকর্তাদের আগমন ও প্রস্থানের তথ্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে।[৮৮] জিডি করার পর পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকে। প্রয়োজনবোধে তদন্ত করা, নিরাপত্তা দেয়া ছাড়াও জিডির বিষয়টি মামলাযোগ্য হলে পুলিশ মামলা করে থাকে। আইনগত সহায়তা পাওয়ার জন্য জিডি অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অনেক সময় আদালতেও জিডিকে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এজাহার করা : ফৌজদারি আইনের ১৫৪ ধারা ও পিআরবির ২৪৩ প্রবিধান মতে কোনো ব্যক্তি নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা না হোক, দেখা সাক্ষী হোক বা না হোক, কোনো আসামি বা সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম বলতে পারুক বা না পারুক, তিনি যদি নিশ্চিত হন যে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তাহলে তিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে এজাহার দায়ের করতে পারেন।[৮৯] এজাহার বা প্রাথমিক তথ্য বিবরণী (FIR-First Information Report) হচ্ছে অপরাধ সংঘটনের পর পুলিশের কাছে পৌঁছানো সর্বপ্রথম লিখিত বা মৌখিক সংবাদ।[৯০] এজাহার দেয়া বা এফআইআর করাকেই মামলা করা বলা হয়।

ভিকটিম সাপোর্ট : কোনো ধরনের সহিংসতার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত বা ভিকটিম সহায়তা চেয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। ভিকটিম, তার পরিবারের সদস্য এবং সাক্ষীর কথা শুনে পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। ভিকটিমের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আইনি সহায়তা ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। পুনরায় ভিকটিম হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে ভিকটিমকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দেয়া হয়।

---

৮৭. www.police.gov.bd/; www.dmp.gov.bd/, visited on 20.06.2018

৮৮. মোঃ মতিয়ার রহমান, *পুলিশ প্রবিধানমালা বেঙ্গল, ১৯৪৩*(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ১৩২-১৩৩

৮৯. আবদুর রহিম খান, *বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশনস*(ঢাকা : খোশরোজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ৫৯

৯০. তদন্ত ম্যানুয়েল প্রস্তুত কমিটি, *অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা*(ঢাকা : পুলিশ হেডকোয়ার্টার, ২০১৫), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

ভিকটিমের ঠিক কি প্রয়োজন সেটা বিবেচনা করে পুলিশ ব্যবস্থা নেয়। শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভিকটিমের জন্য পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করে। দুর্ঘটনায় আহত ভিকটিমের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

নারী ও শিশু ভিকটিমের বিষয়টি সহানুভূতির সাথে দেখা হয় এবং নারী পুলিশ সদস্য বিষয়টি তদারক করেন। ধর্ষণ, যৌতুক এবং অন্য নারী ভিকটিমকে প্রশ্ন করার সময় যাতে তারা কোনো বিব্রতকর বা আপত্তিকর প্রশ্নের সম্মুখীন না হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এ জন্য ১৯৭৬ সালে সর্বপ্রথম মহিলা পুলিশ নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[৯১] ধর্ষণের ক্ষেত্রে আলামত সংগ্রহের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

অর্থ পরিবহণে পুলিশি নিরাপত্তা : বিভিন্ন সময়ে কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনার প্রেক্ষিতে এখন অনেকেই বড় অংকের টাকা নিয়ে যাতায়াতে বেশ উদ্বিগ্ন থাকেন। সব সময় ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন করা সম্ভব না হওয়াতে ব্যক্তি পর্যায়ে এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নগদ টাকা পরিবহন করতেই হয়। বড় অংকের অর্থ আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে ডিএমপির সাহায্য নিতে পারেন সমাজের নাগরিক। এ ক্ষেত্রে যেদিন পুলিশি নিরাপত্তার প্রয়োজন হবে তার চার থেকে পাঁচ দিন পূর্বে ডিএমপির কমিশনার বরাবর কখন এবং কোথায় বিশেষ নিরাপত্তার প্রয়োজন সেটা জানিয়ে আবেদন করতে হয়। এ জন্য আলাদা কোনো মাশুল দিতে হয় না।

হাইওয়ে পুলিশ : মহাসড়ক নিরাপদ করা এবং যানজটমুক্ত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সরকার হাইওয়ে পুলিশ গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে ২০০৫ সালে হাইওয়ে পুলিশ তার যাত্রা শুরু করে। হাইওয়ে পুলিশ রেঞ্জের প্রধান কর্মকর্তা হলেন ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল (হাইওয়ে পুলিশ)। হাইওয়ে পুলিশ রেঞ্জের অধীনে দু'টি হাইওয়ে উইং আছে। ইস্টার্ন উইং এর সদর দপ্তর কুমিল্লায় এবং ওয়েস্টার্ন উইং এর সদর দপ্তর বগুড়ায় অবস্থিত। প্রতিটি উইং এর নেতৃত্বে আছেন একজন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (হাইওয়ে)।[৯২] প্রত্যেক হাইওয়ে থানা/ফাঁড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং চালক ও যাত্রীসাধারণের জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য একটি সীমিত আকারের বিশ্রামাগার রয়েছে। এছাড়া প্রতিটি থানা/ফাঁড়িতে যাত্রী সাধারণ ও চালকের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক টয়লেট রয়েছে।[৯৩] কিন্তু অপর্যাপ্ত জনবল আর যানবাহন সংকটের কারণে দেশব্যাপী বিস্তৃত মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের উপস্থিতি খুব সন্তোষজনক নয়।

পর্যটন পুলিশ : ২০০৯ সালে বিশ্বের দীর্ঘতম বালুকাবেলা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ভ্রমণরত স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানে গঠিত হয় পর্যটন পুলিশ।[৯৪] খুব শীঘ্রই পর্যটন পুলিশের কলেবর বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলোয় এর নিরাপত্তা বিধান কার্যক্রমের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে। পর্যটন পুলিশ জেলা পুলিশের অধীনে কাজ করছে।

পুলিশ অভ্যন্তরীণ ওভারসাইট (PIO) : সারাদেশে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তাদের কার্যক্রম নজরদারি করতে ও তাদের উপর গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পুলিশ অভ্যন্তরীণ ওভারসাইট নামে একটি বিশেষায়িত বিভাগ কাজ করে। ২০০৭ সালে এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তরের একজন সহকারি পুলিশ পরিদর্শক এই বিভাগের প্রধান এবং তিনি সরাসরি পুলিশ মহাপরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেন। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি

---

৯১. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

৯২. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Strategic Plan 2018-2020*(Dhaka : Bangladesh Police, 2018), pp. 8-9

৯৩. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৯৪. http://tourist.police.gov.bd/, visited on 15.02.2019

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ ইউনিট পিআইও এর সরাসরি নজরদারির আওতাধীন। পিআইও এর এজেন্টরা পুলিশ হেডকোয়ার্টারের পিআইও এর ইউনিটের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সারা দেশে ছড়িয়ে আছেন।[৯৫]

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যাবলিতে অবদান : ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ায় বাংলাদেশ পুলিশের প্রথম জাতিসংঘের শান্তি মিশনের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কাজ করে।[৯৬] এরপর থেকে যথাক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা আইভরি কোস্ট, সুদান, দারফুর, লাইবেরিয়া, কসাবো, পূর্ব তিমুর, ডি আর কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা, হাইতিসহ অন্যান্য মিশনে কাজ করে। ২০০৫ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন আইভরি কোস্টে প্রথম সন্নিবেশিত পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) কাজ শুরু করে। শান্তিরক্ষী মিশনে সর্বোচ্চ সংখ্যক পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের। বর্তমানে পৃথিবীর ছয়টি দেশে চলমান সাতটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে দুইটি নারী পুলিশ সদস্যের সমন্বিত (এফপিইউ)সহ (যার একটি কঙ্গোতে অন্যটি হাইতিতে) সর্বমোট ২০৫০ জন কর্মরত আছেন। অতীতে সমাপ্ত এবং বর্তমানে চলমান UNPOL এবং FPU শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের অংশগ্রহণের একটি চিত্র নিচে উল্লিখিত হলো[৯৭] :

ক্রমিক	মিশনের নাম	দেশের নাম	সময়কাল
১.	UNTAG	নামিবিয়া	১৯৮৯-১৯৯০
২.	UNTAC	কম্বোডিয়া	১৯৯২-১৯৯৪
৩.	UNPROFOR	যুগোশ্লাভিয়া	১৯৯২-১৯৯৬
৪.	UNUMOZ	মোজাম্বিক	১৯৯৩-১৯৯৪
৫.	UNAMIR	রুয়ান্ডা	১৯৯৩-১৯৯৫
৬.	UNMIH	হাইতি	১৯৯৪-১৯৯৫
৭.	UNAVEM–III	অ্যাঙ্গোলা	১৯৯৫-১৯৯৯
৮.	UNTAES	পূর্ব স্লোভেনিয়া	১৯৯৬-১৯৯৮
৯.	UNMIBH	বসনিয়া	১৯৯৬-২০০২
১০.	UNMISET/UNMIT	পূর্ব তিমুর	১৯৯৯-২০০২
১১.	UNMIK	কসাভো	১৯৯৯-২০০৯
১২.	UNAMSIL	সিয়েরালিওন	২০০০ থেকে চলমান
১৩.	UNMIL	লাইবেরিয়া	২০০৩ থেকে চলমান
১৪.	UNOCI	আইভরিকোস্ট	২০০৪ থেকে চলমান
১৫.	UNMIS	সুদান	২০০৫-২০১১
১৬.	MONUSCO	ডিআর কঙ্গো	২০০৫ থেকে চলমান

৯৫. https://www.academia.edu/30411191/Bangladesh_police_organogram_branch, visited on 22.08.2019
৯৬. আহমেদ আমিন চৌধুরী, *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৭-৩৮৯
৯৭. https://www.police.gov.bd/bn/at_a_glance_deployment_and_completed_un_missions, visited on 10.09.2019

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	মিশনের নাম	দেশের নাম	সময়কাল
১৭.	UNMIT	পূর্ব তিমুর	২০০৬-২০১২
১৮.	UNAMID	দারফুর	২০০৭ থেকে চলমান
১৯.	UNAMA	আফগানিস্তান	২০০৮-২০১০
২০.	UNMISS	দক্ষিণ সুদান	২০১১ থেকে চলমান

বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দায়িত্ব পালন করার সুবাদে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার কাজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করণে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন।

সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশ পুলিশের অর্জনসমূহ : দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে সমুন্নত রাখতে বাংলাদেশ পুলিশ জনমুখী পুলিশি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জনগণের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও অপরাধ দমন ও নিয়ন্ত্রণকল্পে বাংলাদেশ পুলিশ কাজ করে থাকে। বাংলাদেশ পুলিশ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে কার্যকরীভাবে দায়িত্ব পালনের কারণে দশম জাতীয় সংসদের একাধিক আসনের উপ-নির্বাচন, বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, পরবর্তীতে একাধিক পর্যায়ে চতুর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও পুলিশি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা জোরদার করার মাধ্যমে বিশৃঙ্খল, ধ্বংসাত্মক, নাশকতামূলক ও বিচ্ছিন্নভাবে ঘটা অনাকাঙ্খিত ঘটনা রোধ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনায় গৃহীত পদক্ষেপ যেমন– টহল, চেকপোস্ট, স্ট্যাটিক প্ররক্ষা, ভিআইপি, বেআইনি সমাবেশ ও দাঙ্গা দমন, নির্বাচন, ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের নিরাপত্তা ইত্যাদি হিসেবে ১ জুলাই ২০১৫ তারিখ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ডিউটি সম্পাদন করে।[৯৮]

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অস্থিতিশীল রাজনৈতিক কর্মসূচি, সন্ত্রাস দমন এবং দেশে নতুন জঙ্গি সংগঠনের তথ্য উদঘাটন ও জঙ্গিবিরোধী অভিযানের মাধ্যমে একের পর এক দেশব্যাপী জঙ্গি আস্তানা নিশ্চিহ্ন করা, অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারসহ জঙ্গি সদস্যদের আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখী করে বাংলাদেশ পুলিশ সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে। জঙ্গিবাদ দমনে এন্টিটেররিজম ইউনিট (এটিইউ) গঠন, সোয়াট-এর আধুনিকায়ন, সাইবার অপরাধ, অর্থনৈতিক অপরাধ, মানব পাচার ক্যাসিনোসহ অন্যান্য আন্তঃদেশীয় অপরাধ দমনে কার্যকর ও সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩১ মার্চ ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় ও অপরাধীদের আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে ২৮,০১,৬২৮ জন পরোয়ানাভুক্ত ও সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করা হয়। যুগোপযোগী পুলিশি সেবার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১৮-২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' বাংলাদেশ পুলিশ হেল্পলাইন, অনলাইন পুলিশ ক্লিয়ারেন্স প্রভৃতি সেবা জনগণের জন্য সহজতর ও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।[৯৯]

---

৯৮. বাংলাদেশ পুলিশ, *বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৮), পৃ. ৪
৯৯. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশি কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণসহ পুলিশি সেবাকে অধিকতর গণসম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং এর প্রসারের বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মাদক ব্যবস্থা, নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি পুলিশিং যেমন– ওপেন হাউজ ডে, জনসংযোগ সভা, বিকল্প নিষ্পত্তি, অপরাধ বিরোধী সভা ইত্যাদি কৌশল প্রয়োগের দ্বারা গণসচেনতা সৃষ্টির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের রূপকল্প : বিশ্বাস ও আস্থাভাজন, যোগ্য, দক্ষ, নিবেদিত ও পেশাদার পুলিশ সদস্যগণ কর্তৃক মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাসযোগ্য, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করা।

বাংলাদেশ পুলিশের অভিলক্ষ্য : জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ পুলিশ আইন প্রয়োগ, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ ভীতি হ্রাস, জন-নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অঙ্গীকারাবদ্ধ।[১০০]

বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত উদ্দেশ্য : বাংলাদেশ পুলিশের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও আইনের শাসন জোরদারকরণ।
২. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও জঙ্গি দমনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
৩. বিজ্ঞান ভিত্তিক তদন্ত ব্যবস্থাপনা।
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের সেবা সহজীকরণ।
৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন।
৬. জনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ।
৭. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।
৮. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন।
৯. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।
১০. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

বাংলাদেশ পুলিশের কার্যাবলী : সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পুলিশের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১. অপরাধ তদন্ত কার্যক্রম, অপরাধী সনাক্তকরণ, গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল, সমন জারি ও সাক্ষী হাজিরকরণসহ মামলা নিষ্পত্তিতে আদালতে রাষ্ট্রপক্ষকে সহায়তা প্রদান।
২. গোয়েন্দা কার্যক্রম, ভিভিআইপি/ভিআইপিগণের নিরাপত্তা, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তাসহ জাতীয় ও ধর্মীয় সকল অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা প্রদান।
৩. জনশৃঙ্খলা ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন।
৪. নিরাপত্তামূলক বুদ্ধিবৃত্তি লালন করে নাগরিকদের মানসম্পন্ন জীবনযাপন জন্য ব্যক্তি ও সমাজের জন্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।[১০১]
৫. কমিউনিটি পুলিশিং কার্যক্রম, ওপেন হাউজ ডে এবং অপরাধ বিরোধী জনসংযোগ সভার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
৬. সন্ত্রাস, জঙ্গি দমন ও আন্তঃদেশীয় অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ।

---

১০০. বাংলাদেশ পুলিশ, *বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১০১. A K M Shahidul Hoque bpm ppm, *Police and Community with Concept of Community Policing*(Dhaka : Jatiya Mudran, 2014), pp. 53-54

Dhaka University Institutional Repository

৭. মাদকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মাদক বিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা এবং মাদকের অপব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসা।

৮. তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক পুলিশ সার্ভিস গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল স্তরে ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

৯. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন এবং ইন্টারপোল এর মাধ্যমে অপরাধীদের আইনের আওতায় আনতে সহায়তাকরণ।

১০. দুর্ঘটনায় দ্রুত সাড়া প্রদান ও প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

১১. '৯৯৯' এ টোল ফ্রি কল এবং এর দ্বারা জনগণকে জরুরি সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ।

সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে শাসন বিভাগের পুনর্বিন্যাস : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বিক্ষিপ্ততা, একাধিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপস্থিতি, সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এরূপ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার ক্রমান্বয়ে তিনটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে। একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হলো বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর ভিতরের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের জন্য ক্লাস্টার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এর ফলে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আধুনিকীকরণ সম্পন্ন। সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের অদিকতর সমন্বিত বাস্তবায়নের সাথে সাথে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিকল্পনার উন্নয়ন ও ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক পরিকল্পনার দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

প্রারম্ভিক একীভূতকরণ ও সমন্বয় পর্যায়-১ (২০১৫-২০২৫)-এ নিম্নলিখিত বাস্তবায়ন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে ৫টি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারে বিন্যস্ত করা হয় এবং প্রতিটি ক্লাস্টারের সমন্বয়ের জন্য একটি মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় থাকে।[১০২] বিষয়ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ক্লাস্টারগুলো হলো :

১. সামাজিক ভাতা : মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হলো মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

২. খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা : মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হলো খাদ্য মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

৩. সামাজিক বীমা : মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হলো অর্থ মন্ত্রণালয়; সরকারি পেনশনের জন্য, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ বেসরকারি পেনশনের জন্য; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হলো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

---

১০২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*(ঢাকা : পরিকল্পনা কমিশন, ২০১৫), পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

৪. শ্রম ও জীবিকায়ন : মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়কারী মন্ত্রণালয় হলো স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, অর্থ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।

৫. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন : মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হলো প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; অন্যান্য বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলঅ ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় ইত্যাদি।[১০৩]

অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব হলো তাদের নিজস্ব কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও কর্মসূচির কার্যকর বাস্তবায়ন, সঠিক লক্ষ্য নিশ্চিতকরণ এবং অপচয়রোধে অসহনশীলতা প্রদর্শন। এছাড়াও তারা তাদের ক্লাস্টারভুক্ত অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করবে, এমআইএস কার্যকর করবে ও তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলো পরিবীক্ষণ করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে রিপোর্ট পেশ করবে। মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়গুলো সেসব মন্ত্রণালয় ক্লাস্টারভুক্ত বিষয়ের সাথে যাদের ব্যাপক সংযোগ রয়েছে। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পকিল্পনার উপর ভিত্তি করে তারা চলমান কর্মসূচিসমূহের সমন্বয় ও নতুন কর্মসূচির নকশা প্রস্তাব করবে, ক্লাস্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়গুলোর প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং এসএসসি বিষয়ক কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) নিকট সেসব প্রতিবেদন পেশ করবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কারিগরি সহায়তায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ স্বতন্ত্র্য মন্ত্রণালয় এবং মুখ্য সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় থেকে উপস্থাপিত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক সামগ্রিক কাজের বাস্তবায়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন সাধন করবে। এটি সিএমসি-কে কারিগরি, আর্থিক, প্রশাসনিক ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করবে। সিএমসি কর্ম ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুমোদন করবে, সামাজিক নিরাপত্তা সংস্কারের বাস্তবায়ন সমন্বয় করবে, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয় নিশ্চিতকরণ, সমস্যা সমাধান ও সংকট প্রশমন করবে। সিএমসি এর আরও দায়িত্ব হলো সামাজিক নিরাপত্তা কমৃসূচিগুলোর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা এবং নতুন কমৃসূচির নকশা অনুমোদন দেয়া। সিএমসি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মসূচিসমূহের এমআইএস-এর কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করবে। এছাড়াও সিএমসি এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করবে। বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর সমন্বয় সাধনে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা (ইউএনও) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।[১০৪] যেসব মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ ক্রস-কাটিং দায়িত্ব পালন করে থাকে সেগুলো হলো :

---

১০৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১০৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

(১) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও অন্যান্য জাতীয় কৌশলের সাথে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও নীতির সামঞ্জস্যকরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রস্তুতকরণের দায়িত্ব পালন করবে অত্র বিভাগ। এছাড়া, অত্র বিভাগ বার্ষিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং সিএমসি-কে অতিরিক্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।[১০৫]

(২) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ : আইএমই বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে।

(৩) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ : পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) এবং বিবিএস উপকারভোগীদের তথ্যভাণ্ডার তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও হালনাগাদ করে থাকে।

(৪) অর্থ বিভাগ : এই মন্ত্রণালয় সরকার কর্তৃক অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন ও ব্যয় বরাদ্দ করবে এবং আর্থিক সেবাপ্রদান বিষয়ে তদারকি করবে।

(৫) স্থানীয় সরকার বিভাগ : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকারভোগী চিহ্নিতকরণে কমিউনিটি ভিত্তিক অংশগ্রহণ পদ্ধতি অনুসরণ করবে। এছাড়া অত্র বিভাগ এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত অভিযোগ ও বিরোধ নিস্পত্তিতে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। প্রয়োজনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানে সহায়তা করবে।[১০৬]

এছাড়া প্রারম্ভিক একীভূতকরণ ও সমন্বয় পর্যায়-২ (২০২৬ পরবর্তী সময়ে) এর অংশ হিসেবে জীবনচক্রভিত্তিক ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন করা হবে এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি শক্তিশালী ও পুনর্গঠিত সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হবে যা জীবনচক্রভিত্তিক সব ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তাবয়ন করবে।[১০৭] যেমন : (ক) শিশুদের ভাতা (এতিমদের জন্য কর্মসূচিসহ); (খ) ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা ভাতা কর্মসূচি; (গ) প্রতিবন্ধী ভাতা; (ঘ) বয়স্ক ভাতা ও (ঙ) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচি।

উল্লেখ্য, দুর্যোগ মুকাবিলা কার্যক্রম, কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিসমূহ, খোলা বাজারে বিক্রয় ও জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচির আওতা বহির্ভূত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অব্যাহত থাকবে। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যবণ্টনের উপর ভিত্তি করে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও বিপদ বিবেচনায় নিয়ে নতুন উদ্ভাবনীমূরক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে এসব কর্মসূচির সমন্বয় সাধন করবে।[১০৮] মন্ত্রিপরিষদের সুশাসন ও নীতি প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ অব্যাহত থাকবে এবং মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলোর ক্রস-কাটিং ইস্যু এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব অব্যাহত থাকবে।

(৬) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজ সেবা অধিদপ্তর : পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত কর্মসূচিগুলোর সেবা প্রদানের দায়িত্ব পালন করবে: (১) বয়স্ক ভাতা; (২) শিশুদের ভাতা (এতিমদের জন্য কর্মসূচিসহ)[১০৯]; (৩) প্রতিবন্ধী ভাতা[১১০]; (৪) ঝুঁকিগ্রস্ত মহিলা ভাতা কর্মসূচি ও (৫) মুক্তিযোদ্ধা ভাতা কর্মসূচি।

---

১০৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

১০৭. প্রাগুক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

১০৯. আবদুর রশিদ, *মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৩), পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

জীবনচক্রভিত্তিক কর্মসূচিসমূহের জন্য বিস্তারিত বাস্তবায়ন কৌশল তৈরি করবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এর মূল কর্মসূচিসমূহের আওতাবহির্ভূত কর্মসূচিগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত করে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এনএসএসএস-এর অর্থায়ন ও তৎসম্পর্কিত নীতি পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে এবং সরকারি চাকুরির পেনশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সমন্বয় তদারকি করে। এনএসএসএস-এর সাথে সামাজিক নিরাপত্তা নীতি ও কৌশলের সামঞ্জস্য বিধান এবং মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহের সাথে সমন্বয় সাধন করে।[১১১] নীতি, কর্মসূচি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সকল আইন ও বিধিবিদান মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদন ও কার্যকর করে থাকে। বিদ্যমান প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা মাঠ পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার অধীনস্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে যোগ্য সেবাগ্রহীতাদের কাছে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার দক্ষ ও কার্যকর সরবরাহ নিশ্চিত করে।[১১২] এ উদ্দেশ্য অর্জনে এর প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব নিম্নরূপ :

- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্গঠিত কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা যা দক্ষ ও কার্যকরভাবে সেবা গ্রহীতাদের কাছে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদানে সক্ষম হবে।
- জীবনচক্র সম্পর্কিত সব ধরনের কর্মসূচির সেবা সরবরাহে সেবা প্রদানের মানদণ্ড প্রস্তুত করা এবং সেবা প্রদানে এসব আদর্শমান অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক কর্মসূচির সেবা প্রদানে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ও বিশেষায়িত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা।
- প্রতিটি কর্মসূচির নির্দেশাবলি অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন নিশ্চিত করা।
- যোগ্য উপকারভোগীদের তালিকা হালনাগাদকরণ নিশ্চিত করা এবং অর্থ সেবা প্রদানকারীদেরকে নিয়মিতভাবে সঠিক তালিকা সরবরাহ করা।
- উচ্চ মানসম্পন্ন তথ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হবে।
- অর্থ সেবা প্রদানকারীদেরকে তদারকির জন্য কার্যবিধি ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা এবং সেবা প্রদানকারীরা যেন উচ্চমান বজায় রেখে কাজ করে তা নিশ্চিত করা।
- সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এবং মন্ত্রণালয়ভুক্ত সকল ইউনিটের উচ্চমানসম্পন্ন বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করা।
- উচ্চমানসম্পন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং জিম্মাদার সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি কমাতে কার্যবিধি প্রণয়ন করা ও সেগুলো অনুসরণ নিশ্চিত করা।

(৭) তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য একক রেজিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করা : সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য উচ্চমানসম্পন্ন তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) আবশ্যক। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে বিভিন্ন দেশের উচ্চ মাত্রার বিনিয়োগের কারণে বিদ্যমান তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির

---

১১০. আবদুর রশিদ, *মাতৃ-পিতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
১১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১১২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্বলতা একদিকে যেমন বিনিয়োগকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়; তেমনি অন্যদিকে কর্মসূচিসমূহ পরিচালনা ও পরিবীক্ষণের সামর্থ্যকে খর্ব করে। অধিকন্তু, কমৃসূচিতে ব্যয়িত অর্থ সঠিক সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছানো ও তা সুবিধাভোগীদের উপরে ব্যাপক প্রভাব রাখছে কিনা তা নিশ্চিত করতে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য এক জায়গায় নিয়ে আসাটা কোনো সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক উন্নয়নশীল দেশের দৃষ্টান্ত থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।[১১৩] বিভিন্ন কর্মসূচির 'এমআইএস'সমূহ প্রয়োজনে একটির সাথে অপরটির সংযুক্ত করা যেতে পারে এবং এভাবে সকল প্রধান কর্মসূচি থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়ে সরকারকে জাতীয় পর্যায়ের সামগ্রিক তথ্য প্রদান করা সম্ভব। কার্যত বাংলাদেশে খানাভিত্তিক তথ্য ও জাতীয় পরিচয়পত্রসহ স্বাধীন অথচ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কর্মসূচিভিত্তিক এমআইএসগুলোর নেটওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে জাতীয়ভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

সুতরাং বিভিন্ন কর্মসূচির জন্য একে অপরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে ও সরকারকে সামগ্রিক তথ্য প্রদান করতে পারে এমন এমআইএস-এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ সরকার একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রস্তুত করবে। এই একক তালিকা সকল বাংলাদেশী নাগরিকদের জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভাণ্ডারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ (এসআইডি) এই একক তালিকা প্রতিষ্ঠার প্রধান ভূমিকা পালন করবে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশের সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির এমআইএস-এর উপর একটি সমীক্ষা সম্পাদন করবে। এই সমীক্ষার কাজ হবে একটি উত্তম একক তথ্য তালিকা প্রতিষ্ঠায় কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হতে পারে সে বিষয়েও সুপারিশ প্রদান করা। প্রাথমিক পর্যায়ে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগে এমআইএস চালু করবে। পরবর্তীতে দেশব্যাপী এমআইএস সম্প্রসারণ করা হবে।[১১৪] আশা করা হয়েছিল ২০১৮ সাল নাগাদ একটি সম্পূর্ণ কার্যকর জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একক তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে; কিন্তু বাস্তবে তা আশানুরূপ বাস্তবায়িত হয়নি। কাঙ্খিত সে এমআইএস এর প্রধান বেশিষ্ট্য ছিল :

- সকল কর্মসূচিতে এমআইএস তথ্য ভাণ্ডারের জন্য একই ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা;
- উচ্চমানসমপন্ন কম্পিউটার হার্ডওয়্যারে বিনিয়োগ করা;
- তথ্য আদান-প্রদানে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা;
- অনুমোদিত প্রটোকল অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অন্তর্ভুক্তিকরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং সরকারের সকল স্তরে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে প্রবেশের সুবিধা প্রদান করা;
- এমআইএস ব্যবস্থাপনায় পেশাগতভাবে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা এবং
- নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিতকরণে উচ্চ পর্যায়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকা।

(৮) আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারে সরাসরি সরকার থেকে ব্যক্তি (জি২পি) পেমেন্ট ব্যবস্থা জোরদারকরণ : জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার সংস্কার সাধন হবে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের আরেকটি মূল সংস্কার যাতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসার ঘটে এবং অপচয় রোধ করা যায়। আর্থিক ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবহারের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

---

১১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১১৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যাতে করে উপকারভোগীরা বিভিন্ন আর্থিক সেবা যেমন– সঞ্চয়ী হিসাব খোলা, ঋণ সুবিধা ও বীমা সুবিধায় ব্যাপকভাবে প্রবেশ করতে পারে। বস্তুত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ প্রদান ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করেছে।[১১৫]

সুতরাং এ উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বিদ্যমান জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থার উপর একটি ব্যাপক পর্যালোচনা সম্পাদন করবে এবং এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাসমূহও পর্যালোচনা করবে। পর্যালোচনার মাধ্যমে উপকারভোগীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির জন্য বিদ্যমান অর্থ প্রদান ব্যবস্থাকে কীভাবে সংস্কার করা হবে সে বিষয়ে তারা সুপারিশ প্রদান করবে। এ পর্যালোচনা ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে শুরু হওয়া এমআইএস সমীক্ষার সমান্তরালে পরিচালিত হবে। আলোচ্য পর্যালোচনা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সরকার কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে। অতঃপর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ মূল সেবাদানকারী মন্ত্রণালয় বা বিভাগসমূহের সহযোগিতায় ২০১৬ সালের জুলাই মাস থেকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ বৃদ্ধি লক্ষ্যে জি২পি পেমেন্ট ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে আসছে।

(৯) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি জোরদারকরণ : পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য উপকারভোগী নির্বাচনের বিদ্যমান প্রক্রিয়ায় নেক দুর্বলতা রয়েছে।[১১৬] এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো হলো :

- দরিদ্র পরিবারগুলোকে লক্ষ্য করে গৃহীত কর্মসূচিগুলোতে অতিদরিদ্রদের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে গেছে অথচ যারা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য নয় তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির উপকারভোগীদের প্রায় ৩৩ শতাংশের বয়স নির্ধারিত সয়স সীমার চেয়ে কম।
- দেশব্যাপী প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরনের পদ্ধতি জোরদারকরণ এবং একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন।

মূল সামাজিক কর্মসূচিগুলোতে প্রস্তাবিত ব্যয় বাড়লেও ভাতা ও সহায়তা সঠিক মানুষের কাছে যাচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। তবে, বিশেষ করে দারিদ্র্যভিত্তিক নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সঠিকভাবে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একটি অভিন্ন সমস্যা। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রক্সি মিনস টেস্ট (পিএমটি) পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশ দারিদ্র্য তথ্যভাণ্ডার তৈরি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিএমটি এপ্রোচের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত মানুষদের চিহ্নিত করতে স্থানীয় সরকার ও এনজিওসমূহের সহায়তায় একটি সমন্বিত ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতির সঠিক চিত্র তুলে ধরতে খানাভিত্তিক তথ্যভাণ্ডারের নিয়মিত ও ধারাবাহিক হালনাগাদকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেক উন্নয়নশীল দেশ বয়স নির্ধারণে কার্যকর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, কাজেই বাংলাদেশ তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় ক্ষেত্রেই অনেক দেশের পক্ষেই প্রতিবন্ধী শনাক্ত করা সমস্যাজনক। তবে, সরকার প্রতিবন্ধী ভাতা পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্যদের অন্তর্ভুক্ত করতে পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক।

---

১১৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, সরকার উপকারভোগী বাছাইয়ের বিদ্যমান প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করবে যা প্রতিটি কর্মসূচিতে ব্যবহার করা যাবে। এ সমীক্ষা কেবল বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ও শিশুদের জন্য সুবিধা সংক্রান্ত কর্মসূচিকেই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করবে না, বরং শিক্ষা উপবৃত্তি, দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচি এবং ওয়ার্কফেয়ার কর্মসূচিকেও পর্যালোচনা করবে। এই পর্যালোচনা উচ্চমানের নির্বাচন ব্যবস্থার সুপারিশ করবে।[১১৭] ডিসেম্বর ২০১৫ নাগাদ এ সমীক্ষার কাজ শুরু করার প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং জুন ২০১৬ নাগাদ আলোচ্য পর্যালোচনার সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল। তারপর জুলাই ২০১৬ এর পর থেকে সরকার পর্যায়ক্রমে কর্মসূচিগুলোতে নতুন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এ সমীক্ষা পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করে। তবে সমীক্ষার কাজে সহায়তাকল্পে একটি 'ক্রস গভর্নমেন্টাল এডভাইজরি বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উপকার গ্রহীতাদের বিষয়ে সব সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব সরকারের এ ধরনের উপলব্ধির কারণে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়, যা দেশব্যাপী প্রয়োগযোগ্য একটি নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে। বাছাই প্রক্রিয়া বিষয়ে পরিচালিত সমীক্ষার সমান্তরালে এ সমীক্ষা পরিচালিত হয় এবং এ সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন জুলাই ২০১৬ এর পর থেকে শুরু হয়।

(১০) সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে সম্পৃক্ততা : সামাজিক নিরাপত্তার সাথে উন্নয়ন অংশীদারগণ নানাভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। গত দশকে দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদারগণ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে প্রধানত বেসরকারি খাতের মাধ্যমে।[১১৮] ব্র্যাকের কর্মসূচিতে অর্থায়নের ক্ষেত্রে ডিএফআইডি একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং চর জীবিকায়ন কর্মসূচির (সিএলপি) অর্থায়নের উৎস ডিএফএটি-এর সহায়তায় একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন যেসব কর্মসূচিতে অর্থায়ন করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

- ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম (এফএলএসপি) এবং
- ফুড এন্ড সিকিউরিটি ফর দ্যা আলট্রাপুওর প্রোগ্রাম (এফএসইউপি)।

ইউএনডিপি অর্থায়িত প্রকল্পগুলো হলো :

- রুরাল এমপ্লয়মেন্ট অপারচ্যুনিটিস ফর পাবলিক এসেটস (আরইওপিএ);
- স্ট্রেংদেনিং উইমেন'স এ্যাবিলিটি ফর প্রোডাকটিভ নিউ অপরচ্যুনিটিস (এসডব্লিউএপিএনও)।

এসব কর্মসূচি মূলত আয় বর্ধনমূলক বা সম্পদ হস্তান্তরমূলক কর্মসূচি যেগুলো বহু সংখ্যক অতিদরিদ্রকে চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে লক্ষণীয় মাত্রায় সহায়তা করেছে।

সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম উন্নয়ন অংশীদার হলো বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের আগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র হলো দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ জোরদারকরণ, পিএমটি পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি জাতীয় একক সুবিধাভোগী নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং শর্তযুক্ত একটি নতুন নগদ অর্থ হস্তান্তরমূলক (সিসিটি) কর্মসূচি প্রবর্তন। বিশ্বব্যাংক দরিদ্রদের জন্য পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, এসআইডি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাথে তারা ঘনিষ্টভাবে কাজ করে থাকে। গত তিন বছর ধরে উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ একটি ব্যাপকভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতির প্রয়োজন বিষয়ে

---

১১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

১১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের সাথে একটি নীতি-সংলাপ আয়োজনে সচেষ্ট রয়েছে। এর ফলে এনএসএসএস-এর উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা ও কারিগরি সহায়তা শীর্ষক একটি কার্যকরি কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে। এনএসএসএস প্রণয়নের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সরকার ও উন্নয়ন অংশীদারদের মধ্যে ব্যাপকতর অংশীদারিত্ব বিষয়ে একটি কাঠামো গঠিত হয়েছে।[১১৯] সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উন্নয়ন অংশীদারদের সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহকে সরকার স্বাগত জানায় এবং স্বতন্ত্র্য কর্মসূচিতে তাদের সহায়তার জন্য সরকার এনএসএসএস-কে কাজে লাগাবে। এনএসএসএস বাস্তবায়নে সরকার কারিগরি সহায়তার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান করবে এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতির কাঠামোর (যা সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

(১১) এনজিওদের সাথে সম্পৃক্ততা : সামাজিক নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে বিশ্বমানের বেশ কিছু এনজিও গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের এনজিওদের উদ্ভাবিত 'গ্র্যাজুয়েশন' এপ্রোচ বর্তমানে অনেক দেশে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং সফলভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। এনজিও ও কমিউনিটির মাঝে অংশীদারিত্ব বিষয়ে সরকার গর্ববোধ করে থাকে। দারিদ্র্য নিরসন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্ব ইতিবাচক ফল দিচ্ছে। সরকার এনএসএসএস-এর উপর ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই অংশীদারিত্বকে অব্যাহত রাখবে এবং প্রয়োজনে এই অংশীদারিত্বকে আরো গভীরতর ও বিস্তৃত করবে।[১২০]

উদ্ভাবনীমূলক ধ্যান-ধারণা পাইলটিং করা, বিশেষ করে দুর্গম এলাকায় বসবাসের কারণে বা জনসংখ্যার প্রান্তিক বা অরক্ষিত সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে যাদের কাছে পৌঁছানো কঠিন তাদের মধ্য থেকে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের চিহ্নিতকরণ এবং এনএসএসএস-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তিতে সহায়তা করা।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন ব্যবস্থা : যে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের জন্য যথাযথ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা যথাযথ না হলে সুষ্ঠুভাবে প্রণীত এবং যথাযথ ও পর্যাপ্তভাবে অর্থায়িত সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদানে ব্যর্থ হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও সুশাসন সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি বিশেষ চ্যালেঞ্জ। বাস্তবায়ন ব্যবস্থা নিজেই কিছু সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সুতরাং যে কৌশল অধিকসংখ্যক কর্মসূচি পরিহার করে এবং স্বয়ংক্রিয় অর্থ লেনদেন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা সহজ হবে সে কৌশল ও ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর ও দক্ষ হবে বলে প্রতীয়মান হয়।[১২১] বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতির কতিপয় উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

প্রথমত: ২৩টি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১৪৫টি কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে (সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহও এতে অন্তর্ভুক্ত)।

দ্বিতীয়ত: বেশির ভাগ মন্ত্রণালয় ও সংস্থা ছোট আকারের কর্মসূচি পরিচালনা করছে, যাদের সামষ্টিক বরাদ্দ মোট সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের ১ শতাংশেরও কম।

---

১১৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১২০.প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়ত: প্রায় সাতটি মন্ত্রণালয় যেমন– দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মোট বরাদ্দের ৭৫ শতাংশেরও বেশি ব্যয় পরিচালনা করে থাকে।

চতুর্থত: বাজেট বরাদ্দের দিক দিয়ে সর্ববৃহৎ একক কর্মসূচি হচ্ছে সরকারি কর্মচারিদের জন্য পেনশন কর্মসূচি, যা একটি মন্ত্রণালয় অর্থাৎ অর্থ মন্ত্রণালয় এককভাবে পরিচালনা করে।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ প্রণয়নকালে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের বাজেট বরাদ্দ নিম্নরূপ ছিল[১২২]:

ক্রম	মন্ত্রণালয়ের নাম	কর্মসূচির সংখ্যা (২০১৪-১৫)	বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		মোট এসএসপি বাজেটের %	
			(২০১৩-১৪)	(২০১৪-১৫)	(২০১৩-১৪)	(২০১৪-১৫)
১.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩১	২৫৬৬.২০	৩৭৪৮.৩৪	৯.৬২৮	১২.১৭৪
২.	স্থানীয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৬	৩১১৪.৯৮	৩৭৫৪.২৪	১১.৬৮৭	১২.১৯৩
৩.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১১	৫৬৭২.৯৩	৬১০১.০৯	২১.২৮৪	১৯.৮১৫
৪.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৩	১১০০.৩১	১১৭৮.৯৩	৪.১২৮	৩.৮২৯
৫.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১১	১৭৮০.০৭	১৯৫৫.৬২	৬.৬৭৮	৬.৩৫১
৬.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪	১৫১৬.০০	১৫৭৪.৯৪	৫.৬৮৮	৫.১১৫
৭.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬	৪২৮.০০	৪১৩.০০	১.৬০৬	১.৩৪১
৮.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৭	৭১৭৫.০৫	৮৭৩৭.৭৩	২৬.৯১৯	২৮.৩৭৮
৯.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬	১৩৩.৬০	১৩৫.৯৬	০.৫০১	০.৪৪২
১০.	মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয়	৭	১৫১.৪১	১৯৬.১১	০.৫৬৮	০.৬৩৭
১১.	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪	২৫৯.৪৫	২৯৮.৯৭	০.৯৭৩	০.৯৭১
১২.	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪	২৫১.৭৯	৩০২.১৩	০.৯৪৫	০.৯৮১
১৩.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১	১৫৬৫.০০	১৬৮৭.৫০	৫.৮৭২	৫.৪৮১
১৪.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২৬৬.৭০	২৫০.৮৮	১.০০১	০.৮১৫
১৫.	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	৫৯.৭৫	১০১.৯০	০.২২৪	০.৩৩১
১৬.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	২.৫০	৩.১০	০.০০৯	০.০১০
১৭.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	৮৬.৩৪	১২৪.৪০	০.৩২৪	০.৪০৪
১৮.	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	৩৫.৮৬	৯.৮০	০.১৩৫	০.০৩২
১৯.	শিল্প মন্ত্রণালয়	১	১৫০.০০	০.০০	০.৫৬৩	০.০০০
২০.	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	১৩১.৪৫	৩২.০০	০.৪৯৩	০.১০৪
২১.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩	১৮৫.৭৩	১৬১.৬২	০.৬৯৭	০.৫২৫
২২.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১	৪.৮৯	৬.০০	০.০১৮	০.০১৯
২৩.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১	১৬.০০	১৬.০০	০.০৬০	০.০৫২
	মোট (২৩টি মন্ত্রণালয়)	**১৪৫**	**২৬৬৫৪.০১**	**৩০৭৯০.২৬**	**১০০**	**১০০**

১২২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

Dhaka University Institutional Repository

মোট বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, তখন সামাজিক নিরাপত্তা বাজেটের বৃহদাংশ পেত খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৬ শতাংশ। তারপরেই যথাক্রমে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ২০ শতাংশ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০ শতাংশ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ৯ শতাংশ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৬.৪০ শতাংশ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ৫ শতাংশ। বাজেট বরাদ্দের বৃহৎ কর্মসূচির ব্যবস্থ্যাপনার দায়িত্ব ও বর্তব্যসমূহ নিচের সারণিতে দেখানো হলো[১২৩]:

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়	কর্মসূচি
১.	অর্থ মন্ত্রণালয়	সরকারি কর্মচারিদের পেনশন
২.	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ভাতা
৩.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	ভিজিডি
৪.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	প্রাথমিক উপবৃত্তি
৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাধ্যমিক বৃত্তি
৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	কর্মসৃজন কাজের বিনিময়ে খাদ্য
৭.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	খোলা বাজারে বিক্রয়

উক্ত সারণিতে দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কাজের সমন্বয়ের কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। কতিপয় কৌশলগত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবেচনায় জাতীয় বাজেটের মাধ্যমে কর্মসূচিতে বার্ষিক অর্থায়ন করে থাকে অর্থ মন্ত্রণালয়। তবে তা কোনো স্বতন্ত্র কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মসম্পাদন বা কার্যকারিতার মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে বলে প্রতীয়মান হয় না। কর্মসূচিসমূহের পরিকল্পনার ঘাটতি, বিক্ষিপ্ততা, একই ধরনের লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত থাকা এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে একাধিক বাস্তবায়নকারী সংস্থার উপস্থিতি দেখা যায়। মূলত দুর্যোগ, ঝুঁকি, অর্থনৈতিক সঙ্কট ইত্যাদি থেকে উদ্ভুত প্রকৃত প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে এবং দারিদ্র্য হ্রাসের পরিপূরক পদক্ষেপ হিসেবে স্বতন্ত্র কর্মসূচিসমূহ যুক্ত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের প্রশাসন বা পরিচালনা পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে দুর্বল। কর্মসূচিগুলো বহুসংখ্যক মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের সেবা প্রদানে কোনো মন্ত্রণালয়েরই সুস্পষ্ট কর্মদক্ষতা নেই।[১২৪] বস্তুত, কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়গুলো কাগজভিত্তিক তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহার করে কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। কর্মসূচিসমূহের সুবিধাভোগীদের তথ্যসম্বলিত কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার যেমন নেই, তেমনি কেন্দ্রের সাথে স্থানীয় এলাকাগুলো সংযুক্ত করবে এমন কোনো উন্নত ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিও নেই। ফলে সরকারের পক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর কার্যকরভাবে পরিচালন ও পরিবীক্ষণ সম্ভবপর হয় না।

তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে দুর্বলতা থাকার কারণে ভাতা বা অর্থ প্রদান ব্যবস্থা স্থানীয়ভাবে পরিচালিত হয়। অনেক সহায়তার অর্থ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রদান করা হলেও কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ প্রথমে স্থানীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয় এবং স্থানীয় সরকার তা ব্যাংকে পাঠিয়ে দেয়। এতে জাতীয় পর্যায়ে দরপত্র আহ্বান করে সেবাপ্রদানকারীর মাধ্যমে অর্থ প্রদান করার যে অর্থনৈতিক সুবিধা তা

---

১২৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

১২৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

লাভের সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। দুর্বল পরিচালন ও পরিবীক্ষণের কারণে খাদ্য সহায়তামূলক কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য অপচয় হয়ে যাওয়ারও অনেক উপমা রয়েছে। যেমন– কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিতে বিতরণকৃত খাদ্যশস্যের ৩০ শতাংশ অপচয় হয় বলে দাবি করা হয়। ভিজিডি কর্মসূচিতে খাদ্যশস্যের অপচয়ের পরিমাণ প্রায় ১৩ শতাংশ। বিশেষ করে কেন্দ্র থেকে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ থেকে স্পষ্টত বুঝা যায় যে কর্মসূচি পরিচালনার অন্যান্য দিক কার্যকর নয়। পর্যাপ্ত নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও এখানে পর্যাপ্ত নেই। এছাড়া মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলো যে কার্যকরভাবে কর্মসুচিসমূহ পরিবীক্ষণ করার পাশাপাশি স্থানীয় সরকারকে জবাবদিহি যেমন– পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন বা তাৎক্ষণিক যাচাইয়ের মাধ্যমে করাতে সক্ষম সে ধরনের কোনো লক্ষণও পরিলক্ষিত হয় না। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহ স্বীকার করে যে, কর্মসূচিসমূহ দক্ষ ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের কর্মচারিদের পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের কর্মচারিদের সক্ষমতাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা দরকার।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ব্যবস্থার সেবা প্রদান শক্তিশালীকরণ : বাংলাদেশ সরকার উপলব্ধি করে যে, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সফলতার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করা গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক সমস্যা ও দুর্বল শাসন ব্যবস্থা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উত্তম প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে তা দুর্নীতি কমাতেও সহায়তা করে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় উপকারভোগীদেরকে সেবা প্রদানের জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে শক্তিশালী করা না হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সফল হবে না।[১২৫] বস্তুত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের প্রয়োজন রয়েছে। অগ্রাধিকারভিত্তিক মূল ক্ষেত্রগুলো হলো :

- একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে জোরদার ও নিশ্চিত করবে।
- জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিকরণ যার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহ দক্ষভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীদেরকে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।
- তথ্য ব্যবস্থপনা পদ্ধতিসমূহের মান উন্নয়ন করা যাতে করে এগুলো কার্যকর ও দক্ষভাবে নগদ অর্থ সহায়তা সেবা প্রদানের ভিত্তি হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পরিবীক্ষণে সহায়ক হতে পারে।
- দুর্নীতি কমাতে অর্থ প্রদান ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং বিশেষ করে দরিদ্র ও দারিদ্র্যঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারসমূহের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা পদ্ধতি প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
- কার্যকর নালিশ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে দেশের সকল নাগরিকই সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পুনর্বিবেচনার আবেদন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্টদের দুর্ব্যবহার ও প্রতিশ্রুত সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতার বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সরকারের শাসন বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে আসছে। চলমান সময়ে সামাজিক কর্মসূচির আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং পরিধি ব্যাপক সম্প্রসারণ হওয়ার ফলে এসব কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাসসহ শিক্ষা, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রভৃতি খাতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। তবে কিছু কিছু

১২৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অপচয়, অপব্যবহার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের গুণগতমান রক্ষা এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। এছাড়াও কিছু ক্ষেত্রে কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এসব বিষয়গুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন, সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সুশাসন ও উপযুক্ত নীতিমালার মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জনে সরকারকে বদ্ধ পরিকর হতে হবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের নির্দেশনা অনুসরণ পূর্বক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের তথ্য নিয়ে একটি সমন্বিত এমআইএস (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম) শক্তিশালী করণের কাজ চলমান রয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজে ভূমিকা পালনকারী কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারিত হওয়ার পাশাপাশি অধিকতর কার্যকর সুষমভাবে বাস্তবায়িত হবে এটাই দেশের নাগরিকের ঐকান্তিক কামনা।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ

বাংলার গ্রামীণ শাসন বিভাগ অতি প্রাচীন একটি শাসন ব্যবস্থা। গ্রামীণ শাসন বিভাগ একেক সময় একেক নামে পরিচিত ছিল। পঞ্চায়েত, ইউনিয়ন কমিটি কিংবা ইউনিয়ন পরিষদ নামে খ্যাত এ গ্রামীণ শাসন বিভাগটি সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যোগসূত্র রক্ষা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করত। নিচে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো :

প্রাচীন কালে গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত প্রথা : পঞ্চায়েত প্রথা বাংলার ইতিহাসের মতই প্রাচীন। পঞ্চায়েত বলতে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত পর্ষদকে বুঝায়। স্মরণাতীত কাল থেকে পঞ্চায়েত শব্দটি বাংলাসহ উত্তর ভারতের সমগ্র অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে গ্রাম-সংসদ অথবা পঞ্চায়েত রাজা কর্তৃক মনোনীত বা কোনো গ্রামের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হতো এবং গ্রাম প্রসাশনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এ সংসদ ছিল বাইরের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। পঞ্চায়েতগুলিতে সকল শ্রেণি ও বর্ণের লোকদের প্রতিনিধিত্ব ছিল।[১২৬] পঞ্চায়েতগুলি গ্রামবাসীদের মধ্যে ভূমি বণ্টন করত এবং তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে সরকারের প্রাপ্য অংশ পরিশোধ করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে গ্রাম-বৃদ্ধ বা গ্রামের প্রবীণদের বিষয় উল্লেখ আছে। তারা ছিলেন গ্রাম-সংসদের সম্মানিত সদস্য এবং তাদের দায়িত্ব ছিল গ্রামের ছোটখাটো বিবাদ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সরকারি কর্মকর্তাদের সহায়তা করা।

মুসলিম শাসকগণ এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন যা বৈশিষ্ট্যগতভাবে ছিল কমবেশি কেন্দ্রাভিমুখী। এমনকি, তখনও জমিদারগণ যতদিন রাজকীয় পাওনা নিয়মিত পরিশোধ করতেন ততদিন গ্রামের প্রশাসনে শাসকরা কোনো হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামগুলিতে বিচারব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা বিদানের দায়িত্ব জমিদারদের উপর ন্যস্ত ছিল। বর্ণ-পরিষদ নামে সাধারণ্যে পরিচিত গ্রাম পরিষদ বা পঞ্চায়েত সীমিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। এ পরিষদ শুধু সামাজিক আইন ও প্রথাসমূহের ব্যাখ্যা এবং সামাজিকভাবে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবিধানের নির্দেশ করতে পারত।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনালগ্নে বাংলার গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার প্রচলিত পদ্ধতি বহাল রাখা হয়। জমিদারের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং বর্ণ-কাচারি নামে পরিচিত পঞ্চায়েত কেবল ছোটখাটো দিওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা এবং বর্ণবিষয়ক মামলা যেমন বর্ণচ্যুতি বা বিবাহ সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তি করত। পঞ্চায়েত তখনও প্রশাসনের বিচারবিষয়ক রাজনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি, কারণ জমিদারই ছিলেন গ্রামগুলিতে বিচার ও পুলিশ প্রশাসনের একক কর্তৃত্বের অধিকারী। 'ভিলেজ চৌকিদারি অ্যাক্ট, ১৮৭০'[১২৭] পাস করে গ্রাম্য চৌকিদারের পঞ্চায়েতের অধীনে ন্যস্ত করে এককালের প্রায় নির্জীব পঞ্চায়েতকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়।[১২৮] এতদসত্ত্বেও পঞ্চায়েত কোনো জনপ্রিয় সংস্থা ছিল না। এটি গ্রামের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিতও ছিল না অথবা গ্রামের কোনো কল্যাণমূলক দায়িত্বও এর উপর বর্তায়নি।

বাংলার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাসে ১৮৮৫ সাল এক নবযুগের সূচনা করে। তখন থেকে ব্রিটিশ সরকার গ্রামীণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং বাংলার মাটিতে তা বাস্তবায়নের চেষ্টায় রত ছিল।

---

১২৬. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৪), খ.৫, পৃ. ১৯৮

১২৭. The Village Chaukidari Act, 1870 (Act 6 of 1870)

১২৮. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন[১২৯] দ্বারা প্রতি জেলায় একটি করে জেলা বোর্ড এবং প্রতি মহকুমায় একটি করে লোকাল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথমদিকে গ্রাম-পঞ্চায়েত সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। কিন্তু গ্রামে কোনো কল্যাণমূলক দায়িত্ব ছাড়া গ্রাম-পঞ্চায়েতের সার্থকতা নিয়ে অচিরেই ব্রিটিশ জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। সে অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার রয়্যাল কমিশনের বিকেন্দ্রীকরণ সুপারিশ গ্রহণ করে। এ সুপারিশ অনুসারে চৌকিদারি ও গ্রামের পুরো দায়িত্ব সমন্বিত করে গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম-পঞ্চায়েতের স্থলে ইউনিয়ন বোর্ড নামে একটি নতুন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯১৯ সালের 'বেঙ্গল ভিলেজ সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট'[১৩০] পাসের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পঞ্চায়েত প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১৩১]

গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং দেশের শাসন ব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিচিত্রভাবে তা দেশের শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে এবং বিচিত্ররূপে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জনকল্যাণমূলক কার্যে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে দেশের বৃহত্তর শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা দান করে। এ ব্যবস্থা যেমন একদিকে স্থানীয় সমস্যাসমূহের সুষ্ঠু সমাধানের পথ প্রশস্ত করে, অন্যদিকে তেমনি জনগণকে প্রশিক্ষণ দানে সাহায্য করে। শাসন কার্যে যেমন তা বিকেন্দ্রীকরণ সংঘটিত করে, তেমনি অন্যদিকে গণতন্ত্রকে সার্থক করতে সহায়ক হয়। গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল। গণতন্ত্রের প্রথম পাঠ এই সকল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে জনগণ লাভ করে। জনগণের অংশগ্রহণে গৌরবান্বিত এ সকল সংস্থার কার্যকারিতার সাফল্য দেশের বৃহত্তর শাসন ব্যবস্থার সফলতার শুভ সূচনা করে।

গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতির বিবর্তন : ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৮৭০-১৮৮০ সালের মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে যাতায়াত, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় কমিটি জনসাধারণকে স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছিল। লর্ড রিপনের হাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়। প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনে ১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইনে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হয়।[১৩২] কালক্রমে স্থানীয় সংস্থাসমূহের সদস্য মনোনয়ন প্রথার সাথে নির্বাচনও সংযুক্ত হয়। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনে[১৩৩] প্রাদেশিক আইন পরিষদের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নির্বাচন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[১৩৪] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে[১৩৫] স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় হয়। এই আইন অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশে পরিণত হয়। সংস্থাগুলোর কার্যের পরিধি বিস্তৃত হয়। তাদের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। দেশের শাসন ব্যবস্থায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা হয় উল্লেখযোগ্য।

---

১২৯. The Bengal Local Self-Government Act of 1885 (Bengal Act 8 of 1885)
১৩০. The Bengal Village Self-Government Act, 1919 (Act 5 of 1919)
১৩১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*, প্রাগুক্ত, খ.৫, পৃ. ১৯৯
১৩২. The Indian Councils Act, 1892 (Act of 1892)
১৩৩. The Government of India Act 1919 (9 & 10 Geo. 5 c. 101)
১৩৪. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*(ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ২০০৬), পৃ. ৮৩১
১৩৫. The Government of India Act 1935 (Act of 1935)

Dhaka University Institutional Repository

স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দুই ধারায় বিকশিত হয়েছে; যথা– (ক) পৌর সমস্যাদি সমাধানের জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহ; যেমন– মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা, করপোরেশন ও ক্যান্টেনমেন্ট বোর্ড এবং (খ) গ্রাম্য সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ; যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদ।

পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলি শহর এলাকার জনসাধারণের স্থানীয় সমস্যাবলির সমাধান করা; যেমন– আলোর ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, বিশুদ্ধ পানীয় সরবরাহের ব্যবস্থা করা। কিন্তু গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানসমূহ গ্রামীণ জনসাধারণের স্থানীয় সমস্যাগুলোর সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; যেমন– রাস্তাঘাট নির্মাণ, পুল-কালভার্ট তৈরি, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা ইত্যাদি।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায় শুরু করে তাদের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হয়। তবে আর্থিক অনটন ও অন্যান্য ত্রুটির কারণে তাদের কার্যপ্রণালী ও কার্যক্রম তেমন সন্তোষজনক হয়ে উঠেনি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে শাসন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন নেমে আসে তার ফলে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের জীবনেও নেমে আসে এক অন্ধকারময় অধ্যায়। প্রচলিত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাতিল করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ১৯৫৯ সালের ৭ অক্টোবর ১৮ নং নির্দেশ জারি করে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা প্রবর্তন করেন। মৌলিক গণতন্ত্রের কতকগুলো প্রশংসনীয় দিক থাকলেও তা অচিরে স্বার্থান্বেষী মহলের প্রকৃত রাজনৈতিক হাতিয়ারে রূপান্তরিত হয় এবং কায়িমি স্বার্থের ধারক ও বাহক এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এ ব্যবস্থা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবেই কার্যরত রইল না, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীতে পরিণত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠিত হয় যে, এর সর্বস্তরে সরকারি কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কালক্রমে তা দুর্নীতি ও অনিয়মের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানে এই ব্যবস্থা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য সরকার সচেষ্ট হয়ে উঠে। তাই ১৯৭২ সালের অস্থায়ী শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি এক নির্দেশ জারি করে প্রচলিত সকল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে বাতিল ঘোষণা করেন এবং দেশে পঞ্চায়েত প্রথা চালু করেন। এই নির্দেশ ১৯৭২ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়; এ ব্যবস্থাও ছিল অস্থায়ী।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা আইনে এ ব্যবস্থায় কিছু রদবদল করা হয় এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়ে চূড়ান্তভাবে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা ব্যবস্থা চালু হয়। এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদ নামে চিহ্নিত হয় এবং নগর পঞ্চায়েতগুলো পৌরসভায় রূপান্তরিত হয়।[১৩৬]

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদের ৫৯ অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আইন অনুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হবে। এ সকল বিষয় সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। এভাবে নির্ধারিত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত ক্ষেত্রে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবে।[১৩৭] যেমন :

(১) প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীদের কার্যে সহায়তা দান।

(২) জনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।

(৩) জনসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

---

১৩৬. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩২

১৩৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*(ঢাকা : গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৯৮), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে কর আরোপ করতে পারবে, বাজেট প্রণয়ন করবে এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

১৯৭৫ সালের শেষ দিকে দেশে সামরিক আইন প্রশাসন সংগঠিত হলে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। জিয়া সরকার ১৯৭৬ সালে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ' জারি করে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার বিধির ভিত্তিতে বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ সমূহে ১৯৭৭ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[১৩৮]

এরশাদ সরকার 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ ১৯৮৩' জারি করে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন এবং কার্যাবলিতে কিছু পরিবর্তন সূচিত করেন। এ অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের ৪,৩৫২টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং ৭৮টি পৌরসভা ও তিনটি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৯৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ)' আইনও এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ আইনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন এবং কার্যক্রমের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৯৭ সালের আইনে ইউনিয়ন পরিষদের গঠনে আরো পরিবর্তন আনা হয়।[১৩৯]

গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার পুনর্গঠন : ১৯৮৩ সালের 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ' অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর ও ১৯৮৪ সালের জানুয়ারি মাসে। পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সরকার স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন (রহিতকরণ) অধ্যাদেশ জারি করে উপজেলা পরিষদ বিলুপ্ত করেন। ১৯৯১ সালের ২৫ নভেম্বর সরকার স্থানীয় সরকার পুনর্গঠনের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট এক স্থানীয় সরকার কাঠামো পর্যালোচনা কমিশন গঠন করেন। দীর্ঘ ৮ মাস পর্যালোচনার পর এ কমিশন ১৯৯২ সালের ৩১ জুলাই গ্রামাঞ্চলে দুই স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার এবং শহরাঞ্চলের জন্য পৌরসভা বা করপোরেশনের সুপারিশ করে। গ্রামাঞ্চলে এ কমিশন গ্রামভিত্তিক ইউনিয়ন পরিষদ এবং জেলায় জেলা পরিষদের সুপারিশ করে। থানায় একটি সমন্বয়কারী এককের সুপারিশ করা হয়। আরও সুপারিশ করা হয় যে, স্থানীয় সরকারের এসব প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে। তারা নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট থাকবে সর্বতোভাবে দায়ি।[১৪০] স্বতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসব গড়ে উঠবে। কেন্দ্রের সকল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে।

১৯৯৬ সালের ২৩ জুন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য আর একটি কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি ১৯৯৭ সালে স্থানীয় পর্যায়ে চারটি স্তরে সরকার গঠনের সুপারিশ করে। গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পর্যায়ে থানা পরিষদ এবং জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদ এবং জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় কর্মকর্তা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। শুধুমাত্র গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদের সদস্যদের মনোনয়নের ব্যবস্থা করা হয় যারা ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন।[১৪১] এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদের কাঠামো ও কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে জাতীয় সংসদে। গ্রাম পরিষদের গঠন বিতর্কিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ হাইকোর্টে

---

১৩৮. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

১৩৯. ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *রাষ্ট্র বিজ্ঞান*(ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০২), পৃ. ৫৯৭

১৪০. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৩

১৪১. ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, *রাষ্ট্র বিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সাংবিধানিক বিধি সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে দেশে গ্রামীণ সংস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ এবং উপজেলা পরিষদ এবং শহর ও নগরের জন্য রয়েছে পৌরসভা এবং করপোরেশন।

গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ : বাংলাদেশ সংবিধানের ৩য় পরিচ্ছেদ 'স্থানীয় শাসন' পর্যায়ে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক এককের শাসনভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর দেয়া হবে। এ সকল প্রতিষ্ঠান জনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করবে। সংবিধানের এ বিধি অনুযায়ী **১৯৭৩** সালের জুন মাসে জাতীয় সংসদে 'ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা' সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন করা হয়। এ আইন অনুযায়ী ইউনিয়ন পঞ্চায়েতগুলো ইউনিয়ন পরিষদরূপে পরিচিত হয় এবং নগর পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটিগুলো 'পৌরসভা' নামে পরিচিত হয়।[১৪২] জিয়া সরকার **১৯৭৬** সালে 'স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ' জারি করে ইউনিয়ন পরিষদ, থানা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও পৌরসভাগুলোর সংগঠন ও কার্যাবলির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। এরশাদ সরকারের আমলে 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ **১৯৮৩**' জারি করা হয়। এ অধ্যাদেশে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন প্রণালী নতুনভাবে নির্দেশ করা হয়। **১৯৯৩** সালের ২০ নং আইন হিসেবে জাতীয় সংসদ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) অধ্যাদেশ **১৯৮৩** এর সংশোধন করে একটি আইন প্রণয়ন করে। ফলে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন ও কার্যক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।[১৪৩] সে আইনে কিছু পরিবর্তন এনে **১৯৯৭** সালে জাতীয় সংসদ আর একটি আইন প্রণয়ন করে। পরিশেষে ২০০৯ সালের ৬১ নং আইনটি অনেক ব্যাপক আকারে প্রণীত হয়।[১৪৪] এর কিছু সংশোধনকল্পে প্রণীত হয় 'স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) (সংশোধন) আইন, ২০১০'।[১৪৫] বর্তমানে এ আইনটি কার্যকর রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলী : নতুন আইনে বর্ণিত ইউনিয়ন পরিষদের কার্যাবলি বহুমুখী। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো :

১. পাঁচশালা ও বিভিন্ন মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত।
২. পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
৩. শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা।
৪. স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
৫. কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
৬. মহামারী নিয়ন্ত্রণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
৭. কর, ফি, টোল ইত্যাদি ধার্যকরণ ও আদায়।
৮. পারিবারিক বিরোধ নিরসন, নারী ও শিশু কল্যাণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
৯. খেলাধুলা, সামাজিক উন্নতি সংস্কৃতি ইত্যাদি কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান।
১০. পরিবেশ উন্নয়ন ও সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
১১. আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের অর্পিত দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।
১২. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ।
১৩. সরকারি স্থান, উন্মুক্ত জায়গা, উদ্যান ও খেলার মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ করা।
১৪. ইউনিয়ন পরিষদের রাস্তায় ও সরকারি স্থানে বাতি জ্বালানো।

---

১৪২. ডঃ এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩৫
১৪৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ১৯৯৩(ঢাকা : বিজি প্রেস, ১৯৯৩), ১৯৯৩ সালের ২০ নং আইন
১৪৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০০৯(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০০৯), ২০০৯ সালের ৬১ নং আইন
১৪৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন*, ২০১০(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১০), ২০১০ সালের ৬০ নং আইন

Dhaka University Institutional Repository

১৫. বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ এবং বৃক্ষসম্পদ চুরি ও ধ্বংস প্রতিরোধ।
১৬. কবরস্থান, শ্মশান, জনসাধারণের সভার স্থান ও অন্যান্য সরকারি সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা।
১৭. জনপথ, রাজপথ ও সরকারি স্থানে অনধিকার প্রবেশ রোধ এবং এসব স্থানে উৎপাত ও তার কারণ বন্ধ করা।
১৮. জনপথ ও রাজপথের ক্ষতি, বিনষ্ট বা ধ্বংস প্রতিরোধ করা।
১৯. গোবর ও রাস্তার আবর্জনা সংগ্রহ, অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
২০. অপরাধ ও বিদজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ।
২১. মৃত পশুর দেহ অপসারণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ।
২২. ইউনিয়নে নতুন বাড়ি, দালান নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ এবং বিপজ্জনক দালান নিয়ন্ত্রণ।
২৩. কূপ, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ।
২৪. খাবার পানির উৎসের দূষণ রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সন্দেহযুক্ত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানের পানি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
২৫. খাবার পানির জন্য সংরক্ষিত কূপ, পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে গোসল, কাপড় কাঁচা বা পশু গোসল করানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৬. পুকুর বা পানি সরবরাহের অন্যান্য স্থানে বা নিকটবর্তী স্থানে শন, পাট বা অন্যান্য গাছ ভিজানো নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৭. আবাসিক এলাকার মধ্যে চামড়া রং করা বা পাকা করা নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৮. আবাসিক এলাকার মাটি খনন করে পাথর বা অন্যান্য বস্তু উত্তোলন নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
২৯. আবাসিক এলাকায় ইট, মাটির পাত্র বা অন্যান্য ভাটি নির্মাণ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করা।
৩০. অগ্নি, বন্যা, শিলাবৃষ্টিসহ ঝড়, ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলায় প্রয়োজনীয় তৎপরতা গ্রহণ ও সরকারকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান।
৩১. বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, এতিম, দরিদ্র, বয়স্ক ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের তালিকা সংরক্ষণ ও সাহায্য করা।
৩২. সমবায় আন্দোলন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান।
৩৩. বাড়তি খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা।
৩৪. গবাদিপশুর খোয়াড় নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৩৫. প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা।
৩৬. ইউনিয়নের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা, আরাম-আয়েশ বা সুযোগের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
৩৭. ই-গভর্নেন্স চালু ও উৎসাহিতকরণ।
৩৮. ইউনিয়ন পরিষদের মত সদৃশ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থার সাথে সহযোগিতা সম্প্রসারণ।
৩৯. সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে আরোপিত অন্যান্য দায়িত্বাবলী।

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সরকারের আইন বিভাগ কর্তৃক আইন প্রণীত হয়। প্রণীত আইন অনুযায়ী বিচার বিভাগ বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বিচারের রায় বাস্তবায়ন করার জন্য শাসন বিভাগ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান পালন করে যাচ্ছে গ্রাম কেন্দ্রিক শাসন বিভাগ তথা ইউনিয়ন পরিষদ। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করে থাকে। গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তায় আইনের প্রায়োগিক বাস্তবতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা

মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই শান্তিপ্রিয়। তারা সমাজে নিরাপত্তার সাথে বাস করতে চায়। সামাজিক জীব হিসেবে চলার পথে মানুষের চাহিদা অগণিত। কিন্তু কিছু কিছু চাহিদা বিশ্বের সকল মানুষের, সকল সময়ের। এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে গণ্য করা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। সত্যিকার অর্থে মানুষ এগুলো পূরণের কাজেই জীবনভর ব্যতিব্যস্ত থাকে। আহার, আশ্রয় আর চিকিৎসা সকল প্রাণীর মৌলিক চাহিদা হলেও এগুলোর সাথে শিক্ষা, বস্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের অগ্রাধিকার ভিত্তিক চাহিদা। বর্তমানে চাহিদাগুলো পূরণের সুবিধার্থে মানুষ গড়ে তুলেছে রাষ্ট্রসহ বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগঠন। আর যে দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আনুষ্ঠানিক সংগঠন যত শক্তিশালী সে দেশের নাগরিকরাও ততটা নিরাপদ ও উন্নত। তারপরও পৃথিবীর মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতার মাঝেই তাদের দিন যাপন করছে। নিরাপত্তাহীন বিশ্বের মাঝে বাংলাদেশের সমাজের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা কেমন সে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু। এখানে সাধারণ মানুষ বলতে বাংলাদেশের নারী, শিশু ও শ্রমিক ব্যতীত অন্যান্য সকল মানুষকে বুঝানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা জানতে হলে তাদের মৌলিক চাহিদা সংক্রান্ত নিরাপত্তা অবস্থা জানা আবশ্যক। নিম্নে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করা হলো :

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা অবস্থা : প্রকৃতপক্ষে মানুষের চাহিদা অসীম। তাই মৌলিক চাহিদার সংখ্যাও কম নয়। মানুষের মৌলিক চাহিদামূলক নিরাপত্তার সংখ্যাও ক্ষেত্র বিশেষে অনেক। তবে জৈবিক ও সামাজিক অস্তিত্বের প্রশ্নে কিছু কিছু চাহিদামূলক নিরাপত্তাকে অত্যাবশ্যক হিসেবে সকলেই মনে করেন। অর্থাৎ বেঁচে থাকা এবং সমাজে বসবাস করার জন্য অনেক চাহিদার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা মানুষের বেলায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এগুলোর বিবরণ ধারাবাহিকভাবে নিচে প্রদত্ত হলো :

ক. মানুষের খাদ্যের নিরাপত্তা : অবাধ খাদ্য সরবরাহ এবং সারা বছর খাদ্যের পর্যাপ্ত প্রাপ্যতা হচ্ছে খাদ্য নিরাপত্তা।[১] ক্ষুধা প্রাণী মাত্রেরই প্রধান চাহিদা। ক্ষুধা পেলে মানুষ খাদ্য খায় তাই জীবনের জন্য মানুষের প্রথম প্রয়োজন হলো খাদ্যের। মানুষই কেবল নয়, বরঞ্চ প্রাণী, পাখি, পতঙ্গ, উদ্ভিদসহ সকলেই তাদের জীবনের প্রায় পুরো সময়ই ব্যয় করে খাদ্য সংগ্রহ ও গ্রহণের কাজে। দেহের বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদিতে প্রতিজন মানুষের প্রতি বেলায় প্রয়োজন পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয়ের।[২] আর সুস্থ থাকার জন্য সে পানীয় ও খাবার হতে হবে নিরাপদ ও সুষম। দৈহিক বৃদ্ধিই কেবল নয়, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশেও খাদ্য মানুষকে

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), খ.৩, পৃ. ৩৫৩

২. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*(ঢাকা : চেঞ্জ মেকার, ২০১২), পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষম করে তোলে। খাদ্যের চাহিদা মূলক নিরাপত্তা মানুষের সবচেয়ে তীব্র। এ চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ বৈধ-অবৈধ যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনসংখ্যা ভারাক্রান্ত দেশ। শুধু তাই নয়, দরিদ্র, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতা, মাদকাসক্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের প্রথম কাতারের দিকে। দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন, ভূমি ও কৃষিনির্ভর অর্থনীতি এবং সুশাসনের অভাবে এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদামূলক নিরাপত্তা কখনই সঠিকভাবে পূরণ হয়নি। বরং সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টনের ফলে সামান্য কিছু মানুষ অতিমাত্রায় স্বচ্ছল এবং বিরাট সংখ্যক নাগরিক খুবই দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করে। পর্যাপ্ত খাবার, ভাল পোশাক-পরিচ্ছদ, নিরাপদ বাসস্থান, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা, ন্যূনতম চিত্তবিনোদন সুবিধা এবং অপরিহার্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে দীর্ঘ দিন ধরে। কেবলমাত্র ধর্মচর্চা এবং স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই এদেশের মানুষ অল্পেতুষ্টি নিয়েই বেঁচে আছে।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্বেও কোনো দিন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। এদেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষের ন্যূনতম খাদ্যের সংস্থান কোনো সময়ই হয়নি। মাথাপিছু চাষযোগ্য জমির অত্যন্ত স্বল্পতা, অসম ভূমি বণ্টন, বেকারত্ব ও গণদারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির কারণে অধিকাংশ মানুষই দু'বেলা দু'মুঠো খাদ্যের নিশ্চয়তা পায়নি। বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি, চোরাচালান, মজুতদারি, ফটকাবাজি ও সরকারি দুর্বল ব্যবস্থাপনা এক্ষেত্রে মানুষের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বাংলাদেশের কেউই হয়ত না খেয়ে থাকে না, কিন্তু দরকারি খাদ্যের নিরাপত্তা এখনও অধিকাংশ মানুষের পূরণ হচ্ছে না। ফলে ক্ষুধা, অপুষ্টি, অসুস্থতা ও রোগ-ব্যাধি নিয়েই এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়।

খ. বস্ত্রের নিরাপত্তা : খাদ্যের পাশাপাশি বস্ত্রও মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা।[৩] মানুষ ছাড়া অন্য কারও বস্ত্র বা পোশাকের প্রয়োজন হয় না। মানুষের ত্বক পোশাক ছাড়া শীত, তাপ ও আব্রু রক্ষা করতে পারে না। শুরু থেকেই মানুষ তাই কোনো না কোনো আবরণ বা আচ্ছাদন ব্যবহার করে আসছে। এক্ষেত্রে গাছের ছাল, লতা-পাতা, পশুর চামড়া ইত্যাদি প্রথম দিকে মানুষ ব্যবহার করত। বস্ত্র এর পরবর্তী রূপান্তর। বস্ত্র বা পোশাক মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদা মেটায়। পর্যাপ্ত পোশাক পরিধান না করলে সে মানুষকে সভ্য বলা হয় না।[৪] তাই শীত-তাপের বিধান মেনে চলা, রোগ প্রতিরোধ করা এবং লজ্জা নিবারণের জন্য মানুষের সব সময়ের চাহিদা পোশাক বা বস্ত্র। বর্তমানে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বস্ত্র বা পোশাকের নানা সমারোহ লক্ষ্য করা যায়। বস্ত্রের চাহিদাও তাই হাজার গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বস্ত্রক্ষেত্রে বাংলাদেশকে প্রায় সর্বাংশেই বিদেশের উপর নির্ভর করতে হয়। কারণ বাংলাদেশে পর্যাপ্ত তুলা ও সুতা উৎপন্ন হয় না। সে জন্য বস্ত্রের বিপুল ঘাটতি বাংলাদেশের দীর্ঘ দিনের। এদেশের দরিদ্র মানুষ খুব অল্প কাপড় ব্যবহার করে। দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র ঘাটতি পূরণে সরকার বহুদিন ধরেই বিদেশ থেকে নতুন-পুরাতন কাপড় আমদানি করে থাকে। তাছাড়া সম্প্রতি বছরগুলোতে এদেশে গার্মেন্টস শিল্প গড়ে উঠায় গার্মেন্টেসের বাড়তি পোশাক স্বল্প দামে পাওয়া যাচ্ছে। আর

---

৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৪. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*(ঢাকা : চেঞ্জ মেকার, ২০১২), পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষ তাদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাচ্ছে। তারপরেও এদেশের সকল মানুষের বস্ত্রের চাহিদা সঠিকভাবে পূরণ হয় না। পর্যাপ্ত বস্ত্রের অভাবে শীত-বর্ষা দুর্যোগে বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষকে ভীষণ সঙ্কটে পড়তে হয়; এমনকি মৃত্যুমুখেও পতিত হতে হয়।

গ. বাসস্থানের নিরাপত্তা : প্রাণী, পাখি ও পতঙ্গের অন্যতম একটি চাহিদা হলো নিরাপদ আশ্রয়স্থল।[৫] আর এ জন্য তারা বিভিন্নভাবে তৈরি করে নিজেদের আবাসস্থল। এটি অনেকটা জৈবিক চাহিদা।[৬] তবে মানুষের বেলায় বাসস্থানের প্রয়োজন অন্যান্য পাখি-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বেশি। শান্তিতে ঘুমানোর জন্য, ঝড়-বৃষ্টি-তাপ থেকে দেহকে নিরাপত্তা দানের লক্ষ্যে, জন্তু-জানোয়ার, চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, সুস্থ পরিবার গঠন ও পরিচালনার প্রয়োজনে, সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের জন্য এবং ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় বাসস্থানের অবদান অত্যন্ত জরুরি। ভৌগোলিক অবস্থান, জরবায়ু, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইত্যাদির পার্থক্য অনুযায়ী বিশ্বের নানা এলাকার মানুষের বাসস্থানের ধরন ও আকৃতি-প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে মানুষ অধিকতর উষ্ণ ও আরামদায়ক বাসস্থান গড়ে চলেছে। এর ফলে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছে আরও বেশি নিরাপদ, উপযোগী এবং সুখকর।

তবে নানা কারণে বাংলাদেশের মানুষ নিম্নমানের ঘরে বসবাস করে। অধিকাংশই কাঁচা ঘর, কিছু সংখ্যক আধা পাকা এবং খুব সামান্য সংখ্যক মানুষ এদেশে পাকা বা মানসম্মত ঘরে বাস করে। উপরন্তু, দেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও গৃহহীন। আবার বস্তিবাসীর সংখ্যাও কম নয়। দেশের সাধারণ মানুষের বাসস্থান উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তেমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমন কি দেশের রাজধানী ঢাকা শহরের বাসস্থানও অত্যন্ত অপরিকল্পিত ও নিরাপত্তাহীন। সে কারণে আজ ঢাকা শহর ভূমিকম্পের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরিকল্পিত, নিরাপত্তামূলক ও মানসম্পন্ন বাসগৃহ না থাকার কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় এদেশের বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জনসংখ্যার ঘণত্ব, দারিদ্র্য, গৃহনির্মাণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা ইত্যাদির কারণেও আজ পর্যন্ত দেশের সিংহভাগ এলাকায় মানুষ ভাল বাসস্থান গড়ে তুলতে পারেনি।

ঘ. শিক্ষার নিরাপত্তা : সৃষ্টি জগতে শারীরিকভাবে মানুষই সম্ভবত সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। বেঁচে থাকা এবং প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তাকে বিভিন্ন বিষয় শিখে কাজ করতে হয়। শেখার সক্ষমতা আবার মানুষেরই সবচেয়ে বেশি। তবে শিক্ষা হতে পারে দুই প্রকারের; অসংগঠিত বা অনানুষ্ঠানিক এবং সুসংগঠিত বা আনুষ্ঠানিক। বর্তমানে শিক্ষা বলতে যদিও আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গণ্য করা হয়, তবুও এর বাইরে মানুষ বহু কিছু নিজে নিজে শিখে নেয়। বিশ্বের অন্যান্য পশুপাখি থেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মূলত শিক্ষার কারণে। মানুষ যত শিখে ততই শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। বিশ্বের যে দেশে শিক্ষার হার যত বেশি সে দেশগুলো তত বেশি উন্নত। বর্তমানে বলা হয় যে, সকল দেশেই শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা মানুষকে শক্তিশালী করে; এ জন্য শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা।[৭] বাংলাদেশও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়।

---

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৬. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ ও আয়োজন খুব সীমিত। এ কারণে বিরাট সংখ্যক শিশু-কিশোর শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। যদিও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, কিন্তু এর আয়োজন পর্যাপ্ত না হওয়াতে শিক্ষার সুযোগ সকলেই গ্রহণ করতে পারছে না। তাছাড়া জনসংখ্যা অনুযায়ী এদেশে পর্যাপ্ত বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেমন নেই; তেমনি নেই শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ এবং অবকাঠামো। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় দেশের প্রতিজন অভিভাবকই তার সন্তানদেরকে শিক্ষিত করতে চান। কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ ও অসম শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এদেশের গণমানুষের শিক্ষা সংক্রান্ত নিরাপত্তা চাহিদা পূরণ হচ্ছে না। অথচ সংবিধান অনুসারে শিক্ষা এদেশের সাধারণ ও বিশেষ সকল মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। দেশের বিরাট সংখ্যক এনজিও এবং সরকার উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। এতে স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও সত্যিকার শিক্ষিত মানুষ তৈরি করা যাচ্ছে না। শিক্ষার গুণগত মানের অবনতির জন্য একটি গুরুতর বিষয় হলো ছাত্র ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনীতি ও দল-উপদলীয় সংঘাত।[৮]

ঙ. স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা : সুস্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। জীবনে চলার পথে মানুষ মাত্রেরই নানা কারণে অসুস্থ, রোগগ্রস্ত ও আহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।[৯] এ অবস্থায় প্রয়োজন দেখা দেয় চিকিৎসা, পথ্য, খাদ্য ও পরিচর্যার। এগুলো যথাসময়ে ঠিকভাবে পেলে জীবন হয় সচল, সুস্থ, নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক। তবে কেবল শারীরিক স্বাস্থ্যই নয়, বরং মানসিক এবং আধ্যাত্মিকভাবেও মানুষ সুস্থ্য থাকতে চায়। সুস্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপরই নির্ভর করে মানুষের শিক্ষা, কর্ম, আয়, উন্নতি ইত্যাদি। দৈহিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতা মানুষ ছাড়াও অন্যান্য সকলের মৌলিক চাহিদা। মানুষ যেহেতু শ্রেষ্ঠ জীব তাই সে-ই পারে নিজ ব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে স্বাস্থ্য চাহিদার নিরাপত্তা রক্ষা করতে। স্বাস্থ্যসেবা আধুনিক মানুষের একটি মৌলিক অধিকার[১০]; তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশই এর নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে থাকে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বাংলাদেশও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও চিকিৎসা সেবার মান অত্যন্ত নাজুক। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সুরক্ষার সত্যিকার কোনো ব্যবস্থা আজও এদেশে গড়ে উঠেনি। যদিও এ খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় করা হয় এবং ইউনিয়ন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদা পুরণ হচ্ছে না। দুর্নীতি ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। এদেশের একটি সাধারণ চিত্র হলো, সরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে নিয়মিত চিকিৎসক থাকে না এবং ন্যূনতম ঔষধ পাওয়া যায় না। বেসরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা সেবা নেয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল, নিরাপত্তাহীন ও ঝুঁকিপূর্ণ। তাছাড়া বিশুদ্ধ পানির অভাব, ভেজাল খাদ্য ও ঔষধের ছড়াছড়ি, বায়ু ও শব্দ দূষণ ইত্যাদির কারণে মানুষের রোগ ও অসুস্থতা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবার অভাবে মানুষের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হচ্ছে না। সুস্বাস্থ্য যে কোনো নাগরিকের সবচেয়ে মৌলিক চাহিদাগুলোর একটি, এটি তার অন্যতম মৌলিক অধিকারও বটে। প্রাথমিক সম্পদ গড়ার স্বার্থে তাই অবশ্যই একটি সুষ্ঠু স্বাস্থ্য পরিচর্যা নীতি প্রণয়ন করা আবশ্যক।[১১]

---

৮. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*(ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪), পৃ. ২৩০

৯. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

১১. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫

Dhaka University Institutional Repository

চ. চিত্তবিনোদনের নিরাপত্তা : বিনোদনে অংশগ্রহণ করা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। আদিকাল থেকেই মানুষ সকল বয়সে এবং সকল সময় বিনোদনের সাথে জড়িত হয়েছে। শরীরে শক্তির জন্য যেমন খাদ্য, তেমনি মনের প্রশান্তির জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় বিনোদনের। বিনোদন মানুষের চিত্তকে সুস্থ ও সবল রাখে।[১২] তাই বিশ্বের সকল দেশেই সকল সময়ে গান-বাজনা, অভিনয়-নৃত্য, আবৃত্তি-বিতর্ক, ভ্রমণ-পরিদর্শন ইত্যাদিতে মানুষ জড়িত থেকেছে। বর্তমানে রেডিও, টেলিভিশন, নাটক, সিনেমা, বই-পত্রিকা, পার্ক-চিড়িয়াখানা, জাদুঘর, কম্পিউটার, ক্রীড়া-পর্যটন ইত্যাদি মানুষের চিত্ত বিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণ হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। বিনোদনের মাধ্যম ও উপকরণ অঞ্চল, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইত্যাদির কারণে ভিন্ন হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা এদেশে প্রায় নেই বললেই চলে। পাশাপাশি আধুনিক বিনোদন ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। এদেশে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা হল, খেলার মাঠ, নাট্যমঞ্চ, পার্ক, জাদুঘর, চিড়িয়াখানা, দর্শনীয় স্থান ইত্যাদির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থার অভাবে অপসংস্কৃতির প্রভাব এবং অপরাধ প্রবণতা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এ দেশে মানুষের বিনোদন চাহিদা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নানা কারণে এ চাহিদা পুরণ হচ্ছে না।

ছ. সামাজিক নিরাপত্তা : সামাজিক মানুষের অন্যতম একটি মৌলিক চাহিদা হলো সামাজিক নিরাপত্তা।[১৩] বিষয়টি মানুষের ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্ব থেকে মৃত্যুর পর পর্যন্ত অব্যাহত থাকা প্রয়োজন হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন সময় থেকে মৃত্যুর পরে শেষকৃত্য পর্যন্ত মানুষ সামাজিকভাবে গড়ে তুলেছে রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সংগঠন। মাতৃগর্ভ থেকে সুস্থ অবস্থায় জন্মলাভে, শৈশবে আদর যত্নে লালিত-পালিত হতে, কৈশরে লেখাপড়া করায়, যৌবনে কর্মসংস্থান লাভে, বার্ধক্যে পরিচর্যা পেতে এবং জীবনভর অসুস্থতায়, বৈধব্যে, অভিভাবকহীনতায়, দুর্ঘটনায় এবং বিপদে আপদে মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও নিরাপত্তা পেতে চায়। তাই নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। উন্নত বিশ্বে এ চাহিদাগুলো পর্যাপ্তভাবে পুরণ করা হলেও বাংলাদেশের মত স্বল্পোন্নত দেশে সামাজিক নিরপত্তা বিধান খুব সামান্যই সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। এ কারণে তারা জীবনের অধিকাংশ সময় অসহায়ভাবে দিন কাটায়। অভিভাবকহীন শৈশবে, বেকারত্বে, অসুস্থতায়, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে সাধারণ মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচি বা আয়োজন এ দেশে নেই। দুঃসময়ে কিছু কিছু সাহায্য ও সহায়তার ব্যবস্থা করা হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল ও নগণ্য। তাছাড়া এ সমস্ত সাহায্য দেয়া হয় অনেকটা দান-খয়রাত আকারে যেখানে নাগরিক অধিকার ও সম্মান-মর্যাদা সমুন্নত থাকে না। পাশাপাশি এ ধরনের ত্রাণ সাহায্য নিয়ে চলতে থাকে লাগামহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা। অথচ প্রতিটি নাগরিকেরই একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর কোনো না কোনো আকারে আর্থিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। তরুণদের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রয়োজন কর্মসংস্থান ও প্রবীণদের জন্য পেনশন বা অন্য যে কোনো সামাজিক

---

১২. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা। এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে ঝুঁকি নেয়ার মতো কাজে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।[১৪]

এ আলোচনা থেকে বিষয়টি পরিস্কার হয়েছে যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থামূলক মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পুরণ হচ্ছে না। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি অপরিহার্য চাহিদাগুলো পূরণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ সফল হয়নি। যদিও প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তামূলক মৌলিক চাহিদাগুলো যথাযথভাবে পূরণ হওয়ার তেমন কোনো সুন্দর সম্ভাবনাও পরিদৃষ্ট হচ্ছে না।

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা চাহিদা পূরণ না হওয়ার প্রধান কারণসমূহ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো ন্যূনতমভাবেও পূরণ হচ্ছে না। এ অবস্থা আজকের নয়; বহুদিনের এবং ভবিষ্যতে কতদিন এভাবে চলবে তাও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। এ অবস্থার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। কারণগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. সুশাসন ও স্বশাসনের অনুপস্থিতি : এদেশ দীর্ঘদিন ঔপনিবেশিক শাসক দ্বারা শাসিত হয়েছে। তাছাড়া সত্যিকার সুশাসন ব্যবস্থা কোনো কালে এদেশে গড়ে উঠেনি। ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণের বাস্তব পদক্ষেপ কোনো সরকারই গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারেনি। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে যেমন এদেশের জন্য সত্যিকার কল্যাণ বিধানের উদ্যোগ নেয়া হয়নি; তেমনি বর্তমান বাংলাদেশেও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার ব্যাপারে কেউ সফল হয়নি। কারণ সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য ও ন্যায়বিচারের অভাব থাকলে শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।[১৫]

খ. প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাব : নিরক্ষর ও বেকার মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয় না। দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ নিরক্ষর, অজ্ঞ এবং বেকার। এ অবস্থায় তারা নিজেরা যেমন নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না; তেমনি সক্ষম জনগোষ্ঠীর উপর তারা নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। দেশের গরিব বেকার সাধারণ মানুষ এভাবে যদি কোনো আশার আলো তাদের সম্মুখে দেখতে না পায়, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা তাদেরকে ঘিরে ধরে রাখে, তারা যদি হতাশায় নিমজ্জিত হয়, তাহলে সমাজের সুনাম ক্ষুণ্ন হবে। তা থেকে সৃষ্টি হবে সংঘাত, মুকাবিলা, সহিংসতা ও জনৈরাজ্য। চাঁদাবাজি, ছিনতাই, চুরি, রাহাজানির মতো অপরাধেও বেকার জনসমষ্টির একাংশ জড়িয়ে পড়তে পারে।[১৬]

গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদির কারণে মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রদতর হয়ে পড়ায় অভাবই হয়েছে তাদের নিত্যসঙ্গী। এহেন পরিস্থিতিতে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ পাচ্ছে না।

ঘ. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থাপনা : অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, সম্পদ ও সুযোগের অসম বণ্টন এবং শিল্পে অনগ্রসরতার ফলে মানুষ মৌলিক চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত আয় করতে পারে না।[১৭] ফলে তাদের বঞ্চনার মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে।

---

১৪. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮
১৫. আলতামাশ কবির, *দৈনিক সংবাদ*(ঢাকা : দি সংবাদ লিমিটেড, ৬ অক্টোবর ২০০২), পৃ. ৮
১৬. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০
১৭. আবদুল আউয়াল মিন্টু, *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি : বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হওয়াতে মাথাপিছু চাষযোগ্য জমি, সম্পদ ও সুযোগের অংশ ইত্যাদি দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় সাধারণ মানুষ ক্রমেই দরিদ্র হয়ে পড়ছে।

চ. দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা : গণদুর্নীতি এবং রাজনৈতিক আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সুপরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবে দেশ ও সরকারের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ সত্যিকার ন্যায় বিচার কখনই পায়নি। ফলে তাদের মৌলিক প্রয়োজনও পূরণ হয়নি।[১৮] সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর সরকারি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না।

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না দীর্ঘকাল ধরেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য চাহিদা অধিকাংশ মানুষের অপূরিত থেকে যাচ্ছে। ফলে তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে আজ হয়ত কেউ না খেয়ে বা না পরে থাকে না, কিন্তু সার্বিক মানবিক প্রয়োজন মিটছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ। তাছাড়া শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের অভাবসহ সুশাসন ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক পদক্ষেপের অনুপস্থিতি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের পথে জটিলতার সৃষ্টি করছে। ফলে নানা ধরনের সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, সমস্যা ও অস্থিরতা পরিদৃষ্ট হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা চাহিদা পূরণ না হওয়ায় উদ্ভূত সমস্যাবলী : প্রত্যেক মানুষেরই তার মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া অপরিহার্য। এ ব্যাপারে মানুষ সবচেয়ে বেশি সক্রিয় হয়। এগুলো মানুষের জীবনে এতই আবশ্যক যে যেমন করে হোক তা পূরণ করতেই হয়। স্বাভাবিক বা বৈধ পথে না হলে প্রয়োজনে অবৈধ উপায়েও চাহিদাগুলো পূরণ করতে মানুষ বাধ্য হয়। ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে মানুষ হত্যা পর্যন্ত করে; আবার ঘর না পেলে মানুষ রাস্তাতেই ঘুমায়। সে জন্য রাষ্ট্রের প্রথম দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা। কেন না এ চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার ফলে সমাজে দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। সামাজিক বিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান ও মৌলিক কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সামাজিক নিরাপত্তামূলক মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

(ক) অপুষ্টি : বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা জনিত সমস্যা হলো অপুষ্টি। এটি মূলত মৌলিক মানবিক চাহিদা অপুরণজনিত কারণে সৃষ্ট একটি মারাত্মক সমস্যা। এর প্রধান শিকার হলো শিশু ও নারী। বাংলাদেশের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ শিশু এবং দুই-তৃতীয়াংশ নারী অপুষ্টির শিকার। অপুষ্টির কারণে শিশুদের মধ্যে অন্ধ, প্রতিবন্ধী, কম বুদ্ধি, খাটো হওয়া ইত্যাদি দেখা দেয়। তাছাড়া অপুষ্ট মায়ের সন্তান কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে এবং শিশুমৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়।[১৯] অপুষ্টির শিকার হয়ে অন্যান্য মানুষ রোগগ্রস্ত, অসুস্থ, দ্রুত বার্ধক্য এবং অকাল মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। প্রয়োজনীয় আয়, শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য, আশ্রয় ইত্যাদির অভাবে অপুষ্টি সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

(খ) স্বাস্থ্যহীনতা : সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজন হয়ে থাকে পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, সুশিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও আচ্ছাদন ইত্যাদির। কিন্তু বাংলাদেশে এ সকল মৌলিক মানবিক চাহিদা সঠিকভাবে

১৮. এ্যাডভোকেট তারবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫-১২৬

Dhaka University Institutional Repository

পূরণ হয় না বলে যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হয় স্বাস্থ্যহীনতা তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহরের দরিদ্র মানুষের মধ্যে নানা ধরনের রোগ ও অসুস্থতা লক্ষ্য করা যায়। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় এবং চরম দারিদ্র্যের কারণে অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন। তাছাড়া কুসংস্কার, ভেজাল ও নকল খাদ্য ও ঔষধ স্বাস্থ্য সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।[২০] অপুষ্টি ও রোগ-ব্যাধির কারণে এ দেশের মানুষের গড় আয়ু কম। তাছাড়া শিশুমৃত্যু, প্রসূতিমৃত্যু, প্রতিবন্ধকতাও এক্ষেত্রে অনেক বেশি।

(গ) নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা : মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান হলো শিক্ষা ও জ্ঞান। নিরক্ষর ও অজ্ঞ মানুষ নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ থাকে এবং সঠিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে না। বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৩২.২৩ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর।[২১] বহুল প্রচলিত রয়েছে যে, শিক্ষাই আলো। অথচ শিক্ষার চাহিদা পূরণ না হওয়াতে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম অনুন্নত দেশ হওয়ার পিছনে এই নিরক্ষতাই দায়ি। এদেশের বহুক্ষেত্রের কিছুটা উন্নতি হলেও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নতি ও বিস্তৃতির গতি সবচেয়ে মন্থর। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, বই-পুস্তক, স্কুল-কলেজ ইত্যাদির প্রকট অভাব এ দেশের অধিকাংশ মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। ফলে জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। সাথে সাথে অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধসহ অন্যান্য সামাজিক সমস্যারও সৃষ্টি হচ্ছে।

(ঘ) গৃহ ও বস্তি সংক্রান্ত সমস্যা : গৃহ হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশে বিরাট সংখ্যক মানুষ গৃহহীন। ভূমির স্বল্পতা এর অন্যতম কারণ। দেশের সকল মানুষের জন্য পরিকল্পিত আবাসনের কোনো পরিকল্পনা আজও প্রণীত হয়নি। ফলে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের অন্যতম একটি সমস্যা হলো বস্তি। দেশের সিটি কর্পোরেশনগুলোর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ আজ বাস করছে বস্তিতে। বাসা-বাড়ির স্বল্পতা ও বস্তি বিস্তারের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, পতিতাবৃত্তিসহ নানা জটিল সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।[২২] এ ক্ষেত্রে শিশু ও নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উপযুক্ত আবাসন অপরিহার্য। অথচ বাংলাদেশে এর প্রকট অভাব রয়েছে।

(ঙ) সাধারণ ও কিশোর অপরাধ : আইন পরিপন্থী কাজ করা হলো অপরাধ। আর এ কাজটি কিশোর বয়সে করলে তা হয় কিশোর অপরাধ। মৌলিক মানবিক চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হলে সমাজে নানা অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। অর্থের অভাবে মানুষ যখন খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারে না তখন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা ইত্যাদি অপরাধ বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি অস্বচ্ছলতার কারণে ঘুষ, দুর্নীতি, মজুতদারি, চোরাচালান থেকে শুরু করে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, আত্মহত্যা, নেশা, সন্ত্রাস ইত্যাদি বাংলাদেশে বেড়েই চলেছে।[২৩] পর্যাপ্ত চিত্তবিনোদনের অভাবে এ দেশের মানুষ নানাভাবে অপরাধ কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(চ) সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা : বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সামাজিকভাবে নিরাপদ নয়। মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ না হওয়ার কারণে সৃষ্ট অসহায়ত্ব তাদেরকে বিভিন্ন অপরাধের

---

২০. এ্যাডভোকেট তারবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী, *নারী অধিকার, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭

২১. Ministry of Planning, *Report on Education Household Survey 2014*(Dhaka : BBS, 2015), p. xxviii

২২. এম হেলাল, *বাংলাদেশ ও বিশ্ব অধ্যয়ন*(ঢাকা : ক্যাম্পাস পাবলিকেশন্স, ২০১৪), পৃ. ৮২-৮৫

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭-৯৫

Dhaka University Institutional Repository

দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বিভিন্ন দুর্যোগ ও দুঃস্থতায় গ্রামবাসীরা শহরে এসে বস্তি সমস্যার সৃষ্টি করছে। অথচ গ্রামীণ সমাজে সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকলে খুব অল্প সংখ্যক গ্রামবাসী শহরে আসতে ইচ্ছুক হত। শ্রমিক অসন্তোষ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামা, লুটতরাজ ইত্যাদিও এ দেশে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২৪] সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা না থাকায় যুবক ও কর্মক্ষম শ্রেণি ক্রমশ হতাশ, উদ্বিগ্ন, ভাগ্যনির্ভর ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে।

সাধারণ মানুষ মিথ্যা মামলার শিকার : সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের যথেচ্ছ ব্যবহার 'উদ্দেশ্যমূলক' ও 'মিথ্যা মামলা'র হার বাড়াচ্ছে।[২৫] ফৌজদারি কার্যবিধিতে এক সময় মামলা রুজুর আগে যাচাই-বাছাইয়ের বিধান থাকলেও সেটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কোনো ব্যক্তি যে কারো বিরুদ্ধে মামলা দিতে পারছে। পরে এ মামলা 'মিথ্যা' ও 'উদ্দেশ্যমূলক' প্রমাণিত হলেও মামলার প্রতিপক্ষ তার ভোগান্তি ও ব্যয়িত অর্থ ফেরত পান না।[২৬]

অন্য দিকে অপ্রয়োজনীয় মামলার কারণে আটকে থাকে গুরুত্বপূর্ণ বিচারসমূহ। এসব মামলার শুনানি গ্রহণে দিনের পর দিন আদালতকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। বিচার প্রার্থীর দুর্ভোগ বাড়ছে। অপরিমেয় অর্থ ব্যয় হচ্ছে। সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদের নিয়ন্ত্রণহীন প্রয়োগে ব্যক্তিপর্যায়ে উদ্দেশ্যমূলক, মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলা দায়েরের প্রবণতা উৎসাহিত হচ্ছে। ব্যক্তিপর্যায়ের পাশাপাশি এ প্রবণতায় ব্যাপকভাবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোও জড়িয়ে যাচ্ছে। একাধিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, দেশের আদালতগুলোতে অন্তত ৩৭ লাখের বেশি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে ২০ লাখের বেশি ফৌজদারি মামলা। এসব মামলার ৯০ ভাগই শেষ পর্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক, মিথ্যা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়।[২৭]

ফৌজদারি কার্যবিধিতে মামলা রুজুর আগে প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করার একটি বিধান ছিল। সেটি বাতিল করে দেয়ায় যে কেউ যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকতে পারছে, যার অধিকাংশই পরে 'উদ্দেশ্যমূলক' এবং 'মিথ্যা' প্রতিপন্ন হয়। মামলা শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে– ৯০ ভাগ মামলার ক্ষেত্রে এমন সম্ভাবনা সত্ত্বেও দিনের পর দিন ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে আদালতগুলোকে। ফলে প্রকৃত বিচারপ্রার্থীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। আদালতে মামলার জট বাড়ছে। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার বাস্তবতায় সরকার ফৌজদারি, দেওয়ানি এবং পারিবারিক মামলায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রি-সল্যুশন–এডিআর) পদ্ধতি যুক্ত করার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ছাড়া আইনগত সহায়তাদানকারী বেসরকারি সংস্থা ব্লাস্ট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, জাতীয় মহিলা আইনজীবী পরিষদ, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার মতো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো। চলমান এ প্রক্রিয়াগুলোর বিপরীতেই দেশে বেড়ে চলেছে উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা।

পুলিশ সদর দপ্তরের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়, ২০১৭ সালে নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১৫ হাজার ২১৯টি, ২০১৬ সালে ১৬ হাজার ৭৩০টি, ২০১৫ সালে ১৯ হাজার ৪৮৬টি, ২০১৪ সালে ১৯ হাজার ৬১৩টি, ২০১৩ সালে ১৮ হাজার ৯১টি, ২০১২ সালে ১৯ হাজার ২৯৫টি এবং ২০১১ সালে ১৯ হাজার ৬৮৩টি। কিন্তু পুলিশি তদন্তে মামলাগুলোর ৯০ শতাংশই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।[২৮]

২০১৩ সালে তৎকালীন আইনমন্ত্রী এক সেমিনারে জানান, নারী নির্যাতন মামলার ৮০ শতাংশই মিথ্যা মামলা। সে সময়কার আইন প্রতিমন্ত্রী জানান, যৌতুক নিয়ে যেসব মামলা হয়, তার ৯০ শতাংশই মিথ্যা।

২৪. আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*(ঢাকা : প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ. ২৯-৩৩
২৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
২৬. এ এম এম বাহাউদ্দীন, *দৈনিক ইনকিলাব*(ঢাকা : কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স লিঃ, ৭ জুলাই ২০১৯), পৃ. ১৪
২৭. প্রাগুক্ত।
২৮. আকবর আলি খান, *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০-২৩১

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন, বিদেশে ১০০ ভাগ আসামির সাজা হয়। আর বাংলাদেশে ৮০ শতাংশ খালাস পায়। এর মূল কারণ এসব মিথ্যা মামলা। উদ্দেশ্যমূলক মামলা দায়েরের প্রবণতায় যুক্ত রয়েছে থানা পুলিশ, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতো বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। দুর্নীতি দমন কমিশন ওয়ান-ইলেভেনের পর অন্তত আড়াই হাজার মামলা দায়ের করে। যা পরে উচ্চ আদালতে মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে মর্মে বাতিল হয়ে যায়।

সম্প্রতি জাহালমের বিরুদ্ধে দাখিলকৃত ৩৬টি ভুয়া মামলার চার্জশিটই এ অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করে। এ ছাড়া এনবিআর দায়েরকৃত বহু মামলা উচ্চ আদালতে বাতিল হয়ে যায়। এ সময় প্রচলিত আইনের বিভিন্ন ধারায় দায়েরকৃত মামলার মধ্যে 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক' বিবেচনায় অন্তত ১০ হাজারের বেশি মামলা প্রত্যাহার করে নেয় সরকার। তবে এর পরে গত কয়েক বছরে শত শত মামলা দায়ের করে, যা এখন 'গায়েবি মামলা' হিসেবে পরিচিত। এসব মামলায় আসামির সংখ্যা ৭ লাখেরও বেশি। সূত্র মতে, উদ্দেশ্যমূলক মামলা দায়েরের সংস্কৃতি পুরনো হলেও ব্যক্তিপর্যায়ে এ প্রবণতা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে। জনস্বার্থ, আদালত অবমাননা. মানহানি, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত– ইত্যাদি অভিযোগে দায়ের করা হচ্ছে মামলা।[২৯]

আদালতে বিদ্যমান মামলাজটের উপর যা 'বোঝার উপর খড়ের আঁটি' হয়ে জট আরও বাড়িয়ে তুলছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, জনস্বার্থ, আদালত অবমাননা, মানহানিসহ বিভিন্ন অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই রুজু করা হয়। চাঞ্চল্য সৃষ্টি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিতে আসা, সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম হয়ে আলোচনায় থাকা এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার লক্ষ্যেই অধিকাংশ মামলা রুজু করা হয়। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় স্বীয় দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সুনজরে আসার জন্য। একই ঘটনায় মামলা হয় একাধিক। যদিও একই ঘটনায় একাধিক মামলা করার আইনগত ভিত্তি নিয়ে একটি রিট হয়েছে, তবুও ভাটা পড়েনি মামলা দায়েরে। তৃণমূল পর্যায়ে অতি উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মীরা লাইমলাইটে আসার সিঁড়ি হিসেবে আশ্রয় নিচ্ছেন মামলার। অপরাধের শাস্তি বা ঘটনার প্রতিকার নয়– উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতেই রুজু হয় এসব মামলা।

সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি নাগরিকের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার রয়েছে। এ কারণে কাউকে মামলা থেকে নিবৃত রাখার অধিকার কারো নেই।[৩০] এ অধিকারেরই যথেচ্ছ প্রয়োগের মাধ্যমে হরণ করা হচ্ছে অন্যের আইনের আশ্রয় গ্রহণের অধিকার। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ঠুকে দেয়া হচ্ছে মামলা। মামলার চূড়ান্ত রায় যা-ই হোক, মামলা পরিচালন ব্যয়, হয়রানি, কারাভোগে দুর্বিষহ হয়ে উঠছে বহু নিরীহ অভিযুক্তের জীবন। আর এসব মামলা নিয়ে আদালত ব্যস্ত থাকায় অন্যের বিচার প্রাপ্তি বিলম্বিত হচ্ছে।

বিচারক স্বল্পতা, অকারণে বারবার তারিখ প্রদান, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে আইনজীবীদের অনীহার মতো বহুবিধ কারণে মানুষের দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথে বাধা। মামলা কার্যতালিকায় উঠানো, আদেশের সত্যায়িত অনুলিপি লাভে বিলম্বসহ দুর্ভোগের অন্ত নেই আদালত অঙ্গনে। বিচারপ্রার্থীকে বছরের পর বছর আদালতের বারান্দায় কাটিয়ে দিতে হয় নিতান্তই মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত মামলার বিচার পেতে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নেহায়েত আত্মপ্রচারণার মতো অমৌলিক বিষয়ে মামলা দায়ের করে আদালতের কর্মঘন্টা বিনষ্ট কতটা মানবিক ও যৌক্তিক অনুসন্ধানে এ প্রশ্নও উঠে এসেছে।

---

২৯. জুলফিকার রাসেল, *বাংলা ট্রিবিউন*(ঢাকা : কাজি আনিস আহমেদ, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯), পৃ. ১
৩০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

মামলাজট প্রসঙ্গে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)-এর উপ-পরিচালক (আইন) অ্যাডভোকেট বরকত আলী বলেন, আমরা মামলা থেকে বিরত রাখতে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের প্রধান চেষ্টাই হচ্ছে মানুষকে মামলা থেকে বিরত রাখা। এ লক্ষ্যে ব্লাস্ট বহু ঘটনার নিষ্পত্তি করেছে সালিশের মাধ্যমে। এগুলো মামলায় পরিণত হলে আদালতের উপর চাপ বাড়ত। সরকার মামলার চাপ কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) পদ্ধতি চালু করলেও অধিকাংশ আইনজীবী এ পদ্ধতি কার্যকরে আগ্রহী নন। তাদের ধারণা, এডিআর কার্যকর হলে মামলার সংখ্যা হ্রাস পাবে; পেশায় ধস নামবে। এ ধারণা সঠিক নয়। মামলার চাপ কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি চালু হলেও এ পদ্ধতির সুফল এখনো পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সৈয়দ আমিরুল ইসলাম। তিনি বলেন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না। এতে আইনজীবীদের আন্তরিকতা নেই। তারা ধারণা করছেন, এতে তাদের পেশার ক্ষতি হবে; এ ধারণা ভুল। তিনি বলেন, মিডিয়ার খোরাক হওয়ার জন্যই উদ্দেশ্যমূলক মামলা দায়ের করা হয়। মিডিয়ার প্রয়োজন চাঞ্চল্যকর সংবাদ। আর এ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে অদ্ভুত বিষয়েও মামলা দায়ের করা হচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকায় ফৌজদারি অপরাধ বাংলাদেশের তুলনায় ১০ গুণ বেশি। কিন্তু তাদের মিডিয়ায় এসবের ফলাও প্রচার নেই। তাদের প্রচারণারও নীতিমালা রয়েছে। মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক মামলা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. শাহদীন মালিক বলেন, 'ফৌজদারি কার্যবিধিতে আগে মামলা রুজুর আগে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের একটি বিধান ছিল। এটি বাতিল করে দেয়া হয়েছে; এর ফলাফল ভালো হয়নি।'

হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মনজিল মোরসেদ বলেন, 'দণ্ডবিধির ২১১ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা মামলা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কেউ যদি তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা আদালতে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে বাদীর বিরুদ্ধেও একই ধারায় পাল্টা মামলা করা যায়।'[৩১] ফৌজদারি কার্যবিধি ২৫০ ধারা অনুযায়ী মিথ্যা মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারেন আদালত। কোনো পুলিশ কর্মকর্তা আমলযোগ্য নয়, এ রকম কোনো মামলায় মিথ্যা প্রতিবেদন দাখিল করলে তার বিরুদ্ধেও এ ধারা অনুযায়ী ভিকটিমের পক্ষে আদালত ক্ষতিপূরণের রায় দিতে পারেন।

মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা : জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ১২ হাজার টাকা করে সম্মানী পাচ্ছেন। এছাড়া একই হারে বছরে দু'টি উৎসব ভাতাও দেয়া হচ্ছে। খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে বীরশ্রেষ্ঠদের ৩৫ হাজার টাকা, বীর উত্তমদের ২৫ হাজার টাকা, বীর বিক্রমদের ২০ হাজার টাকা এবং বীর প্রতীকদের ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ও উৎসব ভাতার পাশাপাশি ২ হাজার টাকা করে বাংলা নববর্ষ ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও সকল জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের জনপ্রতি ৫ হাজার টাকা করে বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩৩৮৫.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৩২] কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক নিরাপত্তা ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতা : মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের পরিবারবর্গ ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণেও সরকার কাজ করছে। শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত

৩১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৩২. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও সম্মানী ভাতার জন্য পৃথক কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪৮০.১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৩৩] কর্মসূচিটি মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সুস্বাস্থ্য রক্ষায় অবদান রাখছে।

মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি : মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের আত্মনির্ভরশীল করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষিতদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ৩৭.৭৫ কোটি টাকা এ কর্মসূচির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ কর্মসূচির জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৩৪] এছাড়া চলতি অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ এবং ১৪ কোটি টাকা ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। কতিপয় অপরিহার্য পেশার সাথে সম্পৃক্ত দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে প্রাথমিকভাবে ৭টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এ কার্যক্রম চালু করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ৬৪টি জেলায় এ কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। এছাড়া এসব সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের সরকার উপবৃত্তি প্রদান করছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১,২০০ টাকা হারে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৪ হাজার থেকে ৮৪ হাজারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।[৩৫]

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম : পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অবহেলিত হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসতে সরকার কাজ করছে। হিজড়াদের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রথমবারের মত ৭টি জেলায় এ কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে সকল জেলায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৬ হাজার হিজড়াকে সহায়তার লক্ষ্যে ৫.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।[৩৬]

খাদ্য সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি

ওএমএস কর্মসূচি : নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার খোলা বাজারে বিক্রয় (ওএমএস) কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশেষ ভর্তুকির মাধ্যমে বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৮৯.৩৯ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে ওএমএস কর্মসূচির আওতাভুক্ত রাখা হয়েছে এবং ৯৪৯.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৩৭]

কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচি : গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কারের লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিটার জন্য চলতি অর্থবছরে ৭৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৩৮]

---

৩৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৩৪. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬
৩৫. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
৩৬. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৩৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচি : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচিটি চালু করা হয়েছে। খাদ্য মন্ত্রণালয় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কাবিখার জন্য চলতি অর্থবছরে ১২০৪.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৩৯]

ভিজিডি : এ কর্মসূচির জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৬৮৫.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ১৬৯৮.৯১ কোটি টাকা করা হয়েছে। ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে দেশব্যাপী ৩.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ রয়েছে।[৪০]

ভিজিএফ : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। সাধারণত দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র মানুষের জীবিকা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। প্রতি পরিবারকে মাসিক ২০-৪০ কেজি করে চাল ২-৫ মাস পর্যন্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া মা ইলিশ ও জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেরাও ভিজিএফ সহায়তা পেয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে দরিদ্র জনগণও ভিজিএফ সহায়তা পায়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে ৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্যের অনুকূলে ১৯৫৬.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৪১]

জিআর (খাদ্য/চাল) : দুর্যোগকালে দরিদ্র মানুষকে জরুরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে জিআর (চাল) সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিআর হিসেবে ১.২৫ লক্ষ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ রাখা হয়। টাকার হিসেবে এ বরাদ্দের মূল্যমান ৫৪৩.৫৯ কোটি টাকা।[৪২]

অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি : বছরের কর্মহীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং যে কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর দুর্যোগ মুকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত কর্মহীন ও আপদকালীন সময়ে অতি দরিদ্র মানুষের জীবিকা নির্বাহের বিকল্প হিসেবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে এটি চালু হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের দু'টি কর্মহীন সময়ে দু'বারে ৪০ দিন করে মোট ৮০ দিন অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮.২৭ লক্ষ অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ১৬৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।[৪৩]

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতা ও সম্মানী বাড়লেও জিডিপির তুলনায় বরাদ্দ কমছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ও সামাজিক ক্ষমতায়নের আওতায় আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে প্রায় সব ধরনের ভাতা, সম্মানী ও অনুদান বাড়ছে। বাড়ছে কয়েকটি কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যাও। পাশাপাশি বাড়ছে প্রাথমিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তির টাকাও। তারপরও মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) তুলনায় সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ কমছে আগামী অর্থবছরে। অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বর্তমানে ১৬টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে। এসব কর্মসূচির জন্য চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ রাখা হয় ৩২ হাজার ৪২২ কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে এ বরাদ্দ ৫ হাজার কোটি টাকা বাড়তে পারে বলে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

---

৩৯. সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. প্রাগুক্ত।

৪৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তা খাতের মধ্যে সাধারণত বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, দরিদ্র নারীদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি দেয়া হয়। আর সম্মানী দেয়া হয় মুক্তিযোদ্ধাদের।[৪৪]

এ ছাড়া সরকারি ও বেসরকারি শিশুসদনে অনুদান, ত্রাণ, শহীদ পরিবার ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের রেশন, চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে অনুদান, অবাঙালিদের পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নগদ বরাদ্দ, অবসরে যাওয়া সরকারি কর্মচারীদের পেনশন, দরিদ্রদের আইনি সহায়তা ইত্যাদি খাতেও সরকার ব্যয় করে। দুই লাখ মুক্তিযোদ্ধার জন্য চলতি অর্থবছরে সম্মানী বাবদ ৩ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা আছে। মুক্তিযোদ্ধারা বর্তমানে ১০ হাজার টাকা করে মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকেন। বিজয় দিবস ও পহেলা বৈশাখে দু'টি উৎসব ভাতাও পান তারা। আগামী ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ২ হাজার টাকা বাড়িয়ে ১২ হাজার টাকা করা হচ্ছে। প্রাথমিক বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বৃত্তির পরিমাণ ৭০০ থেকে বাড়িয়ে ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ৮০০ থেকে বাড়িয়ে ৯৫০ টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১ হাজার ২০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৩০০ টাকা করা হচ্ছে। এদিকে সরকারি ও বেসরকারি শিশুসদনগুলোর জন্য বরাদ্দ কিছুটা বাড়ছে। এসব শিশুসদনের এক লাখের বেশি আবাসিক শিক্ষার্থীর জন্য চলতি অর্থবছরে ১৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের তথ্যানুযায়ী, জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়বৈষম্যও দৃশ্যমান। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা যেমন বিস্তৃত করতে হবে, আবার ব্যয়ও তেমনি বৃদ্ধি করতে হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরের বাজেট ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার ১৩ শতাংশ এবং জিডিপির ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ রয়েছে। আগামী অর্থবছরে থাকছে বাজেটের ১২ শতাংশ এবং জিডিপির ২ দশমিক ৪ শতাংশ। ভাতা ও অনুদান : ভাতা ও অনুদানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খরচ হয় বয়স্ক ভাতা দেয়ার ক্ষেত্রে। ৪০ লাখ বয়স্ক লোকের জন্য চলতি অর্থবছরে ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তারা মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা পান। আগামী অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা কিছুটা বাড়ানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে বরাদ্দও বাড়ছে। তবে ভাতার পরিমাণ বাড়ছে কি না, তা জানা যায়নি। বর্তমানে ১০ লাখ প্রতিবন্ধীকে ভাতা দেয়া হলেও আগামী অর্থবছরে দেয়া হবে মোট ১৬ লাখকে। প্রতিবন্ধীরা বর্তমানে ৭০০ টাকা করে ভাতা পান। চলতি অর্থবছরে এ জন্য ৮৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। আগামী অর্থবছরে ভাতা ৭৫০ টাকা করা হচ্ছে। বাড়ছে মোট উপকারভোগীর সংখ্যাও। বর্তমানে ৭ লাখ দরিদ্র নারীকে মাসিক ৫০০ টাকা করে মাতৃত্বকালীন ভাতা দেয়া হয়। চলতি অর্থবছরে এ জন্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আগামী অর্থবছরে ভাতার পরিমাণ বাড়ানো না হলেও উপকারভোগী বাড়ছে আরও ৭০ হাজার। লিভার সিরোসিস ও কিডনি রোগ এবং ক্যানসারে আক্রান্ত ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার করা হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি : দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে নানা ধরনের ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মধ্যেই সরকার তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেনি। অধিকন্তু সরকার বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে মোট ৭৩টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি চলমান প্রকল্প এবং অবশিষ্ট ১৩টি নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। এসব প্রকল্পের

---

৪৪. মতিউর রহমান, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : মতিউর রহমান, ১০ জুন ২০১৯), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

অনুকূলে মোট ২০৯৩১.৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৪৫] সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত কয়েকটি প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

আশ্রয়ণ-২ ও ৩ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন) প্রকল্প : ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ৩০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,২১০টি পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া ২০০২-২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে ৬০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। আশ্রয়ণ প্রকল্প ও আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের সাফল্য ও ধারাবাহিকতায় ২০১০-২০১৯ মেয়াদে আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্পের আওতায় মোট ২.৫ লক্ষ গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ১,৭৮,৯৫৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ১৯৯৭ সাল থেকে ২০১৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সকল আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৮৪,৮৭০টি গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।[৪৬]

প্রকল্পের আওতায় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৩৭,৫২৫ জন উপকারভোগীকে আয়বর্ধক পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক পরিবারকে ৩০.০০ হাজার টাকা করে ঋণ দেয়া হয়। এখন পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় ৫৩.৭৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিজিএফ, বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান, নলকূপ স্থাপন, লেট্রিন ও বাথরুম স্থাপনের কাজ করা হচ্ছে। এটি একটি সমন্বিত দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প।

গৃহায়ন তহবিল : গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকরণ তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে গৃহায়ন তহবিল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক গৃহায়ন তহবিলের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ তহবিল থেকে গৃহ প্রতি ৭০.০০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সাথে জড়িত এনজিওসমূহকে ১.৫ শতাংশ সরল সুদে এবং এনজিওগুলো সর্বোচ্চ ১০ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ৫.৫ শতাংশ সরল সুদে উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান করে থাকে। ৬১৬টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪০৪টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৩১৪.৩৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৮,৫৬১টি গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং মোট ৩,৯২,৮০৫ জন দরিদ্র মানুষ এ থেকে উপকৃত হয়েছে। গৃহ নির্মাণ কার্যক্রম ছাড়াও দরিদ্র নারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য গৃহায়ন তহবিল কাজ করছে। এ তহবিলের অর্থায়নে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ২৪.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে সাভারের আশুলিয়ায় একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে ৭৪৪ জন মহিলা শ্রমিক আবাসিক সুবিধা পাবে।[৪৭]

উল্লিখিত কার্যক্রম ব্যতীত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পরিচালিত 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচিতে গৃহায়ন তহবিল থেকে ২.০০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করেছে। শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ও

---

৪৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৪৬. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৪৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানায় দু'টি শ্রমিক হোস্টেল নির্মাণে গৃহায়ন তহবিল ২৫.০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। তহবিল থেকে সুবিধা বঞ্চিত চা শ্রমিকদের জন্য গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গৃহায়ণ ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি এ তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের মাঝে ১০.৮৪ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।[৪৮]

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম : পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও 'জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি ২০০১' এর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী একটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।[৪৯] পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কয়েকটি প্রকল্পের এবং বিভাগের অধিভুক্ত কয়েকটি সংস্থা ও ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

একটি বাড়ি একটি খামার : 'একটি বাড়ি একটি খামার' একটি স্থায়ী দারিদ্র্য বিমোচন মডেল। প্রতিটি বাড়িকেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ভূমিহীন অর্থাৎ শূন্য থেকে ৫০ শতক জমির মালিক, চরাঞ্চল বা অনগ্রসর এলাকায় এক একর জমির মালিক, সর্বোপরি দরিদ্র বলে সর্বজন স্বীকৃত মানুষই এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্ট-১ 'সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান' এবং অভীষ্ট-২ 'ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার' অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্পটি ৬৪টি জেলার সকল ইউনিয়নের প্রত্যেক ওয়ার্ডে বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৫০]

প্রকল্পটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নিজস্ব স্থায়ী পুঁজি সৃষ্টি ও তার স্থায়ী ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সারা দেশে ৯২,৪৪৬টি সমিতি গঠন করা হয়েছে। এসব সমিতির মাধ্যমে মোট ৪১.৪৮ লক্ষ পরিবারের ২.০৬ কোটি দরিদ্র মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে প্রতি গ্রামে হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং নার্সারির ন্যায় জীবিকায়ন খামার গড়ে উঠেছে। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ লক্ষ পরিবার তথা ২.৫০ কোটি মানুষ স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশকে দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। এ প্রকল্পের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও তার স্থায়ী তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। ৪৮৫টি উপজেলায় এ ব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৫১]

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)-৩য় পর্যায় : দেশের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার দারিদ্র্য হ্রাস ও গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়ন এবং গ্রামকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০,০৩৫টি সমিতি গঠন করে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৩.৫০ লক্ষ লোকের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১.৬৪ লক্ষ জনের আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৫২]

---

৪৮. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৪৯. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০-২১*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৯), পৃ. ৫১৩-৫২৪
৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
৫১. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯
৫২. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

সমবায় অধিদপ্তর : কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে ১,৭৫,৩১০টি নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের সমিতি ২২টি, কেন্দ্রীয় সমিতি ১,১৯১টি এবং প্রাথমিক সমিতি ১,৭৪,৭০৯টি। এ সকল সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ১২,২৮২.৯১ কোটি টাকা। সমবায় সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে বীমা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ ইন্স্যুরেন্স লিঃ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে এর অধীনে ৮০৩টি সমিতি রয়েছে। এর মধ্যে ৯টি জাতীয় পর্যায়ের সমবায় সমিতি, ১২০টি কেন্দ্রীয় সমিতি এবং ৬৭৪টি প্রাথমিক সমবায় সমিতি। বর্তমানে এ সমিতির শেয়ার মূলধন ৬৩.৭৭ লক্ষ টাকা এবং সংরক্ষিত তহবিল ৭৫.৩১ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশে সমবায় কর্মকাণ্ডকে ফলপ্রসূ ও গতিশীল করার জন্য সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।[৫৩] বর্তমানে 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনমান উন্নয়ন' এবং 'দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গংগাচড়া উপজেলার ডেইরি সমবায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প দু'টি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) : গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিআরডিবি অপরিসীম ভূমিকা রাখছে। সংস্থাটি এ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকাণ্ডমূলক ১১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনমূলক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডভিত্তিক এডিপিভুক্ত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিআরডিবির বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো হচ্ছে– (ক) উত্তরাঞ্চলের দরিদ্রের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি; (খ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩; (গ) গাইবান্ধা সমন্বিত পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প এবং (ঘ) সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি। এছাড়া বিআরডিবির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, ঋণ কার্যক্রমসহ ১১টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বিআরডিবি ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১৬,১১৭.৩০ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে এবং ১৪,৬৩২.৪৩ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।[৫৪]

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা : বার্ড পল্লী অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানসহ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করছে। সাম্প্রতিক সময়ে বার্ড জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পরিবার পরিকল্পনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলায় মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা করছে। ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত বার্ড ৬৯৫টি গবেষণা পরিচালনা করেছে। সংস্থাটি বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ, নারী শিক্ষা, পুষ্টি উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে ১০টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।[৫৫]

---

৫৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯-৫২০
৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০-৫২১
৫৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২১-৫২২

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া : ১৯৭৪ সালে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং পরামর্শ সেবা প্রদান প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ। একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। মার্চ ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আরডিএ ৩৩৭টি ব্যাচে ২১,৩৮০ জনকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,৫২,৮০০ জন এ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। আরডিএ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত 'পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট' কোর্স চালু করা হয়েছে। ২০১৮ সাল পর্যন্ত মোট ৮২ জন এই ডিগ্রি অর্জন করে স্বাবলম্বী হয়েছে। মার্চ ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আরডিএ-তে মোট ৬টি গবেষণা ও ১টি প্রায়োগিক গবেষণা এবং শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৪৬০টি গবেষণা ও ৪২টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে ১২টি গবেষণা এবং ৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প চলমান রয়েছে।[৫৬]

সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের টাকায় বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার ৮টি চর ইউনিয়নে দারিদ্র্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এমন ১৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে আরডিএ একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া কৃষি জমি সাশ্রয়, পল্লী এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও গ্রামাঞ্চলে উন্নত আবাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত সমবায়ভিত্তিক বহুতল ভবনবিশিষ্ট 'পল্লী জনপদ' নির্মাণ শীর্ষক প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটি একাডেমি বাস্তবায়ন করছে। 'পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও বিস্তার এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন' শীর্ষক আরেকটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প আরডিএ বাস্তবায়ন করছে। একাডেমির সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ২০০০-২০০১ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ১২৮.৪৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। একই সময়ে ১১৮.৫২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৫৭]

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন : ১৯৯৪ সালে ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন পরিবারের বিশেষত মহিলাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনই এ ফাউন্ডেশ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য। ২০০৭ সাল থেকে ফাউন্ডেশন ঋণ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ৮১৫.৩৭ কোটি টাকা জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। একই সময় পর্যন্ত মোট ৬৬৫.৪৪ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৫৮] এছাড়া সদস্যরা ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে ৭০.৪৫ কোটি টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছে।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) : দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায়

---

৫৬. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২-৫২৪
৫৭. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০
৫৮. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২০১২ সালে এর নামকরণ করা হয় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)'। একাডেমিটি মূলত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন বিষয়ক কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা প্রতিষ্ঠানটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। এছাড়া ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং বিত্তহীন ও বেকার জনগোষ্ঠীর দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি ও অকৃষি খাতের বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে বাপার্ড প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৩৪,৬৯০ জন সুফলভোগী এবং সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।[৫৯]

বেকারদের কর্মসংস্থানে কর্মসংস্থান ব্যাংকের কার্যক্রম : দেশের বেকার জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যাংকটি উৎপাদনমুখী ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে যুব সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করতে ঋণ প্রদান করে। বর্তমানে সারা দেশে ২৪৬টি শাখার মাধ্যমে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৬০]

কর্মসংস্থান ব্যাংকের নিজস্ব ঋণ কর্মসূচি : ব্যাংকের নিজস্ব কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৫,২৮,০৬৫ জন উদ্যোক্তার মধ্যে মোট ৪,৯২৭.৭১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪,৩৮৭.০৮ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৬১]

শিল্প কারখানার স্বেচ্ছা অবসর প্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (শিকাশ্র) কর্মসূচি : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী ব্যাংক কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছা অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পুনরায় আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কর্মসূচিটির আওতায় ১৯,৬৫৬ জন শ্রমিক ও কর্মচারীকে ১০৯.০৮ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। একই সময়ে ৯৮.৭৫ কোটি টাকা ঋণ আদায় হয়েছে।[৬২]

কৃষিভিত্তিক শিল্পে ঋণ সহায়তা কর্মসূচি : অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় কর্মসংস্থান ব্যাংক আবর্তক তহবিলের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করছে। কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ৬৬.৮৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পে নিয়োজিত ২,৩২৮ জন উদ্যোক্তা সরাসরি উপকৃত হয়েছে।[৬৩]

বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি : বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে কর্মসংস্থান ব্যাংক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ঋণদান কর্মসূচি শুরু করে। তাছাড়া ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাত উন্নয়নপূর্বক দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম কর্মসূচিটি চালু করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালিত এ দু'টি কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত মোট ২০,৮৩৮ জন উদ্যোক্তার মাঝে

---

৫৯. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

৬০. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৮-১৯*(ঢাকা : আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ২০১৯), পৃ. ১৭৫

৬১. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৬২. প্রাগুক্ত।

৬৩. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২৮৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে এবং ১৯৫.০২ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে।[৬৪]

কর্মসংস্থান ব্যাংকের ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের তথ্যাবলী

(কোটি টাকা)

ক্রম	কর্মসূচির নাম	বিতরণ	আদায়	আদায়ের হার (%)	সুবিধাভোগী	কর্মসংস্থান সৃষ্টি
১	নিজস্ব কর্মসূচি	৪৯২৭.৭১	৪৩৮৭.০৮	৯৫	৫২৮০৬৫	১৯০৬৩১৫
২	বিশেষ কর্মসূচি :					
	(ক) শিকাশ্র ঋণ কর্মসূচি	১০৯.০৮	৯৮.৭৫	৯২	১৯৬৫৬	৭০৯৫৮
	(খ) কৃভিশি ঋণ সহায়তা কর্মসূচি	৬৬.৮৩	৭৫.২৮	৯৭	২৩২৮	৮৪০৪
	(গ) বিবিধ ঋণ কর্মসূচি	২৮৩.২৯	১৯৫.০২	৯৭	২০৮৩৮	৭৫২২৫
	সর্বমোট	**৫৩৮৬.৯১**	**৪৭৫৬.১৩**	**৯৫**	**৫৭০৮৮৭**	**২০৬০৯০২**

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) : পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে কাজ করছে। সারা দেশে ২৭৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সংস্থাটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সহযোগী সংস্থাসমূহের সদস্যদের প্রায় ৯১ শতাংশই মহিলা। চলতি অর্থবছরে পিকেএসএফ বিভিন্ন খাতে মোট ৩,৭১৫.০০ কোটি টাকা আর্থিক পরিসেবার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুকূলে মোট ১,৬৩৬.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। একই সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে মোট ২৩,৭৮৬.০৭ কোটি টাকা বিতরণ করেছে।[৬৫] ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে মোট ৩২,৬৮৪.২৮ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। বর্ণিত সময়ে সহযোগী সংস্থাগুলো সদস্য পর্যায়ে ৩,২৯,৮৯৩.৮৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। পিকেএসএফ আর্থিক পরিসেবা কার্যক্রম ছাড়াও সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানুষের জীবনমান উন্নয়নেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ‘দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি’ নামক একটি সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দেশের ৬৪ জেলার ১৬৪টি উপজেলার ২০২টি ইউনিয়নে কর্মসূচির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কর্মসূচির আওতায় ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১১৬টি সহযোগী সংস্থার ৩৭৬টি শাখার মাধ্যমে ১২.৪৭ লক্ষ পরিবারের প্রায় ৫৬.৯২ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং ১,১৭৫ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মুকাবিলায় সহায়তার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দুর্যোগ মুকাবিলা ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীদের অগ্রিম শ্রম ও সম্পদ বিক্রি থেকে রক্ষা করতে দ্রুত আর্থিক সুবিধা দিতেই এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এতে করে উপকূল এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠী নানা ধরনের দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী দুরবস্থা মুকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারছে।[৬৬]

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মুকাবিলার লক্ষ্যে পিকেএসএফ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ইউনিটের মাধ্যমে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মুকাবিলা সংক্রান্ত নানা

৬৪. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
৬৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
৬৬. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বয়স্ক লোকদের জীবনমান উন্নয়ন তথা সার্বিক কল্যাণে পিকেএসএফ 'প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করছে। দেশের সকল জেলার ২১৮টি ইউনিয়নের ৩.২০ লক্ষ প্রবীণ এ কর্মসূচির আওতায় নানা ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন।[৬৭]

স্বল্প আয়ের মানুষের উন্নত আবাসন তৈরির লক্ষ্যে নতুন বাড়ি নির্মাণ, পুরাতন বাড়ি সংস্কার এবং সম্প্রসারণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সংস্থাটি 'লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে ১৩টি নির্বাচিত পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।[৬৮]

পিকেএসএফ এর নিজস্ব অর্থায়নে 'কৃষি ইউনিট' এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ ইউনিট' নামক দু'টি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ইউনিট দু'টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষি এবং প্রাণীসম্পদ ভিত্তিক আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু চেইন প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্য ও উপজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে ইউনিট দু'টি কাজ করছে।

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন 'স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (এসইআইপি)' প্রকল্পে বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করছে। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় দরিদ্র অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ না হওয়ার ফলে সমাজে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ মৌলিক চাহিদাগুলো স্বাভাবিকভাবে পূরণ না হলে মানুষ বাধ্য হয়ে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে। তাই, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, বস্তি, অপরাধ, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়। মৌলিক চাহিদাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল। তাই এর একটির অভাব দেখা দিলে অন্যগুলোর উপর তার প্রভাব পড়ে এবং তা থেকে সৃষ্ট সমস্যা ক্রমেই জটিল আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত বা মন্থর হওয়ার পিছনে সামাজিক নিরাপত্তা বিজড়িত মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়াই বিশেষভাবে দায়ি।

মূলত দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকা অনেক দীর্ঘ হলেও বাস্তবে পরিদৃষ্ট হয় যে, সাধারণ মানুষ এসব কর্মসূচির আওতা বহির্ভুত হওয়ায় তাদের জীবন আজ দুর্বিসহ। কেননা, তারা না পারে তাদের বেদনা বলতে, না পারে তা সইতে। সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানের জন্য সরকারের সাংবিধানিক সুষম বণ্টননীতি বাস্তবায়নে দুর্নীতিমুক্ত ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করলেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ফিরে পেতে পারে।

৬৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮
৬৮. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নারীর নিরাপত্তা অবস্থা

নারী হলো সমাজের কারো না কারো মা, স্ত্রী, কন্যা, বোন অথবা অন্য কোনো আপনজন। সমাজের ভারসাম্য ও স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে পুরুষের সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি নারীদেরও সমভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা সকল সভ্য সমাজের নিকট একান্তভাবে কাম্য। এ ব্যাপারে কোনোরূপ ভেদ জ্ঞান করা বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

সাম্যের গান গাই–
'আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বের যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'[৬৯]

যে নারী তার মেধা, মননশীলতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সুনির্মল রূপ-রস-গন্ধ মিশিয়ে দেশের উন্নয়নকল্পে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে যাচ্ছে। যার ছোয়ায় সংসার আলোকিত হচ্ছে। পরিবারের যাবতীয় কিছুকে যে নারী সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদান করে যাচ্ছে, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সে নারীরা কতটুকু নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করছে সে বিষয়ে নিচে আলোকপাত করা হলো :

নারীর নিরাপত্তা অবস্থা

বাংলাদেশের হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদের জীবনমান উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতিকে ভিত্তি ধরে সরকার এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৭৪,৩৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ এবং জিডিপির ২.৫৮ শতাংশ।[৭০] জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা, অতি দরিদ্র ও দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য বিতরণ, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও টেস্ট রিলিফ ছাড়াও বেশ কিছু কার্যক্রম সরকার পরিচালনা করছে। এদের মধ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার', 'আশ্রয়ণ', 'গৃহায়ণ', 'আদর্শ গ্রাম', 'গুচ্ছ গ্রাম', 'ঘরে ফেরা' কর্মসূচি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বয়স্ক ভাতা, দুঃস্থ মহিলা ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাদের ভাতা প্রদানের মাধ্যমে সরকার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে কাজ করছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা এবং সেই সঞ্চয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে সরকার ২০১৮ সালের মধ্যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া, ২০২১ সালে সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নীতি ও কৌশল নির্ধারণপূর্বক একটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করা হয়েছে।[৭১] বাংলাদেশে বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জীবনচক্র পদ্ধতির ভিত্তিতে পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। মূল গুচ্ছভিত্তিক কর্মসূচিগুলো হলো : (ক) শিশুদের জন্য কর্মসূচি; (খ) কর্ম উপযোগী নাগরিকদের জন্য কর্মসূচি; (গ) বয়স্কদের জন্য পেনশন ব্যবস্থা; (ঘ) প্রতিবন্ধীদের জন্য কর্মসূচি এবং (ঙ) ক্ষুদ্র ও বিশেষ ঋণ কর্মসূচি। বর্তমানে যে সব মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তাদের পাঁচটি গুচ্ছে বিন্যস্ত করা হয়েছে। গুচ্ছগুলো হলো– (ক) সামাজিক ভাতা;

---

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*(ঢাকা : নজরুল ইন্সটিটিউট, ২০১২), পৃ. ২৭৩
৭০. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৭১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

(খ) খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা; (গ) সামাজিক বীমা; (ঘ) শ্রম/জীবিকায়ন এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন। প্রতিটি গুচ্ছের সমন্বয়কের দায়িত্বে থাকবে একটি মুখ্য সমন্বয়কারী লিড মন্ত্রণালয়। বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব কর্মসূচিগুলোর নকশা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করে। গুচ্ছের বিষয়বস্তুর সাথে বলিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে এমন একটি মন্ত্রণালয়ই ঐ গুচ্ছ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের তদারকির জন্য একটি ফলাফলভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করাও সরকারের পরিকল্পনাধীন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর পরিধি ও প্রসার বিবেচনায় নিয়ে এর ব্যয় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শেষে অর্থাৎ ২০২০ সালে জিডিপি'র ৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।[৭২]

নারীর সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বয়স্ক, দুঃস্থ মহিলা, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী, এতিম প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন ভাতা হিসেবে নগদ প্রদান ও খাদ্য নিরাপত্তা কার্যক্রমের পরিধি ও বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বয়স্ক ভাতা খাতে ২,৬৪০ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১,০২০ কোটি টাকা এবং মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা বাবদ ৩,৩৮৫.০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ) এর কাছে ন্যস্ত ক্ষুদ্রঋণ ও বিনিয়োগ তহবিলসমূহের সঞ্চালন গতি বৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১০৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক পরিসেবা কর্মসূচি বাবদ ৭৮৫ কোটি টাকা, এসডিএফ এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাবদ ২৩৫ কোটি টাকা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্রঋণ বাবদ ৬ কোটি টাকা এবং সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাবদ ৫৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৭৩]

পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর, বিসিক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিদ্যমান ঘূর্ণায়মান ক্ষুদ্রঋণ তহবিলসমূহের সঞ্চালন ও প্রচলন গতি বৃদ্ধি জন্য বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্যোগসহ আরও কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সংশোধিত ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মূল বাজেট বরাদ্দ নিচের সারণিতে তুলে ধরা হলো[৭৪] :

২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাত*

ক্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম	২০১৮-১৯**	২০১৯-২০***
১.	নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম	৩২১৬১.৪৩	৩৪৪১৪.৪৪
২.	খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি : সামাজিক নিরাপত্তা	১১৭৫৪.১১	১৪৫২৮.৭৫
৩.	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি : সামাজিক ক্ষমতায়ন	৬৭৮.০০	১০৮৪.০০
৪.	বিভিন্ন তহবিল : সামাজিক ক্ষমতায়ন	৭৫৭.২৫	৭৯২.৪৫
৫.	বিবিধ তহবিল ও কার্যক্রম : সামাজিক নিরাপত্তা	১৪২৪.২৬	২৬১৫.৬৭
৬.	চলমান উন্নয়ন প্রকল্প	১৭০৩৬.৩২	১৮৫৩৯.৮০
৭.	নতুন উন্নয়ন প্রকল্প	৫৯২.৮৪	২৩৯১.৮২

* কোটি টাকা, ** সংশোধিত বাজেট, *** মূল বাজেট

৭২. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪
৭৩. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২
৭৪. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কার্যক্রম : সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, খোলা বাজারে পণ্য বিক্রিসহ নানাবিধ কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার নগদ অর্থ সহায়তাও প্রদান করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে নগদ প্রদানসহ (বিভিন্ন ভাতা), সামাজিক ক্ষমতায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রমে ৩৪,৪১৪.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি : দেশের মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ বয়স্ক ও তারা কর্মক্ষম নয়। তাদের অনেকেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট। অবহেলিত বয়স্ক এসব জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছর থেকে সরকার বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২,৬৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৪৪ লক্ষ জন করা হয়েছে।[৭৫] জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে এ ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম : ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছর থেকে দরিদ্র, অসহায় ও অবহেলিত মহিলা জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বিধবাদের জন্য ভাতা প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে মোট ১৭ লক্ষ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ জন। এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণও আগের অর্থবছরের তুলনায় ১৮০ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ১,০২০ কোটি টাকা করা হয়েছে। প্রতি দুঃস্থ মহিলাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হয়।[৭৬]

দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন ভাতা : ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান চালু করা হয়। এর আওতায় মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের ভাতা প্রদানের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে। আগে মাসিক ৫০০ টাকা হারে এ ভাতা প্রদান করা হত। চলতি অর্থবছর থেকে দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন মাসিক ভাতা ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়া ভাতা প্রদানের মেয়াদও ২৪ মাস থেকে বাড়িয়ে ৩৬ মাস করা হয়েছে। পাশাপাশি ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা ৭ লক্ষ জন থেকে বৃদ্ধি করে ৭.৭০ লক্ষ জন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ৭৬৩.২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৭৭]

কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল : ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়। শহরাঞ্চলে কর্মজীবী দরিদ্র মায়েদের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও তাদের গর্ভস্থ সন্তান বা নবজাত শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তার উদ্দেশ্যে এই ভাতা প্রদান করা হয়। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর গার্মেন্টস এলাকা এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাকে এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছে। ইতঃপূর্বে একজন মাকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ২৪ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হত। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতার পরিমাণ ও মেয়াদ দু'টিই বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে একজন মাকে মাসে ৮০০ টাকা করে ৩৬ মাস পর্যন্ত এ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া ভাতাভোগীর সংখ্যা আগের অর্থবছরের তুলনায় ২৫ হাজার জন বৃদ্ধি করে ২.৭৫ লক্ষ জন করা হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ খাতে ২৭৩.১১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[৭৮]

---

৭৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
৭৬. প্রাগুক্ত।
৭৭. প্রাগুক্ত।
৭৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ : গ্রামীণ দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর থেকে এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। জাতীয় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ১,২৯,৯৩৭ জনকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। জাতীয় মহিলা সংস্থাও মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মোট ১০৮টি শাখা অফিসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম চলছে। জনপ্রতি ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় মহিলা সংস্থার অধীনে সর্বমোট ৫১,৭৪৬ জনকে ৭১.২৩ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।[৭৯]

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)-এর মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ : বাংলাদেশে কর্মরত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং এসব প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ২০০৬ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এমআরএ অনুমতি প্রদান করে। দেশে কর্মরত সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির অন্যতম প্রধান কাজ। এ কাজকে আধুনিকায়ন করতে ক্ষুদ্রঋণের ন্যাশনাল ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৮১১টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সনদ দেয়া হয়েছে এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে ১০৯টি প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া, আরও ৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনার সাময়িক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত এসব প্রতিষ্ঠানের মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতির পরিমাণ ৬৭,৫০৫ কোটি টাকা এবং সঞ্চয় স্থিতি ২৬,৩০৪ কোটি টাকা।[৮০]

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) : ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গঠিত হয়। দেশের ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় পিডিবিএফের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এর উপকারভোগী ৯৭ শতাংশই নারী। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত পিডিবিএফ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ হিসেবে মোট ১০,৬৩১.০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে প্রায় ২০ লক্ষ গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[৮১]

বেসরকারি সংস্থাসমূহের (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম : সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ করছে। মূলত দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ উন্নয়নে এনজিওগুলো কাজ করছে। এখানে প্রধান প্রধান এনজিওগুলোর সার্বিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হলো :

(১) ব্র্যাক : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাকের অবদান অপরিসীম। এটি দেশের সবচেয়ে বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নে ব্র্যাক কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ২,০৫,২৮১.৯৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এর ফলে ৭১,১৪,৭২৬ জন উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে লাভবান হয়েছে, যাদের ৮৭ শতাংশই নারী।[৮২]

(২) আশা : ১৯৯১ সালে বিশেষায়িত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আশা' কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বল্প ব্যয় ও টেকসই ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ মডেল হিসেবে পরিচিতি

৭৯. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৮০. প্রাগুক্ত।
৮১. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৯
৮২. Board of Editors, *Annual Report 2018*(Dhaka : BRAC Centre, 2019), pp. 30-34

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের শুরু থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত আশা ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১,৮৫,৮০৭.৭৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। বর্ণিত সময়ে সংস্থাটি থেকে মোট ৭০,০১,১১৪ জন সদস্য ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছে, যাদের প্রায় ৯১ শতাংশই নারী।[৮৩]

(৩) ব্যুরো বাংলাদেশ : ১৯৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যুরো বাংলাদেশ দেশের ৬৪টি জেলার ৪৪১টি উপজেলায় দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৭,২৭,৪০৩ জন সুবিধাভোগীর মাঝে ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৩৩,০৭৫.৬৬ কাটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীদের প্রায় ৯১ শতাংশই নারী।[৮৪]

(৪) কারিতাস : প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কারিতাস নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে ২৬টি জেলার ৬২টি উপজেলায় কারিতাসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ২,৫৪,৮৬৭ জন উপকারভোগীর মাঝে কারিতাস মোট ৩,৯৮৪.০৭ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে।[৮৫]

(৫) এসএসএস : সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সোসাইটি ফর স্যোসাল সার্ভিস (এসএসএস) কাজ করছে। দেশের ৩১টি জেলার ১৮৬টি উপজেলায় সংস্থাটি কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৬,০০,৯০৬ জন সদস্য এসএসএস থেকে ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা নিয়েছে। ঋণ গ্রহীতাদের প্রায় ৯৮ শতাংশই নারী। বর্ণিত সময় পর্যন্ত সংস্থাটি ক্রমপুঞ্জিতভাবে ১৫,৯৩৮.৬৭ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং ১৪,৩৭০.৯১ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।

(৬) শক্তি ফাউন্ডেশন : ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, কুমিল্লা, বগুড়া ও অন্যান্য বড় শহরের বস্তিতে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের ঋণ সুবিধা প্রদানে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ এ সংস্থাটির মূল কার্যক্রম। এছাড়া, দরিদ্র মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবাসহ নানা ধরনের সমাজ উন্নয়নে শক্তি ফাউন্ডেশন কাজ করছে। ফাউন্ডেশনটি ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে ৮,২৫০.৮৪ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে। একই সময়ে ৭,৫১১.৪০ কোটি টাকা ঋণ আদায় করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৪,৫১,৮৪৮ জন সংস্থাটির ক্ষুদ্রঋণ সেবা গ্রহণ করেছে, যাদের ৯৭ শতাংশই নারী।[৮৬]

(৭) টিএমএসএস : দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তুলতে টিএমএসএস ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দেশের ৫৭টি জেলার ৩৪৬টি উপজেলায় সংস্থাটি ঋণ প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ৬৩,৭৮,১৫০ জন উপকারভোগীর মাঝে টিএমএসএস মোট ২৪,৯৪৪.৩৪ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। উপকারভোগীর প্রায় ৯৬ শতাংশই নারী।[৮৭]

(৮) প্রশিকা : দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখার প্রত্যয় নিয়ে ১৯৭৫ সালে মানিকগঞ্জ থেকে প্রশিকার যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের ৫৯টি জেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত সংস্থাটি মোট ৬,১৯০.৬৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। একই সময় পর্যন্ত প্রশিকা থেকে ঋণ নিয়ে উপকৃত হয়েছে ২৭,৭৬,৩৪৪ জন দরিদ্র মানুষ।[৮৮]

(৯) স্বনির্ভর বাংলাদেশ : গ্রামীণ দরিদ্র মানুষকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে স্বনির্ভর বাংলাদেশ কাজ করছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রদান এ সংস্থাটির অন্যতম প্রধান কার্যক্রম। ডিসেম্বর ২০১৮

৮৩. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৮৪. প্রাগুক্ত।
৮৫. প্রাগুক্ত।
৮৬. প্রাগুক্ত।
৮৭. প্রাগুক্ত।
৮৮. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ তার প্রায় ১৭ লক্ষ উপকারভোগীর মাঝে মোট ২,২৫৬.৬৬ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। সংস্থাটির সেবা গ্রহীতার প্রায় ৮৩ শতাংশই নারী।[৮৯] উল্লিখিত এনজিওগুলো ছাড়াও আরও বহু এনজিও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্ণিত এনজিওগুলোর কার্যক্রম ছকের মাধ্যমে নিচে উপস্থাপন করা হলো :

২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত প্রধান প্রধান এনজিওগুলোর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির বিবরণী

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮
ব্র্যাক						
বিতরণ	১৫১৯০.৪৯	১৯২৯৮.২৮	২৪৩০২.৭৮	২৯৩১৭.১৩	৩৫৩৬২.৭৬	২০৫২৮১.৯৪
আদায়	১৩২৮১.৭২	১৭১৩৪.৮১	২১৫৬৩.৬৬	২৬৪৮৬.৮৫	৩১৫৫১.৪১	১৮৪৪৮৪.১৬
সুবিধাবোগী	৫৫১০৯০৫	৫৩৭৭৯৫১	৫৯৫৭৯৫৪	৬৪৮৩৪৮৬	৭১১৪৭২৬	৭১১৪৭২৬
নারী	৪৮৭৬৪৪৫	৪৬৭১০০৪	৫১৮৮২০৬	৫৬৩৩১২১	৬১৬৫১১৯	৬১৬৫১১৯
পুরুষ	৬৩৪৪৬০	৭০৬৯৪৭	৭৬৯৭৪৫	৮৫০৩৬৫	৯৪৯৬০৭	৯৪৯৬০৭
আশা						
বিতরণ	১৪৬৩৮.৫৭	২০৯০৫.৬৮	২৬৯৫৮.৬৩	২৯৮৩১.৪২	২৯৬৮১.৪২	১৮৫৮০৭.৭৫
আদায়	১১৭৯৫.৩২	১৭৬৫০.০৮	২৩৫১৫.৩৭	২৭০৩৬.৪১	২৮৯৫৩.৩৪	১৭০১৬৬.৩১
সুবিধাবোগী	৬৯০২০২৪	৭৬৮৬২৫৫	৭৮৩৯১১৯	৭৮৩৯১১৯	৭৫৭৭৩৫৫	৭০০১১১৪
নারী	৬৩১৯৫০২	৭০৩৩৫২১	৭১৭১২৭১	৭১৭১২৭১	৬৯৩০৪৭৪	৬৪০৫১১৭
পুরুষ	৫৮২৫২২	৬৫২৭৩৪	৬৬৭৮৪৮	৬৬৭৮৪৮	৬৪৬৮৮১	৫৯৫৯৯৭
ব্যুরো বাংলাদেশ						
বিতরণ	২৩৬২.৮৫	২৬৩০.০২	৩৯৫১.৫৪	৫৪৩৯.৩৮	১০৪৬০.৫০	৩৩০৭৫.৬৬
আদায়	২২৯০.৩৫	২৩৫৫.৮৮	৩১৫৪.৮১	৪৬০৪.৮২	৮৯৭৮.৮০	২৮৩১৬.০৮
সুবিধাবোগী	১০৫৩০৩৫	১২৬৯৪১১	১৩৫৬৫৭২	১৪৪৯০৮৫	১৬৪৯৯২৩	১৭২৭৪০৩
নারী	৯৮২৪৭৪	১১৬৮৯৪৫	১২৪১৬৮৭	১৩২৯৭১৯	১৫০১৫৬৪	১৫৫৯৩৭৬
পুরুষ	৭০৫৬১	১০০৪৬৬	১১৪৮৮৫	১১৯৩৬৬	১৪৮৩৫৯	১৬৮০২৭
কারিতাস						
বিতরণ	২৯৭.৩৫	৩১৭.১৬	৩৮০.৪৫	৪৪৮.৫২	৪৮৩.২০	৩৯৮৪.০৭
আদায়	২৯১.৬২	৩১০.০৭	৩৪৬.৫৫	৪১২.০৫	৪৬২.২১	৩৭১৩.৯৫
সুবিধাবোগী	৩৭৮৯৭	২৯২১৭	৬৬১৯	২৫২৬	৪০৭০	২৫৪৮৬৭
নারী	২২৮১৮	১৮৪২১	৭৮৩২	২৪২৯	২১৫৪	২২০৪৯১
পুরুষ	১৫০৭৯	১০৭৯৬	১২১৩	৯৭	১৯১৬	৩৪৩৭৬
এসএসএস						
বিতরণ	১৩১৬.৩২	১৬৮৬.২৬	১১৪৯.৬৭	২৭৬২.৫০	৩১৩৫.২০	১৫৯৩৮.৬৭
আদায়	১২২৯.৩৩	১৫০৭.১৭	৯২৩.২৪	২৩১৭.৬৮	৩০৭৩.৭৮	১৪৩৭০.৯১
সুবিধাবোগী	৪৭৩১১৬	৫০৭২৯৫	৫৭৯১৮২	৬১৬৫৮৫	৬০০৯০৬	৬০০৯০৬
নারী	৪৬২৫৬৭	৪৯৮৫১৮	৫৬৮৬৯৪	৬০০৫২৯	৫৮৫৯৫১	৫৮৫৯৫১
পুরুষ	১০৫৪৯	৮৭৭৭	১০৪৮৮	১৬০৫৬	১৪৯৫৫	১৪৯৫৫
শক্তি ফাউন্ডেশন						
বিতরণ	৬১৮.৬৫	৭৪৫.৭৯	১০০১.৪৫	১১৭৫.০৩	১৩২২.৩৭	৮২৫০.৮৪
আদায়	৫৭০.৩৫	৬৬৯.৯৬	৮২৬.৪৯	১০১৭.০২	১২৩২.৮১	৭৫১১.৪০
সুবিধাবোগী	৪৯৬০৪০	-	-	৫২১৭৫১	-	৪৫১৮৪৮
নারী	৪৭৯৬৮০	-	-	৫০৭৬২৮	-	৪৪০২২৭
পুরুষ	১৬৩৬০	-	-	১৪১২৩	-	১১৬২১

---

৮৯. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

Dhaka University Institutional Repository

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮
টিএমএসএস						
বিতরণ	১৮৯৪.৪৯	২৯৬৩.৮০	২৬২৩.৯৮	৩৩০৫.৮৫	৪২৪৫.০৩	২৪৯৪৪.৩৪
আদায়	১৬২৩.৯৮	২৫৪০.৪২	২৪৬০.৩৫	২৯১৮.২৮	৩৮৩৮.৮৪	২২২৯৪.৩২
সুবিধাবোগী	৫৬৪১২৭	৫১৯১১৮	৪৫৯৫৫৮	৫০৩৯৪২	৫৭৬৬৮৩	৬৩৭৮১৫০
নারী	৫৪৪৩৮৩	৪৯৯৯১০	৪৪১১৭৬	৪৯২৭২২	৫৬৮২০৭	৬০৯৯৪০২
পুরুষ	১৯৭৪৪	১৯২০৮	১৮৩৮২	১১২২০	৮৪৭৬	২৭৮৭৪৮
প্রশিকা						
বিতরণ	২২২.৪২	২১৯.৫১	১৭৮.০২	২৫৫.৭৫	৩৫১.১৮	৬১৯০.৬৮
আদায়	২১৫.৯৮	২১৫.২২	১৬২.৭৮	২৩১.৬২	২৯৭.৮৫	৫৯৭২.৬৯
সুবিধাবোগী	১০৮৫৯০	৯২৫৩৫	৭৯১১৯	১১০৪৮৩	১৪০৪৭১	২৭৭৬৩৪৪
নারী	৭৬০১৩	৭৪২১৫	৫৩৮০১	৭৮৪৪৩	১০৩৯৪৯	১৭৪৩৪৭৫
পুরুষ	৩২৫৭৭	১৮৩২০	২৫৩১৮	৩২০৪০	৩৬৫২২	১০৩২৮৬৯
স্বনির্ভর বাংলাদেশ						
বিতরণ	২০১.০০	৯৮.০০	১৩৫.০০	১১৩.০০	৫০.০০	২২৫৬.৬৬
আদায়	১৯৭.০০	১০৩.০০	১৪৭.০০	১৩৩.০০	৬৬.০০	২০২৯.৪০
সুবিধাবোগী	১০৬৯৪৭	৫৫৪৭৫	৮৫৬৩২	৬৫৮৩২	১৫৬২৫	১৬৮১৪৮৯
নারী	৮৬৬২৭	৩৭৮৮০	৬৭০২০	৫০৬২২	১২১২৫	১৩৯৯১৬০
পুরুষ	২০৩২০	১৭৫৯৫	১৮৬১২	১৫২১০	৩৫০০	২৮২৩২৯

গ্রামীণ ব্যাংক : ১৯৮৩ সালে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংক উদ্ভাবিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম দারিদ্র্য বিমোচনের নতুন মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। ব্যাংকটি মূলত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ২,৫৬৮টি শাখার মাধ্যমে ৬৪ জেলার ৪৭৯টি উপজেলার ৮১,৬৭৮টি গ্রামে ৯১.৩২ লক্ষ সদস্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছে। সদস্যদের প্রায় ৯৭ শতাংশই নারী। ব্যাংকটি ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভাবে মোট ১,৯৪,৪৯০.৯০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং একই সময়ে ১,৭৮,৯২০.৯৭ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে।[৯০] নিচে ছকের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির পরিস্থিতি উপস্থাপিত হলো :

২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯
ঋণ বিতরণ	১৩৮৯০	১৬৯৩৩.১৫	২০৭৮৯.১১	২৪৩২১.৫০	১৭০৪৪.৯২	১৯৪৪৯০.৯০
ঋণ আদায়	১৩৫৩৪.৩৬	১৫১২৩.১৩	১৮২৭০.১৩	২২৫৫৯.৭০	১৬৬৯৪.০২	১৭৮৯২০.৩৭
আদায়ের হার	৯৮.৩৩	৯৮.৮২	৯৯.২২	৯৯.১৩	৯৯.০৩	৯৯.০৩
সুবিধাভোগী	৮৬৮১৩০২	৮৮৫৩৯৬১	৮৯১৫৪৯১	৮৯৮৬০৫	৯১৩২৯৬৬	৯১৩২৯৬৬
নারী	৮৩৪৫৬১০	৮৫৪৮০৬০	৮৬০৯৮৯৩	৮৬৮৯০০	৮৮৩৪৭০৬	৮৮৩৪৭০৬
পুরুষ	৩৩৫৬৯২	৩০৫৯০১	৩০৫৫৯৮	২৯৭০৪৬	২৯৮২৬০	২৯৮২৬০

৯০. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম : বিশেষায়িত কিছু সংস্থা ও এনজিও ছাড়া তফসিলি ব্যাংকগুলোও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিচের ছকে রাষ্ট্রায়ত্ত ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও ২টি বিশেষায়িত ব্যাংকের প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি উপস্থাপিত হলো :

২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

উপাদান	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত ফেব্রুয়ারি ২০১৯
সোনালী ব্যাংক[৯১]						
ঋণ বিতরণ	১০৪১.০০	১১২৭.০০	১১৮৭.৩০	১১৭০.২১	৪৪২.০৯	১৭২৬৬.৬০
ঋণ আদায়	১২৪৪.০০	১১৭৮.০০	১৩০৬.০৮	১২৬৭.৯০	৫৫২.৩৩	১৯২২০.৩১
আদায়ের হার	৪৫.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	৪২.৫২	২৬.০০	৯২.৪১
সুবিধাভোগী	২২৯৭৭৩	২০৮৪৩২	২৯১৪২৯	৩১১০৫৮	১০৯৪৩৯	৭৮৬৭০০৪
অগ্রণী ব্যাংক[৯২]						
ঋণ বিতরণ	২১২০.৫০	১৭৮২.০২	৮৯৮.০০	২৭৪৮.৭৭	৩৩৪০.৯৪	১৩১৭১.৪১
ঋণ আদায়	৩০৫১.৮৫	৩০০৭.৮৬	৯৯৬.০০	১৭৬৭.৮৫	১৪২৯.৩০	১২৯৫৬.৩৫
আদায়ের হার	৭৪.০০	৬৭.০০	৮৮.০০	৬৪.৩১	৬২.০০	৯৮.৩৬
সুবিধাভোগী	১২৮৮৫০	৯২৬৩৬	১৫০১৩৯	৩০৬৯৮	১৮৭৮০	৭৯৪২৭৬
জনতা ব্যাংক[৯৩]						
ঋণ বিতরণ	৭৫১.৫৭	৭৪৪.৮২	৪৯৫.৫৭	৭৫১.৩৬	৫৯৭.৭৭	১১৫২৯.৯১
ঋণ আদায়	৬৯৮.৯১	৬৯১.২৩	৪৯০.২৩	৬৭৮.৫৭	৫৭০.৮৫	১১২১৮.৩৯
আদায়ের হার	৯৩.০০	৯৩.০০	৯৯.০০	৪৮.০০	৫১.৪৮	৯৭.২৬
সুবিধাভোগী	১০৪৫৬৩	৫৫৩৪১৩	৫৫২৩৯২	৭৫৩৭৮৫	৫৫৪৫৪৫	৩১৪০৩৮৫
রুপালী ব্যাংক[৯৪]						
ঋণ বিতরণ	১১.৪৪	১৯.৯৫	১০৫.৫০	৬১২.৩১	৪৪.১১	৯৮৬.৬৪
ঋণ আদায়	১৫.৭১	৩১.৩০	৫৯.৬৯	২৯৩.১৯	৩৬৭.৭৮	৯৩৯.৪০
আদায়ের হার	১৩৭.৩২	১৬৬.০০	৫৭.০০	২৯৩.০০	৩৬৮.০০	৯৫.২১
সুবিধাভোগী	১৫২৫৫	১৪৮৮৬	৩০৬৯৭	৩৪৭৩১	৩৫০২১	৩৫০২১
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক[৯৫]						
ঋণ বিতরণ	৯৬.৫৬	৫৭.৬১	৩১.১৫	৭২.১১	৪৪.৮০	১৯৩৭.৫৭
ঋণ আদায়	১০৬.৭৭	৫২.০৪	২১.১৩	৬৬.৪৯	২৭.৫০	১৬৭৩.২৩
আদায়ের হার	১১১.০০	৫৩.১৭	৬৭.৮৩	৯২.২০	৬১.৩৮	৮৬.৩৬
সুবিধাভোগী	১৬৫২৯	১৬০৪৪	৭২৫৪	১২০৮০	৭৮০৮	১৯৯২৫৯৬
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক[৯৬]						
ঋণ বিতরণ	২৪.৮৮	১২.৭৩	২৫.৬৭	২২.৯৪	২২.৯৪	৫৪০.৪২
ঋণ আদায়	২৯.০৭	১৯.০৯	১২.১৯	৮.৯১	৮.৯১	৪০৭.২০
আদায়ের হার	১১৭.০০	১৫০.০০	৪৮.০০	৩৯.০০	৩৯.৪০	৭৫.৩৪
সুবিধাভোগী	৩৮৩২	৫৫৫২	৬২৫৩	৩৯৩০	২৬৯২	১১৬৪০৬
মোট						
ঋণ বিতরণ	৪০৪৫.৯৫	৩৬৯৭.২২	২৭৪৩.১৯	৫৩৭৭.৭০	৪৪৯১.৪৪	৪৫৪৩২.৫৫
ঋণ আদায়	৫১৪৬.৩১	৪৯৯৬.৫১	২৮৮৫.৩২	৪০৮২.৯১	২৯৫২.৮৩	৪৬৪১৪.৮৮
আদায়ের হার	৯৬.২২	৮৪.৪০	১০৫.১৮	৭৫.৯২	৬৫.৭৪	১০২.১৬

৯১. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ : বাংলাদেশের তফসিলি ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য বাণিজ্যিক এবং বেসরকারি ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। নিচের ছকে কয়েকটি বাণিজ্যিক এবং বিশেষায়িত ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ কর্মসূচির বিবরণ উপস্থাপিত হলো :

(কোটি টাকা)

ব্যাংক	**সুবিধাভোগীর সংখ্যা**			**ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিত ডিসেম্বর ২০১৮)**	**আদায়ের হার (%)**
	নারী	**পুরুষ**	**মোট**		
আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক[৯৭]	৫৫৪৬৩১	৪৯৪৭৭১	**১০৪৯৪০২**	২২০৩.৪৮	৯৬.১৫
ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড[৯৮]	৩১৫৯	৬২৫৫৭	**৬৫৭১৬**	২৪৪৭৩.৫৮	৯১.০০
টি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড[৯৯]	১০৮৬	১৯১৮৪	**২০২৭০**	২৯৫.৬০	৯০.০০
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিঃ[১০০]	৬৭৫১	২২৫০	**৯০০১**	৫৯.৭৫	৯৯.০০
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ[১০১]	২৯৬৭	৮৬৬৬৬	**৮৯৬৩৩**	১১২১৩.০০	৯৩.৩০
উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড[১০২]	৮৭৬	১৪১৮৯	**১৫০৬৫**	৩২৪৫.৯০	৬৯.৭৭
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড[১০৩]	৩৮১৬৩	৩০৬৬১	**৬৮৮২৪**	১৮০৭.৭৬	১০০.০০
বেসিক ব্যাংক লিমিটেড[১০৪]	৫০৩৯৩২	১২৫৯৮৩	**৬২৯৯১৫**	৯৫৩.৫৬	৮০.৬৫
মোট	**১১১১৫৬৫**	**৮৩৬২৬১**	**১৯৪৭৮২৬**	**৪৪২৫২.৬৩**	**৮৯.৯৮**

মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি : দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক নানা ধরনের প্রকল্প/কর্মসূচির পাশাপাশি সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের এই মডেলকে টেকসই করতে সরকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করছে। এ লক্ষ্যে অর্থ বিভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ কাজ করে যাচ্ছে।[১০৫] নিচের ছকে কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের তথ্য উপস্থাপন করা হলো :

২০১৫-১৬ থেকে ২০১৮-১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ক্ষুদ্রঋণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	**সংস্থা**	**২০১৫-১৬**	**২০১৬-১৭**	**২০১৭-১৮**	**২০১৮-১৯**	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রু. ২০১৯)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	**বিআরডিবি**					
	বিতরণ	১০৬৫.৭৩	১১৭৩.৫২	১২৫২.৮৬	৬৪১.৪১	১৬১১৭.৩০
	আদায়	৯৯৭.৪৮	১১০৬.১২	১১৬০.২৯	৬৬১.৭৮	১৪৬৩২.৪৩
	হার (%)	৭৩.০০	৯৪.০০	৭৫.০০	৬৩.০০	৯৭.০০
	পিডিবিএফ					
	বিতরণ	৯৫৬.৯৩	১১৫৬.২৮	১২৬৬.৫০	৮৩১.৯৭	১০৬৩১.০২
	আদায়	৯৪৬.০৯	১১৭৮.৩৫	১৩৫৯.৪৯	৯১৫.১৯	১১০৭৪.৭০

---

৯৭. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন* ২০১৮-২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২
৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২
৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
১০২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯
১০৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
১০৫. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

(কোটি টাকা)						
মন্ত্রণালয়/বিভাগ	সংস্থা	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	ক্রমপুঞ্জিত (ফেব্রু. ২০১৯)
	হার (%)	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৭.০০	৯৮.০০
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জাতীয় মহিলা সংস্থা					
	বিতরণ	১.২৯	১.৫৫	১.৫৩	১.৮৯	৫৬.৪৫
	আদায়	৪.৭২	৫.২৫	২.৪০	২.৫২	৬৪.১২
	হার (%)	৩৬৫.৯০	৩৩৭.১৩	১৫৭.৬৮	১৩৩.০০	১১৩.৫৮
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৭.৯৮	৮.৬১	৯.৩৩	-	৭০.৫২
	আদায়	৮.০৩	৮.৭৯	৮.৮৩	-	৫৮.৯৯
	হার (%)	১০০.৬২	১০২.০৯	৫৯.০০	-	৮৩.৬৪
শিল্প মন্ত্রণালয়	সিরোটসি					
	বিতরণ	৮.৬৫	৭.৮২	৬.৪২	৩৪.৩১	৭৯.৫৭
	আদায়	৮.৬৩	৭.৮১	৬.৫৩	৩৭.০৫	৭৮.২৯
	হার (%)	৯৯.০০	৯৯.০০	১০১.০০	১০৭.০০	৯৮.০০
ভূমি মন্ত্রণালয়	বিতরণ	৬.৭০	৬.৭৯	৬.৬২	৩.৩৭	১৫৭.০৬
	আদায়	৬.০৯	৬.৩৯	৬.২৫	২.৯৪	১২১.৮৫
	হার (%)	৯০.৯০	৯৪.১১	৯৪.৪১	৮৭.২৪	৭৭.৫৮
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড					
	বিতরণ	৪.০৪	৪.১০	৩.৬০	১.৫০	৭৪.৪৬
	আদায়	৩.৪২	৪.২৩	৩.২৫	২.৩৮	৫৪.০৬
	হার (%)	৬৭.৮৯	৭০.২৫	৭০.৭০	৭১.৭৫	৭১.৫৭
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর					
	বিতরণ	১০২.৬৪	১২১.৯৭	১৩৮.৮১	৮৪.৩১	১৮০৩.৪০
	আদায়	৯৯.২৯	১০৯.৯৩	১১৭.১৬	৭৭.০৭	১৫৬৫.০৯
	হার (%)	৯৬.৭৪	৯০.১২	৮৪.৪০	৯১.৪১	৮৬.৭৮
কৃষি মন্ত্রণালয়	তুলা উন্নয়ন বোর্ড					
	বিতরণ	১.২৩	১.২৭	১.৩৪	১.৫৬	১৬.০৫
	আদায়	১.২৮	১.৩৪	১.৪১	-	১৫.১৪
	হার (%)	১০৪.৪৬	১০৪.৯২	১০৪.৫৯	-	৯৪.৩৩

জাতীয় উন্নয়ন ও নারীর সামাজিক নিরাপত্তা : জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা।[১০৬] একটি আধুনিক সমাজে নারী-পুরুষের পৃথক পৃথক অবদানের কথা চিন্তা করা যায় না। পরিবার, সমাজ, বাইরের কর্ম জগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে অধিকার আদায়ে নারীকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হচ্ছে।[১০৭] পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক অবক্ষয়, উগ্র ও মৌলবাদ এবং অশিক্ষার কারণে নারী তার প্রাপ্য অধিকার ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[১০৮] আর্থ-সামাজিক পরিবেশ এখনো নারীর জন্য প্রতিকূলে। নারী হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত সে সহিংসতার শিকার হচ্ছে। নারীর প্রতি সহিংসতায় প্রতি বছর ক্ষতি হয় জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইনে শাস্তির বিধান আছে। এরপরও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। গৃহে ৭৯ শতাংশ নারী

১০৬. Francine Pickup, Suzanne Williams & Caroline Sweetman, *Ending Violence against Women : A Challenge for Development and Humanitarian Work*(UK : Oxfam Publishing, 2001), p. 11

১০৭. Lyn Bates, *Safety for Stalking Victimes, How to Save Your Privacy, Your Sanity & Your Life*(New York : Incubation Press, 2013), p. 56

১০৮. Mary Ellsberg Lori Heise & Megan Gottemoeller, *Ending Violence against Women*(Maryland : Department of Health, Johns Hopkins University, 1999), Vol. 27, Issue 4, p. 1

Dhaka University Institutional Repository

শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার শিকার। নারীর প্রতি সহিংসতার বর্বর উদাহরণ তনু, মিতু, রূপা, নুসরাতসহ আরো অনেক নাম; যা প্রকাশিত হয় কাগজের পাতা ভরে আর যা রয়ে যায় অগোচরে।

নারীরা সমাজে দুইভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। একদিকে সামগ্রিকভাবে সমাজের যে বিন্যাস সেক্ষেত্রে নিপীড়িতদের একজন হিসেবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, অন্যদিকে কেবল নারী হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত তাকে নানা নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হতে হয়, যাকে লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বলা হয়।[১০৯] নারীর উপর এই নির্যাতনসমূহ সংঘটিত হয় রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগতভাবে। গণমাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যমতে দেখা যায় ২০১৭ সালে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার নারীর সংখ্যা ১৩০৬। এর মধ্যে ধর্ষণের শিকার নারী সবচেয়ে বেশি। ধর্ষণ ৬১ শতাংশ, গণধর্ষণ ২০ শতাংশ ও ধর্ষণের চেষ্টা ১৯ শতাংশ নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নির্যাতনের শিকার নারীদের মধ্যে ৫ বছরের থেকে শুরু করে ৬৫ উর্ধ্ব নারীরাও রয়েছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২ থেকে ১৮ বছর বয়সের অর্থাৎ কন্যা ৬৪ শতাংশ। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে বা কন্যাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, তাদের শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্পূর্ণ বিকাশ লাভের পূর্বেই এমন নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে যার কারণে সে পরবর্তী স্বাভাবিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বয়সের বিবেচনায় বৃদ্ধ নারীরাও আজ নিরাপদ নয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু থেকে সব বয়সের নারীরা বিভিন্ন বয়সের পুরুষের দ্বারা নানাবিধ লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

নারী হওয়ার কারণে সকল বয়সের নারীদেরকেই নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ২ বছরের শিশুর প্রতি সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি ৭৫ বছরের নারীর প্রতি সমাজের একই দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছে। তবে নির্যাতনের ধরন অনুযায়ী বয়সের পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন, বাস্তবচিত্রে দেখা যায়, ধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা– এ ধরনের নির্যাতনের ক্ষেত্রে ১৮ বছরের কমবয়সী কন্যা নির্যাতনের শিকার বেশি হয়ে থাকে; শতকরা হারে যা ৮৬ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ কন্যা ১০ থেকে ১৩ বছর বয়সের, তাদের সংখ্যা বেশি। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১০-১৩ বছরে ৩৩ শতাংশ এবং ধর্ষণের চেষ্টার ১০-১৩ বছর বয়সে ১৭ শতাংশ। গণধর্ষণের শিকার ৩১ শতাংশ কন্যা। অন্যদিকে প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ১৮-২২ বছর বয়সে ৫৭ শতাংশ নারী ধর্ষণের শিকার হয় এবং ১৮-২৭ বছর বয়সের মধ্যে ২৪ শতাংশ নারী গণধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন ১৮-২৭ বছর বয়সের নারী, যার শতকরা হার ৮ শতাংশ। বাস্তবচিত্রে দেখা যায়, বয়সে যারা তরুণী তারাই ধর্ষণের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে বেশি। যা তাদের সুস্থ, সুন্দর, নিরাপদ ও স্বাভাবিক মানসিক বিকাশের জন্য খুবই ক্ষতিকর এবং উদ্বেগজনক।[১১০]

বিশেষত ধর্ষণ ও গণধর্ষণের মত জঘন্যতম অপরাধের শিকার হতে হচ্ছে ৩ বছর বয়সের শিশুদের, যারা যৌনতা বুঝা তো দূরের কথা ঠিকমত কথাও বলতে শিখেনি। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০১৭ সালে ২-৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৬ জন, ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে ২২ জন এবং গণধর্ষণের মত বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১ জন। এখানে কতজন শিশু অর্থাৎ নির্যাতনের শিকার শিশুর সংখ্যা বড় কথা নয়। বরং মুখ্য বিষয় হলো, এত অল্প বয়সেই একটি শিশু লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ বয়সী শিশুদের একা পেয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে নিজ ঘরে

---

১০৯. Sharmeen A. Farouk, *Violence Against Women : A Statistical Overview, Challenges and gaps in Data Collection and Methodology and Approaches for Overcoming Them*(Geneva : WHO, 2005), pp. 20-25

১১০. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি* ২০১৩(ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৪), পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে। প্রতিবেশী বা আত্মীয় দ্বারাই সাধারণত এ বয়সের শিশুরা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে যা শিশুর অভিভাবক কখনও চিন্তাও করতে পারে না। এ বয়সের শিশুদের শারীরিক গঠনও ঠিকমত হয় না, ফলে তারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এছাড়া কিশোরীরা ধর্ষণের মত নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। কারণ কিশোরীরা যৌন হয়রানির শিকার হয়ে লজ্জা, সংকোচ ও ভয়ে এবং সামাজিকভাবে হেয় হয়ে যাওয়ার আশংকায় প্রতিবাদ করতে পারে না বা অভিভাবক, শিক্ষক কারো কাছে সে কথা বলতে পারে না। ফলে উত্যক্তকারী প্রশ্রয় পেতে থাকে যৌন হয়রানি থেকে তখন তা ধর্ষণের মত জঘন্য পর্যায়ের অপরাধে রূপ নেয়।

উল্লেখ্য যে, পেশার ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ অনেক সময় মত প্রকাশ করে যে, নারীসমাজ যত বহির্মুখী হবে ততই তাদের নির্যাতনের শিকার হওয়ার ঘটনা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নারীর পেশা বিশ্লেষণে দেখা যায় গৃহবধুরা বেশি ধর্ষণ (৪৭ শতাংশ) ও গণধর্ষণের (৫২ শতাংশ) শিকার হয়ে থাকে কর্মজীবী নারীর তুলনায়। সুতরাং নারীর ঘরের বাইরে বের হওয়া বা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়ার কারণই যে ধর্ষণের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ তা বিবেচনা করা যায় না। নারীর এ বহির্মুখী সামাজিক রূপ দেখার জন্য সমাজকে অভ্যস্ত হতে হবে আর সে জন্যই নারীকে আরও বহিঃঅঙ্গনের কর্মকাণ্ড ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতিটি শিশু নির্যাতন ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠবে, এটি তাদের অধিকার। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, বাংলাদেশে যারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, তাদের অধিকাংশই কন্যা। কন্যারা দুর্বল হওয়ায় সহজেই তারা পুরুষের শিকারে পরিণত হচ্ছে। কন্যার ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় যে, তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাওয়া-আসার পথে বা ভিতরেই প্রতিবেশী তরুণ, সহপাঠী বা শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়।[১১১]

নির্যাতনের শিকার নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিবেচনায় দেখা যায়, ধর্ষণ ও গণধর্ষণের উভয় ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যারা বেশি নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে এবং কন্যাদের মধ্যে বেশিরভাগ পড়ে স্কুল পর্যায়ে ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীতে। সংবাদ মাধ্যমের প্রাপ্ত তথ্য মতে ১ম-৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪১ শতাংশ কন্যা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে, যা খুবই উদ্বেগজনক। একটি শিশুর উপর যৌন নির্যাতন করা মানে তাকে ভবিষ্যতে অন্ধকারে ঠেলে দেয়া। এ ঘটনা বড় হওয়ার সাথে সাথে তার উপর নানা রকমের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। রাষ্ট্র ও পরিবারের সহযোগিতা না পেলে সে ধীরে ধীরে মানসিক রোগীতে পরিণত হয়।[১১২] আর যে ঘটনা তার সাথে ঘটেছে ভবিষ্যত জীবনে তা আতঙ্ক হিসেবে দেখা দেয়।

পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বয়স বিবেচনা করে বলা যায়, সকল বয়স ও পেশার নারীরা নির্যাতনের শিকার হলেও একটি নির্দিষ্ট বয়সের নারীরা যারা পেশায় ছাত্রী এবং বয়স তুলনামূলকভাবে কম তারাই বেশি নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কন্যার ক্ষেত্রে ছাত্রীরা অধিক হারে ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। কিশোরীদের এ বয়সটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ বয়সে তারা প্রকৃতিগতভাবেই বিভিন্ন রকম শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। এর মধ্যে যখন তারা এ রকম ধর্ষণের মতো ঘটনার সম্মুখীন হয় তখন তার প্রভাব তাদের মনোজগতে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তাদের এবং তদের অভিভাবকদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয় যা বাল্যবিবাহের একটি অন্যতম প্রধান কারণ। প্রায় দেখা যায় উপজেলা পর্যায়ে এ সকল ঘটনা বেশি ঘটছে। এর কারণ হয়তো গ্রাম, উপজেলা এলাকার নারীর উপর ধর্ষণের ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ে, কিন্তু জেলা শহর বিশেষ করে

---

১১১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮ নং আইন); নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (৩০ নং আইন)
১১২. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র :* ২০১৭(ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৮), পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

মেট্রোপলিটন এলাকায় সংঘঠিত ধর্ষণের ঘটনা গোপন করে রাখার একটা প্রয়াস থাকে। সে কারণে হয়তো সংবাদপত্রের রিপোর্টে তা স্বল্পই প্রকাশিত হয়। যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ দলবদ্ধ সমাজ। সকলেই সকলের পরিচিত– আপনজন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার নারী ও ধর্ষক উভয়ে উভয়ের পরিচিত হয় ফলে এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা গোপন থাকে না। এছাড়াও বর্তমানে গণমাধ্যম কর্মীরা বিশেষ করে নারীর মানবাধিকার লংঘনের সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন। এ কারণে প্রত্যন্ত অঞ্চলের নারী নির্যাতনের সংবাদ জাতি পত্রিকার পাতায় পূর্বের তুলনায় বেশি করে দেখতে পায়।

ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের চেষ্টা– এ তিনটিতেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী বা কন্যা ধর্ষণের শিকার হয় পরিচিত মানুষজন বা প্রতিবেশী দ্বারা। এ ক্ষেত্রে বেশির ভাগই মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে, প্রেমের প্রস্তাব বা বিয়ের প্রস্তাবে রাযি না হওয়ায় বা কোনো কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেয়ার কারণে নারী বা কন্যারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে। চিহ্নিত সন্ত্রাসী বা বখাটেদের দ্বারা ধর্ষণের ঘটনা অধিক সংখ্যক ঘটে থাকে। এ সন্ত্রাসী ও বখাটেদের মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সব ধরনের ক্ষমতাবান ব্যক্তি। নারী বা কন্যা ধর্ষণের শিকার হয় আত্মীয়-স্বজন দ্বারা, যেখানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চাচা-মামার মত আপনজন ও নিকটাত্মীয়। এ সমস্ত ব্যক্তি দ্বারা ধর্ষণের শিকার হলে তা অপ্রকাশিতই থেকে যায়। পারিবারিক ও সামাজিক কারণে তা গোপন রাখা হয়। সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক, লজ্জাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে থাকে যখন কন্যা তার শিক্ষক দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে ১৩ শতাংশ এবং ধর্ষণের চেষ্টার ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ কন্যা শিক্ষক দ্বারা নির্যাতনের শিকার। ১৬ শতাংশ নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক নারী প্রেমিক দ্বারা ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছে, যা সর্বাধিক। অন্যদিকে প্রেমিক দ্বারা ১২ শতাংশ নারী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী মিথ্যা প্রেমের প্রলোভন, মোবাইল ফোন বা ফেসবুকের পরিচয়ের সূত্র ধরে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির অপব্যবহার, শিক্ষায়তনেও সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার ও খেলাধুলার ব্যবস্থা না থাকায় ঝুঁকে পড়ছে নানা নেশায়, যা তাদের চরিত্র গঠনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়াও রাজনৈতিক প্রভাবও কখনও কখনও এসব নির্যাতনের ক্ষেত্রে ভয়ানক প্রভাব ফেলছে।[১১৩]

ধর্ষণের শিকার নারীর বয়স ও ধর্ষকের বয়সের তথ্য বিবেচনা করলে যে চিত্র ফুটে উঠে তা হলো এ সমাজে নারীর পরিচয় যেন একটিই, তা হচ্ছে সে নারী; মানুষ নয়। বাস্তবে দেখা যায়, ধর্ষণকারী পুরুষের ৪৩ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় অর্ধেকের বয়স ১১-২৫ বছর এবং অন্যদিকে ধর্ষণের শিকার নারীর ৫৪.৬৩ শতাংশ-এর বয়স ২-২৫ বছর। গণধর্ষণের ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ নারীর বয়স ১৬-৩০ বছর, যা খুবই উদ্বেগজনক।[১১৪] তরুণরাই আগামীর ভবিষ্যৎ, উন্নয়নের বাহক। তরুণ প্রজন্মের একটি বিরাট অংশ ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এবং অপরদিকে ধর্ষণ-এর মত জঘন্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে এই তরুণ প্রজন্ম।

অভিযুক্তদের পেশাগত দিক বিবেচনা করে দেখা যায় ধর্ষকের পেশা বিষয়ক তথ্য সংবাদপত্রের পাতায় খুব একটা পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে শিক্ষক দ্বারা ২৫ শতাংশ এবং ধর্ষণের ক্ষেত্রে তা ৩৭ শতাংশ, যা খুবই উদ্বেগজনক এবং ভয়ঙ্কর। কেননা বাস্তবে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে কন্যাশিশু যারা মূলত ছাত্রী। অপরদিকে অভিযুক্তের পেশায় সবচেয়ে বেশি রয়েছে শিক্ষক। পিতামাতার পরে শিক্ষকরা মানুষ তৈরির কারিগর। আর সেখানেই কন্যাশিশুরা সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ। অন্যদিকে, প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, নারীরা গণপরিবহনে

---

১১৩. www.legal-dictionary.thefreedictionary.com/sexualharrasement, visited on 09.05.2018
১১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র : ২০১৭*(ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৮), পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

চলাচল করতে গিয়ে গণধর্ষণের মত বর্বর নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। আবার পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ, বিভিন্ন ধরনের অঙ্গভঙ্গি, কটুক্তিসহ নানা ধরনের যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন, যা বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেকটাই বেশি। এ সময়কালে নারীরা পরিবহন চালক দ্বারা সবচেয়ে বেশি গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন, যার হার হচ্ছে ১১ শতাংশ। সহজেই বুঝা যায় গণপরিবহন অর্থাৎ গণপরিসর নারীদের জন্য নিরাপদ নয়। প্রয়োজনের খাতিরে গণপরিবহনের যাত্রী হয়ে প্রতিদিন অসংখ্য নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। রূপার মত আরও অনেকেই এ রকম বর্বর সহিংসতার শিকার হয়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে অদক্ষ, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নেশাগ্রস্ত গণপরিবহন চালক ও হেলপার দ্বারা। এ সব ঘটনা গণমাধ্যমে তেমন একটা প্রকাশিত হয় না। যদিও পেশা সংক্রান্ত তথ্য খুব একটা বেশি পাওয়া যায় না তারপরও যা পাওয়া যায় তা বিবেচনা করলে দেখা যায় সকল ধরনের পেশার লোক এ অপরাধের সাথে যুক্ত রয়েছে।[১১৫] আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ডাক্তার, শ্রমিক ইত্যাদি। নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পেশা বা শিক্ষা তেমন প্রভাব ফেলে বলে মনে হয় না।

অভিযুক্তদের পেশা ও বয়স বিবেচনা করে দেখা যায় যে, বয়সে তরুণরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষণের মত বর্বর নির্যাতনে অভিযুক্ত যা সমাজের জন্য একটি উদ্বেগের কারণ। যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ সমাজকে অগ্রসর করে নিয়ে যাবে তারাই সমাজের সবচেয়ে জঘন্য অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছে। তরুণদের মধ্যে কেন এ বিকৃত মানসিকতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং কি ধরনের হতাশা বা সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তাদেরকে এ রকম জঘন্য অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা গুরুত্ব সহকারেই ভাবার প্রয়োজন আছে।[১১৬]

ধর্ষণ পরবর্তী প্রভাব বিবেচনা করে দেখা যায়, শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সব ধরনের প্রভাব পড়ছে। নারীর উপর ধর্ষণ পরবর্তী চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে গিয়ে অর্থদণ্ড দিতে হচ্ছে। আবার কোনো নারী ধর্ষণের ফলে অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়ায় তার উপর শারীরিক প্রভাবের পাশাপাশি মানসিক ও সামাজিক প্রভাবও পড়ছে। এখানে লক্ষ্যণীয় যে ধর্ষণ বা গণধর্ষণের শিকার নারী বা কন্যার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী এবং নারীর নিজস্ব ট্রমা তাকে এমন অসুস্থ করে তোলে যে অনেক সময় তার আচরণে আত্মহত্যার মত চরম প্রতিক্রিয়াও ঘটে। এ প্রভাবগুলো শিশুদের উপরই বেশি পড়ে। ধর্ষণের কারণে অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুটি অন্তঃস্বত্ত্বা হওয়ার ফলে লোকলজ্জার ভয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করছে। কখনও তাকে ধর্ষকের সাথে বিয়ে দেয়া হচ্ছে। শিশুটি হয়ত এখন কিছু বুঝতে পারছে না, তবে বড় হওয়ার সাথে সাথে তার উপর নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে থাকে। নারী নির্যাতনের প্রভাব কেবল যে নির্যাতনের শিকার নারীর উপর পড়ে তা নয়; বরং সমগ্র পরিবারকে পরবর্তী সারা জীবন সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক দণ্ড দিতে হয়।

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার নারী বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সে তুলনায় বাড়েনি অভিযুক্তদের শাস্তি প্রাপ্তি বা ন্যায়বিচার পাওয়ার সংখ্যা। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রভাবশালীদের প্রভাবের কারণে সঠিক বিচারের রায় হয়তো অনেক সময় পাওয়া যায় না। আবার মামলা হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত শাস্তি পায় না, এমনকি গ্রেফতারও হয় না, কখনও গ্রেফতার হলেও প্রভাবশালী মহল এসে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। এ কারণে অভিযুক্তরা পুনরায় একই অন্যায় করতে দ্বিধা বোধ করে না, যা নারীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথে প্রধান অন্তরায়।[১১৭]

---

১১৫. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র : ২০১৭*(ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৮), পৃ. ১৮

১১৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (৫৮ নং আইন)

১১৭. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও বিভিন্ন নারী সংগঠনের সহায়তায় ও উদ্যোগে এ সকল মামলাগুলি কোর্ট পর্যন্ত যাচ্ছে। তবে এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্ষণের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ পূর্বের তুলনায় যদিও বৃদ্ধি পেয়েছে; তবুও বিচারহীনতার কারণেই ধর্ষণের ঘটনাগুলো আরও বেশি হচ্ছে। ধর্ষণকারী আমাদেরই কারো সন্তান, আত্মীয়, স্বামী বা পিতা বা ভাই। শৈশব থেকেই যেন পরিবারের ছেলে সন্তানটি নারীকে সম্মান করার শিক্ষাটি পরিবার থেকে পায়। নারীকে ভোগের বস্তু হিসেবে না ভেবে, অধীনস্ত না ভেবে যদি সমপর্যায়ের ভাবতে শিখে, নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য দিতে শিখে তাহলে সে কখনও ধর্ষণকারী হয়ে উঠবে না। এ ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শুধু ধর্ষণের ঘটনার ক্ষেত্রেই নয় যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের আত্মীয়-স্বজন কি ধরনের ভূমিকা রাখছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অভিযুক্ত পুনরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাবে কিনা তা যেমন যথার্থ বিচারের উপর নির্ভর করে একইভাবে তার প্রতি পরিবারের ইতিবাচক বা নেতিবাচক ভূমিকার উপর নির্ভর করে। অভিযুক্তের আত্মীয়-স্বজনরা শাসনের মাধ্যমে, কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে, সুশিক্ষা বা আইনের আশ্রয় নেয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের পেক্ষাপটে দৃশ্যত দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনরা অভিযোগ শিকার না করে নারীকেই দোষারোপ করে বা ভয়ভীতি ও হুমকি প্রদর্শন করে।

প্রকৃতপক্ষে ধর্ষণের বিচার সালিশে হয় না। এটি একটি ফৌজদারি অপরাধ। অনেক ক্ষেত্রে সালিশের মাধ্যমে নামে মাত্র শাস্তি দেয়া হয় যেখানে অভিযুক্ত যথোপযুক্ত শাস্তি পায় না। এ ব্যবস্থা নারীর জন্য অসম্মানজনক। সালিশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচারে ধর্ষকের কাছ থেকে জরিমানা আদায় করা হয় অথবা ধর্ষকের সাথে নির্যাতিতা নারীর বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়।[১১৮]

অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতনের ঘটনা যখন ঘটে তখন সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ, নারী এবং সামাজিক ও মানবাধিকার সংগঠনকে দেখা যায় ঘটনার প্রতিবাদ করতে। এমনকি প্রতিরোধ বা বাধা প্রদান করতে গিয়ে অনেক সময় তারা নিজেরাও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়– অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দেখা যায় অভিযুক্তের পক্ষ নিতে। তবে নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণে যে পরিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায় তা হলো– নারী নির্যাতন বিরোধী সচেতনতা যার প্রতিফলন দেখা যায় নারী নির্যাতনের ঘটনায় স্থানীয় প্রতিক্রিয়া যা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নারী নির্যাতনের ঘটনায় এ সকল সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকা পালনের হারই বেশি এবং এটি সম্ভব হয়েছে নারী এবং মানবাধিকার সংগঠন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর দীর্ঘ সংগ্রাম ও কার্যক্রমের ফলে।

বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতনের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার হয়। যেমন– সম্পত্তি আত্মসাৎ, পারিবারিক শত্রুতার জের ধরে, ঈর্ষা, রাগ, টাকার লোভ, শত্রুতা কিংবা যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ– এ সকল কিছুরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে নারীকে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে বা হত্যার মাধ্যমে। ধর্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশির ভাগ সময়ই যৌন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য অভিযুক্ত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। স্কুল, কলেজ বা মাদরাসায় যাতায়াতের পথে, বাড়িতে একা থাকার সুযোগে, গণপরিবহনে একা পেয়ে, দীর্ঘদিন বা প্রায় উত্যক্তকরণের পরবর্তীতে ধর্ষণ, বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে নিজ ঘরে ডেকে নিয়ে, প্রেম বা বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে, কুপ্রস্তাবে রাযি না হওয়ায়, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে গণধর্ষণ প্রভৃতি। কন্যাদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় শিশুরা স্কুল, কলেজ বা অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের পথে অথবা দিনের পর দিন উত্যক্তকারীদের বা স্থানীয় বখাটেদের দ্বারা উত্যক্ত হওয়ার পর ধর্ষণের শিকার হয়। আবার স্কুলের ভিতর বা প্রাইভেট পড়তে গিয়ে শিক্ষক কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। আবার কখনও কন্যাকে বাড়িতে একা থাকায়

১১৮. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮ নং আইন); নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (৩০ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করে, কখনও গভীর রাতে শৌচাগারে যাওয়ার পথে ধর্ষণ করে। কন্যাদেরও বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ করে।[১১৯]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, নারী নির্যাতনের ধরনগুলো সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে প্রযুক্তি ব্যবহার করে, নারীকে শুধু উত্ত্যক্ত বা ধর্ষণ করেই ঘটনার ইতি টানা হচ্ছে না; বরং ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইলিং করা হচ্ছে বা পুনরায় একই কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে বা পর্নোগ্রাফি তৈরি করে ব্যবসা করা হচ্ছে। আর এর শিকার হচ্ছে কিশোর বয়সীরা যারা জীবন শুরু করার পূর্বেই ট্রমার মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাছাড়াও ভয়াবহ ও উদ্বেজনক বিষয় হচ্ছে অপরাধীর বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্ম। যারা আগামী দিনের সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়ী না হয়ে একটি অসুস্থ মানসিকতার শিকার হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায়, বাস্তবে বাংলাদেশের তরুণ সমাজের চিন্তা-চেতনায় কোন প্রকারের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে তাও আমাদের গভীর বিবেচনায় নিতে হবে। পরিবার ও গোটা সমাজ রাষ্ট্রকে যৌন নির্যাতন মুক্ত করতে তারুণ্য শক্তি, সাহস ও মেধাকে জনশক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সর্বোপরি, নীরবতা ভেঙ্গে পরিবার ও সমাজের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিচর্চায়, গণমাধ্যমে, সুশীলসমাজের নৈতিক বিতর্কে এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক অঙ্গীকারে নারীর প্রতি সহিংসতা নিরসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও বহিঃপ্রকাশ কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে, তাহলে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

১১৯. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮ নং আইন); নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (৩০ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশুর নিরাপত্তা অবস্থা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়ই জীবন গঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকাল হলো শিক্ষা লাভ, জীবন সম্পর্কে জানা ও ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার উপযুক্ত সময়। কবির ভাষায় 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'[১২০] সমাজে শিশুকে শিশু মনে না করে তাকে মানুষ মনে করে তার সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারের নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় গৃহীত পদক্ষেপের আলোকে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাই পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে শিশুর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করা আবশ্যক। শিশুর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর ব্যবস্থা, সমতাভিত্তিক সুযোগ প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে শিশুসহ নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে শিশুদের জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সংবিধানে এতসব প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার সন্নিবেশিত থাকলেও শিশুর নিরাপত্তা সুরক্ষায় একক কোনো আইন ছিল না। এরূপ পরিস্থিতি বিবেচনা করেই শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করা ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রণীত হয় শিশু আইন, ১৯৭৪।[১২১] এ আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য পরবর্তীতে জাতীয় শিশুনীতি, ১৯৯৪ ও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও জাতিসংঘ কর্তৃক শিশু অধিকার সনদ, ১৯৯০ গৃহীত হয় এবং বাংলাদেশ উক্ত সনদের অন্যতম অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র। এছাড়াও বাংলাদেশে বিদ্যমান বিধিবদ্ধ আইন যথা– দেওয়ানি কার্যবিধি, ফৌজদারি কার্যবিধি, পারিবারিক আইন, দণ্ডবিধি, শ্রম আইন, সন্ত্রাসবিরোধী আইন, এসিড অপরাধ দমন আইন, প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, নাগরিকত্ব আইনগুলোতেও শিশু নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কিত বিধিবিধান রয়েছে।

উপরোক্ত আইনগুলোতে শিশুর বয়স, শিশুর সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ রয়েছে। আইনের এ ভিন্নতা শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকার সুরক্ষার পথে কখনো কখনো অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। বাংলাদেশে পূর্বে প্রণীত শিশুনীতিকে যুগোপযোগী করে শিশুনীতি, ২০১১ ও পূর্বের শিশু আইন রহিত করে শিশু আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।[১২২] তাই শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা ও অধিকারের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিশু সম্পর্কিত অন্য আইনগুলোর যথাযথ সংস্কার ও এর ব্যবহার এবং শিশুবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা।

বাংলাদেশে শিশু কারা : শিশু সুরক্ষায় জাতিসংঘ প্রণীত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ দলিল শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে প্রতিটি মানবসন্তানই শিশু।

১২০. নাসির হেলাল, *গোলাম মোস্তফা সমগ্র* ১(ঢাকা : সুহৃদ প্রকাশন, ২০০৫), খ.১, পৃ. ২৫৮
১২১. The Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974) [Repealed]
১২২. শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে শিশুর ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আইনের নামসহ শিশুর বয়স উল্লেখ করা হলো :

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ ১৪ বছর পূর্ণ হয়নি এমন সকল মানবসন্তানকে শিশু এবং ১৪ বছর পূর্ণ করেছে কিন্তু ১৮ বছর পূর্ণ করেনি এমন সকল মানবসন্তানকে কিশোর বলা হয়েছে।[১২৩]
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ ও সংশোধিত, ২০০৩-এ ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত যে কোনো মানবসন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১২৪]
- বাংলাদেশ শিশু আইন, ২০১৩-এ ১৮ বছরের কম বয়সের যে কোনো মানবসন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।[১২৫] তবে রহিতকৃত শিশু আইন, ১৯৭৪-এ শিশুর বয়স ১৬ বছর নির্ধারণ করা হয়েছিল।[১২৬]
- বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে ছেলের বয়স ২১ এবং মেয়ের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হলে তাকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়।[১২৭]
- চুক্তি আইনে বলা হয়েছে, ১৮ বছর বয়সের কম কোনো ব্যক্তি চুক্তি করতে পারবে না। এ আইনে ১৮ বছরের কম বয়সের মানবসন্তানকে শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।[১২৮]
- জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ অনুযায়ী শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

উপরোক্ত ৭টি আইনের মধ্যে ৫টি আইনেই শিশুর বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদেও শিশুর বয়স ১৮ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশে শিশু বলতেই ১৮ বছরের নিচে সকল মানবসন্তানকে বুঝানো হয়।

বাংলাদেশে শিশুর নিরাপত্তায় কী কী আইন রয়েছে : বাংলাদেশে শিশুর স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার্থে ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন পাস হয়। কিন্তু আইনটি বর্তমান সময়ের তুলনায় অপর্যাপ্ত বলে বাংলাদেশ সরকার উক্ত আইনটি রহিত করে ২০১৩ সালে নতুনভাবে শিশু আইন পাস করে। এ আইনটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি একদিকে যেমন শিশুর কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে, পাশাপাশি আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য নমনীয় ও সংশোধনমূলক বিচার ব্যবস্থারও বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮, দণ্ডবিধি ১৮৬০, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ (সংশোধিত) ও বাংলাদেশ সংবিধান এবং সন্ত্রাসবিরোধী আইনে (সংশোধিত ২০১৩) শিশু অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন বিধান রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ, জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শিশু অধিকার সনদ ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও)-এর অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্র যা শিশুদের অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিদ্যমান আইনে শিশু স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘটিত কোন অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য : শিশু আইন, ২০১৩-এ শিশুর নিরাপত্তা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘটিত কতিপয় কাজকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাস্তিযোগ্য অপরাধের না ও শাস্তি নিচে উল্লেখ করা হলো :

কোনো ব্যক্তি যদি–

১২৩. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*(ঢাকা : ইউনিভার্সেল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ২৭, ৩৬

১২৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮ নং আইন); নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (৩০ নং আইন)

১২৫. শিশু আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৪ নং আইন)

১২৬. The Children Act, 1974 (Act No. XXXIX of 1974) [Repealed]

১২৭. বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৬ নং আইন)

১২৮. এ.বি. সিদ্দিক, *চুক্তি আইন*(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১), পৃ. ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

(ক) তার হিফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা শিশুকে আঘাত, উৎপীড়ন, অবহেলা, বর্জন, অরক্ষিত অবস্থায় পরিত্যাগ বা অন্য কোনো অমানবিক নির্যাতন করেন, তবে তিনি অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১২৯]

(খ) কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করলে সে ক্ষেত্রে অপরাধী ব্যক্তি অনধিক ৫ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ড প্রাপ্ত হবেন।[১৩০]

(গ) শিশুর দেখাশুনার দায়িত্বে থাকাকালে কোনো ব্যক্তিকে যদি প্রকাশ্য স্থানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এ কারণে যদি তিনি শিশুটির যথাযথ তত্ত্বাবধান করতে অসমর্থ হন, তাহলে তিনি অনধিক ১ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩১]

(ঘ) কোনো শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী মাদকদ্রব্য বা জীবনহানিকর ঔষধ প্রদান করলে তিনি অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ লক্ষ টাকার অর্থ দণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩২]

(ঙ) কোনো শিশুকে মাদক বা বিপজ্জনক ঔষধ বিক্রয়ের স্থানে নিয়ে যান অথবা এরূপ স্থানের স্বত্তাধিকারী, মালিক বা দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি কোনো শিশুকে অনুরূপ স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি অনুরূপ স্থানে কোনো শিশুর গমণের কারণ সৃষ্টি করেন, তাহলে তিনি অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩৩]

(চ) কোনো ব্যক্তি মৌখিকভাবে, লিখিত শব্দ দ্বারা, কোনো প্রকার ইঙ্গিত দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে কোনো শিশুকে বাজি ধরতে বা পণ রাখতে বা কোনো বাজি বা পণভিত্তিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে বা শেয়ার নিতে উস্কানি প্রদান করেন বা প্রদানের চেষ্টা করেন অথবা অনুরূপ কোনো শিশুকে ঋণ গ্রহণ করতে বা ঋণ গ্রহণমূলক লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে উস্কানি প্রদান করেন, তাহলে তিনি অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড অতবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩৪]

(ছ) কোনো ব্যক্তি কোনো শিশুর নিকট থেকে কোনো দ্রব্য, তা উক্ত শিশুর পক্ষ থেকে বা অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রদেয় হোক না কেন, বন্ধক গ্রহণ করলে তিনি অনধিক ১ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ হাজার টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩৫]

(জ) চার বছরের বেশি বয়সের কোনো শিশুকে যৌনপল্লীতে বাস করতে কিংবা যাতায়াত করার সুযোগ করে দেয়া হলে বা অনুমতি প্রদান করা হলে, এসব কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনধিক ২ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকার অর্থদণ্ড অথবাা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।[১৩৬]

(ঝ) কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শিশুর দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র বা অবৈধ ও নিষিদ্ধ বস্তু বহন বা পরিবহন করান, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে তিনি অনধিক ৩ বছরের কারাদণ্ড বা অনধিক এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।[১৩৭]

---

১২৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *শিশু আইন, ২০১৩ (২৪ নং আইন)*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৩), নবম অধ্যায়, ধারা ৭০, পৃ. ৪০
১৩০. প্রাগুক্ত, ধারা ৭১, পৃ. ৪০
১৩১. প্রাগুক্ত, ধারা ৭২, পৃ. ৪০
১৩২. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৩, পৃ. ৪০
১৩৩. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৪, পৃ. ৪০-৪১
১৩৪. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৫, পৃ. ৪১
১৩৫. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৬, পৃ. ৪১
১৩৬. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৭, পৃ. ৪০
১৩৭. প্রাগুক্ত, ধারা ৭৯, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে শিশুকে বেআইনি কাজে ব্যবহার রোধে অপরাধীর শাস্তির পাশাপাশি এ আইনে আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

শিশু আইন, ২০১৩-এ শিশুর নিরাপত্তা সুরক্ষায় কতিপয় বিধান : বিদ্যমান শিশু আইনে শিশুর নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্য কিছু মাইলফলক বিধান সংযুক্ত করা হয়েছে। এগুলো হলো :

- শিশুদের জন্য নমনীয় ও সংশোধনমূলক বিচার ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক জেলায় শিশু আদালত গঠন।
- জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিশু কল্যাণ তহবিল গঠন।
- প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে একজন পুলিশ অফিসারের নেতৃত্বে শিশু বিষয়ক ডেস্ক তৈরি।
- একজন প্রবেশন কর্মকর্তা থাকবেন যিনি থানা, শিশু আদালত এবং শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র যখন যেখানে প্রয়োজন শিশুকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

শিশুদের অপরাধী হিসেবে গণ্য করার বয়স : বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩-এ বলা হয়েছে– ৯ বছরের নিচের কোনো শিশুকে কোনো অবস্থায় গ্রেফতার বা আটক করা যাবে না। ৯ বছরের বেশি কোনো শিশুকে গ্রেফতার বা আটক করা হলে হাতকড়া বা কোমরে দড়ি পরানো যাবে না। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতেও উল্লেখ আছে, ৯ বছরের নিচে সকল মানবসন্তানকে নিষ্পাপ শিশু হিসেবে গণ্য করা হবে। এছাড়াও কোন কাজটি অপরাধ– এ বিষয়ে যদি শিশুর বোধশক্তি তৈরি না হয়, তাহলে ৯ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর করা কোনো কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ঠিক তেমনি কোনো অপরাধের ফলাফল বুঝার মত বোধশক্তি না থাকলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না।

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের বিচারের বিধান : কোনো ধরনের সংঘাতে জড়িত শিশু বা অপরাধের সংস্পর্শ আসা শিশুর ক্ষেত্রে বিচার বা শাস্তি নমনীয় ও সংশোধনমূলক হয়ে থাকে। শিশুদের বিবেক, বুদ্ধি বা নৈতিকতাবোধ স্বভাবতই অপরিপক্ক হয়ে থাকে। তাই শিশুদের দ্বারা সংঘটিত যে কোনো অপরাধ অনিচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ঘটে বলে ধরা হয়ে থাকে অর্থাৎ দোষী মন বা মানসিক সায় এ ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে।[১৩৮] সেজন্য কোনো ধরনের সংঘাতে জড়িত শিশু বা অপরাধের সংস্পর্শে আসা শিশুদের নৈতিক ও চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে সুনাগরিক হয়ে সমাজে বসবাসযোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য নমনীয় শাস্তি প্রদান ও সংশোধনমূলক কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখা হয়।

শিশু আইন, ২০১৩-এ আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের জন্য আলাদা শিশু আদালত রয়েছে। অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতকে শিশু আদালত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতিরিক্ত দায়রা জজ এরূপ আদালতের বিচারক হিসেবে নিয়োজিত থাকেন। কোনো ধরনের সংঘাতে জড়িত শিশু বা অপরাধের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিরুদ্ধে মামলা থাকলে, যে কোনো আইনের অধীনেই হোক না কেন ঐ মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু আদালতের থাকবে। শিশু অপরাধী ও প্রাপ্ত বয়স্ক অপরাধীকে এক সাথে কোনো অপরাধের দায়ে অভিযোগপত্রভুক্ত (চার্জশিট) করা যাবে না এবং যে কোনো মামলায় শিশুর জামিনের বিধান রাখা হয়েছে। শিশু আদালত শিশুর প্রথম উপস্থিতির তারিখ থেকে ৩৬০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।[১৩৯] তবে যুক্তিযুক্ত কারণসাপেক্ষে উক্ত মেয়াদ

---

১৩৮. সম্পাদনা পরিষদ, *আইনের কথা*(ঢাকা : আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ডিসেম্বর ২০১৩), পৃ. ৪

১৩৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *শিশু আইন, ২০১৩ (২৪ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পঞ্চম অধ্যায়, ধারা ৩২।(১), পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ানো যাবে। এ আইনের অধীনে বিচারাধীন কোনো মামলা বা বিচার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রিন্ট বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা ইন্টারনেটে শিশুর স্বার্থের পরিপন্থী এমন কোনো প্রতিবেদন, ছবি বা তথ্য প্রকাশ করা যাবে না, যার দ্বারা শিশুকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শনাক্ত করা যায়।

শিশুর উপর নির্দিষ্ট কতিপয় দণ্ড আরোপে বিধি-নিষেধ : বিদ্যমান অন্য আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো শিশুকে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ড প্রদান করা যাবে না। তবে কোনো শিশু যখন মারাত্মক ধরনের অপরাধ সংঘটিত করে যা আদালতের মতে, এ আইনে প্রদানযোগ্য আটকাদেশ পর্যাপ্ত নয় অথবা আদালতের কাছে যদি প্রতীয়মান হয় শিশুটি এত বেশি অবাধ্য বা ভ্রষ্ট চরিত্রের যে, তাকে কোনো কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র বা অন্য কোনো প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে পাঠানো যথেষ্ট নয়, তাহলে শিশু আদালত শিশুটিকে কারাদণ্ড প্রদান করে কারাগারে প্রেরণ করবেন। তবে এরূপ সাজা ভোগের কালে যে কেনো সময় শিশু আদালত উপযুক্ত মনে করলে কারাগারে আটক রাখার পরিবর্তে অপরাধী শিশুর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র বা প্রত্যয়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করতে পারেন।

আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা : শিশুর সর্বোত্তম নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচারের সকল পর্যায়ে আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, বয়স এবং পরিপক্কতার বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এরই লক্ষ্যে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুবান্ধব পরিবেশে শিশুর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করবে।[১৪০] এছাড়া শিশু আদালত নিম্নোক্ত এক বা একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন–

(ক) আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুর বিচার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য গোপন রাখবে যেন উক্ত শিশুকে শনাক্ত করা না যায়।

(খ) সাক্ষ্য প্রদানকারী শিশুর ছবি বা দৈহিক বিবরণ গোপন করার জন্য আদালত নিম্নরূপভাবে সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন। যেমন– (১) পর্দার আড়ালে; (২) শুনানির পূর্বে শিশু সাক্ষীর ভিডিওকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে; (৩) রুদ্ধদ্বার অধিবেশন পরিচালনার মাধ্যমে।[১৪১]

বাংলাদেশে শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় অন্যান্য বিধি-বিধান : শিশু আইন ছাড়াও বাংলাদেশে আরও আইন, বিধি ও নীতিমালা রয়েছে, যেগুলো শিশুর অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে কয়েকটি আইনের শিশু সম্পর্কিত বিধানগুলো উল্লেখ করা হলো :

(১) **বাংলাদেশ সংবিধান :** সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ১৭-এ বলা হয়েছে, শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদ ২৮-এ শিশুর স্বার্থে যে কোনো কল্যাণমুখী আইন ও নীতি প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে এবং অনুচ্ছেদ ৩৪-এ শিশুসহ সকল নাগরিককে জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিয়োগ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(২) **বাংলাদেশ দণ্ডবিধি ১৮৬০ :** দণ্ডবিধির ৮২ ধারা অনুযায়ী ৯ বছরের কম বয়স্ক শিশু দ্বারা সংঘটিত কোনো অপরাধই অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ৮৩ ধারা অনুসারে কোন কাজটি অপরাধ এ বিষয়ে যদি শিশুর বোধশক্তি তৈরি না হয়, তাহলে ৯ বছরের বেশি এবং ১২ বছরের কম বয়সের শিশুর করা কোনো কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে না। ঠিক তেমনি

১৪০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *শিশু আইন, ২০১৩ (২৪ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, চতুর্থ অধ্যায়, ধারা ১৪, পৃ. ১৪-১৫
১৪১. সম্পাদনা পরিষদ, *আইনের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

কোনো অপরাধের ফলাফল বুঝার মত বোধশক্তি না থাকলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হবে না। দণ্ডবিধির ৩৬১ ধারা অনুসারে যদি কেউ ১৪ বছরের কম বয়সের কোনো ছেলে বা ১৬ বছরের কম বয়সের কোনো মেয়েকে তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া ছিনিয়ে নিয়ে যায় বা প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যায়, তবে তা শিশু অপহরণ বলে গণ্য হবে। দণ্ডবিধির ৩৬৪(ক) ধারা অনুসারে যদি কোনো ব্যক্তি ১০ বছরের কম বয়সের কাউকে অপহরণ করে এবং তার উদ্দেশ্য থাকে তাকে খুন বা গুরুতর আঘাত করা বা দাসত্বে বাধ্য করা বা পাশবিক নির্যাতন করা, তাহলে সে ব্যক্তির শাস্তি হতে পারে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অর্থদণ্ডও হতে পারে। দণ্ডবিধির ৩৭২ ধারা অনুসারে, কোনো শিশুকে পতিতালয়ে বিক্রি করলে তার শাস্তি ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড হতে পারে।[১৪২]

(৩) **দেওয়ানি কার্যবিধি ১৯০৮ :** দেওয়ানি কার্যবিধির ৩২ নং আদেশের ১-৫ বিধি অনুযায়ী নাবালকের পক্ষে কোনো ব্যক্তি মামলা দায়ের করতে পারে। উক্ত ব্যক্তিকে নাবালকের অভিভাবক হিসেবে গণ্য করা যাবে। কোনো মামলার বিবাদী যদি নাবালক হয়, বাদীর আবেদনক্রমে নাবালকের একজন অভিভাবক নিয়োগ করা যাবে। নাবালকের কোনো অভিভাবক না পাওয়া গেলে আদালত তার কোনো কর্মচারী বা আইনজীবীকে নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করতে পারে। এসব অভিভাবককে কোর্ট গার্ডিয়ান বলা হয়।[১৪৩]

(৪) **জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ :** শিশুর সার্বিক নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণ, সব ধরনের নির্যাতন প্রতিরোধ ও বৈষম্য নিরসন এবং দারিদ্র্য বিমোচন এ নীতির উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১ প্রণীত হয়েছে। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– শিশু কল্যাণ নিশ্চিত করা, বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ নীতিতে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ :

- শিশুর সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- শিশুর বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর) ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- শিশুর জন্য মানসম্পন্ন বিনোদন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- সব ধরনের সহিংসতা থেকে শিশুর সুরক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর ও জন-সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।
- প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- অটিস্টিক শিশুর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

(৫) **সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতন বন্ধে হাইকোর্টের নির্দেশ :** শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও মনন বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবারের পরই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু শিক্ষকদের আচরণ ও অমানসিক শাস্তি প্রদান শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভীতির

১৪২. The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860)
১৪৩. The Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908)

Dhaka University Institutional Repository

জায়গা হিসেবে পরিণত হয়। শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকদের এরূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতাকে চ্যালেঞ্জ করে আইন ও সালিশ কেন্দ্র ও ব্লাস্ট যৌথ উদ্যোগে ২০১০ সালে একটি রিট পিটিশন দায়ের করে। এরই প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক ২০১১ সালে মাদরাসাসহ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে মাদরাসাসহ দেশের সকল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের এ ধরনের শাস্তি প্রদান শাস্তিযোগ্য অপরাধ এ মর্মে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিত করা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১১ প্রণয়ন করেছে।

(৬) **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) :** যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনিভাবে বা নীতি গর্হিত উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে বিদেশ থেকে দেশে নিয়ে আসে বা বিদেশে পাঠায় বা পাচার করে কিংবা ক্রয় বা বিক্রয় করে বা উক্তরূপ কোনো উদ্দেশ্যে কোনো শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হিফাজতে রাখে, তাহলে উক্ত লোক মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। যদি কোনো নবজাতক শিশুকে হাসপাতালে শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হিফাজত থেকে চুরি করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ধর্ষণের কারণে কোনো সন্তান জন্মলাভ করলে সে তার পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার অধিকারী হবে এবং ঐ সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে। সন্তানের এ ভরণপোষণের অর্থ সরকার ধর্ষকের কাছ থেকে আদায় করবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ থেকে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হলে সে ভবিষ্যতে যে সম্পদের অধিকারী হবে সে সম্পদ থেকে তা আদায়যোগ্য হবে।[১৪৪]

(৭) **বাংলাদেশ শ্রম আইন :** বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী একজন রেজিস্ট্রার্ড চিকিৎসক কর্তৃক সনদ প্রদান না করলে কোনো পেশায় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো শিশু বা কিশোরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।[১৪৫] এছাড়া যথাযথ প্রশিক্ষণের মধ্যমে দক্ষতা অর্জন ছাড়া কোনো শিশুকে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কোনো কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না। উক্ত শিশু বা কিশোরের মধ্যে যদি কেউ বিদ্যালয়গামী হয়, তাহলে তার কর্মসময় এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তাদের বিদ্যালয়ে যেতে বাধার সৃষ্টি না হয়।

(৮) **বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন : ১৯২৯** সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ৫ ধারা অনুসারে ১৮ বছরের নিচে মেয়ে এবং ২১ বছরের নিচে ছেলের মধ্যে বিয়ে হলেই তা বাল্যবিবাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এরূপ বাল্যবিবাহের শাস্তি হচ্ছে এক মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা কারাদণ্ড ও জরিমানা দু'টি একসাথে হতে পারে। যিনি শিশুর বিয়ে দেয়ার আদেশ দেন অথবা অনুমতি প্রদান করেন তিনি শাস্তি ভোগ করবেন এবং যারা উক্ত বিয়ে সম্পাদনের কাজে সহায়তা করেন ও জড়িত থাকেন তারাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবে।[১৪৬]

(৯) **সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯ :** সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো তাদের রাজনৈতিক হীনস্বার্থ চরিতার্থের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণির শিশুদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অপব্যবহার আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পায়। শিশুদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার

---

১৪৪. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (৮ নং আইন); নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (৩০ নং আইন)

১৪৫. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭, ৩৬

১৪৬. The Child Marriage Restraint Act, 1929 (Act No. XIX of 1929) [Repealed]

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্টভাবে শিশু আইন ও জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের পরিপন্থী। শিশুদেরকে এরূপ ব্যবহার আমলযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[১৪৭]

(১০) **বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ :** শারীরিক ত্রুটির কারণে কোনো ব্যক্তিকে সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। তাই যেসব শিশুর শারীরিক অক্ষমতা রয়েছে, তাদের শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উপযুক্ত পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া এসব শিশুর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে বাধাহীনভাবে চলাচলের জন্য ঢালু ও বাঁকানো রাস্তা, সিঁড়ি এবং র‍্যাম্প নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা এ আইনে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪৮]

(১১) **নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ :** নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১-এ কোনো বাংলাদেশি নারী বিদেশি পুরুষকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করত না। কিন্তু ২০০৯ সালে এ আইনের সংশোধনী এনে নবজাতকের পিতা বা মাতা যে কোনো একজন বাংলাদেশি হলে নবজাতক জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হবে। এ সংশোধনীর ফলে বাংলাদেশি কোনো নারী বিদেশি কোনো পুরুষকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান জন্মসূত্রে বাংলাদেশি হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দূর হয়েছে।[১৪৯]

(১২) **আইনে শিশুর অভিভাবকত্ব ও ভরণপোষণ :** মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী শিশুর অভিভাবকত্ব দু'ধরনের– স্বাভাবিক বা আইনগত অভিভাবক এবং আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক। শিশুর পিতা তার স্বাভাবিক বা আইনগত অভিভাবক হিসেবে গণ্য হয় এবং মাতা তার সন্তানের জিম্মাদার হিসেবে গণ্য হয়।[১৫০] হিন্দু পারিবারিক আইন অনুযায়ী শিশুর অভিভাবক চার প্রকারের, যথা– স্বাভাবিক অভিভাবক, বাবা কর্তৃক উইল দ্বার নিযুক্ত অভিভাবক, এডহক অভিভাবক ও আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিভাবক।[১৫১] শিশুর আইনগত অভিভাবক হলেন পিতা। পিতা জীবিত না থাকলে সন্তানের অভিভাবক হবেন মাতা। পিতা উইল কর্তৃক কাউকে অভিভাবক নিযুক্ত করলে তিনি উইল দ্বারা নিযুক্ত অভিভাবক হিসেবে বিবেচিত হবেন। এছাড়া অভিভাবকত্ব ও প্রতিপালন আইন অনুযায়ী যখন কোনো শিশুর পিতামাতা থাকে না, সেসব ক্ষেত্রে আদালত শিশুর নিকটবর্তী আত্মীয়দের মধ্য থেকে একজনকে অভিভাবক নিযুক্ত করে থাকে। অভিভাবক নিযুক্তির ক্ষেত্রে আদালত সন্তানের সর্বাধিক কল্যাণ বিবেচনা করেন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরাও এ আইন অনুযায়ী শিশুর অভিভাবকত্ব নির্ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশের শিশুদের আর্থিক নিরাপত্তা : শিশুদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সম্পর্কে নিচে তুলে ধরা হলো :

অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা : অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা আগের বছরের চেয়ে ৫.৪৫ লক্ষ জন বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ জন করা হয়েছে। জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হারে এই ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ বাবদ মোট ১৩৯০.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৫২]

---

১৪৭. সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সালের ১৬ নং আইন)
১৪৮. বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ১২ নং আইন) [রহিত]
১৪৯. নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯
১৫০. মোহাম্মদ মজিবর রহমান, *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*(ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১), পৃ.১০০-১০৯
১৫১. ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ, *বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অধিকার ও পারিবারিক আইন*(ঢাকা : উৎস প্রকাশন, ২০০৯), পৃ. ৮৭
১৫২. সমাজকল্যান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট ২০১৯-২০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি : প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছর থেকে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১.০০ লক্ষ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল ০.৯০ লক্ষ জন। এছাড়া চলতি অর্থবছর থেকে মাসিক উপবৃত্তির পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে জনপ্রতি প্রাথমিক স্তরে মাসিক ৭৫০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৯০০ টাকা হারে মাসিক উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।[১৫৩] এ জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৯৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৫৪] এছাড়া প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিচালিত বিশেষ বিদ্যালয়গুলোর জন্যও মঞ্জুরি প্রদান করা হচ্ছে। চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় ২৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) : দেশের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে ফিজিওথেরাপি ও অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে প্রথমবারের মত প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র চালু করা হয়। এ খাতে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ৩.৭৬ লক্ষ জন প্রতিবন্ধীকে সহায়তার লক্ষ্যে ৬৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।[১৫৫]

অটিজম : 'নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩' এর আওতায় একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ট্রাস্টের মাধ্যমে অটিস্টিক শিশুদের সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়। চালু হওয়ার পর থেকে এ কেন্দ্র থেকে অটিস্টিক শিশু ও ব্যক্তিকে বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।[১৫৬]

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহে নিবাসীদের খোরাকি ভাতা : সরকার সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বসবাসরত এতিম শিশুদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসব প্রতিষ্ঠানে নিবাসী শিশুদের খোরাকি ভাতা হিসেবে ৬৩.৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৫৭]

বেসরকারি এতিমখানার ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টস : সরকারি এতিমখানার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত এতিমখানায় বসবাসরত এতিম শিশুদের কল্যাণে সরকার সহায়তা করে থাকে। ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টস হিসেবে এ অনুদান প্রদান করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে ১.০০ লক্ষ এতিম শিশুর জন্য ১২০.০০ কোটি টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্টস হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে।[১৫৮]

অতি দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১৪ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচনের বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া উন্নয়নেও পিকেএসএফ কাজ করছে।[১৫৯]

---

১৫৩. অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৯), পৃ. ৫৮

১৫৪. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৫৫. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

১৫৬. প্রাগুক্ত।

১৫৭. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট* ২০১৯-২০, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

১৫৮. প্রাগুক্ত।

১৫৯. অর্থ বিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে শিশু নিরাপত্তার বর্তমান অবস্থা : ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে মোট ২ হাজার ১৫৮টি শিশু বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যাদের মধ্যে ৯৮৮ জন শিশু বিভিন্ন ধরনের অপমৃত্যু এবং ৭২৬ জন শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম-এর পক্ষ থেকে এক জরিপ রিপোর্টে এ তথ্য দেয়া হয়েছে। শিশু অধিকার বিষয়ে কাজ করে এমন ২৬৯টি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন বা এনজিওসমূহের এটি একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক। বিএসএএফ শিশু অধিকার বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির সদস্য হিসেবেও সরকারের সাথে তারা কাজ করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তথ্য বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য দেয়া হয়।

এতে বলা হয়, ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে উল্লেখযোগ্য শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো হলো হত্যা, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু, যেমন– পানিতে ডুবে, সড়ক দুর্ঘটনায়, নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া, পিতামাতার হাতে নিহত হওয়া এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পিটিয়ে নির্যাতন।

পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট থেকে আরো জানা যায় যে, ২০১৮ সালের তুলনায় ২০১৯ সালের প্রথম ছয় মাসে দেশে শিশু ধর্ষণ বেড়েছে ৪১ শতাংশ হারে, যা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বছরের প্রথম ছয় মাসে ধর্ষণের শিকার হয়েছে ৪৯৬টি শিশু। যেখানে কিনা গত বছরের প্রথম ছয় মাসে এই সংখ্যা ছিল ৩৫১টি। এপ্রিল এবং মে এই দুই মাসেই শিশু ধর্ষণ হয়েছে ২৪১টি যা কিনা মোট ধর্ষণের অর্ধেকেরও বেশি। এ ৪৯৬টি ধর্ষণ হওয়া শিশুর মধ্যে ৫৩টি শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং ২৭টি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে এবং ২৩ জন শিশুকে ধর্ষণের পরে হত্যা করা হয়েছে।[১৬০]

এই ছয় মাসে ২০৫টি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে যার মধ্যে ১৮টি শিশু পিতামাতার হাতে হত্যার শিকার হয়েছে। এছাড়াও এ সময়ে ১২০টি শিশু অপহরণ হয়েছে এবং ৭২টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। অপহরণ হওয়া শিশুদের মধ্যে ৬১টি শিশুকে অপহরণের পর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর দ্বারা জীবিত উদ্ধার করা গেছে; কিন্তু নিখোঁজ হওয়া শিশুদের মধ্যে ২৪টি শিশুকে মৃত বা হত্যা করা অবস্থায় পাওয়া গেছে।

এ ছাড়াও জানুয়ারি থেকে জুন এ সময়কালে সড়ক দুর্ঘটনায় এবং পানিতে ডুবে যথাক্রমে ২৮৬ এবং ১৯৪টি শিশু নিহত হয়েছে, ৯৩টি শিশু আত্মহত্যা করেছে এবং ২৭টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি বা নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে শিশু অধিকার ফোরামের পক্ষ থেকে রিপোর্ট জানানো হয়েছে।

সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শিশুদের জীবনে প্রভাব ফেলছে যে কারণগুলো : বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। এখানে বাস করে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর ৪০ শতাংশ শিশু অর্থাৎ ৬ কোটিরও বেশি শিশু। আয়তনের দিক থেকে নিউইয়র্ক শহরের সমান হলেও বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে একটি। বাংলাদেশের স্থল সীমানায় আছে ভারত ও মিয়ানমার। এর ভূখণ্ডের উপর দিয়ে বয়ে যায় প্রায় ৭০০টি নদী, যা প্রবাহিত হয় দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম বদ্বীপ এবং সবচেয়ে উর্বর অঞ্চলগুলোর একটি।

মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলগুলো সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে বাংলাদেশ এখন স্থায়ী উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করেছে। কমিয়ে আনা হয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লিঙ্গগত বিভাজন এবং মায়েদের ও পাঁচ বছরের ছোট শিশুদের মৃত্যুহার। উন্নত করা হয়েছে পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশনের খাত। অর্জিত হয়েছে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতি পোষাতে হচ্ছে বাংলাদেশের। দুর্যোগের প্রভাবে শিশুদের মৃত্যু হয় প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় অনেক বেশি। তারা আহত ও অসুস্থও হয়ে পড়ে বেশি।

---

১৬০. আলমগীর মহিউদ্দিন, *দৈনিক নয়া দিগন্ত*(ঢাকা : শামসুল হুদা, ২ জুলাই ২০১৯), পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে ফসলের জমি নষ্ট হয় এবং নিরাপদ পানির উৎস কমে যায়। ঘনঘন বন্যা বা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় মানুষ ও তাদের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করে দেয়। গ্রামের মানুষ হারাতে বসে তাদের পরিবার, পশুপাখি, ঘরবাড়ি ও কাজের সুযোগ।

গ্রামবাসীরা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয় এবং পাড়ি জমায় শহরে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের ঠাঁই হয় বস্তিগুলোতে, যেখানে নেই মানবিক মৌলিক চাহিদাগুলো মিটানোর মত পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। বিগত দুই দশক ধরে বাংলাদেশে নগরায়ন দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে। দুর্যোগের পাশাপাশি গ্রামের মানুষ কাজের সন্ধানে শহরে আসে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ও অন্যান্য শহরগুলোতে এখন প্রায় ৫ কোটি মানুষের বসবাস। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মতে আরও ৩০ বছর পর মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই বাস করবে শহরে।

বাংলাদেশ সরকার অনেক দ্রুততার সাথে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মৃত্যুহার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু নবজাতকদের মৃত্যুহার বৃদ্ধি এই সফলতাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নবজাতক বা এক মাসের কম বয়সী শিশুর মৃত্যুর উচ্চ হারের দিক থেকে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ একটি। পুষ্টিহীনতার কারণে বয়সের অনুপাতে বেঁটে থেকে যাওয়াকে খর্বকায়ত্ব বলা হয়। পূর্বের তুলনায় এই খর্বকায়ত্ব কমিয়ে আনার হারহ্রাস পেয়েছে।[১৬১]

সকলের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এখনও সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশে অনেক সংখ্যক মানুষ মলমূত্র বা আর্সেনিক দ্বারা দূষিত পানি পান করে। স্যানিটেশন ব্যবস্থার অনেক উন্নতি সাধিত হলেও অনেকেই সুরক্ষিত টয়লেট ও হাত ধোয়ার সুবিধা পাচ্ছে না। জন্ম থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত পৌঁছানোর মধ্যে সময়টুকু শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পিতামাতা প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের নিয়মগুলোর সাথে সম্যক অবহিত নন। এর সাথে জড়িত আছে পুষ্টি, শিক্ষা, বিনোদন এবং শিশুর শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা–সুরক্ষা।

যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক চিকিৎসক ছোট শিশুদের প্রতিবন্ধীতা সনাক্ত করতে পারেন না। কিন্তু সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে এর প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এছাড়া যে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার বয়স হয়েছে, তাদের অনেকেই উচ্চ মানের শিক্ষা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে কিশোরী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের আওতায় টয়লেট সুবিধা নেই। এ বয়সী শিশুদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায় না, তাদের বেশিরভাগ শিশুর বাস শহরের বস্তিগুলোতে অথবা দুর্গম বা দুর্যোগপ্রবণ এলাকায়।

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর হার প্রশংসনীয় গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে ঝরে পড়ে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী। মেয়ে শিশুরা নিরাপত্তার অভাব এবং যৌন হয়রানির ভয়ে মাঝে মধ্যে পড়ালেখা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থায় এখনও অনেক ঘাটতি রয়েছে।

বাংলাদেশের ১৭ লক্ষ শিশু জড়িত আছে শিশু শ্রমের সাথে।[১৬২] প্রতি চার জনের এক জনের বয়স ৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে। এদের বেশির ভাগই ছেলে শিশু। স্বল্প আয়ের পরিবারের মেয়ে শিশুরা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে থাকে এবং তাদের সঠিক সংখ্যা জানাও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সাথে সাথে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার পূর্বের তুলনায় অনেক কমেছে; কিন্তু সমাজে এই প্রথাটি এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। বিবাহিত কিশোরীরা প্রায় পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে।[১৬৩]

কিশোর-কিশোরীদের সংখ্যার হারের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে একটি। বয়ঃসন্ধিকাল পেরোচ্ছে এমন শিশুদের কাছে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় জ্ঞান পৌঁছে দিতে হবে এবং তাদের

১৬১. https://www.unicef.org/bangladesh/বাংলাদেশের শিশু, visited on 10.05.2019
১৬২. https://www.prothomalo.com/economy/article/740929, visited on 01.05.2019
১৬৩. Board of Editors, *Report on Child Labour Survey (CLS) Bangladesh 2013*(Dhaka : BBS, 2015), p. 32

Dhaka University Institutional Repository

বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা তাদের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। দেশের উন্নয়নের নীতিমালায় কিশোর-কিশোরীদের কথা ও অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের কার্যক্রমে তাদের কার্যকরী অংশগ্রহণ থাকতে হবে। শিশু অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। শিশু বা শিশু অপরাধীদের নিয়ে গণমাধ্যমের প্রতিবেদনগুলোতে সংবেদনশীরতার প্রকট অভাব রয়েছে। এ ধরনের কাজ শিশু বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রভাব ফেলে বলেই মিডিয়াগুলোর সচেতন থাকা প্রয়োজন।

শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রয়োজন জরুরি বিনিয়োগ। এর আওতায় আনতে হবে প্রতিবন্ধী শিশুদের; যাদের উপর তথ্য সংগ্রহে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান সেবাগুলো সম্পর্কে পরিজ্ঞাত নন।

বাংলাদেশে শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি : বাংলাদেশের ছয়টি জাতীয় দৈনিকের শিশু বিষয়ক সংবাদগুলো পর্যালোচনা করলে ২০১৮ সালের বাংলাদেশের শিশু পরিস্থিতির একটি চিত্র অঙ্কিত করা যায়। বছরান্তে পুরো বছরের তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে 'মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন' বলছে, ২০১৮ সালে শিশুদের নিয়ে ১,০৩৭টি ইতিবাচক সংবাদের বিপরীতে ২,৯৭৩টি নেতিবাচক সংবাদ ছিল। প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২০১৮ সালে ধর্ষণের শিকার হওয়ার মোট ৩৪৫টি সংবাদের মধ্যে শিশু সংশ্লিষ্ট সংবাদের সংখ্যা ৩৫৬; যার মধ্যে মারা গেছে ২২ জন এবং আহত হয়েছে ৩৩৪ জন। প্রকাশিত সংবাদগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায় শিশুরা প্রতিবেশী, উত্যক্তকারী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কিংবা অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে বেশি। এর মধ্যে উত্যক্তকারী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১০ জন আর প্রতিবেশী দ্বারা ১০২ জন। গণধর্ষণের শিকার ৩৭ জন এবং শিক্ষক দ্বারা ১৭ জন।[১৬৪]

তবে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ধর্ষণ সংক্রান্ত সংবাদের সংখ্যা ও ক্ষতিগ্রস্তের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া বিগত বছরে ৫৩টি শিশু ধর্ষণ চেষ্টার শিকার হয়েছে যাদের প্রত্যেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত হয়েছে।

নিচে ২০১৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ৪ বছরে শিশু নির্যাতনের একটি তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হলো[১৬৫] :

নিরাপত্তাহীনতার ধরন/সাল	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
সড়ক দুর্ঘটনা	৩৫৭	২২১	৪৫২	৫৪৫
ধর্ষণের চেষ্টা	২৯	৪৫	৪৫	৫০
হত্যা ও হত্যা চেষ্টা	৩০৮	২৫৪	২২৪	২৭৬
অপহরণ	৮৯	৫৩	৭২	৯৮
অপরাধে সংশ্লিষ্ট শিশু	১১২	২৫৯	১২৮	৪০১

যৌন নির্যাতন : উপরোক্ত ছকে প্রদত্ত যৌন নির্যাতন ছাড়াও গত বছর ধর্ষণ ছাড়া আরও ৭৭টি শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে এবং এর মধ্যে মারা গেছে একজন। যৌন নির্যাতনের সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম জেলায়।

হত্যা ও হত্যা চেষ্টা : উক্ত ছকে দেখা যাচ্ছে ২০১৮ সালে বাংলাদেশ মোট ২৭৬টি শিশু হত্যা ও হত্যা চেষ্টার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে মারা গেছে ২২৭ জন। এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংবাদ ছিল ঢাকা জেলার। এ জেলায় ৩৭ জন আক্রান্ত হয়েছে আর দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে গাজীপুর জেলা। এ সব ঘটনার কারণ হিসেবে যা বলা যায় তার মধ্যে রয়েছে পারিবারিক কলহ, সম্পদের জন্য প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে, চাঁদা না দেয়া, মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করাসহ বিভিন্ন কারণ।

---

১৬৪. https://www.bbc.com/bengali/news-48083795, visited on 01.03.2019
১৬৫. https://www.unicef.org/bangladesh/, visited on 10.03.2019

Dhaka University Institutional Repository

নিচে বাংলাদেশের বয়সভিত্তিক, জেলাভিত্তিক ও লিঙ্গভিত্তিক শিশুসম্পর্কিত ধর্ষণের তথ্য উল্লেখ করা হলো[১৬৬] :

<table>
<tr><th colspan="7">ধর্ষণ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">বয়সভিত্তিক শিশু সম্পর্কিত তথ্য</td><td colspan="2">১-৬ বছর</td><td>৭-১২ বছর</td><td>১৩-১৮ বছর</td><td colspan="2">উল্লেখিত হয়নি</td></tr>
<tr><td colspan="2">৪৬</td><td>১৩৭</td><td>১৩১</td><td colspan="2">৪২</td></tr>
<tr><td rowspan="2">জেলাভিত্তিক শিশু সম্পর্কিত তথ্য</td><td colspan="2">ঢাকা</td><td>নারায়ণগঞ্জ</td><td>গাজীপুর</td><td colspan="2">চট্টগ্রাম, যশোর</td></tr>
<tr><td colspan="2">৪৪</td><td>৩৫</td><td>২৪</td><td colspan="2">১৩</td></tr>
<tr><td rowspan="3">লিঙ্গভিত্তিক শিশু সম্পর্কিত তথ্য</td><td colspan="2">মেয়ে</td><td colspan="2">ছেলে</td><td colspan="2">উল্লিখিত হয়নি</td></tr>
<tr><td>আহত</td><td>নিহত</td><td>আহত</td><td>নিহত</td><td>আহত</td><td>নিহত</td></tr>
<tr><td>৩২৪</td><td>২১</td><td>১০</td><td>১</td><td>০</td><td>০</td></tr>
</table>

এছাড়াও দেশে ১৭৭টি বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটেছে। সবচেয়ে বেশি হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। আর দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে কিশোরগঞ্জ জেলা।

নির্যাতন ও আত্মহত্যা : ২০১৮ সালে শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৪৬ জন। মূলত প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, বিদ্যালয়ে না যাওয়া, চোর সন্দেহে, আত্মীয়, সৎমা ও সহকর্মীর হাতে নানা কারণে শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। একই সময়ে আত্মহত্যা বা আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে ১৯৭টি এবং এতে প্রাণ হারিয়েছে ১৫২ জন। সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে ঢাকা জেলায় আর দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে রাজশাহী জেলা। এছাড়া ৬ জন এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছে। আর ৩৮ জন পাচার হয়েছে।[১৬৭]

বিচারহীনতাই শিশু নির্যাতনের মূল কারণ : পর্যবেক্ষণে দেখা যায় বাংলাদেশে নির্যাতনের বিষয়টি একটা উদ্বেগজনক ব্যাপার, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি মাতৃ-পিতৃক্রোড়ও শিশুদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। প্রতিটি সূচকেই বিগত বছরগুলোর তুলনায় শিশুর প্রতি নিপীড়ন বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ শিশুদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার চেয়েও আসলে ঘটনা ঘটছে অনেক বেশি। কিন্তু সেগুলো জানা যায় না। কারণ, মানুষ সহজে মামলা করতে চায় না কিংবা পুলিশের কাছে যায় না। অপরাধীদের একটা বদ্ধমূল ধারণা যে, তাদের শাস্তি হবে না। এর সবচেয়ে বড় কারণ বিচারহীনতা। দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার কারণে দোষী ব্যক্তির শাস্তি নিয়ে মানুষের আস্থা নেই। এর জন্য বিচাহীনতা বা দায়মুক্তির সংস্কৃতি বড় বাধা। মূল্যবোধ ও নৈতিকতার অবক্ষয় তো আছেই।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত বাংলাদেশের শিশু : জলাবায়ু পরিবর্তনরে ফলে ২০ জেলার শিশুরা অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ২০টি জেলা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বিপর্যয়, যেমন– ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, প্লাবন, আকস্মিক বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতার ইত্যাদির জন্য সবচেয়ে বড় ঝুঁকির মুখোমুখী রয়েছে। মানচিত্রে দেখা যায়, বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং আরও বেশ কয়েকটি অভ্যন্তরীণ প্রত্যন্ত এলাকা বিশেষত দুর্বল অঞ্চল। নিচের ছকে উক্ত ২০টি জেলার ২০১৮ সালে দুর্যোগ কবলিত অনূর্ধ্ব ৫ বছর ও অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের শিশুদের আনুমানিক সংখ্যা দেখানো হলো[১৬৮] :

দুর্যোগ-প্রবণ জেলাসমূহ	প্রধান ঝুঁকি	অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু	অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী শিশু
ভোলা	ঘূর্ণিঝড়	২২৯,৬৬০	৮৭০,৪০৩
বরগুনা	ঘূর্ণিঝড়	৯৪,৯৩৮	৩৬৫,৭৩০
পটুয়াখালী	ঘূর্ণিঝড়	১৭২,২৬৪	৬৭৪,২০৬
পিরোজপুর	ঘূর্ণিঝড়	১১১,৫৫৫	৪৫২,৫৪৮

---

১৬৬. https://www.unicef.org/bangladesh/, visited on 15.05.2019

১৬৭. মোস্তফা কামাল, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*(ঢাকা : ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুফ লিঃ, ১০ জুলাই ২০১৯), পৃ. ১২

১৬৮. https://www.unicef.org/bangladesh/media/2326/file/ClimatechangeReportBD.pdf, visited on 10.08.2019; UNICEF estimate of child population per district based on results of 2011 National Census

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগ-প্রবণ জেলাসমূহ	প্রধান ঝুঁকি	অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু	অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়সী শিশু
কক্সবাজার	ঘূর্ণিঝড়	৩৭৮,১৫৪	১,৩৯৫,৩৬০
নোয়াখালী	ঘূর্ণিঝড়	৪৫১,৫৪০	১,৭১৮,৮৯৩
বাগেরহাট	ঘূর্ণিঝড়	১৩৩,৮২২	৫৫১,১০৪
খুলনা	ঘূর্ণিঝড়	২০০,১০৫	৮৩১,২৮৭
সাতক্ষীরা	ঘূর্ণিঝড়	১৮৫,২৮১	৭৭২,১১৮
উপমোট : ঘূর্ণিঝড়		**১,৯৫৭,৩১৯**	**৭,৬৩১,৬৪৯**
টাঙ্গাঈল	বন্যা	৩৮৬,০৪০	১,৪৮২,৪২০
ফরিদপুর	বন্যা	২১৯,৬৮৬	৮৬২,৪০১
জামালপুর	বন্যা	২৭৯,৩৪৫	১,০২৫,৫৯৮
সিরাজগঞ্জ	বন্যা	৩৯১,৩১৫	১,৪৪০,৭৭২
রাজশাহী	খরা	২৪৬,৭৬৪	১,০২৭,০৩২
গাইবান্ধা	বন্যা	২৯৩,২৬৯	২৯৩,২৬৯
নীলফামারী	খরা	২৩৯,৬৬২	৮৮৮,৫৫৭
উপমোট : খরা		**২,০৫৬,০৮১**	**৭,০২০,০৪৯**
যশোর	জলাবদ্ধতা	২৭৬,৪১১	১,১১২,৫৩১
উপমোট : জলাবদ্ধতা		**২৭৬,৪১১**	**১,১১২,৫৩১**
নেত্রকোণা	আকস্মিক প্লাবন	৩১৮,৪৬৩	১,১২১,৪১৪
হবিগঞ্জ	আকস্মিক প্লাবন	৩২৬,৫১৭	১,১২৫,৯৯৩
সুনামগঞ্জ	আকস্মিক প্লাবন	৪২৪,২৭৫	১,৪০৮,১৯৪
উপমোট : আকস্মিক প্লাবন		১,০৬৯,২৫৫	৩,৬৫৫,৬০১
সর্বমোট ঝুঁকিতে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা		**৫,৩৫৯,০৬৭**	**১৯,৪১৯,৮২৯**

এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ইউনিসেফ আহ্বান করে যে, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে যে-কোনো দূর্যোগ-পরবর্তী পরিস্থিতি মুকাবিলার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর কাছে নগদ অর্থ এবং মানসম্মত সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পরিসেবাগুলো যেন পৌঁছে যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরনের সেবাসমূহ যেন শহরমুখী পরিবারগুলো– যারা প্রায়শই ঢাকা ও অন্যান্য শহরগুলোতে হারিয়ে যায়– তারা যেন পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি জানুয়ারি-জুন ২০১৮ : ২০১৮ সালের প্রথম ছয় মাসে শিশু নির্যাতনের ঘটনাগুলো হলো : ধর্ষণ, হত্যা, বিভিন্ন দুর্ঘটনায় শিশু মৃত্যু যেমন– সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত, পানিতে ডুবে নিহত, আত্মহত্যা, নিখোঁজ, নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া, অপহরণ, অপহরণের পর উদ্ধার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত, নির্মম পিতা-মাতার হাতে নিহত ইত্যাদি। এগুলো নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো[১৬৯] :

ক্রমিক	শিশু নির্যাতনের ধরন	শিশু নির্যাতনের সংখ্যা
১.	ধর্ষণ	৩১২
২.	হত্যা	২০৩
৩.	সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	৩৪০
৪.	পানিতে ডুবে নিহত	২১৪
৫.	আত্মহত্যা	১৬০

১৬৯. সম্পাদকীয় পরিষদ, *হারানো শৈশব*(ঢাকা : বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, জানুয়ারি-জুন ২০১৮), বর্ষ : ৩, সংখ্যা : ১, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক	শিশু নির্যাতনের ধরন	শিশু নির্যাতনের সংখ্যা
৬.	নিখোঁজ	১২৮
৭.	নিখোঁজ পরবর্তী মৃত অবস্থায় পাওয়া	৫৭
৮.	অপহরণ	৭৯
৯.	অপহরণের পর উদ্ধার	৫৯
১০.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	৬৭
১১.	নির্মম পিতা-মাতার হাতে নিহত	২৫

২০১৮ সালের প্রথম ৬ মাসে শিশু ধর্ষণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। এ সময়কালে ৩১২টি শিশু ধর্ষিত হয়েছে যাদের মধ্যে ৪৯টি শিশুকে গণধর্ষণ করা হয়েছে এবং ১০টি প্রতিবন্ধী শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ১৩ থেকে ১৮ বছরের শিশুরা সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের শিকার হয়েছে। উক্ত সময়ে ১৬০টি শিশু আত্মহত্যা করেছে। যার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই বেশি। আত্মহত্যার কারণগুলো ছিল মূলতঃ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া, কোনো নির্দিষ্ট কিছু কিনতে চেয়ে না পাওয়া এবং পিতামাতার সাথে তুচ্ছ কারণে অভিমান করা। এছাড়া শিশু হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২০৩টি। ৭৯টি শিশু অপহরণ করা হয়েছে এবং ১২৮টি শিশু নিখোঁজ হয়েছে। যার মধ্যে ৫৭টি শিশুকে নিখোঁজ পরবর্তী সময়ে হত্যা করা অবস্থায় লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ২৫টি শিশু নির্মম পিতামাতার হাতে হত্যার শিকার হয়েছে। অপহরণ হওয়া শিশুদের মধ্যে ৫৯টি শিশুকে অপহরণের পর আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। উক্ত সময়কালে সড়ক দুর্ঘটনায় এবং পানিতে ডুবে যথাক্রমে ৩৪০ এবং ২১৪টি শিশু নিহত হয়েছে। এছাড়াও ৬৭টি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে।

এক নজরে ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শিশু নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চিত্র : ২০১৫ সাল থেকে অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে শিশু নিরাপত্তা লঙ্ঘনের চিত্র নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো[১৭০] :

২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে শিশু নিরাপত্তা লঙ্ঘন

শিশু নিরাপত্তাহীনতার ধরন	সাল/বছর				
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
ধর্ষণ	৫২১	৪৪৬	৫৯৩	৫৭১	৯০২
গণধর্ষণ	-	৬৮	৭০	৯৪	৯৫
প্রতিবন্ধী শিশু ধর্ষণ	-	৪২	৪৪	২৮	৩৮
ধর্ষণের চেষ্টা	৭২	৭৪	৭২	৯৬	১২২
ইভ টিজিং	৬১	৫৬	৫১	৪৩	-
বিকৃত মানুষের দ্বারা প্রহার	-	৩৫	৬২	১৮	২৪
যৌন হয়রানি	৭৩	৬০	৯০	৮৭	১৯০
ধর্ষণের পর হত্যা	৩০	২১	২২	৬০	৩৬
ধর্ষণের পর আত্মহত্যা	৪	২	৭	৬	১০
পর্নোগ্রাফির শিকার	-	১৫	২৬	১৫	১৯
হত্যা/নিহত	২৯২	২৬৫	৩৩৯	৪১৮	৩৭১
হত্যার চেষ্টা	২৯	২৬	২২	৯৪	৫১
হত্যার উদ্দেশ্যে প্রহার	-	১৭	১৩	৬	১০
সাংগঠনিক আত্মহত্যা	২২৮	১৪৯	২১৩	২৯৮	১৪৯

১৭০. http://bsafchild.net/, visited on 10.11.2019

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নিরাপত্তাহীনতার ধরন	সাল/বছর				
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
আত্মহত্যার চেষ্টা	১৪	৩	১১	২৩	১৪
অপহরণ	২৪৩	১৮৩	১৭৭	১৫০	১৭৫
অপহরণের চেষ্টা ও প্রতিরোধ	৩৩	২৪	১৪	৭	২৮
অপহরণের পর উদ্ধার	১৬৭	১৩১	৯৮	১৩৬	৮৮
অপহরণের পর হত্যা	৪০	১৭	২৬	৩১	২৮
নিখোঁজ	১৩৬	১৩৩	১৮৮	২৩৩	১১৯
নিখোঁজের পর উদ্ধার	৩	১৮	২০	৫১	৩৬
নিখোঁজের পর মৃত অবস্থায় পাওয়া	৬৭	৪৭	৭৫	৮১	৫৬
পাচার কালে/পরে উদ্ধার	১৪৮	৬০	২৫	৩২	১৬
অজানা নবজাতকের মৃতদেহ পাওয়া	৫২	২৮	২৪	৩৯	৩৮
নবজাতক চুরি	৭	৮	১২	৪	৭
নবজাতক চুরির পর উদ্ধার	৫	৩	৫	৬	৭
অজানা শিশু পাওয়া	২৪	৯	১৭	১৬	১৬
এসিড সহিংসতার শিকার	১৪	৪	৯	১২	৫
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত	৪৮০	২৫২	৩৫৭	৬২৭	৪৯২
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত	১৩৮	৩১	৫৮	৯০	৭৩
অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত	৩৩	২০	২১	৪৫	৫৩
অগ্নিদগ্ধ হয়ে আহত	৪৯	২৩	৩৪	৫১	৬
বিদ্যুৎস্পিষ্ট	৬৩	৫৮	৬৪	৬০	৮৩
পানিতে ডুবে নিহত	৪২৩	৩৫২	৩৯১	৬০৬	৪৭৭
বজ্রপাতে নিহত	৪৪	৬৩	৪৯	৮০	৪৮
বজ্রপাতে আহত	৫৭	২	৪	৪০	৬
ককটেল বোমা বিস্ফোরণে নিহত	৫	২	১	২	-
ককটেল বোমা বিস্ফোরণে আহত	৩৫	৪	২	১	২
রাজনৈতিক সহিংসতায় নিহত	৩	৪	৪	৩	১
রাজনৈতিক সহিংসতায় আহত	৮	৩	৩	১	১
সন্ত্রাসী আক্রমণে নিহত	১৪	-	-	-	১
সন্ত্রাসী আক্রমণে আহত	৭৫	৪	১৩	৩	১
শিশু গৃহকর্মী ধর্ষণ	১১	৬	৭	৫	৫
শিশু গৃহকর্মীর আত্মহত্যা/সন্দেহজনক হত্যা	১৩	১৩	১৩	১০	৮
শিশু গৃহকর্মীর হত্যা	৯	৩১	৫	-	৪
শিশু গৃহকর্মীর উপর শারীরিক নির্যাতন	২২	১৪	১৪	১৬	২২
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক নির্যাতনে আহত	২১৯	২৬৩	১১৮	৮৯	৪৩
নির্মম পিতামাতা কর্তৃত হত্যা	৪০	৬৪	৫০	৫৩	৩৩
নির্মম পিতামাতা কর্তৃক নির্যাতিত	১০	৯	৬	১০	১৩
নির্যাতিত/প্রহৃত	৯০	৯৭	৬৬	১৩৯	১০০
পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত	৫	১	১	৬	২
ভুল চিকিৎসায় নিহত	২০	২০	২২	১৩	১৭
ভুল চিকিৎসায় আহত	৫৮	৩	৩	৩	৬

Dhaka University Institutional Repository

শিশু নিরাপত্তাহীনতার ধরন	সাল/বছর				
	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
চিকিৎসায় অবহেলায় হত্যা	২৮	১০	১৩	৩৩	২৪
জলবাহী দুর্ঘটনায় নিহত	৮৫	৫৫	৩১	৭	১৬
জলবাহী দুর্ঘটনায় আহত	২	১	১৭	২	৯
বিভিন্ন দুর্ঘটনায় নিহত	১৮২	৯৩	১৬৭	১৬০	১১১
বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত	১১২	৯৪	৯১	১১৪	২২
খাদ্যে বিষক্রিয়াতে মৃত্যু	৮৫	১৪	৪	২	২
খাদ্যে বিষক্রিয়াতে অসুস্থ	-	১	১৩	৮৪	৫
ডাকাত, ছিনতাইকারী ও দুর্বৃত্ত কর্তৃক ছুরিকাঘাত	২২	-	১২	৫	৪
বাল্যবিবাহের শিকার	-	১০৫	৬৬	৩৮	১৬
বাল্যবিবাহ থেকে উদ্ধার	-	১৩৯	১৮৬	১৩৪	১১১
শিশু বিক্রি	-	৩	৭	২	৬
শিশু হত্যার রায়	-	৩৬	৪৪	৩১	২৩
শিশু ধর্ষণের রায়	-	২৫	৩২	৫০	২৫
শিশু অপহরণের রায়	-	৩	৬	-	৭
ইভ টিজার/ বিকৃত মানুষের শাস্তি/যৌন নির্যাতন	১১	৪৫	২	৩	৪

মূলত শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। অটুট পারিবারিক বন্ধন, আদর, স্নেহ, ভালবাসা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষা, সংবেদনশীল সমাজ ব্যবস্থা শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য অন্যতম উপাদান। এ সকল উপাদানসমূহের কোনো একটি অথবা একাধিক উপাদানের ঘাটতি শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। পিতামাতা উভয় অথবা পিতা কিংবা মাতার মৃত্যু, পারিবারিক নির্যাতন ও সহিংসতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, সামাজিক ন্যায়বিচারে নারীর প্রবেশাধিকারের সীমাবদ্ধতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ কিংবা দারিদ্র্যের কারণে অপরিকল্পিত অভিবাসন এবং নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে চরম ঝুঁকি সৃষ্টি করে। এ সকল কারণে তার পিতামাতার আদর, ভালবাসা, স্নেহ ও যত্ন বঞ্চিত হয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাসমান কিংবা পথশিশুতে পরিণত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নির্যাতন, যৌন নির্যাতন, শোষণ ও পাচারের শিকার হয়। অথচ সুন্দর ও স্থিতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করতে শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধান করা আবশ্যক। আর এ জন্য সমন্বিতভাবে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রমিকের নিরাপত্তা অবস্থা

সরাসরি শ্রমের বিনিময়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করেন তারাই শ্রমিক। যাদের অসামান্য অবদানে বিশ্বসভ্যতা বিনির্মিত হয়েছে সেসব শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করা উক্ত সভ্যতার ধারা বজায় রাখার স্বার্থেই প্রয়োজন। বাংলার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন,

'হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি;
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরই গান,
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।'[১৭১]

শ্রমজীবী মানুষের কঠোর শ্রমে ও অপরিসীম ত্যাগের ফলেই গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদিক থেকে শ্রমজীবীরাই সত্যিকারের মহৎ মানুষ। শ্রমজীবী মানুষেরাই নবজাগরণের মধ্য দিয়ে বিশ্বে পালাবদলের সূচনা করেছে। কিন্তু সামাজিক জীবনে এরা বঞ্চিত, শোষিত, উপেক্ষিত ও অনিরাপদ। যে সকল মজুর ও শ্রমিক অক্লান্ত পরিশ্রম করে অন্যদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা করছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতটুকু সুরক্ষিত হচ্ছে তা জানা আবশ্যক। নিচে বাংলাদেশের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা অবস্থা উপস্থাপিত হলো :

বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিরাপত্তা অবস্থা

দেশে একটি বহুল প্রচলিত কথা রয়েছে, 'গার্মেন্টস মালিকদের বিরুদ্ধে কথা বলা দেশদ্রোহিতার শামিল।' কারণ, তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তাতে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে শ্রমিকদেরও অনেক অবদান রয়েছে। এ ব্যাপারে পত্র-পত্রিকাগুলোও নীরবতার ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ঢাকা শহরেই কয়েকশত গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠন রয়েছে। বিশ-পঞ্চাশজন নিয়ে মাঝে মধ্যে মিছিল করা ছাড়া তারা আর কোনো দায়িত্ব পালন করে না। শুধু গার্মেন্টস শ্রমিক নয়; সকল বেসরকারি খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অবস্থা খুবই করুণ। এ ছাড়া প্রতিবছর শ্রমবাজারে ১৭ লাখ লোক প্রবেশ করছে। এদের ১০ শতাংশ কোনো রকমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। দুই-আড়াই কোটি বেকারের পদভারে সারা দেশ আজ প্রকম্পিত।[১৭২] যাদের কর্মসংস্থান হয়েছে তারাও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ পাচ্ছে না।

শিশু শ্রমিকের নিরাপত্তা : শ্রম আইনের ধারাগুলিতে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে শিশুদের নিয়োগের ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী দরিদ্র। দারিদ্র্য নিরসনের জন্য অথবা পরিবারকে সামান্য সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনেক অভিভাবকই শিশুদেরকে তাদের বয়স সম্পর্কে বিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ক সমস্যার সমাধান না করে ও তাদের সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র না নিয়ে বিভিন্ন শ্রমে নিয়োজিত করে।[১৭৩] অপরপক্ষে কর্তৃপক্ষ অধিক মুনাফার আশায় অল্প পারিশ্রমিকে এসব শিশুশ্রমিকদের কর্মে নিয়োগ করেন। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ

১৭১. সম্পাদনা পরিষদ, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯
১৭২. আবুল আসাদ, *দৈনিক সংগ্রাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ, ৬ অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ১৫
১৭৩. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬(ঢাকা : ইউনিভার্সেল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ৬৪-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে অনেক শিশু বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়। সরকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা ঘোষণা ও কতিপয় বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু-কিশোরদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে। তারপরও দেখা যায় বাংলাদেশের শিশুরা এসব কাজে নিয়োজিত রয়েছে এবং আইনের আলোকে কিশোর শ্রমিকের জন্য নির্ধারিত কর্মঘন্টাও যথারীতি অনুসরণ করা হয় না।

শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশের শ্রম আইনে রয়েছে, সাধারণভাবে যেখানে ৫০ জনের অধিক শ্রমিক কর্মরত রয়েছে সেখানে শ্রমিকদের ব্যবহার উপযোগী উপযুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত বিশ্রামাগার বা আশ্রয় কক্ষ থাকতে হবে। তাতে খাবার পানির ব্যবস্থাসহ একটি খাবার ঘর থাকতে হবে। যাতে শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে আনীত খাবার ঐ ঘরে বসে খেতে পারে।[১৭৪] কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ব্যবস্থা রাখা হয় না। যে কারখানায় সাধারণভাবে ২৫ জনের অধিক নারী শ্রমিক কর্মরত আছেন সেখানে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক বিশ্রাম কক্ষের ব্যবস্থা থাকতে হবে। সাধারণত চল্লিশ বা ততোধিক নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাদের অনধিক ছয় বছর বয়স্ক সন্তানদের ব্যবহারের উপযুক্ত শিশু কক্ষ বা কক্ষসমূহ থাকতে হবে। উক্ত কক্ষে অবশ্যই পর্যাপ্ত স্থান ও আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উক্ত কক্ষ অবশ্যই স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হবে এবং শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেখানে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাকে নিযুক্ত করতে হবে।[১৭৫] কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠানে এসব আইন মান্য করা হয় না।

যে সব কারখানায় ৫০ বা ততোধিক সংখ্যক শ্রমিক কর্মরত আছেন সেখানে অবশ্যই নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট পন্থায় সেইফটি কমিটি গঠন ও তাকে কার্যকর করতে হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠানে ৫০০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিযুক্ত রয়েছেন সেসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শ্রমিক কল্যাণ অফিসার নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে এরূপ কমিটি ও কল্যাণ অফিসার দেখতে পাওয়া যায় না।

১৯৬৫ সালের কারখানা আইন চালু হওয়ার পর কারখানাসমূহ পরিদর্শনের জন্য ১৯৭০ সালে মাত্র ২০৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে 'কারখানা পরিদর্শক' প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর জনবল মাত্র ২২৬ জন। এর মধ্যে নিরাপত্তা বিধিসমূহ দেখাশোনার জন্য প্রকৌশলী রয়েছেন মাত্র ১১ জন। তার মধ্যে পুরো ঢাকা বিভাগের গার্মেন্টেসসহ কলকারখানার নিরাপত্তা পরিদর্শনের দায়িত্বে মাত্র ৪ জন প্রকৌশলী। ফলে এ ৪ জনের পদধূলি পড়েনি এমন ফ্যাক্টরি ও কারখানার সংখ্যাই অসংখ্য। দেশজুড়ে এ প্রতিষ্ঠানের মাত্র যে ৪৮ জন পরিদর্শক রয়েছেন, তারাই যতটা সম্ভব কারখানাগুলো পরিদর্শন করেন। শ্রমিকদের নিরাপত্তা ছাড়াও স্বাস্থ্য, কাজের পরিবেশ, ছুটি, বেতন-ভাতাসহ শ্রম আইনে প্রদত্ত সুবিধাগুলো শ্রমিকরা পাচ্ছে কি-না সেটাও দেখার দায়িত্ব ঐ পরিদর্শকদের। শ্রম পরিদপ্তর আবার সেসব পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট তৈরি করে। সে রিপোর্ট পাঠানো হয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে। এভাবে কারখানাসমূহের শ্রমিক নিরাপত্তার উপর সরকারি নজরদারি খাতা-কলমে ঠিক থাকলেও বাস্তবে ঘটছে বিপরীত ঘটনা। শ্রমিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে উল্লেখযোগ্য কোনো তৎপরতা ও সক্ষমতা এ প্রতিষ্ঠানের নেই।

বাংলাদেশেও আট ঘন্টা শ্রম দিবস স্বীকৃত।[১৭৬] স্ট্যান্ডিং অর্ডার ১৯৬৯-তে এ সম্পর্কে স্পষ্ট করে যা লিখিত আছে তাহলো নিম্নরূপ :

কোনো শ্রমিককে দৈনিক আট ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করানো যাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ওভারটাইম করানো যাবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত রয়েছে। (ক) শ্রমিকের সম্মতির ভিত্তিতেই

---

১৭৪. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬(ঢাকা : ইউনিভার্সেল বুক হাউস, ২০১৫), পৃ. ৯৯

১৭৫.প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

১৭৬. মোঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সালের ৪২ নং আইন)*(ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৩), ধারা ১০১, দফা (গ), পৃ. ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

কেবল ওভারটাইম করানো যেতে পারে, (খ) কোনো অবস্থাতেই (এমনকি শ্রমিকের সম্মতি থাকলেও) দুই ঘন্টার বেশি ওভারটাইম করানো যাবে না।[১৭৭] ওভারটাইমের জন্য দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই কোনো শ্রমিককে ১০ ঘন্টার বেশি পরিশ্রম করানো যাবে না এবং ওভারটাইমের জন্য দ্বিগুণ মজুরি দিতে হবে। তবে এসব হচ্ছে বইয়ের কথা; আইনের বইয়ে এগুলো লেখা রয়েছে। বাস্তবে অবস্থাটা ভিন্ন রকমের। এখনও বহু শিল্পে বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে এক-একজন শ্রমিককে ১৪ থেকে ১৬ ঘন্টা এমনকি তার চেয়েও বেশি পরিশ্রম করানো হয় এবং ব্যতিক্রমহীনভাবে কোনো গার্মেন্টস কারখানায় দ্বিগুণ হারে মজুরি দেয়া হয় না। উপরিউক্ত আইন ভঙ্গ করলে মালিককে শাস্তি পেতে হবে। এটাও আইনের বইয়ে লিখিত আছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো মালিক এই অবৈধ কাজের জন্য শাস্তি পায়নি। শুধু তাই নয়, ২০০০ সালে গার্মেন্টস শিল্পের মালিক সমিতি সরকারের কাছে আবদার করেছিল, গার্মেন্টস শিল্পে যেন শ্রম ঘন্টা ১৪ ঘন্টা করা হয়।[১৭৮]

২০০৪ সালে মালিক সমিতি বিজিএমইএ কয়েকটি ভুয়া দালাল শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি করে, যাতে দৈনিক ১৩ ঘন্টা শ্রম ঘন্টা নিয়োগ করার ব্যাপারে উভয় পক্ষ সম্মত হয়। এরই ভিত্তিতে সরকার এক নোটিশ জারি করে যে, ছয় মাসের জন্য শ্রম দিবস হবে ১৩ ঘন্টা। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্তৃপক্ষ এখানে সুস্পষ্টভাবে বেআইনি কাজ করেছেন। শ্রম দিবস সংক্রান্ত আইন কোনো চুক্তির দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে না। কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষও এমন আইন তৈরি করতে পারে না। একমাত্র জাতীয় সংসদই পারে আইন তৈরি করতে বা সংশোধন করতে।[১৭৯] বিষয়টি তদন্ত করে দেখা দরকার এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা ও কারখানার মালিকের শাস্তির আওতায় আনা আবশ্যক।

গার্মেন্টসগুলোতে বারবার সংঘটিত বড় ধরনের দুর্ঘটনায় অসহায় শ্রমিকদের নির্মম মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। কখনও আগুনে ভস্মীভূত হয়ে, কখনও পদপিষ্ট হয়েছে। ২০০৫ সালে সাভারে স্পেকট্রাম সোয়েটার নয়তলা গার্মেন্টস ভবন ধসে পড়ে এবং প্রায় তিনশ জন শ্রমিক ইট-বালুর নিচে চাপা পড়ে। সেনাবাহিনীর হিসাব মতে, ৭৩ জন হতভাগ্য শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ক্ষতবিক্ষত শতাধিক শ্রমিককে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৭ জানুয়ারি ২০০৫ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের সান গার্মেন্টেসের আট তলা ভবন থেকে তাড়াহুড়া করে নামার সময় পদপিষ্ট হয়ে মারা যায় ২৩ জন শ্রমিক। একই বছরে নোয়াখালীর ডোরা গার্মেন্টেসে আগুনে পুড়ে মারা যায় ১৬ জন শ্রমিক।

২০০০ সালে নরসিংদী বিসিক শিল্প নগরীর চৌধুরী নিটওয়্যারে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আগুনে পুড়ে ও পদদলিত হয়ে ৪৮ জন শ্রমিক প্রাণ হারায়। এরও আগে মিরপুর সারাকা গার্মেন্টেসে ৩২ জন, রহমান গার্মেন্টেসে ২৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আজ থেকে সোয়াশ-দেড়শ বছর আগের শ্রমিকদের উপর অমানুষিক নির্যাতন হয়েছে; কিন্তু সেখানে শত শত শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে জানা যায় না।

রাজধানী ঢাকার আশপাশের বিভিন্ন জেলায় গড়ে উঠা দুই সহস্রাধিক গার্মেন্টেসের কেউই আন্তর্জাতিক শ্রম আইন মানছে না। প্রায় অর্ধ শত গার্মেন্টেসের কাজ চলছে সাভারের সোয়েটার গার্মেন্টেসের মত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে। বিকল্প সিঁড়ি থাকলেও দুর্ঘটনার সময় তা কাজে আসে না। কারণ বেশির ভাগ সিঁড়ি হালকা, নড়বড়ে, ব্যবহারের অনুপযোগী, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অপ্রতুলতাসহ মালিকদের অমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই এ সকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ি।[১৮০]

---

১৭৭. মোঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, ধারা ১০৮, দফা (১), পৃ. ৫৪

১৭৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, ১০ ভাগ, অনুচ্ছেদ ১৪২, পৃ. ৬০

১৭৯. প্রাগুক্ত।

১৮০. https://www.bbc.com/bengali/news-47790208, visited on 02.04.2019

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি বছর মহান মে দিবসে বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর সমাবেশ আয়োজন, শ্রমিক শো-ডাউন মূলত শ্রমিক স্বার্থে নয়। রাজনৈতিক স্বার্থে শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য সাজানো নাটক বলেই প্রতীয়মান হয়, যা কেবলই কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শাসক দলগুলো শ্রমিকের স্বার্থে যদি সামান্য অবদান রাখত তাহলে রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা বন্ধ হতে পারত না। নামেমাত্র মূল্যে রাষ্ট্রায়ত্ত মিলগুলো ব্যক্তি মালিকানায় বিক্রি করে লাখ লাখ শ্রমিককে বেকারে পরিণত করা হয়েছে। ব্যক্তি মালিকানার মিলের মালিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে শ্রমিকদের ভাগ্য। যা মে দিবসের আদর্শের এবং চেতনার সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। বামপন্থী রাজনীতকদের ক্রমাগত ভুলের কারণে মে দিবসের বিজয় অর্জনের ভাগীদার সেজেছে শাসক বুর্জোয়া দলগুলো।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) হিসাব মতে, দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা ৪ কোটি ৭৪ লাখ। এর মধ্যে ৪৪টি ফরমাল সেক্টরে (মাসিক বেতনে চাকুরি) শ্রমিক রয়েছে ১ কোটি ২ লাখ ও ইনফরমাল সেক্টরে শ্রমিক সংখ্যা ৩ কোটি ৭২ লাখ। বর্তমান বাজার দরে ফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা জীবনযাত্রার ন্যূনতম ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। অনিয়মিত হলেও ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের আয় কিছুটা বেশি। তাই কাজের মৌসুমে তারা ফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের তুলনায় কিছুটা ভাল থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানায় প্রায় ৩৫ হাজার স্থায়ী ও ৫০ হাজারের মত অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরি না বাড়লেও তাদের জন্য আবাসন, যোগাযোগসহ নানা ধরনের সুবিধা থাকায় বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের তুলনায় কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছেন তারা।[১৮১]

গত কয়েক বছরে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি, বাড়িভাড়া, যাতায়াত, চিকিৎসাসহ সকল প্রয়োজনীয় মানবিক খাতের ব্যয় কয়েকগুণ বেড়েছে। এতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে, কমছে ক্রয় ক্ষমতাও। স্বামী-স্ত্রী, বয়োবৃদ্ধ পিতামাতা সকলেই মিলে আয়-রোজগার করেও নিত্যদিনই প্রয়োজন ও সাধ্যের মধ্যে অমানবিক আপস করতে হচ্ছে শ্রমিক পরিবারকে। পরিবারের ব্যয় মিটাতে বাধ্য হয়েই শিশুরাও শ্রমে নিয়োজিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে ২০০1 সালে সরকারের ঘোষিত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১ হাজার ৩৫০ টাকা। ২০০৯ সালে ঘোষিত সরকারি পে-স্কেলের সর্বনিম্ন গ্রেডের বেতন ৪ হাজার ১০০ টাকা। ভয়াবহ শ্রমিক আন্দোলনের মুখে ২০০৬ সালে পোশাক শিল্প খাতের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয় ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা। বিভিন্ন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, শ্রমিকদের বিদ্যমান মজুরি কাঠামোয় আনুষঙ্গিক ব্যয় তো দূরের কথা, একজন মানুষের নূনতম আহার খরচই মিটে না। অর্থনীতির সাধারণ হিসাবে, দারিদ্র্য সীমার ঊর্ধ্বে বেঁচে থাকতে হলে দৈনিক ২১২২ কিলোক্যালরি খাদ্য প্রয়োজন। এ পরিমাণ খাদ্যের পিছনে দৈনিক ৬১ টাকা ৫০ পয়সা এবং মাসিক ১৮৪৫ টাকা আবশ্যক। শ্রমিক পরিবারের খাদ্যব্যয় মোট ব্যয়ের ৪৪.৭ ভাগ। বাকি ৫৫.৩ ভাগ অন্যান্য পরিবারের ব্যয়।[১৮২]

বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের মাসিক ন্যূনতম ব্যয় ২০,০০০ টাকা। পরিবারে দু'জন কর্মক্ষম লোক থাকলেও তাদের ব্যয়ের জন্য মাসিক আয় জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি মাসে ১০ হাজার টাকা নির্ধারণে জোর দাবি জানিয়ে আসছে। তারা এটাকে লিভিং ওয়েজ বা বাঁচার মত মজুরি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের আয় রোজগার সে তুলনায় কিছুটা ভাল। তবে বছর জুড়ে কাজের নিশ্চয়তা নেই তাদের। তাদের আয় অঞ্চলভেদে কম-বেশি হয়। সেজন্য এ ধরনের শ্রমজীবীদের

---

১৮১. মোস্তফা কামাল, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*(ঢাকা : ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুফ লিঃ, ৩০ এপ্রিল ২০১৮), পৃ. ১২
১৮২. আবুল আসাদ, *দৈনিক সংগ্রাম*(ঢাকা : বাংলাদেশ পাবলিকেশন্স লিঃ, ৬ অক্টোবর ২০১৮), পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর অহরহ দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে ক্ষেতে-খামারে কাজ করে ১০০ টাকার বেশি আয় করা যায় না। যমুনা নদীর পূর্ব তীরে আবার কৃষি শ্রমের মজুরি অঞ্চলভেদে দৈনিক ১৫০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা। রিকশা চালিয়ে ঢাকা শহরে সব খরচ বাদ দিয়ে ৩০০ টাকা আয় করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে কাজের বিনিময়ে টাকা কর্মসূচির আওতায় একজন শ্রমিকের দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫০ টাকা। বিলসের সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশে ফরমাল সেক্টরে মজুরি আঞ্চলিক দেশগুলোর তুলনায় কম। বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশ ভারতে ন্যূনতম মজুরি ৪৬৬৭ টাকা ৫৩ পয়সা, পাকিস্তানে ৪৯২৯ টাকা ৪৮ পয়সা, শ্রীলঙ্কায় ৪০৯২ টাকা ৭৬ পয়সা, নেপালে ৪৬০ টাকা ৮৫ পয়সা ও ভুটানে ৪৬২৬ টাকা ৩৭ পয়সা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৮৩] সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম হলো ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনা। এ সময়ের মধ্যে দিনে মাথাপিছু ন্যূনতম দুই ডলার আয়সীমা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ হিসেব বিবেচনা করলে চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় হতে হবে ২৮০ মার্কিন ডলার।

শিশু শ্রমিক বৃদ্ধির অবস্থা : বর্তমানে বাংলাদেশে শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ও উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের অল্প মজুরিতে দীর্ঘক্ষণ কাজে রাখা যায় বলে নিয়োগকর্তাও শিশুদের কাজে নিয়োগ দেয়। এতে শিশুকে মননশীলতা ও শারীরিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অল্প বয়সে অমানবিক পরিশ্রমের ফলে পুষ্টিতে ভোগে এবং কখনো কখনো তাদের কঠিন রোগের মুখোমুখি হতে হয়। শ্রমে নিয়োজিত থাকায় শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা পারিবারিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। ২০০২-২০০৩ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিশুশ্রম জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ৫ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৩ কোটি ৫০ লাখ ৬৩ হাজার। শ্রমজীবী শিশুর সংখ্যা ২৬ লাখ ৫০ হাজার। এর মধ্যে ৫ লাখ ৬০ হাজার শিশু ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত। ২০০৬ সালের শ্রমজীবী শিশুর উপর আইএলওর রিপোর্টে বলা হয়েছে, মোট শিশুশ্রমিকের সংখ্যা ৪৭ লাখ। এর মধ্যে ৫ থেকে ১৪ বছরের ৩৪ লাখ ছেলে শিশু ও ১৩ লাখ মেয়ে শিশু। ২০১৩ সালের শিশু শ্রমিক জরিপে দেখা গেছে, ৪ কোটি ২৪ লাখ শিশুর মধ্যে ৪০.৬ শতাংশ শিশু শ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত।[১৮৪] ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী শিশু শ্রমিকের সংখ্যা আরো বেড়েছে। এভাবে সারা দেশে শিশুরা প্রায় ৪৩০ ধরনের কাজে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে চামড়া প্রক্রিয়াজাত কারখানা, রাসায়নিক শিল্পকারখানা, ঝালাই কারখানা, ইলেকট্রিক ওয়ার্কশপ, চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা, গৃহ ও রাস্তা নির্মাণ কাজের মত ৪৭ ধরনের কাজ সর্বাধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।[১৮৫] অথচ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিয়োগ দেয়া সম্পূর্ণরূপে বেআইনি।

বাংলাদেশের মহান সংবিধানে শিশুসহ সকল নাগরিকের শিশুসহ সব নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ ও ১৪-২০ অথাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের উপর জোর দেয়া হয়েছে।[১৮৬] মৌলিক অধিকার অংশের অনুচ্ছেদ ২৭-২৯, ৩১, ৩৪ ও ৩৭-৪১-এ মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা

---

১৮৩. মতিউর রহমান, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : মতিউর রহমান, ৫ মে ২০১৭), পৃ. ১

১৮৪. Board of Editors, *Report on Child Labour Survey (CLS) Bangladesh 2013*(Dhaka : BBS, 2015), p. 32

১৮৫. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩২০

১৮৬. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৬

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।[১৮৭] বিশেষত জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে আইনগতভাবে প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তার বিধানও রয়েছে।

শিশুদের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে শিশু আইন এবং ১৯৭৬ সালে শিশু বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। শিশু আইন ১৯৭৪ এর ষষ্ঠ ভাগের ধারা ৪৪(১) অনুযায়ী শিশুকে ভৃত্যের চাকুরি বা কারখানা কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজে নিয়োগ করলে, তাকে শোষণ করলে, আটকে রাখলে, তার উপার্জনে জীবনধারণ করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ।[১৮৮] অথচ এর কোনো বাস্তবায়ন নেই।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ কর্মক্ষেত্রে কোনো শিশুর নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছর তারা আইনের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কাজ করতে পারবে। এ আইনের ৪০ ধারায় শিশুকে বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকার সময়ে সময়ে বাজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যে তালিকা করবে এবং ঐ সব কাজে কোনো শিশু, কিশোর বা কিশোরীকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।[১৮৯]

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিধি অনুযায়ী শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। আইএলও'র কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত যে কোনো মানুষকে শিশু ধরা হয়। ২০০০ সালের ২৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ আইএলও'র ১৮২ নম্বর কনভেনশনে অনুস্বাক্ষর করেছে। এ কনভেনশন অনুসারে ১২ বছরের কম বয়সী কোনো শিশু কাজের সাথে যুক্ত হতে পারবে না। অথবা ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সী যেসব শিশু পরিশ্রমী কাজের সাথে যুক্ত সেগুলোকে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম হিসেবে বিবেচনা করা হবে।[১৯০]

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে একই কথা বলেছে। এ সনদের ৩১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশু বিশ্রাম, অবসরযাপন, বয়স অনুযায়ী খেলাধুলা, বিনোদনমূলক কর্মসূচি এবং সাংস্কৃতিক, সুকুমার শিল্পে অংশগ্রহণের অবাধ অধিকার অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রগুলো স্বীকার করবে এবং সনদের ৩২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক শোষণ থেকে শিশুর অধিকারকে রক্ষা করবে। স্বাস্থ্য অথবা শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সামাজিক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর বা শিশুর শিক্ষায় ব্যাঘাত ঘটায় বা বিপদ আশঙ্কা করে এমন কাজ যেন না হয় তার ব্যবস্থা নিতে হবে।[১৯১]

কিন্তু এসব আইন প্রণয়নের পরও সারা দেশে শিশুদের, বিশেষ করে শ্রমজীবি শিশুদের অবস্থা খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। বরং শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রমিকদের শোষণ, গৃহস্থালী কাজে নিয়োজিত শিশুদের উপর নির্যাতন প্রভৃতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের প্রতি সদয় আচরণের মানবিক মূল্যবোধটুকুও যেন অনেকের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে।

শিশুদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে শিশু হিসেবে আইনগত বয়স নির্ধারণ। বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন আইনে শিশুদের সংজ্ঞায় বিভিন্ন বয়সসীমা বর্ণিত আছে। শিশুদের নানা ধরনের প্রয়োজন মিটানো বা সুরক্ষার লক্ষ্যে অনেক আইন নির্দেশনা দিয়েছে। এর মধ্যে শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী যার বয়স ১৬ বছরের নিচে সে শিশু হিসেবে গণ্য। অন্যান্য আইনের মধ্যে ১৮৭৫ সালের সাবালকত্ব আইনে ও ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনে ১৮ বছরের কম

---

১৮৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-১২
১৮৮. মোঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩০
১৮৯. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া, *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৭-৩২০
১৯০. ILO, *Worst Forms of Child Labour Convention, 1999*(Geneva : ILO, 1999), Convention No. 182
১৯১. UNO, *The Convention on the Rights of the Child*(New York : UNESCO, 1995), p. 29

Dhaka University Institutional Repository

বয়সী মানুষকে শিশু বলা হয়েছে। ২০০৬ সালের শ্রম আইনের ২ ধারায় শিশু অর্থ ১৪ বছর পূর্ণ করেনি এমন কোনো ব্যক্তি। আবার জাতীয় শিশু নীতিমালা অনুযায়ী শিশুর বয়স সর্বোচ্চ ১৪ বছর ধরা হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষত ১৯৮৯ সালের শিশু সনদে যে ব্যক্তির বয়স ১৮ এর নীচে সে ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য।[১৯২]

বর্তমানে বিভিন্ন আইনে ভিন্ন ভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারিত থাকায় শিশু অধিকার সংশ্লিষ্ঠ আইনের প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ হচ্ছে না। যথাযথভাবে এ আইন বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই সরকারি, বেসরকারি সংস্থা, মালিক ও শ্রমিক সংগঠন এবং শিশু শ্রমবিষয়ক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করতে হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করতে হলে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইসলামের মহান বাণী কম-বেশি সকলের কাছে জানা বিষয়। অথচ ইসলামের বিধান যে চোখের সামনে লঙ্ঘিত হচ্ছে, তা যেন কারো দৃষ্টিগোচরে আসছে না। কারণ শ্রেণি স্বার্থ সবচেয়ে বড় বিষয়। তাই বর্তমান সময়ে মহা ধুমধামে মে দিবস পালন করলে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না, তাদের আর্থিক-সামাজিক ও শারীরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে ইসলামের মহান রাসুলের আদর্শের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব। মে দিবস ও বাংলাদেশ শ্রমিক শোষণ-নির্যাতন বিষয়ে বলতে গিয়ে কর্মসংস্থানের বিষয়টি এভাবে উল্লেখ-আলোচনার প্রয়োজন হলে বিশেষত এ কারণেই যে, শ্রমিকদের অবস্থা, তাদের উপর শোষণ নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে অবস্থার এ দিকটি সাধারণত উহ্যই থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, মে দিবসের সরকারি ছুটি এবং ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্র[১৯৩] প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ হলো চরম শ্রমিক নিরাপত্তাহীন ও নির্যাতনের দেশ।

বাংলাদেশের কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা কেমন, তারা কিভাবে দুধে-ভাতে বেঁচে আছেন এটা কোনো অজানা বিষয় নয়। নিয়মিতভাবে সেখানে বেসরকারিকরণের নামে, ক্ষতি বন্ধের নামে কারখানা, এমনকি আদমজীর মতো বিশাল এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকারখানা বন্ধ করে দেয়া হয়, সেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রার বিবরণ বর্ণনাতীত। গার্মেন্টস কারখানা শ্রমিকদের অবস্থা তো রাজধানী শহরের মানুষের চোখের সামনেই দেখা যায়। এ গরীবদের শ্রমশক্তি থেকে অর্জিত মুনাফা ও বৈদেশিক মুদ্রার কথা অর্থমন্ত্রীসহ শাসক শ্রেণির সকল লোক গৌরব প্রকাশ করেন। কিন্তু এদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, নিয়মিত সাপ্তাহিক ছুটি নেই, নিয়মানুযায়ী ওভারটাইম মজুরি নেই। উপরন্তু আছে সকল প্রকার শিল্প শ্রমিক থেকে নিম্নতর মজুরি, আছে যে কোনো দেশের গার্মেন্টস কারখানা শ্রমিকের থেকেও বেশি জীবনের নিরাপত্তাহীনতা।

শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রায় ১০৪৭টি আপিল ঝুলে আছে দেশের একমাত্র আপিল ট্রাইব্যুনালে। বছরের পর বছর নিষ্পত্তি হচ্ছে না এসব আপিল। প্রায়ই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের পদ খালি থাকে। এ কারণে মামলাজট আরো বাড়ছে। বিচারপ্রার্থীরা বিপাকে পড়ছেন, হয়রানির শিকার হচ্ছেন। ২০০৮ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন বিচারপতি আমিরুল কবির চৌধুরী। তিনি ঐ তারিখে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে যোগ দেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলার আপিল এ আদালতে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।[১৯৪]

সারা দেশে শ্রম আদালত রয়েছে সাতটি। এসব আদালতের দেয়া রায়ের পর ক্ষুব্ধ আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করে। যেসব আপিল করা হয় সেগুলো উল্লেখযোগ্য মামলার আপিল। আদমজী

---

১৯২. UNO, *The Convention on the Rights of the Child*, Ibid, p. 29
১৯৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৯৪. জাকির হোসেন, *বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে ত্রিপক্ষীয়তার অবস্থা এবং সমন্বয়পূর্ণ শিল্প ও শ্রম সম্পর্কের সুযোগ*(ঢাকা : বিলস, ২০১৭), পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

জুট মিলের শ্রমিকদের ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের সাংবাদিকদের করা আপিল এ আদালতে ঝুলে আছে। বিচারক না থাকায় এসব আপিলের শুনানি কবে হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। দেশের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের জন্য সর্বোচ্চ আদালত এটি। পুরানা পল্টনের পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল অবস্থিত। ট্রাইব্যুনাল অঙ্গন যেন এক ভুতুড়ে পরিবেশ। বিচারপ্রার্থীদের জন্য শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল খুঁজে বের করা কষ্টকর। ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ দেয়া ও একটি মানসম্মত স্থানে ট্রাইব্যুনাল স্থানান্তর করা আবশ্যক। ঢাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা তিনটি। এ আদালত তিনটিতে মামলাজট নজির সৃষ্টি করেছে। শ্রম আদালত-১ এ দুই হাজার ১৮৪টি, শ্রম আদালত-২ এ ৯৪০টি, শ্রম আদালত-৩ এ ৩ হাজার মামলা বিচারাধীন আছে।[১৯৫]

রাজধানীর রাজউক এ্যাভিনিউ শ্রম ভবনে তিনটি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগের যে কোনো স্থান থেকে মামলা করতে শ্রমিকদের এ আদালতে আসতে হয়। এখানে আসতে ভোগান্তির শিকার হতে হয় তাদের। বিশেষ করে ঢাকার বাইরের শ্রমিকদের মামলা করতে আসতে হলে এ আদালতের অসাধু কর্মচারী ও দালালরা প্রত্যেককে হয়রানি করে থাকে। দালালরা টাকা চায় আদালতের পেশকার বলেন, ‘উকিল-ব্যারিস্টার লাগবে না। তাকে (দালাল) টাকা দিলে আমরা আপনার পক্ষে মামলা করতে দিব।’ শ্রম আদালতে মামলা করতে কোনো কোর্ট ফি লাগে না। আইনজীবী ছাড়া নিজেও আদালতের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্কট, সমন জারিতে বিলম্ব, জবাব দাখিলে সময় নেয়ার কারণে চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে প্রায় ১ হাজার ৭০০ মামলার বিচার ঝুলে আছে। ফলে বিচারপ্রার্থীরা মালিকের হয়রানির প্রতিকার চাইতে এসে আরেক দফা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। চট্টগ্রাম শ্রম আদালতের সংখ্যা দু'টি। বিগত এক বছরে প্রথম শ্রম আদালতে ২৪০টি মামলার নিষ্পত্তি ও দ্বিতীয় শ্রম আদালতে মাত্র ৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। এদিকে চট্টগ্রাম প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রম আদালতে রেজিস্ট্রার নেই। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার পদও খালি। এতে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা বিরাজ করছে। চট্টগ্রাম প্রথম শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র রয়েছে নগরীর চান্দগাঁও ও ডবলমুরিং থানা ছাড়া চট্টগ্রাম জেলা, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও চাঁদপুর। দ্বিতীয় শ্রম আদালতের অধিক্ষেত্র রয়েছে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও সিলেটে। এ ছাড়া নগরীর চান্দগাঁও ও ডবলমুরিং থানায়।

দেশের অন্যান্য আদালতের চেয়ে ভিন্ন নিয়মে শ্রম আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। জেলা ও দায়রা জজ পদমর্যাদার একজন বিচারক শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান থাকেন। প্রতিটি আদালতে ৬ জন করে ১২ জন মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়োগ দেয়া হয় আইন মন্ত্রণালয়ের বিধি মুতাবিক রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন। সাধারণত দুই বছরের জন্য তারা নিয়োগ পেয়ে থাকেন। প্রতিটি মামলায় মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধি দু'জন এবং শ্রম আদালতের চেয়াম্যান মামলা নিষ্পত্তি করে থাকেন। কিন্তু চট্টগ্রাম শ্রম আদালতের মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা আদালতে উপস্থিত থাকেন না। বিচারকরা ঘন ঘন ছুটিতে থাকায় মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। কারণ অবসরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বিচারকদের এখানে পোস্টিং দেয়া হয়। শ্রমিক প্রতিনিধিরা নয়; বিচারিক কার্যক্রমে বিলম্ব হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলেই দায়ি।

খুলনা ও বরিশাল বিভাগের জন্য নির্দিষ্ট খুলনা শ্রম আদালত। এখানে শ্রম আইন লঙ্ঘনের দায়ে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অনেক মামলা হয়। এ আদালতে বর্তমানে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা প্রায়

১৯৫. নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*(ঢাকা : ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুফ লিমিটেড, ১ মে ২০১৮), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৫৬০টি। রাজশাহী বিভাগীয় শ্রম আদালতে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মজুরি, শ্রমিক ইউনিয়নের লাইসেন্স, সরকারি বিভিন্ন কারখানা থেকে বরখাস্ত সংক্রান্ত বেশি মামলা হয়। রাজশাহী বিভাগীয় এ শ্রম আদালত প্রতি মাসে তিন দিন বগুড়ায় বসে।[১৯৬] ২০০৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষে নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকে ১৩৮টি মামলা। ২০০৯ সালে মোট ৩৩১টি মামলা হয়। ২০০৮ সালের নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকা মামলা ও ২০০৯ সালে নতুন মামলা, সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৬৯টি। এর মধ্যে নিষ্পত্তি হয় ২৪৭টি। নিষ্পত্তির অপেক্ষায় থাকে ২২২টি।[১৯৭]

এ আদালতে একজন জেলা জজ রয়েছেন। তিনি প্রতি মাসে তিন দিন বগুড়ায় বসেন। এ ছাড়া ২০০৫ সালের ১৪ এপ্রিলের পর থেকে এখানে রেজিস্ট্রারের পদ শূন্য রয়েছে। যার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। এসব কিছু সত্ত্বেও ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে আমাদের জাতীয় ছুটি। দিনটি বিভিন্ন শ্রমিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনের দ্বারা পালিত হয়ে থাকে। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশি জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হয়ে থাকে সরকারের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দ্বারা, বর্তমানে বিরোধী দলে অবস্থিত প্রাক্তন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের দ্বারা; মালিক শ্রেণির রঙবেরঙের প্রতিনিধিদের দ্বারা।[১৯৮]

৪১টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাবসহ শ্রম আইন ২০১৮ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন : বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮-এ নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রীসভা। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী বর্তমান বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-কে আরও যুগোপযোগী করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সচিবালয়ে মন্ত্রীপরিষদ বৈঠকে সংশোধিত আইনের খসড়ায় অনুমোদন দেয়া হয়। এখন ২০১৮ সালে সংশোধনের মাধ্যমে এটিকে আরও যুগোপযোগী এবং শ্রমবান্ধব করা হয়েছে। শ্রম আইনে ধারা হচ্ছে ৩৫৪টি। এ সংশোধনী প্রস্তাবে দু'টি ধারা, চারটি উপধারা, আটটি দফা সংযোজন করা হয়েছে। ৬টি উপধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। ৪১টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই আইনের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীর মধ্যে রয়েছে কোনো কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এর আগে ৩০ শতাংশের প্রয়োজন ছিল। ১৪ বছর বয়সের নিচে কোনো শিশুকে কোনো কারখানায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। ১৪ বছরের নিচে কাউকে নিয়োগ দেয়া হলে মালিকের ৫ হাজার টাকা জরিমানা হবে। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে। কারখানায় নারী শ্রমিকরা ৮ সপ্তাহের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন। এর ব্যত্যয় হলে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। কোনো নারী শ্রমিক সন্তানসম্ভবা হলে তার প্রমাণ পেশ করার ৩ দিনের মধ্যে ছুটি দিতে হবে। ৫১ শতাংশ শ্রমিকের অনুমতি সাপেক্ষে ধর্মঘট করা যাবে। যে কোনো শ্রম আদালতে ৯০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে হবে। না হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। এ ১৮০ দিনের মধ্যে যদি নিষ্পত্তি না হয় তাহলে বাকি পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে। কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক মারা গেলে দুই লাখ টাকা এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে পঙ্গু হলে আড়াই লাখ টাকা শ্রমিককে দিতে হবে। আর কোনো শ্রমিক সংগঠন বিদেশ থেকে চাঁদা আনলে তা সরকারকে অবহিত করতে হবে। শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন ৬০ দিনের পরিবর্তে ৫৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। শ্রমিকদের কল্যাণে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক এই ত্রিপক্ষীয় পরিষদ করার বিধান রাখা হয়েছে।

সংশোধিত শ্রম আইন কতটা শ্রমিকবান্ধব হবে : বাংলাদেশে প্রচলিত শ্রম আইনের ৪১টি ধারা সংশোধন করে নতুন শ্রম আইনের খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে মন্ত্রীসভা। আইএলও এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর

১৯৬. নঈম নিজাম, *বাংলাদেশ প্রতিদিন*(ঢাকা : ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুফ লিমিটেড, ১ মে ২০১৮), পৃ. ১

১৯৭. প্রাগুক্ত।

১৯৮. জুলফিকার রাসেল, *বাংলা ট্রিবিউন*(ঢাকা : কাজি আনিস আহমেদ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮), পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

চাপের মুখে এই সংশোধনী আনা হচ্ছে। এই আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আইনে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী অনেক ধারা রয়েছে বলে দাবি শ্রমিক নেতাদের। তারা বলছেন, ক্ষতিপূরণ বাড়ানো হয়েছে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে যে ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের দেয়া উচিত, আইএলও'র বিধান মেনে তা করা হয়নি। আর এখন মামলা করতে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন দরকার হবে, যা আরেকটি বড় ক্ষতির দিক।

শ্রম আইন ২০০৬-কে ২০১৩ সালে একবার সংশোধন করা হয়েছিল। তখন এ আইনের ৯০টি ধারা সংশোধন করা হয়েছিল। শ্রম আইনে ৩৫৪টি ধারা। এই সংশোধনী প্রস্তাবে দু'টি ধারা, চারটি উপধারা, আটটি দফা সংযোজন করা হয়েছে। ৬টি উপধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। ৪১টি ধারা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। ৪১টি সংশোধনীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো :

কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ২০ শতাংশের সম্মতিতে ট্রেড ইউনিয়ন করা যাবে। এর আগে ৩০ শতাংশের প্রয়োজন হত।[১৯৯] ৫১ শতাংশ শ্রমিকের অনুমতি সাপেক্ষে ধর্মঘট করা যাবে। আগে দুই-তৃতীয়াংশ শ্রমিকের সম্মতি প্রয়োজন হত।[২০০] কর্মক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক মারা গেলে দুই লাখ এবং দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে পঙ্গু হলে আড়াই লাখ টাকা শ্রমিককে দিতে হবে। আগে এই ক্ষতিপূরণ ছিল এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা।[২০১] এখন সেটা বাড়িয়ে করা হয়েছে আড়াই লাখ টাকা। এ ছাড়া উৎসব-ভাতা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৪ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে কোনো কারখানায় নিয়োগ দেয়া যাবে না। ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সি কিশোরদের কারখানায় শ্রমিক হিসেবে হালকা কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে। আগে ১২ বছরের শিশুরা হালকা কাজের সুযোগ পেত। ১৪ বছরের নিচে কাউকে নিয়োগ দিলে ৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। নারী শ্রমিকরা ৮ সপ্তাহের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবেন।[২০২] এর ব্যাত্যয় হলে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। কোনো নারী শ্রমিক সন্তানসম্ভবা হলে তার প্রমাণ পেশ করার ৩ দিনের মধ্যে ছুটি দিতে হবে।

শ্রমিকদের মামলা শ্রম আদালতে ৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে। তা না হলে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে অবশ্যই করতে হবে। যদি এই ১৮০ দিনের মধ্যেও নিষ্পত্তি না হয়, তাহলে বাকি পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে। অসদাচরণের জন্য মালিক ও শ্রমিকের কারাদণ্ড দুই বছর থেকে কমিয়ে এক বছরের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বেআইনি ধর্মঘটের শাস্তিও কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। এখনকার আইনে এই সাজা এক বছর। সেটা ছয় মাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে জরিমানা আগের মতই ৫ হাজার টাকা বিদ্যমান থাকছে। শ্রমিক সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন ৬০ দিনের পরিবর্তে ৫৫ দিনের মধ্যে করতে হবে। কোনো শ্রমিক সংগঠন বিদেশ থেকে চাঁদা আনলে তা সরকারকে অবহিত করতে হবে। শ্রমিকদের কল্যাণে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরকার, মালিক ও শ্রমিক এই ত্রিপক্ষীয় পরিষদ করার বিধান রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এই আইন সংশোধন নিয়ে আইএলও-কে সঙ্গে নিয়ে সরকারের সঙ্গে বার বার বৈঠক করা হয়েছে। তারপর সরকার নতুন করে এই প্রস্তাব করেছে। তবে নীতিগতভাবে অনুমোদন হওয়া এই খসড়া আইনে অনেক কিছু আছে, যা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যাবে। মামলা নিষ্পত্তির সময় বেঁধে দেয়া হলেও এখন আর শ্রমিকরা সরাসরি শ্রম আদালতে মামলা করতে পারবে না। কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া শ্রমিকরা মামলা করতে পারবে না। এই অনুমোদন নিতেই তো মাসের পর মাস কেটে যাবে। শ্রমিকরা হয়রানির শিকার হবে। মামলা তো পরের কথা। ক্ষতিপূরণ বাড়ানো প্রসঙ্গে আইএলও'র নীতি অনুযায়ী একজন শ্রমিক যখন নিহত বা পঙ্গু হবে, সেই সময় থেকে গড় আয়ু হিসাব করে তিনি যতদিন কর্মক্ষম থাকতেন এবং সেই সময়ে যে আয়

১৯৯. মোঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬
২০০.মতিউর রহমান, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : মতিউর রহমান, ১০ জুন ২০১৯), পৃ. ১
২০১. মোঃ নজরুল ইসলাম, *বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (৪২ নং আইন)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
২০২.প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

Dhaka University Institutional Repository

করতেন তার হিসাব করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হয়।[২০৩] এটাই ছিল শ্রমিকদের দাবি। এক লাখ টাকা বাড়িয়ে বাহবা নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমিকরা প্রকৃত ক্ষতিপূরণের বিধান চায়।

দেখা যায়, ধর্মঘট করা, ট্রেড ইউনিয়ন করা, এসব নিয়ে যে সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন আনা হয়েছে, তাতে আসলে কোনো ফল আসবে না। কারণ, নানা কৌশলে ট্রেড ইউনিয়নের অনুমোদন আটকে দেয়া হচ্ছে। আর ধর্মঘট করার জন্য কোনো লিখিত সমর্থনের বিধান থাকা উচিত নয়; কারণ, যা অবস্থা তাতে কেউ স্বাক্ষর করতে সাহস পাবে না।

এখন আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে। ফলে মালিকেরা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ দিবে। মূল শ্রমিকদের চাকুরিই এখন হুমকির মুখে পড়বে। নতুন প্রস্তাবিত আইনে শ্রমিকদের ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে বদলির বিধান করা হয়েছে। আগে যা ছিল ৮ কিলোমিটার। কিন্তু এ জন্য কোনো প্রণোদনা বা ক্ষতিপূরণ নেই। ফলে শ্রমিকরা নতুন করে হয়রানির শিকার হবেন। প্রস্তাবিত সংশোধনী শুনলে মনে হয় অনেক ভাল। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। আগে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ছিল লজ্জাকর, এখন হয়েছে হাস্যকর। মানুষের জীবনের দাম দুই-আড়াই লাখ টাকা। আর আইএলও কনভেনশনে বলা আছে, ১০ শ্রমিকও যদি শ্রমিক ইউনিয়ন করতে চায়, তাদের অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু সংশোধনী প্রস্তাবেও ২০ শতাংশ বলা হয়েছে। আর শ্রমিকদের ধর্মঘটের ২১ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে। এটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এমনিতেই ৬০০ ট্রেড ইউনিয়নের মাত্র ৫০টি কাজ করতে পারে। বাকিরা পারে না। নতুন আইন আরো কঠিন হবে।

তবে শিশুদের পিতামাতার আয় না বাড়লে বাস্তবে শিশুশ্রম বন্ধ করা কঠিন হবে। শ্রমিকরা চায় এমন একটি শ্রম আইন হোক, যা সকলের জন্য কল্যাণকর। কেবিনেটে সংশোধনীর খসড়া নীতিগতভাবে অনুমোদন করেছে। এটি সংসদে পাশ হবে। তারপর আইন হবে। সংসদে পাশ হওয়ার আগে এই আইন নিয়ে কোনো মন্তব্য করা যায় না। তবে আশা করা যায়, নতুন আইনে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হবে।

নিজেদের অধিকার ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কয়েকজন শ্রমজীবী মানুষদের আত্মকথা নিচে উপস্থাপিত হলো :

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি খুবই কম : জার্মানির পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিলস আনেন সম্প্রীতি বাংলাদেশ সফর করেছেন। সেই সফর নিয়ে ডয়চে ভেলেকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি রোহিঙ্গা সংকট ও পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি খুবই কম। তাই শ্রমিকদের আয় বাড়াতে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি, কর্তৃপক্ষ ও এনজিওদের সঙ্গে জার্মানি কাজ করছে বলে জানান জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। তবে এ ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ক্রেতাদেরও কেনাকাটার অভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে, বলে মনে করেন তিনি। রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর পোশাক কারখানাগুলোর কর্মপরিবেশের কিছুটা উন্নতি হলেও পরিস্থিতি এখনও সন্তোষজনক নয়, বলে মন্তব্য করেন তিনি।

জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আনেন মনে করেন, রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফিরে যেতে এখনও অনেক সময় লাগতে পারে। তারা নিরাপদে মিয়ানমারে ফিরতে পারবেন না বলে এখনও মনে করেন না রোহিঙ্গারা। তিনি বলেন, দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, রোহিঙ্গাদের ফেরার ব্যাপারে মিয়ানমার সরকার ও সাধারণ মানুষের এখনও বেশ আপত্তি আছে। সেটি কমাতে ভারত ও চীনের সঙ্গে জার্মানি আলোচনা করছে, বলে জানান জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।[২০৪]

রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি যেন আন্তর্জাতিক বিশ্বের চোখের আড়ালে পড়ে না যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে চায় জার্মানি। জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের সদস্য এবং আগামী বছর থেকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে জার্মানি এই বিষয়ে কাজ করবে বলে জানান আনেন। তিনি বলেন, বিশ্বে নতুন কোনো সংকট তৈরি হলে রোহিঙ্গাদের বিষয়টি চাপা পড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় আছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গাদের ফেরা নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে বলে মনে করেন জার্মান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক বিশ্বকে এ লক্ষ্যে কাজ করতে হবে বলে জানান তিনি।

২০৩. মতিউর রহমান, *দৈনিক প্রথম আলো*(ঢাকা : মতিউর রহমান, ১০ জুন ২০১৯), পৃ. ১
২০৪. প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে শ্রমিক নিরাপত্তা লঙ্ঘিত : বাংলাদেশের পোশাকশিল্পে শ্রমিক নিরাপত্তা ও অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বলে মনে করে পাঁচটি আন্তর্জাতিক জোট। ইউরোপীয় কমিশনের কাছে পণ্য রপ্তানিতে অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা পুনর্বিবেচনার জন্য বাংলাদেশে একটি তদন্ত দল পাঠানোর দাবি জানিয়েছে তারা। তবে এই অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ'র সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান। ডয়চে ভেলেকে তিনি বলেন, আমরা কারখানাগুলোর অবকাঠামোর উন্নয়ন করেছি। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে কাজ করা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করেই এই সেক্টরের উন্নতি করা হয়েছে। এখন তারা যেটা বলছে, সেটা একেবারেই ঠিক নয়। আমরা বিষয়টা তাদের বলব।

বাংলাদেশের জিএসপি পুনর্বিবেচনার দাবি করা জোট পাঁচটি হচ্ছে, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন, দ্যা ইউরোপিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন ও ইউএনআই গ্লোবাল ইউনিয়ন। তারা শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রমাণ করতে 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের পোশাকশিল্প : সাসটেইনেবল কমপ্যাক্টের ব্যর্থতা' নামে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে।

এ ৫টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের মধ্যে একমাত্র ইন্ডাস্টিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়নের বাংলাদেশে সহযোগী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন তাদের পক্ষে কাজ করে। সংগঠনটির মহাসচিব ডয়চে ভেলেকে বলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্লোবাল ইউনিয়ন আমাদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোনো তথ্য-উপাত্ত নেয়নি। ব্যক্তি পর্যায়ে কারো কাছ থেকে কোনো তথ্য নিয়েছে কি-না সেটা আমাদের জানা নেই। তবে অবশ্যই বাংলাদেশ নিয়ে তাদের কোনো রিপোর্ট প্রকাশের আগে আমাদের কাছ থেকে তথ্য নেয়া উচিত ছিল। তাদের প্রতিবেদন যে ঠিক না এটা বলব না, তবে বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে। সারা বিশ্বে কোথাও এখন আর বাংলাদেশের পণ্য বয়কট করা হয় না। শ্রমিকদের স্বার্থের জায়গায় কিছু দুর্বলতা থাকলেও অবকাঠামো বা তাদের নিরাপত্তার জায়গায় বাংলাদেশ অনেক উন্নতি করেছে। এখনো এসব কাজ অব্যাহত রয়েছে।

জোটের প্রকাশ করা শ্বেতপত্রে শ্রম আইন সংশোধন, রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)-এ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, ইউনিয়ন নিবন্ধনের উন্নতি এবং ইউনিয়নবিরোধী কার্যক্রম বন্ধ না হওয়াকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ এসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। শ্বেতপত্রে কয়েকটি কারখানার শ্রমিক নির্যাতনের তথ্যও তুলে ধরা হয়। শ্বেতপত্রটি ইউরোপিয়ান কমিশনে পাঠানো হয়েছে। বিবৃতি দিয়ে তারা বলেছে, বাংলাদেশ সরকার সাসটেইনেবল কমপ্যাক্ট অমান্য করছে। ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শ্রম আইন সংশোধনে সামান্যতম অগ্রগতি হয়নি। ইপিজেড শ্রম সংঘ নিশ্চিত করার বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, সেটি পরিস্কার নয়। ইউনিয়ন করতে গিয়ে অনেক কারখানার শ্রমিকেরা নির্যাতিত হওয়ার তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। কিন্তু শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ চার বছর সময় পেয়েছে।

আসলে বাংলাদেশে শ্রমিক নিরাপত্তা ও অধিকারের চিত্রটা কেমন? এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও শ্রমিক নেত্রী জলি তালুকদার ডয়চে ভেলেকে বলেন, তারা অনেক কিছুই নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করলেও শ্রমিকদের বিষয়ে তারা যে রিপোর্ট দেয় সেটা ঠিক আছে। আমিও মনে করি, বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। ২০১৩ সালে সর্বশেষ বেতন কাঠামো হয়েছে। ৫ বছর পার হলেও নতুন কোনো বেতন কাঠামো এখনো হয়নি। অথচ এই সময়ে গ্যাস-বিদ্যুতের দামসহ বাড়ি ভাড়া সবই বেড়েছে। আমাদের কারখানাগুলোতে এখনো শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারে না। অনেক জায়গায় বাধা দেয়ার অভিযোগ আছে। আজও আমরা আশুলিয়াতে শ্রমিক সমাবেশ করতে পারিনি পুলিশী বাধার কারণে।

Dhaka University Institutional Repository

২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসের পর পোশাকশিল্পের কর্মপরিবেশ উন্নতি ও শ্রমিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে চারপক্ষীয় উদ্যোগ নেয়া হয়। ঐ বছরের জুলাই মাসে জেনেভায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ ও আইএলও'র উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে যোগ দিয়ে 'স্টেইং এনগেইজড অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি কমপ্যাক্ট উইথ বাংলাদেশ' নামের উদ্যোগের ঘোষণা দেয়। সংক্ষেপে এটি 'কমপ্যাক্ট' নামে পরিচিত। পরে এতে কানাডাও যুক্ত হয়।[২০৫]

২০১৮ সালের মে মাসে ঢাকায় কমপ্যাক্টের তৃতীয় পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষায় যৌথ দর কষাকষির অভিন্ন অধিকার চালু করতে দেশের ইপিজেড আইন সংশোধনের জন্য বাড়তি সময় পায় বাংলাদেশ। দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে দৃশ্যমান অগ্রগতি দেখতে চেয়েছিল বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদারেরা। এদিকে, ২০১৮ সালের জুনে আন্তর্জাতিক লেবার কনফারেন্স (আইএলসি)-এ বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিশেষ অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়। এতে বলা হয়, শ্রমিক অধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে পদক্ষেপের ঘাটতি ও ব্যর্থতা অত্যন্ত উদ্বেগের। এ ক্ষেত্রে শ্রম আইন, ২০১৩-তে সংশোধনী আনা, ইপিজেড আইনে সংগঠিত হওয়ার অধিকার পুরোপুরি নিশ্চিত করা, ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্যের তদন্ত করা এবং ইউনিয়নের নিবন্ধন স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে করার মত চারটি প্রসঙ্গ ঐ অনুচ্ছেদে এসেছে। এসব কারণেই বাংলাদেশের জিএসপি সুবিধা অব্যাহত রাখার বিষয়টি যাচাই করতে চাইছে ইইউ। অবশ্য ২০১৮ সালের জুনে জেনেভায় আইএলসিতে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী বৈষম্যমূলক আচরণ ও সহিংসতা বন্ধের জন্য আগামী নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশকে সময় বেঁধে দেয়া হয়।

সার্বিক বিষয়ে সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (SANEM) তথ্যানুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যে অনেক সমস্যা আছে। প্রতিবছর দেখা যায়, বরাদ্দ বাড়ছে, কিন্তু প্রকৃত বরাদ্দ বাড়ছে না। যে বরাদ্দ দেয়া হয়, সেটারই-বা কীভাবে কী হলো, তা জানা যায় অনেক পরে। আবার একই ধরনের কর্মসূচি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হাতে নিয়েছে, যাতে দ্বৈততা দেখা যায়। এগুলো দূর করে সমন্বিত কর্মসূচি হাতে নেয়া জরুরি। চলাঞ্চল, নদীভাঙন এলাকা তথা দরিদ্র মানুষদের উদ্দেশ্য করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি হাতে নিতে হবে বলে মনে করেন সমাজ বিশেষজ্ঞগণ।

বাংলাদেশে বিভিন্ন পেশায় সর্বনিম্ন মজুরির পরিমাণ : বিস্ময়কর হলেও বাংলাদেশে একজন শ্রমিক মাসে সর্বোচ্চ মজুরি পান ১৬ হাজার টাকা। আর এটি জাহাজ ভাঙ্গা পেশায়। মূল মজুরি ছাড়াও এর মধ্যে বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা, যাতায়াত, খাদ্য বা রেশন ভাতাও অন্তর্ভুক্ত। চলতি বছরেই এ মজুরি নির্ধারণ করে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। এছাড়া, বাকি ৪১টি শ্রমশিল্পের মধ্যে টাইপ ফাউন্ড্রির একজন শ্রমিকের মাসিক মজুরি সর্বনিম্ন ৫২১ টাকা। আর পেট্রোল পাম্পের একজন শ্রমিক বা কর্মচারীর ন্যূনতম মজুরি ৭৯২ টাকা। তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণে বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে এখন আলোচনা চলছে। কিছুদিন পূর্বে বোর্ড গঠনের পর উক্ত বোর্ড একটি বৈঠক করে এবং এবং সেখানে শ্রমিক ও মালিক পক্ষ মজুরি বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে।

বাংলাদেশে সম্প্রতি গার্মেন্টস ও পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের নিয়ে অনেক কথাবার্তা, দাবি-দাওয়া উঠলেও বাকি পেশার শ্রমিকরা আলোচনার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। নিচে বিভিন্ন শিল্প খাতের শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির হার উল্লেখ করা হলো[২০৬] :

ক্রম	শ্রমিকের পেশা		মজুরি	ক্রম	শ্রমিকের পেশা		মজুরি
১	দর্জি কারখানা	:	৪,৮৫০	২০	নির্মাণ ও কাঠ শিল্প	:	৯,৯৮৩
২	ট্যানারি	:	১২,৮০০	২১	প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রিজ	:	৫,১০০
৩	জাহাজ ভাঙ্গা	:	১৬,০০০	২২	রাইস মিল	:	৫,৫২০
৪	চা প্যাকেটিং	:	৭,০৮০	২৩	বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি (কর্মচারী)	:	২,৪৩২

২০৫.https://bn.wikipedia.org/wiki/ visited on 01.05.2019
২০৬.http://mwb.portal.gov.bd/site/news/, visited on 05.09.2019

Dhaka University Institutional Repository

ক্রম	শ্রমিকের পেশা		মজুরি	ক্রম	শ্রমিকের পেশা		মজুরি
৫	ফার্মাসিউটিক্যাল	:	৮,০৫০	২৪	এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল ইন্ডাস্ট্রিজ	:	৪,৩৫০
৬	সোপ এন্ড কসমেটিকস (কর্মচারী)	:	৫,৬৪০	২৫	সল্ট ক্রাশিং	:	৫,৩০০
৭	হোসিয়ারি	:	৪,৬৫০	২৬	কটন টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিজ	:	৩,৩০৩
৮	হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট	:	৩,৭১০	২৭	হোমিওপ্যাথ কারখানা	:	৫,২০১
৯	চিংড়ি	:	৪,৪১৯	২৮	রি-রোলিং মিলস (কর্মচারী)	:	৫,২০০
১০	'স' মিলস	:	৬,৮৫০	২৯	প্রিন্টিং প্রেস (কর্মচারী)	:	৫,০০০
১১	জুট প্রেস এন্ড বেলিং	:	৪,৮৫০	৩০	গ্লাস এন্ড সিলিকেটস	:	৫,০০০
১২	গার্মেন্টস	:	৫,৩০০	৩১	ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রডাক্টস	:	৭,৪২০
১৩	ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ	:	৪,৫৬০	৩২	ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহণ	:	৬,৩০০
১৪	জুতা কারখানা (কর্মচারী)	:	৪,১০১	৩৩	চা বাগান (কর্মচারী)	:	১,৯৭৮
১৫	সিনেমা হল	:	২,৬১০	৩৪	আয়রন ফাউন্ড্রি এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ	:	৪,২৪০
১৬	রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ	:	৪,৯৫০	৩৫	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ	:	১,৯৩০
১৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল	:	৪,৩৮০	৩৬	আয়ুর্বেদিক কারখানা	:	৪,৩৫০
১৮	ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প	:	৩,০০০	৩৭	পেট্রোল পাম্প	:	৭৯২
১৯	কোল্ড স্টোরেজ	:	৬,০৫০	৩৮	টাইপ ফাউন্ড্রি	:	৫২১

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের উপাত্ত অনুযায়ী, ন্যূনতম মজুরির দিক থেকে এগিয়ে আছে জাহাজ ভাঙ্গা (১৬০০০), ট্যানারি (১২৮০০), নির্মাণ ও কাঠ শিল্প (১০০০০), ফার্মাসিউটিক্যাল (৮০৫০), ওয়েল মিলস এন্ড ভেজিটেবল প্রোডাক্টস (৭৪২০) এবং 'স' মিলস (৬৮৫০ টাকা)। অপরদিকে, টাইপ ফাউন্ড্রি ও পেট্রোল পাম্প ছাড়া, ন্যূনতম মজুরির দিকে পিছিয়ে থাকা শ্রম খাতগুলো হলো : অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (১৯৩০), চা বাগান (১৯৭৮), বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি (২৪৩২), সিনেমা হল (২৬১০) এবং কৃষি ও গৃহ ছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প কারখানা (৩০০০ টাকা)। তবে নিম্নতম মজুরি বোর্ডে গার্মেন্টস, গ্লাস এন্ড সিলিকেট, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি, এ্যালুমিনিয়াম এন্ড এনামেল এবং সিকিউরিটি সার্ভিস– এ ছয়টি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নের কাজ চলছে বলে জানানো হয়েছে।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডে রি-রোলিং মিলস, রাইস মিল, প্লাস্টিক, ব্যক্তি মালিকানাধীন পাটকল, সিকিউরিটি সার্ভিস, ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহণ ও চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা– এ ৭টি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকগণের জন্য নিম্নতম মজুরি হারের সুপারিশ প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩টি– এ্যলুমিনিয়াম এন্ড এনামেল, গার্মেন্টস ও গ্লাস এন্ড সিলিকেট শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা হয়েছে। নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৭টি– চা প্যাকেটিং, জাহাজ ভাঙ্গা, ট্যানারি, দর্জি কারখানা, কটন টেক্সটাইল, বেকারি, বিস্কুট ও কনফেকশনারি ও অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি হার নির্ধারণ করা হয়েছে।[২০৭]

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মজুর ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষের সীমাহীন পরিশ্রমের ফলেই সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মানুষের মৌলিক চাহিদা সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তাসমূহ নিশ্চিত হচ্ছে। সেই শ্রমিক শ্রেণির মানুষেরও তদ্রূপ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অন্যান্য শ্রেণির মানুষেরও নৈতিক ও মানবিক কর্তব্য।

২০৭.http://mwb.portal.gov.bd/site/news/, visited on 05.09.2019

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বিশ্বের বিরল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন একটি দেশ। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করে হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও উপজাতি সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠী। সকলেই তাদের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার ভোগ করে আসছে আবহমান কাল থেকে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে এ দেশের সরকার কর্তৃক প্রণীত হয়েছে নানাবিধ আইন, নীতিমালা ও অধ্যাদেশ। এসব আইন, নীতিমালা ও অধ্যাদেশ বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম অধ্যুষিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ইসলামি আইনের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি-বিধানও পরিপালিত হয়ে থাকে সামাজিকভাবে। এ সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও ভুক্তভোগীদের মনে লুকিয়ে রয়েছে অনেক চিন্তা-ভাবনা। তাদের সেসব চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বর্তমান স্তরে উপনীত হতে জোরালোভাবে সহযোগিতা করেছে।

জরিপের উদ্দেশ্য : বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহ প্রচলিত আইন ও নীতিমালা অনুসরণপূর্বক দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপকহারে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমেই দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে ইসলামি নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় এদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সর্বদাই ইসলামি রীতিনীতি ও পদ্ধতির অনুসরণে পরিপালিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত হয় সরকার কর্তৃক প্রণীত কর্মসূচি ও আবহমান কাল থেকে প্রচলিত ইসলামি রীতি-নীতির সমন্বয়ে। দেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামি আইনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিচালিত করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এসব বিষয়ে সমাজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও সাধারণ শ্রেণির ভুক্তভোগীগণ কতটুকু জানেন এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে।

জরিপ পদ্ধতি : এটি একটি প্রাথমিক গবেষণা জরিপ। ২০১৮ সালের ১০ মার্চ হতে ১০ জুলাই পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫০ জন বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ নাগরিকের মধ্য থেকে ৫০ জন ভুক্তভোগীর উপর এ জরিপ পরিচালিত হয়েছে। প্রদত্ত প্রশ্নমালার আলোকে গৃহীত বক্তব্য সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে সারণিবদ্ধভাবে উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সারণির নিচে উপাত্ত বিশ্লেষণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞগণের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ়করণ সাপেক্ষে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার স্বার্থে অসামান্য অবদান রেখে চলেছেন। বিশেষজ্ঞগণ তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতার আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দৃঢ়তার সাথে কাজ করছেন। প্রশ্নমালার এ অংশে বিশেষজ্ঞগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত বিশেষজ্ঞগণের সামনে ৩০টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম ৩টি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে উত্তরদাতার নাম, পেশা ও পদবী সংক্রান্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নদ্বয় ছিল যথাক্রমে উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক; যা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : বিশেষজ্ঞগণের বয়স/জন্ম তারিখ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৫০ বছর ও তদুর্ধ্ব	৩০	৬০
	৩০-৫০ বছর	২০	৪০
	৩০ বছরের নিচে	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভূক্ত গণসংখ্যা।

প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে সর্বোচ্ছ শতকরা ৬০ ভাগের বয়স ৩০-৫০ বছরের মধ্যে, ৪০ ভাগের বয়স ৫০ বছরের উর্ধ্বে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কারও বয়স ৩০ বছরের নিচে ছিল না।

সারণি-২ : বিশেষজ্ঞগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	পোস্ট গ্রাজুয়েট	৪৫	৯০
	অন্যান্য	৫	১০
	গ্রাজুয়েট	-	-
	এইচ.এস.সি	-	-
	এস.এস.সি	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২নং সারণিতে বিশেষজ্ঞগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ৫০ জন বিশেষজ্ঞের মধ্যে সর্বোচ্চ ৯০% পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী ও ১০% অন্যান্য ডিগ্রিধারী। উল্লেখ্য যে, জরিপে

Dhaka University Institutional Repository

অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেউই শুধুমাত্র এস.এস.সি, এইচ.এস.সি ও গ্রাজুয়েট পাশ ছিলেন না।

সারণি-৩ : বিশেষজ্ঞগণের পেশাভিত্তিক তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
আপনার পেশা কি?	চাকুরি	৩৫	৭০
	ব্যবসা	৮	১৬
	রাজনীতি	৭	১৪
	অন্যান্য	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% চাকুরি, ১৬% ব্যবসা ও ১৪% রাজনীতির সাথে জড়িত আছেন। অন্যান্য পেশায় কর্মরত আছেন বলে কেউই মতামত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-৪ : পেশা নির্বাচন করার কারণ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
আপনি বর্তমান এই পেশা কেন বেছে নিলেন?	কোনোটিই নয়	২০	৪০
	স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করার জন্য	১২	২৪
	ইসলামি আইন বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য	৮	১৬
	স্মার্ট সেলারি প্রাপ্তির জন্য	৬	১২
	বাংলাদেশের প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে অংশ নিতে	৩	৬
	সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য	১	২
	নিরুপায় হয়ে	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পেশা নির্বাচনের কারণ হিসেবে ৪০ শতাংশ কোনোটিই নয়, ২৪ শতাংশ স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করার জন্য, ১৬ শতাংশ ইসলামি আইন বাস্তবায়নে অবদান রাখর জন্য, ১২ শতাংশ স্মার্ট সেলারি প্রাপ্তির জন্য, ৬ শতাংশ বাংলাদেশের প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে অংশ নিতে ও ২ শতাংশ সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। নিরুপায় হয়ে পেশা গ্রহণ করেছেন বলে কেউ মত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-৫ : ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্য কতটুকু?	সম্পূর্ণ	৩০	৬০
	মোটামুটি	১২	২৪
	তেমন পার্থক্য নেই	৫	১০
	মন্তব্য নেই	৩	৬
	স্বল্প	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৫নং সারণিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্যের ব্যাপারে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ সম্পূর্ণ ৬০%। এছাড়া, মোটামুটি ২৪%, তেমন পার্থক্য নেই ১০% ও মন্তব্য নেই ৬% বিশেষজ্ঞ। স্বল্প বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি।

সারণি-৬ : সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইসলামি আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইসলামি আইনসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	অনেক	২৫	৫০
	মোটামুটি	২০	৪০
	স্বল্প	৫	১০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইসলামি আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন পর্যায়ক্রমে অনেক ৫০%, মোটামুটি ৪০% ও স্বল্প ১০%। তেমন ভূমিকা রাখছে না ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি।

সারণি-৭ : সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাংলাদেশি আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাংলাদেশি আইনসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?	মোটামুটি	২০	৪০
	অনেক	১৬	৩২
	স্বল্প	১৪	২৮
	তেমন ভূমিকা নেই	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাংলাদেশি আইনসমূহের ভূমিকা সম্পর্কিত বিষয়ে মোটামুটি ৪০%, অনেক ৩২%, স্বল্প ২৮% বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তেমন ভূমিকা নেই ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-৮ : সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞগণ কোন ধরনের আইনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কোন ধরনের আইনে আপনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন?	ইসলামি আইন	২৬	৫২
	বাংলাদেশের প্রচলিত আইন	১৯	৩৮
	মন্তব্য নেই	৫	১০
	বৃটিশ আইন	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞগণ কোন ধরনের আইনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে বিষয়ে ৫২% মত ব্যক্ত করেছেন ইসলামি আইন, ৩৮% বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, ১০% মন্তব্য নেই। বৃটিশ আইনে কেউ মত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-৯ : বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক	সম্পূর্ণ সম্ভব	৩৫	৭০

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না?	মোটামুটি সম্ভব	১০	২০
	স্বল্প সম্ভব	৫	১০
	সম্ভব না	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

পূর্বোক্ত ৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না সে সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৭০% সম্পূর্ণ সম্ভব। এরপর ২০% মোটামুটি সম্ভব ও স্বল্প সম্ভব, ১০%। সম্ভব না ও মন্তব্য নেই বলে কারো মত পাওয়া যায়নি।

সারণি-১০ : সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ সম্পর্কে জনগণ কতখানি জানেন সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ সম্পর্কে জনগণ কতখানি জানেন?	স্বল্প	২৫	৫০
	মোটামুটি	২০	৪০
	তেমন কিছু জানেনা	৫	১০
	সম্পূর্ণ	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ সম্পর্কে জনগণ কতখানি জানেন সে বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫০% স্বল্প। এরপর ৪০% মোটামুটি, ১০% তেমন কিছু জানে না। সম্পূর্ণ ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-১১ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশি আইন কতখানি কার্যকর হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশি আইন কতখানি কার্যকর হয়েছে?	স্বল্প	৩০	৬০
	মোটামুটি	১৮	৩৮
	পর্যাপ্ত	২	৪
	মোটেও না	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশি আইন কতখানি কার্যকর হয়েছে সে সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬০% স্বল্প। এরপর মোটামুটি ৩৮% ও পর্যাপ্ত ৪%। মোটেও না ও মন্তব্য নেই বলে কারো মত পাওয়া যায়নি।

সারণি-১২ : ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন?	আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা	২৫	৫০
	আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অসহযোগিতা	১২	২৪
	ঘুষ ও দুর্নীতি	১০	২০
	চাপ প্রয়োগ	২	৪
	আঞ্চলিকতা ও স্বজনপ্রীতির সমস্যা	১	২
	কোনো সমস্যা নেই	-	-

Dhaka University Institutional Repository

	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত **১২**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা, এরপর ২৪% আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অসহযোগিতা, ২০% ঘুষ ও দুর্নীতি, ৪% চাপ প্রয়োগ ও ২% আঞ্চলিকতা ও স্বজনপ্রীতির সমস্যা বলে মত দিয়েছেন। কোনো সমস্যা নেই ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-১৩ : ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
ইসলামিআইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা	৩৮	৭৬
	জনগণকে মোটিভিশন	৬	১২
	দ্রুত সেবা প্রদান	৪	৮
	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	২	৪
	কোনো সমস্যা নেই	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত **১৩**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণ ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে সর্বোচ্চ ৭৬% রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা, ১২% জনগণকে মোটিভিশন, ৮% দ্রুত সেবা প্রদান ও ৪% যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান বলে মত দিয়েছেন। কোনো সমস্যা নেই ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-১৪ : নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	সম্পূর্ণ	২০	৪০
	মোটামুটি	১৪	২৮
	তেমন ভুমিকা রাখছে না	১১	২২
	স্বল্প	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত **১৪**নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৪০% সম্পূর্ণ। এরপর ২৮% মোটামুটি, ২২% তেমন ভুমিকা রাখছে না ও ২% স্বল্প। মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেনি।

সারণি-১৫ : নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে	মোটামুটি	৪০	৮০
	সম্পূর্ণ	৫	১০

পারছে?	স্বল্প	৪	৮
	মন্তব্য নেই	১	২
	ভূমিকা রাখছে না	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণ নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৮০% মোটামুটি, ১০% সম্পূর্ণ, ৮% স্বল্প, ২% মন্তব্য নেই। ভূমিকা রাখছে না মর্মে কেউ মন্তব্য করেননি।

সারণি-১৬ : শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	মোটামুটি	২০	৪০
	সম্পূর্ণ	১৫	৩০
	স্বল্প	১০	২০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	৪	৮
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% মোটামুটি। এরপর ৩০% সম্পূর্ণ, ২০% স্বল্প, তেমন ভূমিকা রাখছে না ৮% ও মন্তব্য নেই ২%।

সারণি-১৭ : শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	মোটামুটি	৪০	৮০
	সম্পূর্ণ	৫	১০
	স্বল্প	৪	৮
	মন্তব্য নেই	১	২
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% মোটামুটি। এরপর ১০% সম্পূর্ণ, ৮% স্বল্প ও মন্তব্য নেই ২%। এ অংশে তেমন ভূমিকা রাখছে না প্রশ্নে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৮ : শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন	মোটামুটি	২০	৪০

Dhaka University Institutional Repository

কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	অনেক	১৫	৩০
	তেমন ভূমিকা রাখছে না	১০	২০
	স্বল্প	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% মোটামুটি। এরপর ৩০% অনেক, তেমন ভূমিকা রাখছে না ২০% ও ১০% স্বল্প। মন্তব্য নেই মর্মে কেউ মত প্রদান করেননি।

সারণি-১৯ : শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	মোটামুটি	৪০	৮০
	অনেক	৬	১২
	স্বল্প	৪	৮
	তেমন ওয়াকিফহাল নই	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% মোটামুটি। এরপর ১২% অনেক ও ২% স্বল্প। তবে তেমন ওয়াকিফহাল নই ও মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২০ : বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রয়োগ করে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রয়োগ করে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না?	মোটামুটি	২৫	৫০
	স্বল্প	১৩	২৬
	সম্পূর্ণ	৭	১৪
	মোটেও নয়	৩	৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২০নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রয়োগ করে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতা বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে ৫০% মোটামুটি। ২৬% স্বল্প, ১৪% সম্পূর্ণ, ৬% মোটেও নয় ও ৪% মন্তব্য নেই।

সারণি-২১ : বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রচলিত আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রচলিত আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না?	মোটামুটি	৩৫	৭০
	স্বল্প	১৪	২৮
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোটেও নয়	-	-
	সম্পূর্ণ	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২১নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণ বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রচলিত আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৭০% মোটামুটি। এরপর ২৮% স্বল্প ও ২% মন্তব্য নেই। মোটেও নয় ও সম্পূর্ণ বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২২ : বিশ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি আইনের সক্ষমতা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বিশ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কতখানি সক্ষম?	পুরোপুরি সক্ষম	৩০	৬০
	মোটামুটি সক্ষম	১৪	২৮
	স্বল্প সক্ষম	৫	১০
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোটেও সক্ষম নয়	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২২নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি আইনের সক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% পুরোপুরি সক্ষম। এরপর ২৮% মোটামুটি, ১০% স্বল্প সক্ষম ও ২% মন্তব্য নেই। এখানে মোটেও সক্ষম নয় বলে কেউ উল্লেখ করেননি।

সারণি-২৩ : বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর হতে পারে?	ইসলামি আইন বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে	৩০	৬০
	উপরের সবগুলো	১৩	২৬
	স্বতন্ত্র ইসলামি আইন প্রবর্তন করে	৫	১০
	নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৩নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% ইসলামি আইন বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে, ২৬% উপরের সবগুলো, ১০% স্বতন্ত্র ইসলামি আইন প্রবর্তন করে ও ৪% নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে।

সারণি-২৪ : বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে সামাজিক	উপরের সবগুলো	১৭	৩৪

Dhaka University Institutional Repository

নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় কি?	রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা	১৫	৩০
	রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার	১২	২৪
	নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটানো	৪	৮
	জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রতকরণ	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৪নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৪% উপরের সবগুলো। এরপর ৩০% রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা, ২৪% রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার, ৮% নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটানো ও ৪% জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রতকরণ।

সারণি-২৫ : সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার অধিক কার্যকরী কোনটি সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
আপনি কী মনে করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রচলিত আইন অপেক্ষা অধিক কার্যকর?	অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর	৩৫	৭০
	মোটামুটি কার্যকর	১০	২০
	মন্তব্য নেই	৩	৬
	অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর	২	৪
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৫নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার অধিক কার্যকরী কোনটি সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর। এরপর ২০% মোটামুটি কার্যকর, ৬% মন্তব্য নেই ও ৪% অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর।

সারণি-২৬ : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রক্ষা করা সম্ভব এতদ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রক্ষা করা সম্ভব?	বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় ইসলামি আইনের প্রসার ঘটানো	১৫	৩০
	উপরের সবগুলো	১২	২৪
	সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণই আইনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত	৮	১৬
	উপযুক্ত আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইন কার্যকরীকরণ ও প্রয়োগে অধিক জোর দেয়া উচিত	৬	১২
	বাংলাদেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য দেয়া	৫	১০
	শক্তিশালী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুনিশ্চিতকরণ	৪	৮
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৬নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রক্ষা করা সম্ভব এতদ সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩০% বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় ইসলামি আইনের প্রসার ঘটানো।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ২৪% উপরের সবগুলো, ১৬% সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণই আইনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত, ১২% উপযুক্ত আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইন কার্যকরীকরণ ও প্রয়োগে অধিক জোর দেয়া উচিত, ১০% বাংলাদেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য দেয়া ও ৮% শক্তিশালী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুনিশ্চিতকরণ।

সারণি-২৭ : বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে না কেন?	রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার অভাব রয়েছে	২২	৪৪
	সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়	১৮	৩৬
	ইসলামি আইনের প্রয়োগ নেই	১০	২০
	বর্তমানে প্রচলিত আইন ত্রুটিপূর্ণ	-	-
	বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য না দেয়া	-	-
মোট		৫০	১০০

পূর্বোক্ত ২৭নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত না হওয়ার কারণ সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪৪% রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার অভাব রয়েছে। এরপর ৩৬% সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, ২০% ইসলামি আইনের প্রয়োগ নেই। এখানে বর্তমানে প্রচলিত আইন ত্রুটিপূর্ণ ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য না দেয়ার বিষয়ে কেউ মত উল্লেখ করেননি।

বাস্তবিকপক্ষে বলা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৫০ জন সম্মানিত সমাজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের নিকট পৌঁছা সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের বয়স ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল (দ্র. সারণি-১) এবং তাদের সর্বোচ্চ সংখ্যক পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারি (দ্র. সারণি-২)। এ বিশেষজ্ঞগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে জানা গেছে ইসলামি আইন ও বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রচলিত আইন পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামি সামাজিক বিধিমালা সংক্রান্ত আচার ও বাংলাদেশের আইন, বিচার ও শাসন বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। তবে বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত না হওয়ার কারণ হলো জাতীয় নেতাদের মাঝে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার যথাযথ প্রতিফলন ঘটছে না। সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় পরিলক্ষিত হচ্ছে (দ্র. সারণি-২৭)। এছাড়া, এদেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামি আইনের পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগও নেই। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে এগুলো বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। এরপরও তারা আশাবাদী যে, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বাংলাদেশে প্রচলিত আইনসমূহকে যদি ইসলামি আইনের সাথে ব্যাপকভাবে সমন্বয় সাধন করে সামাজিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তবে দূর অতীতে যেমন সমাজে স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা বিরাজ করত আজও তা সম্ভব। বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সমাজব্যবস্থা ইসলামি আইন ও বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক এটাই একান্ত কাম্য।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভুক্তভোগীগণের দৃষ্টিতে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিশেষজ্ঞগণের পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছে। ভুক্তভোগীদের মতামত ও অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকারও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে গতিশীল করতে পারছেন। প্রশ্নমালার এ অংশে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকাণ্ডে আক্রান্ত ভুক্তভোগীগণের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

এখানে সম্মানিত ভুক্তভোগীগণের সামনে ২৬টি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল যার প্রথম তিনটি প্রশ্ন ছিল যথাক্রমে মতামত ব্যক্তকারীর নাম, পেশা ও পদবী সম্পর্কিত বিষয়ে। চতুর্থ ও পঞ্চম প্রশ্নদ্বয় ছিল যথাক্রমে উত্তরদাতার বয়স/জন্ম তারিখ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ক, যা তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। নিচে প্রশ্নমালার আলোকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপিত হলো :

সারণি-১ : ভুক্তভোগীগণের বয়স/জন্ম তারিখ সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা (N = ৫০)*	শতকরা হার (%)
বয়স/জন্ম তারিখ	৩০-৫০ বছর	৩৫	৭০
	২০-৩০ বছর	১০	২০
	২০ বছরের নিচে	৫	১০
	৫০ বছর ও তদুর্দ্ধ	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

* N = গবেষণার অন্তর্ভুক্ত গণসংখ্যা।

ভুক্তভোগীগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার উপরোক্ত ৪নং প্রশ্নে উত্তরের জন্য কোন নির্দেশনা ছিল না। উত্তরদাতাগণের প্রদত্ত বয়স/জন্ম তারিখ থেকেই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। উপরোক্ত ১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫০ জন ভুক্তভোগীর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% মত দিয়েছেন; যাদের বয়স ৩০-৫০ বছরের মধ্যে। ২০% উত্তর দিয়েছেন ২০-৩০ বছর বয়সী ও ১০% এর বয়স ২০ বছরের নিচে। উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে কারও বয়স ৫০ বছরের ঊর্ধ্বে ছিল না।

সারণি-২ : ভুক্তভোগীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	গ্রাজুয়েট	২০	৪০
	এস.এস.সি	১৫	৩০
	অষ্টম শ্রেণি পাশ	৮	১৬
	এইচ.এস.সি	৫	১০
	অন্যান্য	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভুক্তভোগীগণের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালার ৫নং প্রশ্নে উত্তরদাতাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতাদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোচ্চ ৪০% গ্রাজুয়েট। এরপর ৩০% এস.এস.সি, ১৬% অষ্টম শ্রেণি পাশ, ১০% এইচ.এস.সি ও অন্যান্য ৪%।

সারণি-৩ : ভুক্তভোগীগণের পেশা সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
আপনার পেশা কি?	চাকুরি	৩০	৬০
	অন্যান্য	১৫	৩০
	ব্যবসা	৩	৬
	রাজনীতি	২	৪
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৩ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভুক্তভোগীগণের পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৬০% চাকুরি পেশায় নিয়োজিত। এরপর ৩০% অন্যান্য পেশায়, ৬% ব্যবসায়ী ও ৪% রাজনীতির সাথে জড়িত।

সারণি-৩১ : ভুক্তভোগীগণের পেশার সেক্টরভিত্তিক ধরন সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
আপনার উক্ত পেশার সেক্টরভিত্তিক ধরন কি?	অন্যান্য	২০	৪০
	তৈরি পোশাক	১৫	৩০
	পরিবহণ	১০	২০
	কৃষি	৫	১০
	চা শিল্প	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৪ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ভুক্তভোগীগণের পেশার সেক্টরভিত্তিক ধরন সংক্রান্ত বিষয়ে উত্তরদাতাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% অন্যান্য সেক্টরে কর্মরত। এছাড়া, ৩০% তৈরি পোশাক শিল্পে, ২০% পরিবহণ সেক্টরে ও ১০% কৃষি খাতে কাজ করেন। এখানে চা শিল্পের কোনো ভুক্তভোগী পাওয়া যায়নি।

সারণি-৫ : সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে ভুক্তভোগীর ধারণা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু?	মোটামুটি	২৫	৫০
	স্বল্প	১৫	৩০
	তেমন অবহিত নই	৭	১৪
	মন্তব্য নেই	৩	৬
	সম্পূর্ণ	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৫ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে ভুক্তভোগীর ধারণা সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% মোটামুটি। এছাড়া, ৩০% স্বল্প, ১৪% তেমন অবহিত নই ও ৬% মন্তব্য নেই। এখানে সম্পূর্ণ বলে কেউ মত প্রদান করেননি।

সারণি-৬ : বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ধরন সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা কিরূপ?	তেমন ভাল নয়	৩৫	৭০
	স্বল্প ভাল	১০	২০
	মোটামুটি ভাল	৪	৮

Dhaka University Institutional Repository

	অনেক ভাল	১	২
	মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

পূর্বোক্ত ৬ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তার ধরন সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% তেমন ভাল নয়, ২০% স্বল্প ভাল, ৮% মোটামুটি ভাল ও ২% অনেক ভাল। মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৭ : বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা কিরূপ?	স্বল্প ভাল	২০	৪০
	তেমন ভাল নয়	১৮	৩৬
	মোটামুটি ভাল	১১	২২
	মন্তব্য নেই	১	২
	অনেক ভাল	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৭ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে নারীর সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% স্বল্প ভাল। এছাড়া, ৩৬% তেমন ভাল নয়, ২২% মোটামুটি ভাল ও ২% মন্তব্য নেই। এখানে অনেক ভাল বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-৮ : বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কিরূপ?	তেমন ভাল নয়	২৫	৫০
	স্বল্প ভাল	১৫	৩০
	মোটামুটি ভাল	১০	২০
	অনেক ভাল	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ৮ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% তেমন ভাল নয়। এছাড়া, ৩০% স্বল্প ভাল, ২০% মোটামুটি ভাল। এখানে অনেক ভাল ও মন্তব্য নেই মর্মে কারও মত পাওয়া যায়নি।

সারণি-৯ : বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের সম্ভবনা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না?	সম্পূর্ণ সম্ভব	২৮	৫৬
	মোটামুটি সম্ভব	১৫	৩০
	স্বল্প সম্ভব	৭	১৪
	সম্ভব না	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ৯ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের সম্ভবনা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর প্রদান করেছেন জরিপে অংশগ্রহণকারী ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬% সম্পূর্ণ সম্ভব। এছাড়া, ৩০% মোটামুটি সম্ভব, ১৪% স্বল্প সম্ভব ও ১০% সম্ভব না। এ অংশে মন্তব্য নেই বলে কেউ মত দেননি।

সারণি-১০ : বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের সম্ভবনা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না?	মোটামুটি সম্ভব	২০	৪০
	স্বল্প সম্ভব	১৫	৩০
	সম্ভব না	১০	২০
	সম্পূর্ণ সম্ভব	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১০ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নের সম্ভবনা সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% মোটামুটি সম্ভব। এছাড়া, ৩০% স্বল্প সম্ভব, ২০% সম্ভব না ও ১০% সম্পূর্ণ সম্ভব। এখানে মন্তব্য নেই কেউ মত দেননি।

সারণি-১১ : প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতখানি কার্যকর রয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতখানি কার্যকর রয়েছে?	মোটামুটি	২০	৪০
	স্বল্প	১৫	৩০
	পর্যাপ্ত	১০	২০
	মোটেও না	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতখানি কার্যকর রয়েছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৪০% মোটামুটি। এছাড়া, ৩০% স্বল্প, ২০% পর্যাপ্ত ও ১০% মোটেও না। এখানে মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১২ : ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা রয়েছে?	আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা	৩০	৬০
	আইন প্রয়োগকারী সংস্থারগুলির অসহযোগিতা	১৫	৩০
	চাপ প্রয়োগ	৫	১০
	কোনো সমস্যা নেই	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত ১২ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়ে বেশির ভাগই বলেছেন দীর্ঘসূত্রিতা ৬০% ভুক্তভোগী। এছাড়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থারগুলির অসহযোগিতা বিষয়ে ৩০% ও চাপ প্রয়োগ বলে ১০% মত দিয়েছেন। এখানে কোন সমস্যা নেই ও মন্তব্য নেই বলে কেউ মত প্রকাশ করেননি।

সারণি-১৩ : ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় কি?	আইন প্রয়োগে দ্রুত সেবা প্রদান	২৫	৫০
	জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি	১৫	৩০
	যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান	৮	১৬
	মন্তব্য নেই	২	৪
	কোন সমস্যা নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৩ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে করণীয় সম্পর্কিত বিষয়ে ভুক্তভোগীগণ জবাব দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৫০% আইন প্রয়োগে দ্রুত সেবা প্রদান। এছাড়া, ৩০% বলেছেন জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, ১৬% যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৪% বলেছেন মন্তব্য নেই। কোনো সমস্যা নেই বলে কেউ মত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-১৪ : নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	মোটামুটি	২৫	৫০
	সম্পূর্ণ	১৫	৩০
	স্বল্প	৮	১৬
	তেমন ভুমিকা রাখছে না	২	৪
	মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৪ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে জরিপে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% মোটামুটি। এছাড়া, ৩০% সম্পূর্ণ, ১৬% স্বল্প ও ৪% তেমন ভুমিকা রাখছে না। এখানে মন্তব্য নেই বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৫ : নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	মোটামুটি	৩৫	৭০
	স্বল্প	৮	১৬
	ভূমিকা রাখছে না	৫	১০
	মন্তব্য নেই	২	৪
	সম্পূর্ণ	-	-

Dhaka University Institutional Repository

	মোট	৫০	১০০

উপরোক্ত ১৫ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% মোটামুটি। এছাড়া, ১৬% স্বল্প, ১০% ভূমিকা রাখছে না ও ৪% মন্তব্য নেই বলে মত দিয়েছেন। এখানে সম্পূর্ণ বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-১৬ : শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	তেমন ভুমিকা রাখছে না	২০	৪০
	মোটামুটি	১৫	৩০
	সম্পূর্ণ	১০	২০
	স্বল্প	৫	১০
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৬ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন উত্তরদাতাগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৪০% তেমন ভুমিকা রাখছে না। এছাড়া, ৩০% মোটামুটি, ২০% সম্পূর্ণ ও ১০% স্বল্প বলে উল্লেখ করেছেন। মন্তব্য নেই বলে কেউ মত ব্যক্ত করেননি।

সারণি-১৭ : শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	তেমন ভূমিকা রাখছে না	৩৫	৭০
	মোটামুটি	১০	২০
	স্বল্প	৫	১০
	সম্পূর্ণ	-	-
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৭ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে মত দিয়েছেন অংশ গ্রহণকারীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৭০% তেমন ভূমিকা রাখছে না। এছাড়া, ২০% মোটামুটি ও ১০% স্বল্প। এখানে সম্পূর্ণ ও মন্তব্য নেই বলে কারও মত পাওয়া যায়নি।

সারণি-১৮ : শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	তেমন ভূমিকা রাখছে না	২৫	৫০
	স্বল্প	১৫	৩০
	মোটামুটি	৭	১৪
	অনেক	৩	৬

Dhaka University Institutional Repository

	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৮ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সম্পর্কিত বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০% তেমন ভূমিকা রাখছে না। তারপর ৩০% স্বল্প, ১৪% মোটামুটি, ৬% অনেক। তবে মন্তব্য নেই বলে কেউ মতামত উল্লেখ করেননি।

সারণি-১৯ : শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?	তেমন ওয়াকিফহাল নয়	২৬	৫২
	স্বল্প	১৪	২৮
	মোটামুটি	৮	১৬
	অনেক	২	৪
	মন্তব্য নেই	-	-
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ১৯ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে মত দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫২% তেমন ওয়াকিফহাল নয়। এরপর ২৮% স্বল্প, ১৬% মোটামুটি, ৪% অনেক। তবে মন্তব্য নেই বলে এ বিষয়ে কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

সারণি-২০ : সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সংক্রান্ত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না?	মোটামুটি	২৯	৫৮
	স্বল্প	১৫	৩০
	মোটেও নয়	৩	৬
	সম্পূর্ণ	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
	মোট	**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২০ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব দিয়েছেন ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৮% মোটামুটি। এরপর ৩০% স্বল্প, ৬% মোটেও নয়, সম্পূর্ণ ৪% ও ২% মন্তব্য নেই।

সারণি-২১ : সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না?	মোটামুটি	২৬	৫২
	স্বল্প	১৪	২৮
	মোটেও নয়	৭	১৪

Dhaka University Institutional Repository

	সম্পূর্ণ	২	৪
	মন্তব্য নেই	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২১ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে কি-না সে সম্পর্কিত সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত দিয়েছেন জরিপে অংশগ্রহণকারি ভুক্তভোগীগণের মধ্যে সর্বোচ্চ ৫২% মোটামুটি। এছাড়া, ২৮% স্বল্প, ১৪% মোটেও নয়, ৪% সম্পূর্ণ ও ২% ভুক্তভোগীর কোনো মন্তব্য নেই।

সারণি-২২ : বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন?	খুব ভাল না	৩২	৬৪
	মোটামুটি ভাল	১০	২০
	মোটেও ভাল নয়	৫	১০
	ভাল	৩	৬
	মন্তব্য নেই	-	-
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২২ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, উত্তরদাতা ভুক্তভোগীগণের মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি সম্পর্কে উত্তর দিয়েছেন সর্বোচ্চ ৬৪% খুব ভাল না। এছাড়া, ২০% মোটামুটি ভাল, ১০% মোটেও ভাল নয় ও ৬% ভাল। তবে মন্তব্য নেই বলে কারো মতামত পাওয়া যায়নি।

সারণি-২৩ : বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় সম্পর্কিত তথ্য

প্রশ্নের ধরন	নির্দেশিত উত্তরমালা	গণসংখ্যা	(%)
বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় কি?	উপরের সবগুলো	৩৪	৬৮
	রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা	১০	২০
	রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা	৩	৬
	নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে	২	৪
	জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রত করণ	১	২
মোট		**৫০**	**১০০**

উপরোক্ত ২৩ নং সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় প্রসঙ্গে উত্তরদাতা ভুক্তভোগীগণের মধ্যে মত ব্যক্ত করেছেন সর্বোচ্চ ৬৮% উপরের সবগুলো। এছাড়া, ২০% রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা, ৬% রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার প্রতিফলন, ৪% নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ও ২% জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রত করণ দরকার বলে।

মূলত দেখা যায় যে, গবেষণাকর্ম বাস্তবমুখী করার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৫০ জন সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ভুক্তভোগীর কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। জরিপে দেখা গেছে অধিকাংশ ভুক্তভোগীর বয়স ৩০-৫০ বছর সীমার মধ্যে ছিল (দ্র. সারণি-১)। সর্বোচ্চ সংখ্যক ভুক্তভোগী গ্রাজুয়েট ডিগ্রিধারী (দ্র. সারণি-২)। এসব ভুক্তভোগীগণের মূল্যবান মতামতের আলোকে

Dhaka University Institutional Repository

জানা গেছে ইসলামি সামাজিক রীতিনীতি ও বাংলাদেশে বিদ্যমান প্রচলিত আইন পরিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা মোটামুটি (দ্র. সারণি-১৪-২২)। তবে এখানে ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো হলো আইনি জটিলতা ও আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অসহযোগিতা এবং আইনের প্রয়োগের উপর প্রভাবশালী মহলের চাপ প্রয়োগ (দ্র. সারণি-১২)। এরপরও তারা আশাবাদী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা পূর্বক রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে, নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে এবং জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রতকরণ করতে পারলে (দ্র. সারণি-২৩) বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে সুপারিশ ও করণীয়

বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বলতে নারী, শিশু, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়ে থাকে। অত্র গবেষণালব্ধ জ্ঞানের আলোকে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে তথা ধারাবাহিকভাবে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা, নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে কতিপয় সুপারিশ ও করণীয় নিচে উপস্থাপিত হলো :

সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে কতিপয় সুপারিশ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে নিচের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

- স্থল, নৌ ও আকাশ পথে সড়কের নিরাপত্তা বিধান করা। এ ব্যাপারে ট্রাফিক আইনসহ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় আইন পালনের প্রতি জনগণের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা।
- ভেজাল ও বিষমুক্ত খাদ্য ও পানীয়-এর নিরাপত্তা প্রদান করা। সাথে সাথে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুতদারি ও অধিক হারে মুনাফাখোরি ব্যবস্থার মূলোৎপাটনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সাধারণ মানুষের নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা।
- সকলের জন্য স্বাধীন মতামত প্রকাশের নিরাপত্তা প্রদান।
- পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তির জন্য নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সৎ, মেধাবী ও যোগ্য যুব সমাজের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- দান গ্রহীতা নয়; দাতা সৃষ্টি করার প্রকল্প অধিক হারে গ্রহণ করা আবশ্যক।
- সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পর্কের চেয়ে সামাজিক সম্পর্ককে অগ্রাধিকার প্রদান করা।
- 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতির অনুসরণই পারে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা ফিরিয়ে দিতে।
- ধর্মীয় রীতি-নীতি হৃদয়ে ধারণপূর্বক বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা।
- মুসলিম সমাজে অত্যধিক সালামের প্রচলন করা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় রীতিনীত অনুসরণপূর্বক শিষ্টাচারমূলক অভিবাদন পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন করা।
- চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা।
- পথহারা পথিককে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া।
- সৎ ও ন্যায় কর্মে পারস্পরিক সহযোগিতা করা ও অসৎ ও অন্যায় কর্মে পারস্পরিক সহযোগিতা পরিহার করা।
- সমাজের সকল স্তর থেকে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্বের চির অবসান ঘটিয়ে সুনীতি, ন্যায় ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- দেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করা।

Dhaka University Institutional Repository

- দেশে প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পাশাপাশি ইসলামের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন– যাকাত, সদকা, কুরবানি, ওয়াকফ, মিরাছ, বাইতুল মাল, ‘উশর ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করা।

নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে কতিপয় সুপারিশ : বাংলাদেশে নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে নিচের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

- নারী ও কন্যাশিশুদেরকে সর্বদা ভিন্নভাবে সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি যৌন নিপীড়নসহ সকল প্রকার সহিংসতা ও নির্যাতন বন্ধ করার সামাজিক বলয় গড়ে তোলা।
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে পুত্র ও কন্যার সমঅধিকার নিশ্চিত করা।
- পরিবারগুলোকে নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন প্রতিরোধের সর্বপ্রথম দূর্গ হিসেবে গড়ে তোলা।
- নির্যাতনের শিকার নারী ও কন্যাশিশুদের পাশে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে দাঁড়ানো কর্তব্য।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি নির্যাতনকারীকে রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক আশ্রয়, প্রশ্রয় দেয়া বন্ধ করা।
- উত্যক্তকরণ, যৌনহয়রানি ও নিপীড়নরোধে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের আলোকে পৃথক আইন প্রণয়ন করার ব্যবস্থা করা।
- বিচারিক কাজের সাথে যুক্ত সম্মানিত বিচারকবৃন্দ ও আইনজীবীদের প্রশিক্ষণ সূচিতে নারীর মানবাধিকারের বিষয়টি বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- নারী ও কন্যাশিশু নির্যাতন প্রতিকারের জন্য যে সকল আইন রয়েছে সে আইনগুলো সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন থেকে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
- পারিবারিক সুরক্ষামূলক আইনসহ নারী ও শিশুর প্রতি সংবেদনশীল আইনসমূহ গণমাধ্যমে ব্যাপক হারে প্রচারণার ব্যবস্থা করা।
- জাতিসংঘ শিশু সনদের অনুচ্ছেদ-২ ও ১৬(১)(গ) এর উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করা।
- নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি বিদ্যমান দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে নারী-পুরুষের সমতা ধারণা, নারী ও শিশুর মানবাধিকার ইস্যুসমূহ সমন্বিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার এবং ওসিসি-এর কার্যক্রম দেশব্যাপী আরও বিস্তৃত ও সম্প্রসারণ করা।
- সুনির্দিষ্ট আইনের মাধ্যমে মেডিকোলিগ্যাল পরীক্ষা নিশ্চিত করা।
- বিচার বিভাগের সাংবিধানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করা।
- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক কর্মসূচি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখা।
- নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- সাক্ষীর সুরক্ষা আইন জরুরি ভিত্তিতে প্রণয়ন করা।
- নারী ও শিশুর প্রতি সকল সহিংসতারোধে দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে সচেতন, বলিষ্ঠ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখা।

Dhaka University Institutional Repository

- ধর্ষণের আইনের সংস্কার করতে হবে। ঘটনার শিকার নারী ও কন্যাশিশুর পরিবর্তে অভিযুক্ত অপরাধীকে প্রমাণ করতে হবে সে এ ঘটনা ঘটায়নি। এ মর্মে প্রচলিত আইনের বিধান সংশোধন করা আবশ্যক।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও উত্যক্তকরণ বন্ধে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
- জেলা পর্যায়ে ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে নারী চিকিৎসক দিতে হবে এবং ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুর মেডিকেল পরীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- তরুণসমাজ, পুরুষসহ সাধারণ জনগণের মাঝে নারী ও কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও নির্মূল বিষয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করতে হবে।
- তরুণসমাজকে ভয়াবহ নেশার আগ্রাসন থেকে মুক্ত করতে হবে। তরুণদের মাঝে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বাড়াতে হবে।
- রাজনৈতিক দলের সংস্কৃতি পরিবর্তন করতে হবে এবং নারীবান্ধব হতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জেন্ডার সংবেদনশীল হতে হবে।
- নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সহায়ক ও পর্যবেক্ষক কমিটি শহর, গ্রাম ও এলাকাভিত্তিক হতে হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা বিশেষ করে ধর্ষণ, গণধর্ষণের মামলা দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।
- ডিএনএ টেস্ট নিশ্চিত করতে হবে এবং এর ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।
- চব্বিশ ঘন্টা হেল্প লাইন এর ব্যবস্থা করা এবং এর প্রচার যেন নির্যাতনের শিকার নারী খুব সহজে অভিযোগ জানাতে পারে।
- রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী ও শিশুর শিকার হওয়া বিভিন্ন নির্যাতন সম্পর্কে ডাটাবেইজ তৈরি করা ও তা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নারী নির্যাতন পরিস্থিতি গবেষণা কাজের পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতনের আইন সম্পর্কে তাদের জানানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেন তারা নির্যাতনকে চিহ্নিত করতে পারে ও তার প্রতিরাধে ও প্রতিকারের পদক্ষেপ নিতে পারে।
- গণমাধ্যমের কর্মীদের নির্যাতনের সংজ্ঞাগুলো স্পষ্টভাবে জানা এবং এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলো স্পষ্টভাবে ও সঠিক তথ্য দিয়ে প্রকাশ করা এবং রিপোর্টের ফলোআপ করা।
- গণমাধ্যমে নির্যাতিতার নারীর নাম, ঠিকানা ও ছবি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করতে হবে।
- যেসব আইনে শিশুর বয়সের তারতম্য রয়েছে সেগুলোর সংশোধনপূর্বক শিশু সংক্রান্ত সকল আইনে শিশুর বয়সের সমন্বয় করা আবশ্যক।
- শিশুদের জন্য পৃথক অধিদপ্তর, জাতীয় শিশু নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কাঠামো গঠন, শিশু বিষয়ক যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণে প্রধান কর্তৃপক্ষ হিসেবে শিশুশ্রম ইউনিটি সক্রিয় করা, শিশুদের পৃথক বাজেট ঘোষণা, শিশুদের রাজনৈতিক কাজে অপব্যবহার বন্ধ এবং শিশু বিষয়ক জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে কতিপয় সুপারিশ : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিবিধানে নিচের সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করা যেতে পারে :

Dhaka University Institutional Repository

- শ্রম সংক্রান্ত মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)[১] পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- ক্ষতিপূরণের বেলায় আইএলওর নির্দেশনা পরিপূর্ণ অনুসরণ করা আবশ্যক।
- ট্রেড ইউনিয়নকে[২] স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়া প্রয়োজন।
- আইনের মাধ্যমে শ্রমিকের চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদান করা জরুরি।
- শ্রম আদালতে বিচারকার্য শেষ হওয়ার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া ও তার যথাযথ পর্যবেক্ষণ জোরদার করা বাঞ্ছনীয়।
- শ্রমিকের যৌন হয়রানি বন্ধে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।
- শ্রমিকের সুবিধার্থে শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার।
- কর্মক্ষেত্রে যে-কোনো ধরনের হয়রানির জন্য সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান করা জরুরি।
- শ্রমিকদের জন্য দুর্ঘটনা বীমার ব্যবস্থা করা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

উপরিউক্ত সুপারিশমালা গবেষণালব্ধ জ্ঞানের ফলাফলের আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ যদি উক্ত সুপারিশমালার আলোকে তাদের কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হন তাহলে দেখা যাবে বাংলাদেশের সমাজে বর্তমানে দৃশ্যমান নিরাপত্তাহীনতার যে চিত্র রয়েছে তা মুছে গিয়ে সেখানে পরিপূর্ণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার আবহ অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হতে থাকবে।

---

১. ADR : Alternative Dispute Resolution. see. https://rahmansc.com/alternative-dispute-resolution/, visited on 10.05.2019

২. শ্রমিকগণ কর্তৃক তাদের কাজের শর্তাবলি উন্নয়নের লক্ষ্যে সংগঠিত তৎপরতা। দ্র. সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলাপিডিয়া*(ঢাকা : বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি, ২০০৪), খ.৪, পৃ. ১৪৫-১৪৬

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলাম শান্তি, শৃঙ্খলা, সামাজিকতা ও নিরাপত্তার ধর্ম। বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্র না হলেও বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হিসেবে পরিচিত। সাংবিধানিক আইনে ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশের নাগরিকগণ স্ব-স্ব ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করে থাকেন। সে হিসেবে বাংলাদেশের মুসলিমগণ ইসলামি আইনের ভিত্তিতে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রমগুলো ব্যক্তিগত ইবাদত পরিপালন হিসেবে বাস্তবায়ন করে থাকেন। সাথে সাথে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোও সমান ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। দৃশ্যত দু'টি ধারা মনে হলেও উভয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনোরূপ সাংঘর্ষিক সম্পর্ক নেই। বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

এ গবেষণায় প্রথমে ইসলাম ও ইসলামি সমাজের পরিচিতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে ইসলামি আইন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ সামাজিক নিরাপত্তার ধরন, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, ক্ষেত্র ও পরিসীমা বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বাংলাদেশ পরিচিতি, সমাজের পরিচয়, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন স্তর এবং বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তায় বাংলাদেশের আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং গ্রামীণ শাসন বিভাগের অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। পরিশেষে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তার বাস্তব প্রায়োগিক অবস্থা জানার জন্য নারী, শিশু, শ্রমিক এবং অন্যান্য নাগরিকের নিরাপত্তা অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণা অভিসন্দর্ভকর্ম শেষ করে ও সমীক্ষার মাধ্যমে সমাজ বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীগণের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সংগ্রহ করে সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক সমস্যাবলী উদ্ঘাটন করে সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইসলামি আইন মহান আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রচলিত আইন মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রণয়ন করেন। মানুষ কর্তৃক প্রণীত প্রচলিত এসব আইনে অনেক কল্যাণকর দিক থাকা সত্ত্বেও এর মধ্যে যে যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকতে পারে এবং এগুলো সকল ক্ষেত্রে স্থায়ী নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি তাও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশে যে সাংবিধানিক আইন চালু আছে তাতে দেশ স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও এদেশের জনগোষ্ঠী প্রচলিত আইনের আওতায় সকল সুফল ভোগ করতে পারছে না। আজ সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় হাহাকার, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা।

এরপর এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর সকল সৃষ্টিকে রিযিক দেয়ার দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। এ উদ্দেশ্যে সমগ্র আসমান-যমিন ও এ দু'য়ের মাঝে অবস্থিত যাবতীয় শক্তি, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, মেঘ-বৃষ্টি, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, গাছপালা-তৃণলতাসহ পুরো প্রকৃতিকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। একমাত্র মানুষকে তিনি রিযিক সন্ধান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সা. রিযিক সন্ধানের উপায়সমূহ বলে দিয়েছেন। মানুষ যদি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী রিযিকের সন্ধানে বের হয় তাহলে কোনো মানুষই রিযিক থেকে বঞ্চিত থাকবে না– তাও আল্লাহ ও তাঁর রাসুল বলে দিয়েছেন। মূলত

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে জীবনবিধান দিয়েছেন, সে বিধানই মানুষকে রিযিকের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

পরবর্তীতে দেখানো হয়েছে যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাষ্ট্রে শাসকগণ আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষসহ সকল প্রাণী, জীব-জন্তুর রিযিক তথা সামাজিক নিরাপত্তা দানের জন্য দায়িত্বশীল। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে পরকালে তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। রাসুল সা. এবং খুলাফায়ে রাশিদার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে এ দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করা হয়েছে। তাদের শাসনামলে অসহায়, অবহেলিত, নিঃস্ব জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে যে নজির সৃষ্টি করেছেন তা আজও স্মরণীয় হয়ে আছে এবং চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে ইসলামের উপায়সমূহ বিশেষ করে কাজ করা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি দায়িত্ব পালন, যাকাত ব্যবস্থা, বাইতুল মালের দায়িত্ব পালন, যাকাত ছাড়াও অন্যান সম্পদের হক আদায়, আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় ও সদকা, ওয়াকফ, মোহর ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া ইয়াতিম, বিধাবা, বেকার, শ্রমিক ও অমুসলিমদের সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। উত্তরাধিকার, সুদ নিষিদ্ধকরণ, অসিয়াত, আমানত, করযে হাসানা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এ গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

ইসলামে সম্পদ পুঞ্জিভুত ও মজুতদারি করে রাখা এবং তা অলসভাবে ফেলে রাখারও (Idle Money) কঠোর সমালোচিত হয়ে থাকে। ইসলাম প্রত্যেক নগদ সম্পদ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছলেই তার উপর যাকাত ফরয করে দিয়েছে। এ সম্পদেও মালিক তা থেকে উপকৃত হোক বা না হোক। এ নিয়মে প্রত্যেক বিত্তশালীদের ব্যবসায় নিজের পুঁজি বিনিয়োগে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ প্রতি বছর তার যাকাত দিতে দিতেই যেন তার অর্থ শেষ হয়ে না যায়। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সে সমাজে দরিদ্র ও বেকার থাকে না এবং বিত্তশালীরা নিজের সম্পদ ব্যয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করে; ফলে সমস্যা সহজেই সমাধান হয়।

মানুষ আদর্শিক নীতির তুলনায় বাস্তব ঘটনা বেশি বিশ্বাস করে। এখানে কতিপয় জীবন্ত উদাহরণ দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা কায়িমের মাধ্যমে দরিদ্র ও বুভুক্ষাকে ইসলামি ব্যবস্থা কিভাবে মুকাবিলা করেছে এবং চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা এবং ইনসাফের ভিত্তিতে কেমন করে স্বচ্ছলতা ও সুখ-শান্তির জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দেখানো হয়েছে। এ জীবন ব্যবস্থা আজও উত্তম ফল দিতে পারে যদি তা ভালভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা যায় ও তার আহকাম এবং হিদায়াত থেকে পুরোপুরি উপকার নেয়া যায়। এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে সম্পদের সহজপ্রাপ্যতা, সার্বিক সুখ-শান্তি এবং সামষ্টিক কল্যাণের এক নবতর যুগের সূচনা হবে।

রাসুলুল্লাহ সা. ও খুলাফায়ে রাশিদিনের শাসনকাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম এবং ইনসাফ কায়িমের কয়েক বছরের মধ্যেই মুসলিমগণ কিভাবে ধনবান, অর্থনেতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ, দৃঢ় ও স্বাবলম্বী হয়েছিলেন। এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা বিশ্বে আর কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মুসলিম জাতি দুর্ভাগ্যবশত এ নযিরবিহীন জীবনব্যবস্থার বরকত থেকে আজ বঞ্চিত রয়েছে। তার কারণ হলো, যালিমরা তার উপর জোরপূর্বক চেপে বসে আছে এবং ধনসম্পদের উপর পুরোপুরি দখল প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ বিশ্বে ৫৭টি মুসলিম দেশ রয়েছে যারা ওআইসির সদস্য। কিন্তু জানা মতে একটি রাষ্ট্রেও ইসলাম ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নেই। সমগ্র বিশ্বের মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

ভাই ভাই। অতএব যখন কোনো বিশেষ এলাকার বা দেশের বাসিন্দারা যাকাত এবং সদাকার মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যাবে এবং সেখানকার বিত্তবানদের যাকাত থেকে গরিবদের প্রয়োজনাবলী পূরণের পর কিছু বেঁচে থাকলে তখন তা দিয়ে অন্য কোনো এলাকার গরিবদের প্রয়োজনাবলী পূরণ করা ফরয। বর্তমানে ওআইসি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলামি বিশ্বে ইসলাম ঘোষিত সামাজিক নিরাপত্তা কোথাও পুরোপুরি চালু আছে বলে জানা নেই। এখানে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধু তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে তা বাস্তবায়ন করার মত তাদের পর্যাপ্ত সুযোগ ও সামর্থ রয়েছে।

বাংলাদেশে যে সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাতে দেশ স্বাধীনতার ৪৮ বছর পরেও এদেশের জনগোষ্ঠী তার পুরোপুরি সুফল পাচ্ছে না। আজ সর্বক্ষেত্রে যে হাহাকার, নৈরাজ্য, বিরাজ করছে তা থেকে উত্তরণের পথ দেখানো হয়েছে। আজ বাংলাদেশে যদি ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু থাকত যেমন– যাকাত, সদকা, বাইতুল মাল, খারাজ, ‘উশর, খুমুস, ওয়াকফ, মোহর, মিরাছ ইত্যাদির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হত এবং পুরোপুরি ইসলামি আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হত তাহলে এদেশে একজনও দরিদ্র খুঁজে পাওয়া যেত না। ইসলামের সুবাতাস প্রতি ঘরে ঘরে অবিরত প্রবাহিত হত।

বাস্তবতার নিরিখে এ কথা বলা যায় যে, ইসলাম যে ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার নির্দেশনা দিয়েছে তার কিয়দাংশ আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে আমেরিকা, ইউরোপ ও অষ্ট্রেলিয়াসহ অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রে বিদ্যমান আছে। তারা একে ধর্মের নামে প্রচার না করে সাধারণ মানবীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থেকেই সীমিত আকারে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তাতেই তারা অনেক সুফল পাচ্ছে। এরপরও যদি কোনো রাষ্ট্রে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাহলে সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়ে দারিদ্র্যের চির অবসান ঘটবে। মানুষ শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার সাথে সমাজে জীবনযাপন করবে এবং সমগ্র সমাজে দানের মুখাপেক্ষী কোনো অভাবী ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেখা যাবে দাতা তার কাছে দান করার উদ্দেশ্যে রক্ষিত সম্পদের বোঝা মাথায় নিয়ে দান গ্রহীতার সন্ধানে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে; কিন্তু গ্রহীতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। আর এটিই হবে ইসলামি আইনের আলোকে প্রণীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তব চিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট : সাক্ষাৎকার অনুসূচি

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায় : বিশেষজ্ঞ ও ভুক্তভোগীদের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (বিশেষজ্ঞ দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Specialist

পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা কতটুকু প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি আইনের প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে, কোনো সমস্যা আছে কি-না, সমস্যা থাকলে তা থেকে উত্তরণের উপায় কি? এসব বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হবে।

১. নাম : ... ...
২. পেশা : ... ...
৩. পদবী : ... ...
৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... ...
৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) এস.এস.সি (খ) এইচ.এস.সি (গ) গ্রাজুয়েট (ঘ) পোস্ট গ্রাজুয়েট (ঙ) অন্যান্য

৬ . আপনার পেশা কি ? (ক) চাকুরি (খ) ব্যবসা (গ) রাজনীতি (ঘ) অন্যান্য

৭. আপনি বর্তমান এই পেশা কেন বেছে নিলেন?
(ক) সামাজিক পদমর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য (খ) স্মার্ট সেলারি প্রাপ্তির জন্য (গ) স্বচ্ছল ও স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-যাপন করার জন্য (ঘ) বাংলাদেশের প্রচলিত আইন বাস্তবায়নে অংশ নিতে (ঙ) ইসলামি আইন বাস্তবায়নে অবদান রাখার জন্য (চ) নিরুপায় হয়ে (ছ) কোনোটিই নয়

৮. ইসলামি আইন ও প্রচলিত আইনের মধ্যকার পার্থক্য কতটুকু?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন পার্থক্য নেই (ঙ) মন্তব্য নেই।

৯. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ইসলামি আইনসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?
(ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

১০. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় বাংলাদেশি আইনসমূহ কতখানি ভূমিকা রাখছে?
(ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা নেই (ঙ) মন্তব্য নেই

১১. সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে কোন ধরনের আইনে আপনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন? (ক) বাংলাদেশের প্রচলিত আইন (খ) ইসলামি আইন (গ) বৃটিশ আইন (ঘ) মন্তব্য নেই

১২. বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না ?

Dhaka University Institutional Repository

(ক) সম্পূর্ণ সম্ভব (খ) মোটামুটি সম্ভব (গ) স্বল্প সম্ভব (ঘ) সম্ভব না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৩. সামাজিক নিরাপত্তা ও গ্রামীণ শাসন বিভাগ সম্পর্কে জনগণ কতখানি জানেন ?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন কিছু জানেনা (ঙ) মন্তব্য নেই

১৪. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশি আইন কতখানি কার্যকর হয়েছে? (ক) পর্যাপ্ত (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৫. ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন? (ক) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অসহযোগিতা (খ) চাপ প্রয়োগ (গ) আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা (ঘ) ঘুষ ও দুর্নীতি (ঙ) আঞ্চলিকতা ও স্বজনপ্রীতির সমস্যা (চ) কোনো সমস্যা নেই (ছ) মন্তব্য নেই

১৬. ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানে করণীয় কি? (ক) জনগণকে মোটিভিশন (খ) দ্রুত সেবা প্রদান (গ) যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান (ঘ) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা (ঙ) কোনো সমস্যা নেই (চ) মন্তব্য নেই

১৭. নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) তেমন ভুমিকা রাখছে না (গ) স্বল্প (ঘ) মোটামুটি (ঙ) মন্তব্য নেই

১৮. নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৯. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২০. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২১. শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২২. শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?
(ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ওয়াকিফহাল নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৩. বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রয়োগ করে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৪. বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৫. বিশ্ব রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মুকাবিলায় ইসলামি আইন বাস্তবায়ন কতখানি সক্ষম? (ক) পুরোপুরি সক্ষম (খ) মোটামুটি সক্ষম (গ) স্বল্প সক্ষম (ঘ) মোটেও সক্ষম নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৬. বাংলাদেশে ইসলামি আইন বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর হতে পারে? (ক) ইসলামি আইন বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে (খ) স্বতন্ত্র ইসলামি আইন প্রবর্তন করে (গ) নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে (ঘ) উপরের সবগুলো

২৭. বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় কী? (ক) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছা (খ) রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব পরিহার (গ) নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটানো (ঘ) জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রত করণ (ঙ) উপরের সবগুলো

Dhaka University Institutional Repository

২৮. আপনি কী মনে করেন যে, সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন প্রচলিত আইন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর? (ক) অপেক্ষাকৃত বেশি কার্যকর (খ) অপেক্ষাকৃত কম কার্যকর (গ) মোটামুটি কার্যকর (ঘ) মন্তব্য নেই

২৯. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে কীভাবে সামাজিক নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে রক্ষা করা সম্ভব? (ক) বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় ইসলামি আইনের প্রসার ঘটিয়ে (খ) বাংলাদেশে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনে সামাজিক নিরাপত্তার প্রসঙ্গটি প্রাধান্য দিয়ে (গ) সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণই আইনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত (ঘ) উপযুক্ত আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইন কার্যকরীকরণ ও প্রয়োগে অধিক জোর দিয়ে (ঙ) শক্তিশালী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুনিশ্চিতকরণ (চ) উপরের সবগুলো

৩০. বর্তমানে বাংলাদেশের প্রচলিত আইন দ্বারা সামাজিক নিরাপত্তা রক্ষিত হচ্ছে না কেন? (ক) বর্তমানে প্রচলিত আইন ত্রুটিপূর্ণ (খ) ইসলামি আইনের প্রয়োগ নেই (গ) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার অভাব রয়েছে (ঘ) বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে জনগণের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে প্রাধান্য না দেয়া (ঙ) সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

সামাজিক নিরাপত্তায় ইসলামি ও প্রচলিত আইন প্রয়োগে প্রতিবন্ধকতা ও তা দূরীকরণের উপায় : বিশেষজ্ঞ ও ভুক্তভোগীদের উপর জরিপের প্রশ্নপত্রের নমুনা কপি

(এ জরিপ শুধুমাত্র গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য)

সাক্ষাৎকার বিবরণী (ভুক্তভোগী দৃষ্টিকোণ)

Questionnaire for the Sufferers

পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনাম

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তার বিধান

ইসলাম ও বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা কতটুকু প্রতিফলিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামি আইনের প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে, কোনো সমস্যা আছে কি-না, সমস্যা থাকলে তা থেকে উত্তরণের উপায় কি? এসব বিষয়ে ভুক্তভোগীগণের মতামতের উপর ভিত্তি করে এ প্রশ্নমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত হবে।

১. নাম : ... ...

২. পেশা : ... ...

৩. পদবী : ... ...

৪. বয়স/জন্ম তারিখ : ... ...

৫. শিক্ষাগত যোগ্যতা : (ক) অষ্টম শ্রেণী পাশ (খ) এস.এস.সি (গ) এইচ.এস.সি (ঘ) গ্রাজুয়েট (ঘ) অন্যান্য

৬ . আপনার পেশা কি ? (ক) চাকুরি (খ) ব্যবসা (গ) রাজনীতি (ঘ) অন্যান্য

৭. আপনার উক্ত পেশার সেক্টরভিত্তিক ধরন কি? (ক) পরিবহণ (খ) তৈরি পোশাক (গ) কৃষি (ঘ) চা শিল্প (ঙ) অন্যান্য

৮. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন অবহিত নই (ঙ) মন্তব্য নেই

৯. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে শিশুদের সামাজিক নিরাপত্তা কিরূপ? (ক) অনেক ভাল (খ) মোটামুটি ভাল (গ) স্বল্প ভাল (ঘ) তেমন ভাল নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

১০. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে নারীর সামাজিক নিরাপত্তা কীরূপ? (ক) অনেক ভাল (খ) মোটামুটি ভাল (গ) স্বল্প ভাল (ঘ) তেমন ভাল নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

১১. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সাধারণ মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা কিরূপ? (ক) অনেক ভাল (খ) মোটামুটি ভাল (গ) স্বল্প ভাল (ঘ) তেমন ভাল নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

১২. বাংলাদেশে ইসলামি আইন প্রয়োগে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না? (ক) সম্পূর্ণ সম্ভব (খ) মোটামুটি সম্ভব (গ) স্বল্প সম্ভব (ঘ) সম্ভব না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৩. বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি-না? (ক) সম্পূর্ণ সম্ভব (খ) মোটামুটি সম্ভব (গ) স্বল্প সম্ভব (ঘ) সম্ভব না (ঙ) মন্তব্য নেই

Dhaka University Institutional Repository

১৪. প্রান্তিক পর্যায়ের জনসাধারণের কাছে ইসলামি ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতখানি কার্যকর রয়েছে? (ক) পর্যাপ্ত (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৫. ইসলামি আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কার্যকরের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা রয়েছে? (ক) আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির অসহযোগিতা (খ) চাপ প্রয়োগ (গ) আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রিতা (ঘ) কোনো সমস্যা নেই (ঙ) মন্তব্য নেই

১৬. ১৫ নং প্রশ্নে উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে করণীয় কী?   (ক) জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি (খ) আইন প্রয়োগে দ্রুত সেবা প্রদান (গ) যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান (ঘ) কোনো সমস্যা নেই (ঙ) মন্তব্য নেই

১৭. নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে?   (ক) সম্পূর্ণ (খ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (গ) স্বল্প (ঘ) মোটামুটি (ঙ) মন্তব্য নেই

১৮. নারীর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

১৯. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২০. শিশুর নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২১. শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ভূমিকা রাখছে না (ঙ) মন্তব্য নেই

২২. শ্রমিকের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) অনেক (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) তেমন ওয়াকিফহাল নই (ঙ) মন্তব্য নেই

২৩. সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় ইসলামি আইন কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৪. সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা রক্ষায় বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রয়োগে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে? (ক) সম্পূর্ণ (খ) মোটামুটি (গ) স্বল্প (ঘ) মোটেও নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৫. বর্তমানে বাংলাদেশে নারী ও শিশু নিরাপত্তা পরিস্থিতি কেমন? (ক) ভাল (খ) মোটামুটি ভাল (গ) খুব ভাল না (ঘ) মোটেও ভাল নয় (ঙ) মন্তব্য নেই

২৬. বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বাস্তবায়নে করণীয় কী? (ক) রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সদিচ্ছার প্রতিফলন (খ) রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব পরিহার করা (গ) নেতৃস্থানীয় লোকদের মাঝে ইসলামি জ্ঞানের প্রসার ঘটানো (ঘ) জনগণের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা জাগ্রত করণ (ঙ) উপরের সবগুলো

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি উৎস

১. القرآن الكريم وتفسير القران الكريم

২. أبو عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري : صحيح البخاري، بيروت : دار ابن كثير للنشر والطباعة، الطبعة الأولى ১৪২৩هـ

৩. أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري : الصحيح لِمسلم، دمشق : دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ১৪১৬هـ

৪. أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي : جامع الترمذي، لاهور : مكتبة العلم بدون التاريخ

৫. أبو داود سليمان بن الأشعث : سنن أبي داود، الرياض : مكتبة دار السلام، ২০০৮م

৬. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي : سنن نسائي، الرياض : بيت الأفكار الدولية، ১৪২০هـ

৭. أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني : سنن ابن ماجه، بيروت : دار الفكر، ১৪২৪هـ

৮. شاه ولي الله الدهلوي : حجة الله البالغة، بيروت : دار الفكر، ১৪১০هـ

৯. الفقه الإسلامي وأصوله

বাংলা উৎস

১০. মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী : *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন*, অনূঃ ও সম্পা. মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

১১. মুহাম্মদ আলাউদ্দীন আল-আযহারী : *আরবী বাংলা অভিধান*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

১২. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান [আল-মু'জামুল ওয়াফী]*, ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, ২০১৭

১৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ফিকহে হানাফরি ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১৪

১৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ফাতাওয়া ও মাসাইল*, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০১৫

১৫. সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. : *ইসলামের পরিচয়*, অনূ. মাওলানা হাবীবুর রহমান, ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১৭

১৬. ড. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম : *ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ*, ঢাকা : আইসিএস পাবলিকেশন, ২০১৪

১৭. এ.জেড.এম. শামসুল আলম : *ইসলাম ও হিন্দুধর্ম*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৫

১৮. ড. মুস্তফা আস-সিবায়ি : *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, অনূ. আকরাম ফারুক, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৭

১৯. সাইয়েদ কুতুব শহীদ : *ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা*, অনূ. আবদুল খালেক, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০১৭

২০. হাসান আইউব : *ইসলামের সামাজিক আচরণ*, অনূ. এ.এন.এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০১৪

২১. মুফতি মুহাম্মদ তকি উসমানি : *ইসলামী জীবনব্যবস্থা*, অনূ. মুফতি মুহাম্মদ তৈয়্যেব হোসাইন, ঢাকা : বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

২২.	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী	:	*ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান*, অনূ. আবদুস শহীদ নাসিম প্রমূখ, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৩
২৩.	মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম	:	*আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৭
২৪.	মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম	:	*ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯
২৫.	শামসুল আলম	:	ইসলামী রাষ্ট্র, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯৫
২৬.	ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.	:	শরীয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থা, অনূ. জুলফিকার আহমদ কিসমতী, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৮
২৭.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	*ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, নভেম্বর ১৯৯৮
২৮.	মোহাম্মদ জিয়াউল হক	:	*আল কুরআনের আলোকে অর্থনীতি*, ঢাকা : প্রিয়বই প্রকাশনী, ২০০২
২৯.	এ. জেড. এম. শামসুল আলম	:	*ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ইফাবা, নভেম্বর ২০০৩
৩০.	এম. এ হামিদ	:	*ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*, অনুবাদ ও সম্পাদনা, প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২
৩১.	প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	:	*ইসলামী অর্থনীতি : নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল, ২০০৫
৩২.	এম. এ মান্নান	:	*ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, অনূ. আলী আহমেদ রুশদী, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩
৩৩.	ড. এম ওমর চাপড়া	:	*ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, অনূ. ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা : বিআইআইটি, ২০০০
৩৪.	ড. এম ওমর চাপড়া	:	*ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, অনূ. ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব প্রমূখ, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০
৩৫.	মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, মে ১৯৯৬
৩৬.	মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী	:	*ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা*, অনূ. ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইফাবা, জুন ১৯৯৫
৩৭.	প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৪
৩৮.	মোঃ শামসুল কবির খান	:	*বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, ডিসেম্বর ২০০০
৩৯.	মাওলানা হিফজুর রহমান	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা*, অনূ. মাওলানা আব্দুল আওয়াল, ঢাকা : ইফাবা, মার্চ ২০০২
৪০.	মুহাম্মদ আকরাম খান	:	*রাসূলুল্লাহ সা.-এর অর্থনৈতিক শিক্ষা*, অনূ. নূর হোসের মজিদী, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৯
৪১.	ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ	:	*ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১০
৪২.	আনু মাহমুদ	:	*ক্রান্তিকালীন অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯
৪৩.	সম্পাদনা পরিষদ	:	*ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪
৪৪.	সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী	:	*ইসলামী অর্থনীতি*, অনূ. আব্বাস আলী খান প্রমূখ, ঢাকা :

Dhaka University Institutional Repository

শতাব্দী প্রকাশনী, ২০১৫

৪৫. ইকবাল কবীর মোহন : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : জেরিন পাবলিশার্স, ২০১৬

৪৬. ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, অনূ. মুহাম্মদ আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৩

৪৭. এম. আজিজুর রহমান : *আধুনিক ব্যষ্টিক অর্থনীতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯২

৪৮. ড. নাজাতুল্লাহ সিদ্দিকী : *ইসলামী অর্থনীতিতে বীমা*, অনূ. অধ্যাপক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭

৪৯. মুহাম্মদ লোকমান হাকীম : *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১২

৫০. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৯

৫১. নুরুল ইসলাম মানিক : *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১৩

৫২. মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন : *ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা*, ঢাকা : রাহনুমা প্রকাশনী, ২০১৪

৫৩. ফারিশতা জ.দ. যায়াস : *যাকাতের আইন ও দর্শন*, অনূ. হুমায়ুন খান, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৪

৫৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ওয়াকফ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল*, ঢাকা ; ইফাবা, ২০১৩

৫৫. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী : *ইসলামের যাকাত বিধান*, অনূ. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮

৫৬. ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান : *ইসলামে পরিবার ও পারিবারিক কল্যাণ*, ঢাকা : সবুজপত্র, ২০১৪

৫৭. গাজী শামছুর রহমান : *ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮১

৫৮. নূরুল ইসলাম : *ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৬

৫৯. আবদুস শহীদ নাসিম : ইসলামের পারিবারিক জীবন, ঢাকা : বর্ণালি বুক সেন্টার, ২০১৪

৬০. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম : *ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান লালন পালন ও আধুনিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : সমাচার, ২০১৬

৬১. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫

৬২. এ. বি. এম হোসাইন : *ইসলামে বাণিজ্য আইন*, অনূ. এম রুহুল আমিন, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০০

৬৩. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, নভেম্বর ২০১৫

৬৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, মে ২০১৭

৬৫. মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী : *ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি*, অনূ. আবদুল মান্নান তালিব, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ডিসেম্বর ২০১৭

৬৬. মুহাম্মদ রুহুল আমিন : *ইসলামী আইনের উৎস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, আগস্ট ২০১৩

৬৭. এ. বি. সিদ্দিক : *চুক্তি আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাইস, নভেম্বর ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী : *আল-হিদায়া*, অনূ. মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ, ঢাকা : ইফাবা, এপ্রিল ২০১৪

৬৯. ড. মুসতাফা হুসনী আস-সুবায়ী : *ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ*, অনূ. এ.এম.এম. সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা : ইফাবা, মে ২০০৭

৭০. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ইফাবা, অক্টোবর ২০০৪

৭১. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ : *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইফাবা, ফেব্রুয়ারি ২০১০

৭২. আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী : *ইসলামে হালাল-হারামের বিধান*, অনূ. মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, ঢাকা : কায়রুন প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭

৭৩. আল্লামা মুফতী সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান : *ফিকহুস সুনানি ওয়াল আছার*, অনূ. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, ঢাকা : ইফাবা, সেপ্টেম্বর ২০১০

৭৪. বিচারপতি মওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *সুদ নিষিদ্ধ পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*, অনূ. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, মার্চ ২০০৭

৭৫. ডি.এফ. মুল্লা : *মুসলিম আইনের মূলনীতি*, অনূ. শেখ মতলুব আহমদ, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১

৭৬. মোহাম্মদ মজিবর রহমান : *মুসলিম ও পারিবারিক আইন পরিচিতি*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১

৭৭. মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০১৭

৭৮. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১৫

৭৯. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৪

৮০. ড. আহমদ আলী : *ইসলামের শাস্তি আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৫

৮১. ড. মোঃ ইব্রাহীম খলিল : *ইসলামে সামাজিক ব্যবস্থা ও পরিবার কল্যাণ*, ঢাকা : মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ২০১২

৮২. ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ : *ইসলামে শ্রমিকের অধিকার*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৪

৮৩. মোঃ আনসার আলী খান : *মুসলিম আইন*, ঢাকা : বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০০০

৮৪. সালাহউদ্দীন : *মৌলিক মানবাধিকার*, অনূ. মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল বাশার আখন্দ, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৭

৮৫. মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন : *ইসলামে মানবাধিকার*, অনূ. মুহাম্মদ আবুত তাওয়াম, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯২

৮৬. মুহম্মদ মতিউর রহমান : *মানবাধিকার ও ইসলাম*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০১৭

৮৭. ড. মোঃ মশিউর রহমান : *বিদায় হজ্জের ভাষণে মানবাধিকার*, ঢাকা : ইফাবা, ২০১৬

৮৮. আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১১

৮৯. প্রফেসর মোঃ আব্দুল করিম : *বাংলায় মুসলিম শাসনের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্রন্থ কুটির, ২০১৬

৯০. সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলাদেশের উৎপত্তি ও বিকাশ*, ঢাকা : ইফাবা, ২০০৮

৯১. মওদুদ আহমদ : *বাংলাদেশ*, অনূ. জগলুল আলম, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৭

৯২. মুনতাসির মামুন : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : সুবর্ণ, ২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

৯৩. ড. এ.এইচ.এম. মাহবুবুর রহমান : *স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস*, ঢাকা : সামী-সীমান্ত পাবলিকেশন্স, ২০১৬

৯৪. হেলাল হামিদুর রহমান : *বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

৯৫. তালুকদার মনিরুজ্জামান : *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংকট ও উত্তরণ*, ঢাকা : বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ২০০১

৯৬. আকবর আলি খান : *অবাক বাংলাদেশ বিচিত্র ছলনাজালে রাজনীতি*, ঢাকা : প্রথমা, ২০১৭

৯৭. এম হেলাল : *বাংলাদেশ ও বিশ্ব অধ্যয়ন*, ঢাকা ; ক্যাম্পাস পাবলিকেশন্স, ২০১৪

৯৮. আবদুল আওয়াল মিন্টু : *বাংলাদেশ : পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, ঢাকা : ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৪

৯৯. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন : *বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা : বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৩

১০০. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, অনূ. মোহাম্মাদ আসাদুজ্জামান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২

১০১. সিরাজুল ইসলাম : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলাদেশ এসিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০

১০২. রমেশচন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১২

১০৩. নীহাররঞ্জন রায় : *বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪২১ বঙ্গাব্দ

১০৪. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাঙ্গালার ইতিহাস*, কলাকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

১০৫. সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১২

১০৬. ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস*, ঢাকা : অধুনা প্রকাশন, ২০০৩

১০৭. মুসা আনসারী : *ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯২

১০৮. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম : *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬

১০৯. ড. অতুল সুর : *বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন*, কলকাতা : সাহিত্যলোক, ২০১৭

১১০. ইবনে খালদুন : *আল-মুকাদ্দিমা*, অনূ. গোলাম সামদানী কোরায়শী, ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০১৭

১১১. আবদুল হালিম : *পৃথিবীর ইতিহাস*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০০৮

১১২. নিজাম উদ্দিন আহমেদ : *পৃথিবীর আদিম সমাজ*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭০

১১৩. এ.এফ. ইমান আলি : *সমাজতত্ত্ব*, ঢাকা : সেন্টার ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৯৩

১১৪. মিয়া মুহম্মদ সেলিম : *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৯

১১৫. ডঃ এমাজউদ্দীন : *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ২০০৬

১১৬. ডঃ সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম : *রাষ্ট্র বিজ্ঞান*, ঢাকা : হাসান বুক হাউস, ২০০২

১১৭. গোলাম মোস্তফা চৌধুরী : *রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিচিতি*, ঢাকা : গ্রন্থকুটির, ২০১০

১১৮. মোঃ কামরুল ইসলাম : *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : কোয়ালিটি পাবলিকেশন, ২০১৭

১১৯. অধ্যক্ষ মোঃ জহিরুল ইসলাম : *বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, ঢাকা : কনফিডেন্স প্রকাশনী, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

১২০. টম বটোমোর : *সমাজবিজ্ঞান*, অনূ. কাজী ফারহানা আকতার ও সাদাত উল্লাহ খান, ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০১৪

১২১. আবুল আসাদ : *যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম সমাজ*, ঢাকা : এপিক পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৬

১২২. হানস হাইনজ হোলজ : *সমাজ দর্শন ও পরিবর্তন*, অনূ. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪

১২৩. রেবতী বর্মণ : *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : দি স্কাই পাবলিশার্স, ২০১৬

১২৪. সৈয়দ মকসুদ আলী : *রাষ্ট্রবিজ্ঞান*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৩

১২৫. ড. মোঃ মকসুদুর রহমান : *রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০১২

১২৬. এবনে গোলাম সামাদ : *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা : মজিদ পাবলিকেশন, ২০১৯

১২৭. মোঃ আসাদুজ্জামান : *সামাজিক ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা*, ঢাকা : কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৫

১২৮. মোঃ নূরুল ইসলাম : *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, ঢাকা : ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০১২

১২৯. সম্পাদনা বোর্ড : *সমাজবিজ্ঞানের উপাদান*, ঢাকা : অনু প্রকাশনী, ২০১২

১৩০. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম : *মানবাধিকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমাজকর্ম*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩

১৩১. বিনয় ঘোষ : *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ঢাকা : বুক ক্লাব, ২০১৫

১৩২. T. A. Sinclair : *এ্যারিস্টটল-এর পলিটিকস*, অনূ. সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৮

১৩৩. ড. আহমদ আলী : *ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও মর্যাদা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১৭

১৩৪. ডঃ মরিস বুকাইলি : *মানুষের আদি উৎস*, অনূ. আখতার-উল-আলম, ঢাকা : জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৫

১৩৫. আইন মন্ত্রণালয় : *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা : বিজি প্রেস, ১৯৯৮

১৩৬. মোঃ মোবারক হোসেন ভূঁইয়া : *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ঢাকা : ইউনিভার্সেল বুক হাউস, ২০১৫

১৩৭. মোঃ নজরুল ইসলাম : *বাংলাদেশ শ্রম আইন*, ২০০৬, ঢাকা : বিজি প্রেস, ২০১৩

১৩৮. মোঃ আব্দুল হামিদ : *নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার বিষয়ক আইন*, বাংলা একাডেমী, ২০১০

১৩৯. তাহমিনা হক : *নারী অধিকার ও কয়েকটি আইন*, ঢাকা : শ্রাবণ প্রকাশনী, ২০০৭

১৪০. ড. আবুল হোসেন : *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ*, ঢাকা : মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১০

১৪১. সম্পাদনা বোর্ড : *বাংলাদেশে নারী ও কন্যা নির্যাতন চিত্র : ২০১৭*, ঢাকা : বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ২০১৮

১৪২. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী : *তথ্য অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, জাতীয় সংসদ ও নাগরিক দায়িত্বসমূহ*, ঢাকা : চেঞ্জ মেকারস, ২০১৪

Dhaka University Institutional Repository

১৪৩. এ্যাডভোকেট তানবীর উল ইসলাম সিদ্দিকী : *নারী অধিকার, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, জাতীয় সংসদ ও নাগরিক দায়িত্বসমূহ*, ঢাকা : চেঞ্জ মেকারস, ২০১২

১৪৪. সম্পাদনা পরিষদ : *শিশু অধিকার কর্মসূচি করণ*, ঢাকা : সেভ দ্য চিলড্রেন, ২০০৯

১৪৫. প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী : *রাষ্ট্র, শাসন ও রাজনীতি : প্রতিবন্ধী, শিশু, নারী ও সালিশ*, ঢাকা : সেন্টার ফর সোশ্যাল রিসার্চ, বাংলাদেশ, ২০১৭

১৪৬. ড. নিবেদিতা দাশপুরকায়স্থ : *বাংলাদেশে হিন্দু নারীর অধিকার ও পারিবারিক আইন*, ঢাকা : উৎ প্রকাশন, ২০০৯

১৪৭. এস.এ. হাসান : *গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী, ২০১৬

১৪৮. জাকির উদ্দিন আহমদ : *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন*, ঢাকা : রহিম ল' বুক হাউস, ২০১৭

১৪৯. জগলুল আহমেদ চৌধূরী : *শিশু ও নারী উন্নয়নে অগ্রগতি*, ঢাকা : বাসস, ২০০৭

১৫০. মুহম্মদ আবদুল জলিল : *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১

১৫১. মুস্তাফা মজিদ : *বাংলাদেশের রাখাইন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৩

১৫২. সম্পাদনা পরিষদ : *বাংলাদেশের আইনে নারী নির্যাতন প্রসঙ্গ*, ঢাকা : আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ২০১৫

১৫৩. মোঃ আদিল হাসান চৌধুরী : *বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সমস্যা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০১০

১৫৪. ছিদ্দিকুর রহমান মিয়া : *দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপীল বিষয় আইন*, ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০১

১৫৫. হাসান মাহমুদ : *অর্থঋণ আদালত আইন*, ২০০৩, ঢাকা : নিউ ওয়ার্সী বুক কর্পোরেশন, ২০০৮

১৫৬. এ.বি. সিদ্দিক : *চুক্তি আইন*, ঢাকা : কামরুল বুক হাউস, ২০১১

১৫৭. মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান : *ইসলামী বিচার ব্যবস্থা*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১২

১৫৮. কাজী এবাদুল হক : *বিচার ব্যবস্থার বিবর্তন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮

১৫৯. মোঃ শফিকুর রহমান : *বাংলাদেশের আইন, বিচার ব্যবস্থা এবং সাংবিধানিক ক্রমবিকাশ*, ঢাকা : বিশ্বসাহিত্য ভবন, ১৯৯৮

১৬০. রুমিজ উদ্দীন আহমেদ : *প্রতিবন্ধী : বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু*, ঢাকা : মিতা ট্রেডার্স, ২০১৮

১৬১. কাবেদুল ইসলাম : *অবিভক্ত বাংলার পুলিশের ইতিহাস*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১২

১৬২. কাবেদুল ইসলাম : *বাংলাদেশের জেলা পুলিশ*, ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৪

১৬৩. আহমেদ আমিন চৌধুরী : *বাংলাদেশ পুলিশ উত্তরাধিকার ও ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা : সমাবেশ, ২০০৬

১৬৪. আহমেদ আমিন চৌধুরী : *পুলিশ আইন সহায়িকা*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০৭

১৬৫. আবদুর রহিম খান : *বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশনস (পিআরবি)*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৮

১৬৬. মোঃ মতিয়ার রহমান : পুলিশ প্রবিধানমালা বেঙ্গল, ১৯৭৩, ঢাকা : কামরুল বুক

Dhaka University Institutional Repository

হাউস, ২০১৫

ইংরেজি উৎস

167. Tamizul Haque : *Laws of Islam & their impect on human society,* Dhaka : Himel Printers, 2002

168. Justice Abdul Bari Sarker : *The Role and Status of Women in Islam,* Dhaka : IFB, 2012

169. Shah Muhammad Ahsanuzzaman : *The Fundamental Learning of Islam,* Dhaka : IFB, 2018

170. Dr. Khurshid Ahmed : *Economic Development in an Islamic Framework,* Leicester : The Islamic Foundation, 1979

171. Board of Editors : *Thought on Islamic Banking,* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 1982

172. M. Umar Chapra : *Islam and economic development : a strategy for development with justice and stability,* Islamabad : International Institute of Islamic Thoughts, Islamic Research Institute, 1993

173. Board of Editors : *Bangladesh Economic Review 2016,* Dhaka : Economic Adviser's Wing, Finance Division, Ministry of Finance, 2017

174. Board of Editors : *Statistical Year Book Bangladesh 2016,* Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2017

175. AKM Shahidul Hoque : *Police and Community with Concept of Community Policing,* Dhaka : Jatiya Mudran, 2014

অন্যান্য বই, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনসমূহ

১৭৬. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ২০১৮-২০১৯, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭৭. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো ২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭৮. বাৎসরিক বাজেট ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৭৯. ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা : হালচিত্র ২০১৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮০. সমৃদ্ধ আগামীর পথযাত্রায় বাংলাদেশ, বাজেট বক্তৃতা ২০১৯-২০, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮১. টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়ন, বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮২. মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি বিবৃতি ২০১৮-১৯ থেকে ২০২০-২১, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮৩. বিকশিত শিশু : সমৃদ্ধ বাংলাদেশ, শিশু বাজেট ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮৪. জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৮৫. কিশোর বিচার ব্যবস্তার সংস্পর্শে আসা শিশু : পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য হ্যান্ডবুক, ইউনিসেফ বাংলাদেশ কান্ট্রি অফিস, ২০০৫

১৮৬. অপারেশন ম্যানুয়াল, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dhaka University Institutional Repository

১৮৭. মাসিক পরিসংখ্যান বুলেটিন, ডিসেম্বর-২০১৭, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
১৮৮. বাংলাদেশ ব্যাংক-এর বার্ষিক প্রতিবেদন (২০১০-২০১৮)
১৮৯. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিবেদন ২০১৭-২০১৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯০. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৮
১৯১. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৯
১৯২. অর্থনীতি গবেষণা, ঢাকা, সংখ্যা ৩, নভেম্বর ২০০২; সংখ্যা ৪, জুলাই ২০০৩; সংখ্যা ১০, ডিসেম্বর ২০০৮; সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩
১৯৩. গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট, ২০১৭
১৯৪. বার্ষিক প্রতিবদেন ২০১৭-২০১৮, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৮
১৯৫. জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল : বাংলাদেশ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০১৫
১৯৬. বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা, সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন, ২০১৮
১৯৭. ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১৭
১৯৮. অপরাধ তদন্ত নির্দেশিকা, পুলিশ হেডকোয়ার্টাস, ঢাকা, বাংলাদেশ, ২০১৫
১৯৯. ওয়েবসাইট ও ইন্টারনেট।

Dhaka University Institutional Repository